উৎখনন-বিজ্ঞান

যদ্যপি কীর্ত্ত্যতে শক্তির্লেখন্যাঃ কবিভির্ভুবি।
ইতিহাসলেখনে তু খনিত্রং বলবত্তরম্॥

উৎখনন-বিজ্ঞান

সুধীর রঞ্জন দাশ

এম. এ., পি. এইচ্. ডি., এফ্. এ. এস্

বিশ্ববিদ্যালয়-অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়. প্রাক্তন অধ্যাপক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩৬৮

Utkhanan-Vijnan
Sudhir Ranjan Das

প্রকাশক ঃ

শ্রীসমরেন্দ্র নাথ সেন
১৯০।এ, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯

পরিবেশক ঃ

নবভারত পাবলিশার্স
৯২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন
পি. বি. প্রেস
৩২।ই, শরৎ বসু রোড
কলিকাতা-২৯

মূল্য ৮৫·০

পরমারাধ্য পিতৃদেব

ও

মাতৃদেবীর

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

উৎসর্গীকৃত

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

Rajbadidanga : Report on Excavations at Rajbadidanga, 1968

Stone Tools : History and Origins, 1968

An Approach to Indian Archaeology, 1972

Archaeological Discoveries from Mursidabad District, 1972

Folk Religion of Bengal, 1953

Folk Ritual Drawings : A Study in Origins, 1958

Folk Religious Rites : A Study in Origins, 1959

Karnasuvarna (In Press)

নির্ঘণ্ট

মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম নির্দেশসমূহ বিদেশী ভাষার মাধ্যমে প্রণিধান করা আয়াসসাধ্য। উপরন্তু আমাদের দেশের নগণ্য সংখ্যক উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্তগণের মধ্যেই উক্ত বিজ্ঞান-শিক্ষালব্ধ জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ফলে, বিজ্ঞান-সাধকের সংখ্যাও অত্যল্প। বিদেশী ভাষার মধ্যস্থতায় বিজ্ঞান-শিক্ষাই বিজ্ঞান-সাধনায় বিফলতার প্রধানতম কারণ।

প্রাক্-স্বাধীনতা-পর্বেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-প্রদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি লাভ করে; এমন কি, কার্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টাও যে হয় নাই তাহা বলা যায় না। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষাকে মধ্যস্তর পর্যন্ত শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করে। তৎপরে মাতৃভাষার মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়েও বিভিন্ন পাঠক্রমের শিক্ষা-প্রদানের নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু সক্রিয়তার অভাবে এই মৌলিক নীতি কার্যকরী হয় নাই। স্বাধীনতার পরে আঞ্চলিক ভাষায় সর্বপর্যায়ে শিক্ষাদানের বিধি গৃহীত হয়; কিন্তু অদ্যাপি এই বিধিকে কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। স্বাধীনতা লাভ করিবার পরেও আমরা পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষা-গ্রহণে উৎসাহী। স্বাধীনতা-উত্তর ২৭ বৎসর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মাতৃভাবার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তার সম্ভবপর হয় নাই। কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত উচ্চ মানের কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচিত হয় নাই। এমন কি, জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান-বিস্তারের নিমিত্ত কোন প্রকার প্রচেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান-প্রসূত ফল উপভোগ করে; কিন্তু বিজ্ঞান-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন কি, শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও বিজ্ঞান-বিষয়ে অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য উল্লেখ্য। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার অভাবই এই অবস্থার প্রকৃত দায়ী। ইহার প্রধান কারণ, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে প্রেরণার

বা উৎসাহের অভাব এবং পরিভাষার প্রতিবন্ধকতা। প্রেরণা ও উৎসাহের অভাবই সর্বাপেক্ষা প্রবল। অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত মনে করেন যে, বাংলা ভাষায় উচ্চ মানের বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নহে। কেহ-কেহ মন্তব্যও করিয়াছেন যে, বাংলা ভাষায় ভাবের প্রাচুর্য সত্ত্বেও শব্দের অপ্রতুলতার জন্যই বিজ্ঞান-সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। শব্দের অপ্রতুলতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ক্রমাগত বিজ্ঞান-সাহিত্য-রচনার মাধ্যমেই ভাষাগত সচ্ছলতার এবং শব্দের সমৃদ্ধিলাভ স্বাভাবিক।

এমন কি, পারিভাষিক প্রতিবন্ধকতার অপসারণও অসাধ্য নহে। অনেক পূর্ব হইতেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পারিভাষিক শব্দ-সঙ্কলনকার্যে ব্রতী হইয়াছে। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখায় ব্যবহৃত শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রকাশিতও হইয়াছে। রাজশেখর বসু মহাশয় তাঁহার অভিধানে কতিপয় বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা সংযোজিত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক অন্তরায় দূরীকরণের নিমিত্ত একটি উচ্চ পর্যায়ের সমিতি গঠন করে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত সমিতি কর্তৃক সঙ্কলিত পরিভাষা 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পরে পশ্চিম বঙ্গ সরকারও এক সমিতির মাধ্যমে সঙ্কলিত পরিভাষার তালিকা প্রকাশ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধান বা পরিভাষা নামে অনেক গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেক পারিভাষিক শব্দ বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে নিবেদিত হইয়াছে। পারিভাষিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা যে হয় নাই বা হইতেছে না তাহা স্বীকার করা যায় না। তৎসত্ত্বেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা অবহেলিত। নিরন্তর নিজ-ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা এবং বিজ্ঞান-গ্রন্থ-

লিখনের মাধ্যমেই পারিভাষিক প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত হওয়া স্বাভাবিক। সমিতি করিয়া পারিভাষিক শব্দ-নির্ধারণ বাঞ্ছনীয় নহে। লেখকের উপরই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-রচনার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত। ফলে, একই শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ সঙ্কলিত হওয়াও স্বাভাবিক। একাধিক প্রতিশব্দ হইতেই লেখক ও পাঠকগণ সঙ্গত ও যথার্থ শব্দ মনোনীত করিতে পারিবেন। প্রথমে, অনেক শব্দ অসঙ্গত বলিয়া মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু, ক্রমাগত ব্যবহার-দ্বারা উক্ত শব্দসমূহের সঙ্গতি স্বীকৃতি লাভ করিবে।

মনে হয়, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার একমাত্র প্রতিবন্ধক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে উৎসাহের, অনুরাগের এবং প্রচেষ্টার অভাব। যাঁহারা আমাদের দেশের শাসন-কার্যের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব অনুভব করেন না; করিলেও, মনে করেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-বিষয়ে উচ্চশিক্ষা-প্রদান অবাস্তব ও অসম্ভব। অনেক বিদগ্ধ বিজ্ঞানবেত্তাও উক্ত মত পোষণ করেন। ফলে, বাংলা ভাষায় উচ্চ মানের বিজ্ঞান-চর্চা ব্যাহত হইয়াছে ও হইতেছে।

সকল প্রগতিশীল দেশেই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা-প্রদান লক্ষণীয়। মাতৃভাষার মধ্যস্থতায় বিশ্বের বিজ্ঞান-ভাণ্ডারের জ্ঞান অর্জন করিয়াই বিভিন্ন দেশের মনীষিগণ বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। জাপান ৫০ বৎসরের মধ্যেই নিজ-ভাষার মধ্যস্থতায় পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করিয়া বিজ্ঞান ও শিল্প-জগতে স্বীয় আধিষ্ঠান সুদৃঢ় করিয়াছে। বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-উত্তর চীন দেশও আপন ভাষাকে বাহন করিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিয়াছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে চীনদেশ নিজ-ভাষায় পাশ্চত্য বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করিয়া বিজ্ঞান-জগতকে

বিমুক্ত করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিয়াও আমরা অদ্যাপি বিজ্ঞান-জগতে সম্পূর্ণভাবে পরাধীন। এই পরাধীনতার শৃঙ্খলপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে বিজ্ঞান-জগতে আমরা কোন দিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব না। এই মুক্তির একমাত্র পথ মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তার।

পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি মৌলিক বিজ্ঞান-বিষয়ে বাংলা ভাষায় কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে বা হইতেছে; কিন্তু বিজ্ঞানের এমন অনেক শাখার উদ্ভব হইয়াছে যে, তাহাদের সম্পর্কে বাংলা ভাষায় অদ্যাপি কোন চর্চা হয় নাই। বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ও জ্ঞানের এক নবতম শাখা, যাহার নাম সাধারণভাবে অপরিচিত। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই উক্ত বিজ্ঞান-শাখা সমাদৃত ও জনপ্রিয়। এই বিজ্ঞান-শাখার নাম প্রত্নতত্ত্ব (আর্কিওলজি)। প্রত্নতত্ত্ব একটি সমন্বয়ী বিজ্ঞান—অর্থাৎ বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার সমন্বয়জাত। প্রত্নবিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ 'ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ব' (ফিল্ড, আর্কিওলজি) সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। ক্ষেত্রীয় প্রত্নবিজ্ঞানের প্রধান শাখা উৎখনন বা এক্স্‌ক্যাভ্যাসন্। বর্তমানে উৎখনন সম্পূর্ণভাবে একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-শাখায় অধিষ্ঠিত। উৎখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে ইংরেজী ও অপর ইউরোপীয় ভাষায় অসংখ্য পুস্তক রচিত হইয়াছে। আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই উৎখনন-বিজ্ঞান-সাধনার সূত্রপাত হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ের পাঠক্রমও প্রবর্তিত হইয়াছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থা কর্তৃক উৎখননকার্যও পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন আঞ্চলিক ভাষায় উৎখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন গ্রন্থ অদ্যাপি রচিত হয় নাই। বাংলা ভাষায় তথা অপর ভারতীয় ভাষায় বর্তমান গ্রন্থের গ্রথন সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা।

প্রত্নতত্ত্বীয় সাধনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অবদান সুশৃঙ্খলভাবে নিবেদন করাই এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন মানবজীবনের সহিত সুপরিচিত হইবার নিমিত্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার অবদান-প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। লেখ-আবিষ্কারের সহস্র-সহস্র বৎসর পূর্বে মানবসংস্কৃতির উদ্ভব হয়। উক্ত প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির রূপায়ণ ও কালনিরূপণ একাধিক বিজ্ঞান-শাখার তন্ত্রের সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে। প্রাচীন মানবজীবনের পরিবেশ-সংক্রান্ত তথ্যাদির পর্যালোচনাও সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-প্রসূত। নৃবিজ্ঞান এবং জীববিদ্যার আনুকূল্যেই প্রাচীন মানুষের জীবাশ্ম ও কঙ্কালাদি অধ্যয়ন করিয়া নরগোষ্ঠীর নির্ণয়কার্য সাধিত হইয়াছে। সাধারণ প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন শ্রমশিল্প-নিদর্শনের অঙ্গ-বিন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে শ্রমশিল্প-নিদর্শনতত্ত্বের সাধনা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থনীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আবাস, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্যাদি উদ্ঘাটন করিয়া মানব-জীবনযাত্রার পূর্ণাঙ্গ চিত্র রূপায়ণ করাই বর্তমান শ্রমশিল্পতত্ত্ব-সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। উক্ত তথ্যাদির অনুশীলন সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-প্রসূত; ফলে, প্রত্নতত্ত্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। এমন কি, শিল্প-উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস যেমন, আকরিক উপকরণ, নির্মাণ-পদ্ধতি প্রভৃতি, বিজ্ঞানের নানাবিধ প্রয়োগ-কৌশল ও নিয়ম-তন্ত্রের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

অধুনা, বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার নিবেদিত মৌলিক তত্ত্ব-সমূহের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রত্নতত্ত্বের সাধনা অবাস্তব। বর্তমান প্রত্নবিজ্ঞানে পুরাবস্তুর গুণাত্মক অপেক্ষা পরিমাণাত্মক অনুশীলন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এতদ্‌ভিন্ন প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্করণের পদ্ধতি ও কৌশল একান্তভাবে বিজ্ঞান-তন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। সমকালীন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক

অনুসন্ধানের স্পৃহাদ্বারা অনুপ্রাণিত। কেবল পুরানিদর্শনের আবিষ্কারই বর্তমান উৎখননের উদ্দেশ্য নহে; উৎখননের উদ্দেশ্য ইতিহাস-সমস্যার সমাধান করা। আকস্মিক ভাবে আবিষ্কৃত পুরাবস্তুর বা ভূপৃষ্ঠে দৃশ্যমান ভগ্নাবশেষের নির্দেশ দ্বারা বর্তমান উৎখননবিৎ পরিচালিত হন না। প্রকৃতপক্ষে, উৎখননবিৎ যথার্থ প্রামাণিক তথ্যাদির আবিষ্কার-কার্যে নিমগ্ন। এই কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত উৎখনক বিবিধ বিজ্ঞান-শাখার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। বর্তমান প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা বৈজ্ঞানিক অভিসন্ধিমূলক। বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ-পদ্ধতি, চৌম্বক মানযন্ত্র, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও তন্ত্র উৎখননবিদের প্রকৃষ্ট হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, আধুনিক অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দানে পরিবর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান উৎখননতত্ত্ব এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-শাখায় সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে একাধিক বিজ্ঞান-শাখা উৎখননতত্ত্বকে নানাভাবে সাহায্য করিতে আগ্রহান্বিত। উৎখনন-কার্যে বিজ্ঞানের নানাবিধ অবদানের এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত-রূপায়ণতত্ত্বের যথার্থ পর্যালোচনা করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষ অতীব প্রাচীন সুসভ্য দেশ। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ভারতবর্ষের বিভিন্নাংশে মৃত্তিকাগর্ভে সমাধিস্থ অবস্থায় বিদ্যমান। মৃত্তিকা খনন দ্বারা উক্ত সভ্যতার সর্বপ্রকার নিদর্শন আবিষ্কার পূর্বক ইতিবৃত্ত-রূপায়ণ করাই উৎখননের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উৎখননকার্য সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্রের অধীন। সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অতীতের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচিতির ঔৎসুক্য অতীব প্রবল। কেবল উৎখনন-বিজ্ঞানের মাধ্যমেই অতীতকে সম্যকভাবে প্রণিধান করা সম্ভবপর। কিন্তু মাতৃভাষায় উৎখনন-বিজ্ঞান-চর্চার অভাবহেতু সাধারণ মানুষের এই ঔৎসুক্যের তৃপ্তিসাধন

অদ্যাপি সম্ভবপর হয় নাই। এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সম্পর্কে নানা প্রকার কৌতূহল বর্তমান কি রূপে সকল প্রকার সংস্কৃতির নিদর্শন মৃত্তিকাগর্ভে সমাধিস্থ হয় এবং বিন্যস্ত থাকে! কি প্রকারে ভূগর্ভস্থ বাস্তব নিদর্শন অনাচ্ছাদন করিয়া ইতিহাস রূপায়িত হয়,—এই প্রকার নানাবিধ প্রশ্ন সাধারণ মানুষকেও বিচলিত করে। যে বিজ্ঞান উক্ত প্রকার কৌতূহল চরিতার্থ করে, তাহার বৈজ্ঞানিক কাঠামো এবং সম্যক পরিচিতি প্রদান করিবার অভিলাসেই এই গ্রন্থের গ্রথনকার্যে ব্রতী হইয়াছি। উৎখনন-কার্যে বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কিত সকল প্রকার পর্যালোচনার প্রয়াস করা হইয়াছে। উৎখননতত্ত্ব-সংক্রান্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, শৃঙ্খলা নিয়মতন্ত্র ও অপর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যথাযথ-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু অনন্যসাধারণ। প্রতি পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় একটি পৃথক পুস্তক-রচনার যোগ্য। অতএব এই গ্রন্থে কেবল মাত্র মৌলিক তথ্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত হইয়াছে।

মাতৃভাষায় দক্ষতা ব্যতিরেকে কোন বিজ্ঞান-বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র। ভাষাগত নৈপুণ্যের অভাব সত্ত্বেও লেখক দুরূহ উৎখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে মাতৃভাষায় গ্রন্থ-রচনায় সচেষ্ট হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থের ভাষা ও ভাব-প্রকাশের দুর্বলতা বহুলাংশে প্রতীয়মান হওয়া স্বাভাবিক। এই পুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা শব্দের অক্ষর -বিন্যাসও অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর হইয়াছে। সাধারণতঃ 'চলন্তিকা'র অক্ষর-বিন্যাস-পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে; কোন-কোন স্থানে 'চলন্তিকা'র বানানের সহিত অসঙ্গতিও রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেকাংশে একই শব্দের বর্ণ-বিন্যাস বা বানান একাধিক ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে যেমন, ডেট্যাম ও ডেটাম, বুদ্‌বুদ্‌ ও বুদ্বুদ, মেক্‌শিকো ও

মেক্সিকো, রং ও রঙ, পেট্রি ও পেট্রী, পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্ত্য, বুদবুদ ও বুদ্বুদ, এশিয়া ও এসিয়া, তুরমুস ও তুরমুজ, ষ্ট্রিপ ও ষ্ট্রীপ, ছেদ ও চ্ছেদ, প্রস্থচ্ছেদ ও প্রস্থচ্ছেদ, ক্রস ও ক্রুশ, সমোন্নতি ও সমুন্নতি, সনাক্তকরণ ও সনাক্তীকরণ, মেঝ ও মেঝে, পলেস্তারা ও পলাস্তারা, পৃথককরণ ও পৃথকীকরণ, লক্ষ ও লক্ষ্য জাদু ও যাদু, আরিক্কামেড্ ও আরিকামেড্, গ্রীড ও গ্রিড, কীলক ও কিলক, গাথুনী ও গাথুনি, লেবেল ও ল্যাবেল, সকৃলিমান ও সকৃলীমান, ইত্যাদি। এই সকল শব্দ শুদ্ধিপত্রে প্রদত্ত হয় নাই। মুদ্রণ-প্রমাদজনিত কতিপয় ভ্রমাত্মক শব্দ শুদ্ধিপত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থের বিভিন্নাংশে একাধিক বিষয়ের আলোচনায় তথ্যের ও যুক্তির পুনরুক্তিজনিত ত্রুটিও উল্লেখ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্গতি রক্ষার জন্য আলোচনার ও অনুশীলনের পুনরুক্তি অপরিহার্য। এই গ্রন্থের নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতির বিদ্যমানতা স্বীকার্য। অধিকাংশ ত্রুট অনবধানতজনিত। অনভিজ্ঞ মুদ্রাকরের অসাবধনতাবশতঃ কতিপয় ত্রুটিপূর্ণ শব্দও মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রুফ-সংশোধন-কার্যও যথাযথভাবে সাধিত হয় নাই। সকল প্রকার ত্রুটি ও বিচ্যুতির জন্য লেখকই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। মাতৃভাষায় এই দুরূহ বিজ্ঞান-বিষয়ে পুস্তক-রচনা লেখকের এই প্রথম প্রয়াস। পরবর্তী সংস্করণে পূর্বের ত্রুটি-বিচ্যুতির অপসারণের জন্য গ্রন্থকার যত্নশীল হইতে একান্ত ইচ্ছুক।

বর্তমান গ্রন্থে কোন ইংরেজী শব্দ রোমক অক্ষরে লিখিত হয় নাই। সকল বৈজ্ঞানিক শব্দের বর্ণান্তরীকরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণান্তরীকরণের অক্ষর-বিন্যাসও যথাযথ হয় নাই। সুতরাং এই বিভ্রান্তি-রীদূকরনের নিমিত্ত 'বর্ণান্তরীকরণ'-

অংশে ইরেজী শব্দ রোমক অক্ষরে এবং বাংলা হরফে নির্দেশিত হইয়াছে (পৃ: ৪৩১-৪৪২)। পুস্তকের বিভিন্নাংশে বিদেশী বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ঐতিহাসিক প্রভৃতির বংশ-নাম বা পদবী বাংলা অক্ষরে লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ নাম ও আবির্ভাবকাল 'ব্যক্তি-সংস্থা-নাম পরিচিতি'-অংশে রোমক ও বাংলা অক্ষরে নিবেদিত হইয়াছে (পৃঃ ৪৪২—৪৪৮)। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উল্লেখিত প্রত্নক্ষেত্রের ও স্থানের পরিচিতি 'স্থান ও প্রত্নক্ষেত্র-নির্দেশিকা'-অংশে সংক্ষিপ্তাকারে প্রদত্ত হইয়াছে (পৃঃ ৪৪৮—৪৫৫)।

পারিভাষিক শব্দ-সঙ্কলন অতীব দুরূহ কার্য। প্রত্নবিজ্ঞানের এবং অপর বিজ্ঞানশাখার সঙ্কলিত অনেক প্রতিশব্দ বা পরিভাষা এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ 'পরিভাষা'-অংশে নিবেদিত হইয়াছে (পৃঃ ৪১০—৪৩০)। পরিভাষা-রচনাকার্যে অনেক অসঙ্গতির বিদ্যমানতা স্বাভাবিক। এই কার্যে যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে 'চলন্তিকা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা', পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতের প্রত্নতত্ত্ব' এবং বিবিধ বাংলা ও ইংরেজী ভাষার অভিধান বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিষয় নানাবিধ চিত্রের মাধ্যমে পর্যালোচিত হইয়াছে। পাঠকের পক্ষে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অংশ-গ্রহণের এবং বোধগম্যতার পথ বহুলাংশে সুগম করিবার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব রেখাচিত্র ও আলোকচিত্রের হাফটোন্-ব্লক্ সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'চিত্র-পরিচিতি'-অংশে রেখা-চিত্রণের ও হাফটোন্-ব্লকের আলোকচিত্রের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (পৃঃ ২৯৯-৪০৯)। যে সকল প্রামাণিক নিবন্ধ ও গ্রন্থ হইতে বর্তমান পুস্তকের আলোচিত

তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের পূর্ণ তালিকা 'গ্রন্থপঞ্জী'-অংশে সংযুক্ত হইয়াছে (৪৫৭-৪৬৯)। উৎখনন-বিজ্ঞানের জ্ঞান-পিপাসু এবং প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ পাঠকবর্গ উক্ত গ্রন্থপঞ্জী হইতে অধিক জ্ঞান-সঞ্চয়ন করিতে পারিবেন। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য গ্রন্থে উল্লিখিত বিশেষ শব্দ-সকলের বর্ণানুক্রমিক সূচি 'উল্লেখপঞ্জি'-অংশে প্রদত্ত হইয়াছে (৪৭০-৫১৬)।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন উৎখননবেত্তা স্যার মর্টিমার হুইলারের নিকট শিক্ষণ-প্রাপ্ত এবং উৎখননকার্যে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও উৎখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে লব্ধজ্ঞানের ভিত্তিতেই বর্তমান গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। অধিকন্তু, গ্রন্থকারের পরিচালনায় গত কয়েক বৎসর যাবৎ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাজবাড়িডাঙা নামক প্রত্নক্ষেত্রের উৎখননকার্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত উৎখনন-সংক্রান্ত অনেক তথ্য, আলোকচিত্র ও রেখা-চিত্র বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

যাহার অনুপ্রেরনায় ও প্রোৎসাহে প্রবুদ্ধ হইয়া উৎখনন-বিজ্ঞান বিষয়ে এই গ্রন্থ গ্রথনকার্যে ব্রতী হইয়াছিলাম তিনি আজ পরলোক-বাসী। পরমারাধ্য শিক্ষাগুরু ও পরমাত্মীয় আচার্য নির্মল কুমার বসু মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যতায় উৎবুদ্ধ হইয়াই এই গ্রন্থ-প্রণয়নে নিবিষ্ট হইয়াছিলাম। ভারতকোষের সম্পাদনাকার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন আচার্য বসু মহাশয় উৎখনন-সম্পর্কে একটি মৌলিক নিবন্ধ-লিখনের গুরুভার আমার উপর অর্পন করেন। উৎখনন-বিষয়ের এই রচনা ভারতকোষের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ভারতকোষে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর আচার্য বসু মহাশয় ও অনেক সহকর্মী, সুহৃদ ও ছাত্র-ছাত্রীর অনুরোধে উৎসাহিত হইয়া উৎখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে মাতৃভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হইয়াছি। যাঁহার প্রেরণায়

ও আনুকূল্যে এই কার্যে নিবিষ্ট হইয়াছিলাম তিনি এই গ্রন্থের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন না। একমাত্র সান্ত্বনা যে, তিনি প্রথম দুইটি পরিচ্ছেদ মুদ্রিত অবস্থায় দেখিয়া গিয়াছেন। যিনি এই গ্রন্থ-প্রকাশনায় সর্বাধিক আনন্দ ও গর্ব বোধ করিতেন তাঁহার অবর্তমানতা যে কত মর্মান্তিক তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাঁহার আশীর্ব্বাদ ব্যতীত এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হইত না।

প্রত্নবিজ্ঞানের সাধনায় যাঁহারা আমাকে দীক্ষিত করিয়াছেন এবং সক্রিয় সাহায্যদানে বাধিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আচার্য রমেশ চন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় এবং অধ্যাপক সরসী কুমার সরস্বতীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। তাঁহাদের নিকট লেখক চিরঋণী। সহকর্মী ও কনিষ্ঠ সুহৃদবর ডঃ কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত এই গ্রন্থের মুদ্রণ, সংশোধন প্রভৃতি নানা প্রকার কার্যে একনিষ্ঠ-ভাবে সাহায্য দানে বাধিত করিয়াছেন। তাঁহার অভিনিবেশ ও অনুপ্রেরণা ব্যতীত এই গ্রন্থের মুদ্রণ সম্ভব হইত না। যাঁহাদের নিকট হইতে এই গ্রন্থের গ্রন্থণকার্যে নিয়ত উৎসাহ ও নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে ডঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীল কুমার রায়, শ্রীনির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে সকল বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের গ্রন্থসমূহ হইতে উৎখনন-সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের সকলের নিকটই গ্রন্থকার ঋণী। শিক্ষাগুরু স্যার মর্টিমার হুইলারের নিকট লেখকের ঋণ অপরিশোধ্য। হুইলার কর্তৃক লিখিত একাধিক গ্রন্থ ও নিবন্ধ হইতে অনেক তথ্য বর্তমান পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে সকল প্রখ্যাত উৎখননবিদের গ্রন্থ বা নিবন্ধ হইতে আলোকচিত্রণ ও রেখা-

চিত্রণ প্রতিলিপিত হইয়াছে তাঁহাদের সকলের নিকটই লেখক ঋণী। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত রেখাচিত্র ও আলোকচিত্রের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্বশ্রী নিতাই চন্দ্র দাস, প্রণব ঘোষ, রনেন মুখার্জি, বলাই চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট ধন্যবাদার্থী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় লেখক কর্তৃক পরিচালিত রাজবাড়িডাঙার উৎখনন-সংক্রান্ত অনেক আলোকচিত্র ও রেখাচিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। লেখকের রাজবাড়ীডাঙ্গা-উৎখননের প্রতিবেদনে প্রকাশিত কতিপয় রেখাচিত্রের ও আলোকচিত্রের মুদ্রাঙ্কন-পট্ট (ব্লক্) ব্যবহার করিবার অনুমতি-প্রদানের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির নিকট লেখক কৃতজ্ঞ। ডঃ রামকৃষ্ণ দত্ত রায় এবং শ্রীমতী প্রতিমা দত্ত রায় অতীব নিষ্ঠা-সহকারে বর্তমান গ্রন্থের উল্লেখপঞ্জী তৈয়ার করিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে এই উল্লেখপঞ্জীর সংযোজন সম্ভব হইত না।

পরিভাষা, ব্যক্তি-ও-সংস্থা-পরিচিতি, স্থান ও প্রত্নক্ষেত্র-নির্দেশিকা, গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতির সংকলনকার্যে আমার পুত্রদ্বয় শ্রীমান সুরঞ্জন ও সুস্মিত রঞ্জন নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। পি. বি. প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রী চণ্ডী চরণ সেন এই গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্যের গুরুদায়িত্ব পালন করিয়াছেন। শ্রী শান্তি দাশগুপ্ত এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন-পট্ট-তৈয়ার ও মুদ্রণকার্য সাধন করিয়াছেন। শ্রী প্রণব ঘোষ গ্রন্থের প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়াছেন।

যিনি এই গ্রন্থের সংকলনকার্যের সহিত ওতোঃপ্রোতভাবে জড়িত এবং যিনি নানাপ্রকার কর্মব্যস্ততার মধ্যেও দৈনন্দিন শ্রুতিলিখন, একাধিকবার পাণ্ডুলিপি-তৈয়ার প্রভৃতি কার্যসমূহ অতীব

নিষ্ঠা ও অভিনিবেশের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন তাঁহার সহিত আমার যে সম্পর্ক তাহাতে তাঁহার নিকট কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ বা ধন্যবাদ-জ্ঞাপন অসাজন্ত। তাঁহার সক্রিয় সাহায্য ও প্রগাঢ় অনুরক্তি ব্যতীত এই গ্রন্থের সংকলনকার্য লেখকের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হইত না।

বর্তমান গ্রন্থ কেবলমাত্র প্রত্নবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষণ-প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিকের জন্য লিখিত হয় নাই। সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে উৎখননতত্ত্ব সম্পর্কে পরিচয় প্রদান করিবার অভিপ্রায়েই বর্তমান গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বর্তমান জগতে প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসা অতীব নিগূঢ় ও ব্যাপক। সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতত্ত্বীয় আবিষ্কার ও উৎখনন-সংক্রান্ত সংবাদ-পরিবেশনের উদ্দেশ্য জনসাধারণের ঔৎসুক্য চরিতার্থ করা। অপেশাদার পুরাতাত্ত্বিক উৎখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনে উৎসাহী। এমন কি, তাঁহারা পেশাদার উৎখননবিদগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতেও পশ্চাৎপদ্ নহেন। প্রত্নতত্ত্বের অপেশাদার অনুরাগীবৃন্দও উৎখননতত্ত্বের সহিত সম্যকভাবে পরিচিতি লাভ করিতে উৎসুক।

ছাত্র-ছাত্রী, প্রত্নতত্ত্বের অপেশাদার সাধক, সাধারণ-শিক্ষিত জনসমাজ, প্রভৃতির ঔৎসুক্য ও জ্ঞানার্জনের অভিলাষ চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়েই এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্নবিজ্ঞানের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশতঃ লেখক উৎখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে মাতৃভাষায় গ্রন্থ-রচনায় ব্রতী হইয়াছে। অক্ষমতা সত্ত্বেও সাধ্যমত কর্তব্য-পালনে বিচ্যুত হই নাই। নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থের মূল্যায়ন একমাত্র অনুরাগী সাধারণ পাঠক সমাজই নির্দ্ধারণ করিবেন। উৎখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ পরিচিতি প্রদানের প্রচেষ্টা ঈষৎ ফলপ্রসূ হইলেই লেখকের পরিশ্রম-এবং অভিপ্রায় সার্থক হইবে।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৫১/২, হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯

সুধীর রঞ্জন দাশ

শ্রীপঞ্চমী
১৩৬৮

প্রস্তাবনা

আর্কিওলজি বিশাল বিজ্ঞান-বৃক্ষের নবতম শাখা। ইংরেজী আর্কিওলজি শব্দ দুইটি গ্রীক শব্দ হইতে উদ্ভূত--আর্কাওস্ (প্রত্ন বা পুরা) + লোগস্ বা লোগিয়াম্ (বিজ্ঞান বা তত্ত্ব)। বাংলা ভাষায় আর্কিওলজির পারিভাষিক শব্দ প্রত্নতত্ত্ব বা প্রত্নবিজ্ঞান বা পুরাতত্ত্ব [প্র + ত্ন (ত্নপ্)=প্রত্ন (প্রাচীন বা পুরাতন); তৎ+ত্ব = তত্ত্ব; বিজ্ঞান বা জ্ঞান]। প্রত্নতত্ত্ব বা পুরাতত্ত্ব প্রাচীন অথবা পুরাতন সম্পর্কিত জ্ঞানকে বুঝায়। কিন্তু প্রাচীন-সংক্রান্ত সকল প্রকার জ্ঞানকেই প্রত্নতত্ত্ব বলা যায় না। সাধারণতঃ প্রত্নবিজ্ঞান প্রত্ননিদর্শন-রাজির অধ্যয়ন-অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রত্নবিজ্ঞানের মর্মার্থ অধিক ব্যাপক।

প্রথমে ইংরেজী ভাষায় আর্কিওলজি শব্দ প্রাচীন ইতিহাস অর্থে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইতিহাসের তাৎপর্য বহুপ্রসারী। ইতিহাস বলিতে প্রাচীনতম কাল হইতে মানবসমাজের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত বা আখ্যানকে বুঝায়। লিখিত ও অলিখিত উপাদানের সাহায্যেই ইতিহাস রূপায়িত হয়। প্রত্নতত্ত্বও ইতিহাস-বিজ্ঞান। সাধারণভাবে বলিতে পারা যায়, যে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানবসমাজের ক্রম-বিকাশের প্রত্যেক অবস্থার যাবতীয় মনুষ্যনির্মিত ও ব্যবহৃত বাস্তব নিদর্শন অনুশীলন করিয়া ইতিহাস রূপায়ণ করা যায় তাহাই প্রত্নতত্ত্ব বা প্রত্নবিজ্ঞান। কিন্তু ইতিহাস ও প্রত্নবিজ্ঞানের রূপায়ণতত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইতিহাস সাহিত্য- ও লিখিত-উপাদানভিত্তিক। লিখিত উপাদানজাত তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইতিহাস রূপায়িত হয়। কিন্তু

প্রত্নতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখন-নজিরভিত্তিক নহে। প্রধানতঃ প্রত্নতত্ত্বের বনিয়াদ অলিখিত বাস্তব উপাদান। মনুষ্যনির্মিত ও ব্যবহৃত সর্বপ্রকার ভাষাহীন ও চেতনহীন বাস্তব নিদর্শনের তথ্য নিষ্কাশিত করিয়া মানবসমাজের ইতিবৃত্তের রূপায়ণতত্ত্বই প্রত্নবিজ্ঞান। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বীয় সাধনায় লেখসম্বলিত বাস্তব পদার্থের নজিরও অগ্রাহ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক যুগে প্রস্তর, তাম্রপাত্র, মৃন্ময় বস্তু প্রভৃতির উপর খোদিত লেখও প্রত্নতত্ত্ব-সাধনার বিষয়বস্তু। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব কেবলমাত্র অলিখিত বাস্তব নিদর্শনজাত ইতিহাস-বিজ্ঞানকেই বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে লিখিত ও অলিখিত সকল প্রকার বাস্তব নিদর্শনের ভিত্তিতে ইতিহাস-রূপায়ণতত্ত্বই প্রত্নবিজ্ঞান।

সাধারণতঃ প্রত্নতত্ত্ব বলিতে প্রাচীন ইতিহাসকে বুঝায়। কিন্তু ক্রমে প্রত্নতত্ত্ব বা আর্কিওলজির অর্থ ও তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরাবস্তুর সুনিয়ন্ত্রিত বিবরণাত্মক অনুশীলনের অর্থে আর্কিওলজি শব্দ ব্যবহৃত হইত। অধুনা আর্কিওলজির সাধারণ অর্থ প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার ও অধ্যয়ন। জনসাধারণের বিশ্বাস যে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পর্বতে, অরণ্যে বা মরুভূমিতে বিলুপ্ত নগর বা বাসস্থানের অনুসন্ধান করে এবং মৃত্তিকা খনন করিয়া ভূগর্ভে বিন্যস্ত বাস্তু-নিদর্শনের, ধনদৌলতের এবং শিল্পকলার অভিজ্ঞান সংগ্রহ করে। কিন্তু প্রত্নবস্তুর আবিষ্কারককে বা সংগ্রহকারককে প্রত্নবিজ্ঞানী বলা যায় না। প্রত্নতত্ত্বের উদ্দেশ্য মানবসংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায় নির্ণয় করিয়া যথার্থ ইতিহাস রূপায়ণ করা। ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ ও জলগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত বাস্তব নিদর্শনসমূহ হইতে মানবসংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের রূপায়ণতত্ত্বই প্রত্নবিজ্ঞান। প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণা বাস্তব প্রত্ননিদর্শনভিত্তিক। মানবসংস্কৃতির তথা মানবসমাজের উৎপত্তি, পরিবর্তন, ক্রমোন্নতি, অবনতি প্রভৃতি সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞান প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণা-প্রসূত। পৃথিবীতে মানুষের উদ্ভবকাল হইতে

আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত মানবসমাজের ধারাবাহিক বৃত্তান্তের রূপায়ণই প্রত্নতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। প্রত্নতাত্ত্বিক অতীতের অনুসন্ধাতা; কেবলমাত্র পুরাবস্তুর অন্বেষক নহে। মানবজীবন-সংক্রান্ত জ্ঞানান্বেষণই প্রত্নত্ত্বীয় সাধনা। প্রত্নুনিদর্শনের ভিত্তিতে মানুষের অতীত জীবনী সঙ্কলন করাই প্রত্নবিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা। প্রত্নতত্ত্বীয় ইতিবৃত্ত চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয়, কিন্তু কল্পনাত্মক নহে।

অধুনা প্রত্নতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানশাখায় প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই বর্তমান প্রত্নতত্ত্ব সীমাবদ্ধ। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানশাখা প্রত্নতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব কেবলমাত্র অস্থিচর্মসার বিজ্ঞান নহে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্নতত্ত্ব এক সমন্বয়ী বিজ্ঞান। মানবতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ের কাঠামোর উপরই প্রত্নবিজ্ঞান অধিষ্ঠিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ কেবলমাত্র প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কারক বা উদ্ধারক নহে। প্রত্নতাত্ত্বিক মানবতত্ত্বের সাধক ও রূপকার। সর্বপ্রকার মনুষ্যনির্মিত বা ব্যবহৃত প্রত্ননিদর্শনই মানবতত্ত্ব-অনুশীলনের প্রকৃত ধারক ও বাহক। ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যগত মানবজীবনধারণের ইতিহাস নহে; তাহা মানুষের মনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস।

প্রাচীন ও বর্তমান মানবজীবন বৈচিত্র্যময়। প্রারম্ভিক কাল হইতে মানবজীবনের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে ধাবমান। মানবসংস্কৃতির এই ক্রমোন্নতির প্রতি ধাপের বাস্তব নিদর্শন বিভিন্ন অবস্থায় অদ্যাপি বিরাজমান। এই সকল আবিষ্কৃত নিদর্শনের যথার্থ তথ্য নিষ্কাশিত করিয়া মানবজীবন-যাত্রার প্রকৃত পথপরিচর্য় প্রদান করা সম্ভবপর। মানুষের যাত্রাপথের পরিচয়, বিন্যাস ও বর্ণনা মানবতত্ত্বের বিষয়বস্তু। কিন্তু প্রত্ননিদর্শনের

অনুসন্ধান, আবিষ্কার, উদ্ধার, তথ্যনির্ণয় ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং প্রত্নবিজ্ঞান মানবতত্ত্ব এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ের ফল।

প্রাণীজগতে মানবকুলই একমাত্র প্রজাতি যে জীবনধারণের নিমিত্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামে অদ্যাপি লিপ্ত। সর্ব-প্রথমে বিভিন্ন প্রাণি-গোষ্ঠীর অনুরূপ মানুষও প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভরশীল ছিল। প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত সহাবস্থান করিয়াই মানুষ প্রথমে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই সহাবস্থান বিপর্যয়মূলক হইবার ফলে মানুষ জীবনধারণের নিমিত্ত প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চিরন্তন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ ও এই সংগ্রামের ফলেই মানবসংস্কৃতির জন্ম। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াই মানুষ সর্বপ্রথম সহজপ্রাপ্য বাস্তব পদার্থের সাহায্যে হাতিয়ার তৈয়ার আরম্ভ করে। হাতিয়ার-নির্মাণই প্রকৃতির উপর মানুষের প্রথম বিজয়-ঘোষণা। হাতিয়ার-নির্মাণ ও তাহার ব্যবহার করিয়াই মানুষ প্রকৃতিকে বশীভূত করে। প্রথমাবস্থায় দারু, প্রস্তর ও পশুঅস্থি দ্বারা হাতিয়ার-তৈয়ার আরম্ভ হয়। এই সকল হাতিয়ারের সাহায্যে পশুশিকারই মানুষের সর্বপ্রথম বিজয়-অভিযান। জীবনধারণের নিমিত্ত পশুশিকারেই মানবসংস্কৃতির প্রথম জন্ম। নানাবিধ হাতিয়ারের দ্বারা খাদ্য-সংগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রথম খাদ্য-সংগ্রাহক মানবসমাজ গড়িয়া উঠে। উক্ত সময় হইতে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে অধিক তীব্র ও ব্যাপক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। বিবর্তনের সাফল্যের বিভিন্ন পর্যায়ের সহিত মানব-সংস্কৃতির প্রগতি বা ক্রমোন্নতি এবং তাহার রূপ ও প্রকারভেদ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। উদ্‌বর্তনের ধাপে-ধাপে ক্রমোন্নতি সাধন-করিয়া মানুষ বর্তমানে সংস্কৃতির উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। তথাপি প্রকৃতির সহিত এই সংগ্রাম বিরামহীন। জীবনধারণের নিমিত্ত এই

সংগ্রামই মানুষের অনুবৃত্তি। এই জীবনসংগ্রামের ফলেই প্রযুক্তি-বিস্তার ও শিল্প-বিজ্ঞানের উদ্ভব ও ক্রমোন্নতি-সাধন সম্ভব হইয়াছে।

মনুষ্যনির্মিত এবং ব্যবহৃত বাস্তব নিদর্শন-সমূহের অধ্যয়নের সাহায্যে মানবসংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই প্রত্ন-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্মরণাতীত কাল হইতে মানুষ সহজপ্রাপ্য বাস্তব পদার্থ দ্বারা তাহার প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও অন্য সরঞ্জাম তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। এই সকল মনুষ্যনির্মিত হাতিয়ারের ও আসবাবপত্রের কিয়দংশ অবিনষ্ট এবং বিভিন্ন অবস্থায় বিরাজমান। কালের প্রবাহে মনুষ্যনির্মিত অবিনষ্ট নিদর্শনসমূহ ভূগর্ভে বা জলগর্ভে বিন্যস্ত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ও মানবীয় কার্যকলাপের ফলে উক্ত নিদর্শন ভূপৃষ্ঠেও প্রকটিত হয়। ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ এবং জলগর্ভ হইতে উদ্ধৃত প্রত্ন-নিদর্শনরাজির বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নই প্রত্নতত্ত্বের সাধনা। ভূগর্ভ ইহতে আবিষ্কৃত বা ভূপৃষ্ঠ হইতে আহৃত বাস্তব নিদর্শনরাজির অনুশীলন দ্বারা মানবসংস্কৃতির উৎপত্তির এবং ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের রূপায়ণতত্ত্বই প্রত্নবিজ্ঞান

প্রত্নবিজ্ঞানের দুইটি শাখা—'সাধারণ প্রত্নবিজ্ঞান' এবং 'ক্ষেত্রীয় প্রত্নবিজ্ঞান'। সাধারণ প্রত্নবিজ্ঞান বলিতে বিভিন্ন পুরানিদর্শনের সাধারণ অন্বীক্ষা ও অধ্যয়নকে বুঝায়। যাহারা উক্ত প্রকার প্রত্নবস্তুর অনুশীলনের সাহায্যে ইতিহাস রূপায়ণ করেন তাঁহাদিগকে 'আরাম-কেদারায় আসীন' প্রত্নতত্ত্ববিদ্ আখ্যায় ভূষিত করা হয়। কিন্তু এই প্রকার অনুশীলনজাত ইতিবৃত্ত সর্বক্ষেত্রে বাস্তব তথ্যভিত্তিক নহে। উপরন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন মানবসংস্কৃতির বিকৃত রূপ প্রদান করে। সাধারণ প্রত্নতত্ত্বীয় অন্বীক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক নহে।

বর্তমানে প্রত্নবিজ্ঞান বলিতে কেবলমাত্র 'ফিল্ড-আর্কিওলজি'

বা ক্ষেত্রীয় প্রত্নবিজ্ঞানকে বুঝায়। ফিল্ড-আর্কিওলজি সংজ্ঞা উইলিয়ম ফ্রিম্যান্‌ই সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ফিল্ড-আর্কিওলজি বলিতে 'ফিল্ড - সার্ভে' বা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্যপ্রণালীকে বুঝায়। সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ-জাত বাস্তব পদার্থভিত্তিক তত্ত্বসাধনাই ক্ষেত্রীয় প্রত্নবিজ্ঞান। ক্ষেত্রীয় প্রত্নবিজ্ঞান দুইটি শ্রেণীভুক্ত—সাধারণ ক্ষেত্রীয় প্রত্নবিজ্ঞান (জেনারেল্‌ ফিল্ড আর্কিওলজি) এবং খনন (এক্সক্যাভেসন্‌)। সাধারণ ক্ষেত্রীয় প্রত্নবিজ্ঞানকে 'হাম্‌পস্‌ ও বাম্‌পস্‌' বিজ্ঞান বলা হয়—অর্থাৎ উচ্চ ও নিম্ন ভূস্থানে সরেজমিন অনুসন্ধান এবং প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার ও উদ্ধার। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মানবীয় ও প্রাকৃতিক কার্য-কলাপের ফলেও ভূগর্ভস্থ প্রত্ননিদর্শন ভূপৃষ্ঠে প্রকটিত হয়। এই সকল প্রত্নবস্তুও তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাহাদের যথার্থ লিপিকরণের এবং অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার্য। সরেজমিন তদন্ত করিয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে আহৃত সর্বপ্রকার পুরাবস্তুর অনুশীলনতত্ত্ব সাধারণ ক্ষেত্রীয় প্রত্নবিজ্ঞানের অধীন। অনেক প্রত্ননিদর্শন—যেমন, মেঝে, মন্দির, সৌধের ধ্বংসাবশেষ এবং অবিনষ্ট গৃহস্থালী-সরঞ্জাম, আলংকারিক উপকরণ, দেব-দেবীর মূর্তি ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠেও প্রকটিত থাকে। এই সকল স্থাবর ও অস্থাবর পুরানিদর্শনও ইতিহাস রূপায়ণের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকার সাধারণ প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন চিত্তবিনোদন-প্রসূত এবং যথার্থ ইতিহাস-রূপায়ণকার্যে বিভ্রান্তিকর। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত প্রকার অনুশীলন প্রত্ননিদর্শনের পক্ষে ক্ষতিকারক নহে, উপরন্তু বৈজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠা দ্বারা পরিচালিত সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়ন ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নির্দেশ প্রদান করে।

ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পদ্ধতি ও কৌশল

সংক্রান্ত তত্ত্ব ক্রোফর্ড (১৯৫৪) সর্বপ্রথম বিস্তারিতভাবে নিবেদন করিয়াছেন। তিনিই প্রথমে ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্বের সাধনায় আকাশ-আলোকচিত্র-গ্রহণের গুরুত্ব এবং মানচিত্রের সাহায্যে প্রত্নক্ষেত্রের ও প্রত্নবস্তুর বিস্তার ও পরিধি সম্পর্কে সুনির্ধারিত পথের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের প্রধান তিনটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়—সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও পুরাবস্তুর নিরীক্ষণ, যথাযথ লিপিকরণ এবং ব্যাখ্যা প্রদান। কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রীয় প্রত্নবিজ্ঞানজাত মানব-সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত বিকারগ্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক

মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিবৃত্ত এক্সক্যাভেসন্ বা উৎখনন ভিত্তিক। এক্সক্যাভেসনের (ডিগিং) সাধারণ অর্থ মৃত্তিকাখনন। কিন্তু প্রত্ন-বিজ্ঞানশাস্ত্রে এক্সক্যাভেসন্ শব্দ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রত্ন বিজ্ঞানে এক্সক্যাভেসন্ বলিতে মৃত্তিকা-খননদ্বারা ভূগর্ভস্থ নিদর্শনের প্রকটন, উত্তোলন এবং অনুশীলন সম্পর্কিত সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক কার্যপ্রণালীকে বুঝায়। ভূগর্ভে বিন্যস্ত মানবসংস্কৃতির যাবতীয় নিদর্শনরাজির অনাবরণ, উদ্ধরণ, লিপিকরণ, অনুশীলন এবং ইতিহাস-রূপায়ণ সংক্রান্ত তত্ত্ব-সাধনাই এক্সক্যাভেসনের বিষয়বস্তু। বাংলা ভাষায় এক্সক্যাভেসন্-অর্থে খনন শব্দের ব্যবহার বিশেষ অর্থবোধক নহে। খনন বলিতে মৃত্তিকাদির বিদারণকে বুঝায়। কিন্তু এক্সক্যা-ভেসনের অর্থঃ মৃত্তিকাখনন পূর্বক ভূগর্ভে বিন্যস্ত নিদর্শনরাজির আবিষ্করণ, উদ্ধরণ এবং তাহাদের যথার্থ অনুশীলন। এই বিশেষ অর্থে এক্সক্যাভেসনের বাংলা পারিভাষিক শব্দ উৎখনন বহুলাংশে (উৎ—খন +অনট্) অর্থবোধক। উৎখনন বলিতে মৃত্তিকা খনন করিয়া ভূগর্ভস্থ নিদর্শনের উন্মোচন ও উদ্ধরণকে বুঝায়। সুতরাং খনন-শব্দের পরিবর্তে উৎখনন্-শব্দ এক্সক্যাভেসনের যথার্থ বাংলা পরিভাষা বলিয়া গ্রহণ করা শ্রেয়। অতএব 'সায়েন্স অব্ এক্সক্যাভেস,

সংজ্ঞাকে উৎখনন-বিজ্ঞান বা উৎখননতত্ত্ব আখ্যায় অভিহিত করা যায়। উৎখনন-বিজ্ঞান সম্পর্কিত সামগ্রিক আলোচনাই বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু।

কালের প্রবাহে সকল প্রকার পুরানিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত হয়। মৃত্তিকাবৃত অধিকাংশ পুরানিদর্শন ভূগর্ভে সুরক্ষিত থাকে। সুতরাং ভূগর্ভস্থ সকল প্রকার প্রত্ন-নিদর্শনের অনাবরণ ও পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত মৃত্তিকা খনন আবশ্যক। পূর্বে মূল্যবান পুরাবস্তু বা ধনদৌলত সংগ্রহের জন্যই প্রাচীন বাসক্ষেত্রে বা সমাধিক্ষেত্রে খনন করা হইত। উক্ত প্রকার খননকার্যের উদ্দেশ্য ছিল প্রত্নবস্তু-লুণ্ঠন। এই প্রকার খননকার্য মানবসংস্কৃতির ইতিহাস-রূপায়ণে ফলপ্রদ হয় না। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত প্রকার ধন-দৌলতের লুণ্ঠন-প্রণোদিত মৃত্তিকা-খননই বৈজ্ঞানিক উৎখননের উৎস। লুণ্ঠিত প্রত্নবস্তুর অনুশীলনের ফলেই প্রত্ননিদর্শনজাত ইতিহাস প্রথমে প্রতিভাত হইয়াছে। মৃত্তিকা-খনন পূর্বক কেবলমাত্র প্রত্নবস্তুর সংগ্রহ বা উদ্ধারই উৎখননের উদ্দেশ্য নহে। উৎখননের মুখ্য উদ্দেশ্য মানবসংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণ করা। বিশৃঙ্খল মৃত্তিকা-খননজাত পুরানিদর্শন ইতিহাস-রূপায়ণের পরিপন্থী। এই প্রকার খননকার্য মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস-রূপায়ণের অমূল্য সম্পদ-সমূহকে চিরকালের জন্য ধ্বংস করে। উক্ত প্রকার প্রত্ননিদর্শনজাত ইতিবৃত্ত বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক।

ইতিহাস-রূপায়ণে উৎখননতত্ত্বের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় উৎখনন-কার্যের পরিচালনা অবিদিত ছিল। উৎখননের সহিত জড়িত সকল বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্রও অজ্ঞাত ছিল। স্তরবিন্যাসই উৎখননের সারকথা; কিন্তু পূর্বে এ সম্পর্কেও কোন জ্ঞান ছিল না। প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণ পদ্ধতিও

অজ্ঞাত ছিল। বর্তমানে উৎখনন সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলাদ্বারা পরিচালিত। প্রাক-উৎখনন-পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেদনের (রিপোর্ট) প্রকাশন পর্যন্ত সর্ব পর্যায়ই বৈজ্ঞানিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার অবদানের ফলেই উৎখনন অধুনা একটি সুশৃঙ্খলিত বিজ্ঞান-শাখায় পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমান উৎখননবিদ্যাই মানবসংস্কৃতির ইতিহাস-রূপায়ণের সুদৃঢ় ভিত্তি।

উনবিংশ শতাব্দীতে শ্লীম্যান্ ও পেট্রী ব্যাপক উৎখননকার্যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহাদের উৎখনিত প্রত্ন-নিদর্শনরাজি অদ্যাপি ইতিহাস-রূপায়ণের অমূল্য সম্পদরূপে স্বীকৃত। কিন্তু বর্তমান উৎখননতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাদের খননকার্যের বিরূপ সমালোচনা করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। কারণ, তাঁহাদের উৎখননকার্য বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয় নাই এবং বিশৃঙ্খল খননের ফলে মানবসংস্কৃতির ইতিহাস-রূপায়ণ পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শ্লীম্যান্ ও পেট্রী উৎখনন-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা এবং দৃষ্টিভঙ্গী উনবিংশ শতাব্দীতে অজ্ঞাত ছিল। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে মার্শাল্ কর্তৃক পরিচালিত উৎখনন-কার্যকেও বৈজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠা-বর্জিত বলা চলে। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মার্শাল মহেঞ্জো-দারোতে ব্যাপক উৎখননকার্য পরিচালনা করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শনরাজি আবিষ্কার করিয়াছেন। মার্শালের এই উৎখনন বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিচালিত হয় নাই। এমন কি, বিদগ্ধ উৎখননবিদ্‌গণ মার্শাল কতৃক পরিচালিত উৎখননকে 'আন্তর্জাতিক কলঙ্ক' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ ও পদ্ধতি প্রবর্তিত হইবার পরেও অবৈজ্ঞানিক উপায়ে মার্শালের উৎখনন-কার্যক্রমের জন্যই মহেঞ্জোদারো সভ্যতার ইতিবৃত্তের অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর হয় নাই। তৎসত্ত্বেও স্বীকার

করিতে হইবে যে, মার্শালের ব্যাপক উৎখননের ফলেই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার সামগ্র্য চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, নিয়মনিষ্ঠা ও দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান উৎখননকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে। পিট্ রিভার্সই উৎখননকার্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও নিয়মতন্ত্রের প্রথম প্রবর্তক। ইংলণ্ডের প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ঈভান্‌স্ এবং পিট্ রিভার্স উৎখননের এবং প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার ও উদ্ধরণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সর্বপ্রথমে বিন্যাস করিয়াছেন। পিট রিভার্স কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়ন্ত্রণ-তন্ত্র উৎখননের আদর্শ বৈজ্ঞানিক পন্থা হিসাবে অদ্যাপি স্বীকৃত। রিভার্সের পরেও অনেক বিজ্ঞানবেত্তা উৎখননকার্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও অনুশাসনের প্রবর্তন করিয়াছেন। উলী, হুইলার প্রভৃতি বিদগ্ধ উৎখননবিদ্‌গণ উৎখননের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বহুলাংশে সুদৃঢ় করিয়াছেন। ভারতবর্ষে হুইলারই বৈজ্ঞানিক পন্থায় উৎখননকার্য পরিচালনার প্রথম প্রবর্তক।

স্তরবিন্যাসই উৎখনন-বিজ্ঞানের মৌলিক ভিত্তি। সকল প্রকার বাস্তব নিদর্শনই ইতিহাস-রূপায়ণের অমূল্য সম্পদ। সমকালীন উৎখননতত্ত্ব কেবলমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্নবস্তুর সাপেক্ষ নহে। পক্ষান্তরে, বর্তমান উৎখননতত্ত্বে প্রত্ননিদর্শনের যথাবস্থান এবং সংশ্লিষ্ট নজীরের গুরুত্ব সর্বাধিক। স্তরবিন্যাসজাত প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার এবং তাহাদের অনুশীলনজাত মানবসংস্কৃতির ইতিহাস-লিখনই বর্তমান উৎখনন-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। উৎখনন-বিজ্ঞানে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত বা সংগৃহীত প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব স্বীকার্য নহে।

বিভিন্ন যুগের মানবসংস্কৃতির নিদর্শনরাজি ভূগর্ভে বিন্যস্ত থাকে। মৃত্তিকা খনন করিয়া তাঁহাদের বিপর্যস্ত ও ধ্বংস করা হয়। এই ধ্বংস-সাধনের সার্থকতা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ও নিয়মতন্ত্রের প্রয়োগের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল—যেমন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে

প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্করণ, যথাযথ লিপিকরণ, মর্মার্থ নিষ্কর্ষণ এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উৎখনন-প্রতিবেদনের প্রকাশণ। ভূগর্ভে বিন্যস্ত প্রত্ননিদর্শনের যথাযথ পূনর্বিন্যাস করাই উৎখনন-প্রতিবেদনের মুখ্য উদ্দেশ্য। উৎখননজাত সকল প্রকার প্রত্ননিদর্শনের সাহায্যে প্রত্নক্ষেত্রের অধিবাসিগণের এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদিগের সংস্কৃতির রূপায়ণ করিতে হইবে। কোন প্রত্নক্ষেত্রের উৎখননজাত উপাদানকে স্বতন্ত্রভাবে অনুশীলন করা যায় না। এক সংস্কৃতির সহিত অপর সমকালীন সংস্কৃতির তুলনামূলক অধ্যয়ন করিয়া সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতির প্রভাব, প্রভৃতির সম্যক পরিচয় প্রদান করাও অত্যাবশ্যক। উক্ত কার্যক্রম বৈজ্ঞানিক পন্থায় পরিচালিত হইলেই উৎখননের সার্থকতা প্রতিপাদিত হইবে এবং মানবসমাজের ইতিবৃত্ত-রূপায়ণে নূতন তথ্যের সংযোজন সম্ভবপর হইবে। কেবলমাত্র প্রত্নবস্তু-আহরণের অভিলাষ-প্রসূত খননকার্য ইতিহাসের মৌলিক তথ্যের ধ্বংস সাধন করে।

উৎখনন-কার্যক্রমের সর্বস্তরই বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি ও নিয়মতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত—প্রত্নক্ষেত্রের অনুসন্ধান ও নির্দ্দিষ্টীকরণ, খননকার্য, স্তরবিন্যাস-নির্ণয়, পুরাবস্তুর লিপিকরণ ও পরিমাপ-গ্রহণ, উদ্ধরণ ও সংরক্ষণ, কালনিরূপণ, আলোকচিত্র-গ্রহণ, নক্সাঙ্কন ও ছেদস্তর-চিত্রণ, মর্মার্থ-উদ্ঘাটন, প্রতিবেদন-লিখন ও প্রকাশণ ইত্যাদি। বর্তমান প্রত্নবিজ্ঞান যথার্থ ক্ষেত্রীয় বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। যে বিদগ্ধ বিদ্যার্থী এই মৌলিক সত্যকে অগ্রাহ্য করে তিনি পণ্ডিত বলিয়া সমাদৃত হইতে পারেন, কিন্তু প্রত্নবিজ্ঞানী নহেন। ক্ষেত্রীয় পর্যবেক্ষণ ও উৎখনন-বহির্ভূত প্রত্নতত্ত্বীয় সাধনা অপরিদর্শিত দেশের মানচিত্র-অঙ্কনের প্রায়াসের অনুরূপ। ক্ষেত্রীয় পর্যবেক্ষণে ও উৎখননের কার্যক্রমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ ও প্রয়োগ সংক্রান্ত সর্বপ্রকার তত্ত্বালোচনাই বর্তমান্ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

উৎখননতত্ত্বের আলোচনা একাধিক সংস্কৃতিপর্ব-সম্বলিত : প্রি-হিষ্টরিক্, প্রোটো-হিষ্টরিক্ এবং হিষ্টরিক্। মানবসংস্কৃতির উক্ত প্রকার বিভাজন সন্তোষজনক নহে; এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর। তথাপি আলোচনার সুবিদার জন্য এই বিভাজন সাধারণভাবে স্বীকৃত।

উল্লিখিত তিনটি সংস্কৃতি-পর্বের সংজ্ঞা বর্তমান গ্রন্থে প্রায়শঃই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রত্নতত্ত্বীয় আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংজ্ঞা তিনটির আলোচনা আবশ্যক। প্রি-হিস্‌ট্রি, প্রোটো-হিস্‌ট্রি, হিস্‌ট্রি বলিতে প্রাক্-ইতিহাস, আদি-ইতিহাস ও ইতিহাসকে বুঝায়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় প্রি-হিস্‌ট্রি শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় প্রাক্-ইতিহাস প্রি-হিস্‌ট্রি শব্দের পরিভাষা। প্রথমে প্রাক্-ইতিহাস সংজ্ঞা মানব-সংস্কৃতির আদি-পর্বকে বুঝাইত। পরে প্রাক্-রোমক ইতিবৃত্তকে প্রাক্-ইতিহাস অখ্যায় অভিহিত করা হয়। কিন্তু বর্তমান প্রত্নবিজ্ঞানে প্রাক্-ইতিহাস সংজ্ঞা বিশেষ অর্থবোধক।

মানবসংস্কৃতির প্রারম্ভকাল হইতে আরম্ভ করিয়া লেখ-নজীরের প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত মানবসমাজের ইতিবৃত্ত প্রাক্-ইতিহাসের পর্বভুক্ত। প্রাক্-ইতিহাস লিখিত উপাদান-প্রাপ্তির পূর্ববর্তী মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত। লেখনজীর-প্রাপ্তির সময় হইতেই ইতিহাসের সূচনা। প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-ইতিহাস-পর্ব লেখ-নজীরের পূর্ববর্তী অধ্যায় এবং ইতিহাস লেখ-নজীরের সমবর্তী ও উত্তরবর্তী। প্রাক্-ইতিহাসের আবর্তনক্ষেত্র পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া লেখ-নজীরের আবিষ্কারকাল পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। ইতিহাস লেখ-নজীর-ভিত্তিক। প্রাক্-ইতিহাস অলিখিত বাস্তব নিদর্শন-ভিত্তিক। অলিখিত উপাদানজাত মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্তই প্রাক্-ইতিহাস। প্রাক্-ইতিহাসের উপাদান মনুষ্যনির্মিত জড়বস্তু বা বাস্তব

পদার্থনির্মিত নিদর্শন—যেমন, হাতিয়ার বা অস্ত্রশস্ত্র, গৃহস্থালী-সরঞ্জাম, আলংকারিক বা বেশভূষার সামগ্রী, বাস্তু ইত্যাদি।

কতিপয় বিজ্ঞানবেত্তা প্রাক্-ইতিহাসকে দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন—যেমন, মুখ্য প্রাক্-ইতিহাস এবং গৌণ প্রাক্ ইতিহাস। মুখ্য প্রাক্-ইতিহাস ইতিহাসের পূর্ববর্তী ইতিবৃত্ত। লিখিত নজীরভিত্তিক গৌণ প্রাক্-ইতিহাসে নিরক্ষর ও সাক্ষর মানবসংস্কৃতির সহিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। সাধারণত: মানবসংস্কৃতির প্রাক্-ইতিহাস-পর্বকে 'ষ্টোন্ এইজ' বা অশ্মীয়যুগ বলা হয়। অর্থাৎ, এই যুগে প্রস্তরের ব্যবহারই অধিক প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই সংজ্ঞা বিভ্রান্তিকর। কারণ, অশ্মীয় যুগেও মানুষ অন্যান্য সহজপ্রাপ্তিসাধ্য পদার্থদ্বারাও বস্তু নির্মাণ করিত—যেমন, দারু এবং অস্থি। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাক্-ইতিহাস-পর্বে মানুষ প্রধানত: প্রস্তরই ব্যবহার করিত। অধিকন্তু দারু বা অস্থি-নির্মিত বস্তু নশ্বর। সুতরাং সুপ্রাচীন দারু বা অস্থিনির্মিত বস্তু সাধারণত: প্রাপ্তিসাধ্য নহে। কেবলমাত্র প্রস্তরই অবিনষ্ট। এই মর্মে অশ্মীয় যুগ আখ্যার তাৎপর্য স্বীকার্য—অর্থাৎ, এই যুগে মানবসংস্কৃতির নিদর্শন প্রস্তর-নির্মিত বস্তুর মধ্যেই বহুলাংশ সীমাবদ্ধ।

বিবিধ প্রস্তর-হাতিয়ারের নির্মাণ-কৌশল অনুশীলন করিয়া অশ্মীয় যুগকে তিনটি প্রধান পর্বে বিভক্ত করা হইয়াছে—প্যালাইও-লিথিক্ (প্যালাইও = প্রত্ন; লিথিক্ = অশ্মীয়; প্রত্নাশ্মীয়), মেসোলিথিক্ (মেসো = মধ্যম; লিথিক্ = অশ্মীয়; মধ্যাশ্মীয়) এবং নিওলিথিক্ (নিও = নব; লিথিক্ = অশ্মীয়; নবাশ্মীয়)—অর্থাৎ, প্রত্নাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয়। প্রত্নাশ্মীয় যুগের হাতিয়ার অতীব নিকৃষ্ট ধরণের। বন্ধুর ও অমার্জিত প্রস্তরদ্বারা হাতিয়ার নির্মিত হইত। প্রস্তর হাতিয়ারের নির্মাণ-কৌশলের ক্রমোন্নতিও লক্ষ্যণীয়।

এই ক্রমোন্নতি অনুশীলন করিয়া প্রত্নাশ্মীয় পর্বকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে—অধস্তন-প্রত্নাশ্মীয়, মধ্যস্তন-প্রত্নাশ্মীয় ও ঊর্ধ্বস্তন-প্রত্নাশ্মীয়। অধিকন্তু, বিভিন্ন প্রস্তর-হাতিয়ারের নির্মাণ-পদ্ধতি, আকার ও অন্যান্য লক্ষণ অনুধাবন করিয়া প্রতি পর্যায়কে একাধিক উপ-পর্যায়ে বিন্যাস করা হইয়াছে। ঊর্ধ্বতন প্রত্নাশ্মীয় পর্যায়ে মানুষ অতীব উন্নত ধরনের হাতিয়ার নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে। এই পর্যায়ে নানাবিধ অস্থি-নির্মিত হাতিয়ার বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়।

মধ্যাশ্মীয় পর্বে এক নূতন ধরনের প্রস্তর-হাতিয়ারের নির্মাণ লক্ষণীয়। এই ধরনের হাতিয়ারকে মাইক্রোলিথ্ (মাইক্রো = ক্ষুদ্র + লিথ = অশ্ম) বা ক্ষুদ্রাকৃতির প্রস্তর-হাতিয়ার বলা হয়। এই সকল হাতিয়ারের নির্মাণ-পদ্ধতি ও ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধারণতঃ মৎস্য-শিকারের জন্য ক্ষুদ্রাকৃতি অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। নবাশ্মীয় যুগের প্রস্তর-হাতিয়ার সম্পূর্ণ নূতন কৌশলে নির্মিত। অমার্জিত প্রস্তর দ্বারা নির্মাণোত্তর হাতিয়ারকে ঘর্ষণ করিয়া মসৃণ ও উজ্জ্বল করা হইত।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অশ্মীয় যুগ, প্রত্নাশ্মীয় যুগ ইত্যাদি যুগবাচক উক্তি বিভ্রান্তিকর। কারণ, যুগ শব্দের মধ্যে কাল বা সময়ের সূচনা অন্তর্নিহিত। প্রত্নাশ্মীয় যুগ, এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কেবলমাত্র অমার্জিত ও বন্ধুর প্রস্তরের হাতিয়ার একই সময়ে ব্যবহার করিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর এক অংশে প্রত্নাশ্মীয় হাতিয়ারের ব্যবহার প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও অপর অংশে নবাশ্মীয় হাতিয়ার ব্যবহৃত হইত। পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্নাশ্মীয় হাতিয়ারের সমকালীনতা প্রতিপাদ্য নহে। অতএব যুগ-শব্দের ব্যবহার অযৌক্তিক। যুগ-শব্দের পরিবর্তে পর্ব বা পর্যায় শব্দের ব্যবহার শ্রেয়। প্রত্নাশ্মীয় যুগের পরিবর্তে প্রত্নাশ্মীয় পর্ব বা 'পর্যায় উক্তির সঙ্গতি অধুনা স্বীকৃত।

শ্রমশিল্পই মানব প্রকৃতির ও সংস্কৃতির বা সমাজের প্রকৃত উৎস। শ্রমশিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে মানবসংস্কৃতির ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠনের বিবর্তন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নূতন ধরনের শ্রমশিল্পের প্রবর্তনের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য রীতিনীতি ও সংহতি পরিবর্তিত হয়। শ্রমশিল্পের ঊষালগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া যান্ত্রিক ও শ্রমবিপ্লব এবং বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানব-সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির পথক্রমের ইতিবৃত্ত-রূপায়ণকার্যই প্রত্নতত্ত্বের অনবদ্য অবদান। এই রূপায়ণের কাঠামো শ্রমশিল্পজাত বাস্তব নিদর্শন।

প্রত্নাশ্মীয় পর্বে মানুষ খাদ্য-সংগ্রহণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। পশু ও মৎস শিকার এবং উদ্ভিদ্‌রাজি সংগ্রহ করিয়া মানুষ জীবন-ধারণ করিত। এই খাদ্য-সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল মানুষের সমাজকে 'খাদ্য-সংগ্রাহক সমাজ' বলা যায়। খাদ্য-সংগ্রাহক সমাজে মানুষ সকল প্রকার বন্ধন ও শৃঙ্খল হইতে মুক্ত ছিল। তাঁহার কোন স্থায়ী বসতি ছিল না। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া দেশ-দেশান্তরে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বিচরণ করিত। পরিবার-গঠন ও বিবাহ-শৃঙ্খলা অবিদিত ছিল। বংশ বা কুল বা গোষ্ঠী সম্পর্কিত কোন প্রকার বন্ধন ছিল না। পণ্ডিতগণ এই প্রারম্ভিক মানবসমাজকে অসভ্য বা বর্বর আদিম সমাজ আখ্যায় চিহ্নিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্নাশ্মীয় শ্রমশিল্পজাত মানবসমাজকে প্রাক্‌-গোত্র বা শৃঙ্খলমুক্ত সমাজ আখ্যায় অভিহিত করা যায়।

মধ্যাশ্মীয় পর্বে নূতন শ্রমশিল্পের প্রবর্তনের ফলে মানবসমাজের রূপ ও গঠন পরিবর্তিত হয়। মানুষের স্থায়ী আবাসস্থল, গৃহস্থালীর বিবিধ সাজসরঞ্জাম-তৈয়ার, খাদ্য সংগ্রহ ও ভোজন, বেশভূষা প্রভৃতি বিষয়ে মানবসমাজ ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। নবাশ্মীয় পর্বে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের শ্রমশিল্পের উদ্ভবের সঙ্গে মানবসমাজের বৈপ্লবিক

রূপান্তর সাধিত হয়। কেবলমাত্র খাদ্য সংগ্রহ করিয়া মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আকস্মিকলব্ধ বা প্রাকৃতিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও বাস্তব নিদর্শনের সাহায্যে মানুষ খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করে। খাদ্য-উৎপাদনের ফলে মানবজীবনের ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়—নূতন মানবসমাজ সৃষ্টি হয়। এই সমাজকে 'খাদ্য-উৎপাদক সমাজ' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে।

উক্ত সময় হইতেই মানুষ গৃহাদি নির্মাণ করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। স্থায়ী বসবাস ব্যতিত খাদ্য-উৎপাদন অসম্ভব। খাদ্য-উৎপাদনের সঙ্গেই অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিবর্তন যেমন, নানাবিধ শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিময়-প্রথা প্রভৃতি জড়িত। সাংসারিক বা পারিবারিক শৃঙ্খলা ও সম্পর্ক বিধিবদ্ধ হয়। বিবাহ-বন্ধন সুদৃঢ় হয়। বংশ, কুল, গোত্র ও গোষ্ঠী, গ্রামভিত্তিক-সমাজ প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। এই সমাজেই পুরুষের প্রভাব ও আধিপত্য বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়িয়া ওঠে। দেবতা ও উপদেবতায় বিশ্বাস ও নানা প্রকার ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের উদ্ভব হয়। খাদ্য-উৎপাদক সমাজেই মানুষ বিশ্রাম বা অবসর গ্রহণের প্রথম সুযোগ পায়। অবসরই মানুষকে অধিক চিন্তাশীল করিয়া তোলে। মননশক্তির বলে বলীয়ান হইয়াই মানুষ জীবনযাত্রার নূতন পথের সন্ধান করিতে সক্ষম হয়। এই অবসরজাত চিন্তাশীলতাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আবিষ্কারের পথ-প্রদর্শক। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান জগতে অধিকাংশ মৌলিক বিজ্ঞান-শাখার উৎসের সন্ধান নবাশ্মীয় পর্বেই পাওয়া যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খাদ্য-উৎপাদক এবং পরবর্তী সমাজেও খাদ্য-সংগ্রহণকার্য অব্যাহত ছিল।

পৃথিবীর বিভিন্নাংশের অনুরূপ, ভারতবর্ষেও প্রাক্-ইতিহাস-পর্ব প্রস্তর-নির্মিত প্রারম্ভিক হাতিয়ারের প্রাপ্তিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া

লেখনজীর-নিদর্শনের আবিষ্কারকাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্নাংশ হইতে প্রত্নাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় পর্বের প্রস্তর-হাতিয়ারের আবিষ্কারও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইউরোপের অনুরূপ প্রত্নাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় পর্বভুক্ত হাতিয়ারের এবং সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক নিদর্শনের স্তরবিন্যাস-প্রসূত তথ্যাদির কালনির্ঘণ্টদায়ক অনুক্রম পর্যায় নির্ণয় করা ভারতবর্ষে অদ্যাপি সম্ভবপর হয় নাই। ভারতবর্ষের যথার্থ লেখনজীরের প্রাপ্তিকাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ধার্য করা হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক উপাদান-অনুসারে ভারতবর্ষের ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করা যায়। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রাক্-ইতিহাস অধস্তন প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য-ভিত্তিক ইতিহাসের আরম্ভকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রের মধ্যভাগে আরোপিত হইয়াছে। স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈদিক সাহিত্যজাত ইতিহাসের প্রত্নতত্ত্বীয় ভিত্তি অদ্যাপি অবর্তমান। তথাকথিত আর্য-সংস্কৃতিও প্রত্নতত্ত্বীয় মূলবর্জিত। তথাপি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করা হয়। অতএব ভারতবর্ষের প্রাক্-ইতিহাস-পর্ব লেখনজীরের প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত প্রসার্য।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্র হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লেখ-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফলে, প্রাগৈতিহাসিক পর্বকে সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভবকাল পর্যন্ত প্রসারিত করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সিন্ধু সভ্যতার লেখর পাঠোদ্ধার অদ্যাপি সম্ভবপর হয় নাই। সিন্ধু সভ্যতার ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণরূপে বিবিধ বাস্তব পদার্থজাত নিদর্শনভিত্তিক। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার রূপায়িত ইতিবৃত্তকে যথার্থ ইতিহাস বলা যায় না। কারণ, লিখিত

তথ্য হইতে উক্ত ইতিবৃত্ত রূপায়িত হয় নাই। সিন্ধু সভ্যতাকে ইতিহাস-পর্বে অন্তর্ভুক্ত করাও সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে, লেখ-নিদর্শনের বিদ্যমানতার জন্য সিন্ধু সভ্যতাকে প্রাক্-ইতিহাস-পর্বের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতা-পর্বের জন্য অপর একটি সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে—আদি-ইতিহাস।

মানবসংস্কৃতির যে পর্বে আবিষ্কৃত লেখনজীরের পাঠোদ্ধারজাত ইতিবৃত্তকে সন্নিবেশ করা সম্ভব হয় নাই সেই পর্বকেই আদি-ইতিহাস (প্রোটো-হিস্টরি) আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। আদি-ইতিহাস সংজ্ঞা দ্বারা ইতিহাস-পর্বের উষালগ্নকে বুঝায়—অর্থাৎ, প্রাক্-ইতিহাসের উত্তরবর্তী এবং ইতিহাসের অব্যবহিত পূর্ববর্তী। আদি-ইতিহাস-পর্বে লেখনজীরের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণরূপে বাস্তব নিদর্শনজাত। অধিকন্তু ইতিহাস-পর্বের সংস্কৃতির সহিত লৌহের ব্যবহার জড়িত। লৌহের অবিদ্যমানতা আদি-ইতিহাস সংস্কৃতি-পর্বের বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষের লেখনজীর-সম্বলিত হরপ্পা-সংস্কৃতি আদি-ইতিহাস-পর্বভুক্ত।

আদি-ইতিহাস সংজ্ঞার পরিবর্তে অপর একটি সংজ্ঞা উৎখনন-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়—ক্যাল্‌কোলিথিক্ (চ্যাল্‌কোলিথিক্) [ক্যাল্‌কো—তাম্র/ব্রোঞ্জ + লিথ্—অশ্ম; অর্থাৎ, তাম্র/ব্রোঞ্জ ও প্রস্তরের যুগপৎ ব্যবহার]। সাধারণভাবে বলা যায় যে, নবাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বের পরবর্তী অধ্যায়ে মানুষ তাম্র-ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ করে। এই ধাতুর প্রবর্তন সত্ত্বেও প্রস্তর-হাতিয়ারের নির্মাণ ও ব্যবহার পরিত্যক্ত হয় নাই।

তাম্র-ধাতুর ব্যবহার মানবসভ্যতার বিকাশের সর্বপ্রথম ধাপ। প্রথমে মানুষ আকরিক তাম্রদ্বারা জিনিষপত্র-তৈয়ার আরম্ভ করে।

পরে তাম্র গলাইবার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার ফলে ধাতু প্রস্তুতের প্রক্রিয়া-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। ক্রমে তাম্রের সহিত টিন্ (রাঙ্গ্) মিশ্রিত করিয়া ব্রোঞ্জ ধাতু তৈয়ার করিবার প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয়। এই ধাতব পদার্থ-দুইটির সহিত প্রস্তরের ব্যবহার অব্যাহত ছিল। সুতরাং তাম্র/ব্রোঞ্জ এবং প্রস্তর ব্যবহারের যুগপত্তা স্বীকার্য। যুগপৎ তাম্র/ব্রোঞ্জ এবং প্রস্তরের শ্রমশিল্পজাত মানবসংস্কৃতির পর্বকেই তাম্রাশ্মীয় (ক্যাল্‌কোলিথিক্) বলা হয়।

অনেক উৎখননবেত্তা তাম্রাশ্মীয় বা ক্যাল্‌কোলিথিক্ সংজ্ঞা-প্রয়োগের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে তাম্র-ধাতুর ব্যবহারই একটি নূতন সংস্কৃতি-পর্বের সূচক। উক্ত সময় হইতেই তাম্র-যুগের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং তাম্রাশ্মীয় সংজ্ঞার ব্যবহার অর্থহীন। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সর্বপ্রথম তাম্র অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য পদার্থ ছিল। অতএব তাম্র-ধাতুর অধিক প্রচলনও সম্ভবপর হয় নাই। ফলে, মানবসমাজ প্রস্তর-শিল্পের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল। এমতাবস্থায় তাম্র-প্রস্তরযুগ-সংজ্ঞার ব্যবহার একেবারে অসঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ, তাম্রাশ্মীয় সংজ্ঞা তাম্র ও প্রস্তরের যুগপৎ ব্যবহারের অভিব্যক্তিমূলক। তৃতীয়তঃ, মানবসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় নবাশ্মীয় এবং পরিণত ব্রোঞ্জ সংস্কৃতি-পর্ব দুইটির মধ্যে বিচ্ছেদের বিদ্যমানতাও উল্লেখ্য। এসিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত নবাশ্মীয় ও ব্রোঞ্জ-পর্বভুক্ত নিদর্শনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদও প্রকটিত। সুতরাং নবাশ্মীয় ও ব্রোঞ্জ যুগের মধ্যবর্তী সংস্কৃতি-পর্বকে ক্যাল্‌কোলিথিক্ আখ্যায় অভিহিত করা অসঙ্গত নহে। এক বিদগ্ধ উৎখনন-বেত্তা মন্তব্য করিয়াছেন যে, ক্যাল্‌কোলিথিক্ সংজ্ঞার ব্যবহার বিরক্তিকর এবং বিরূপজনক; কিন্তু প্রত্নবিজ্ঞানে এই সংজ্ঞার উপযোগিতাও অস্বীকার করা যায় না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তাম্র-ধাতুর ব্যবহারই মানবসভ্যতার বিকাশের প্রকৃত উৎস। তাম্র-ধাতুর ব্যবহারের ক্রমোন্নতির সঙ্গেই সভ্যতার বৈশিষ্টসূচক বিভিন্ন ধারার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়—শিল্পের বিশিষ্টকরণ, নগর-বিন্যাসের উৎপত্তি ও ক্রমবৃদ্ধি, দ্রব্য-বিনিময়-প্রথার উদ্ভব, মুদ্রার প্রচলন, সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন, পুঁজিবাদী শ্রেণীর অভ্যুত্থান, শ্রেণীবদ্ধ সমাজবিন্যাস, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, বিভিন্ন প্রণালীর বিধিবদ্ধকরণ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত লিখনের আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। মানবসংস্কৃতির এই সকল বিশিষ্টতার সঙ্গে নগরকেন্দ্রিক বিপ্লবের উদ্ভব ঘটে। নগরকেন্দ্রিক বিপ্লব হইতেই মানবসভ্যতার জন্ম। ক্যাল্‌কোলিথিক্ সংজ্ঞা মানবসভ্যতার এই উষালগ্নের পরিচয়জ্ঞাপক।

ভারতবর্ষের একাধিক প্রত্নক্ষেত্রে উৎখননের ফলে উপরি-উক্ত নগরসভ্যতার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই সভ্যতার ক্রমোন্নতি বা যাত্রাপথের সূচনা ক্যাল্‌কোলিথিক্ আখ্যা দ্বারা অভিজ্ঞাত। মহেঞ্জোদারোর উৎখনক মার্শাল তাঁহার উৎখনন-প্রতিবেদনেও ক্যাল্‌কোলিথিক্ আখ্যা ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, যুগপৎ প্রস্তর এবং তাম্র/ব্রোঞ্জ-নির্মিত সামগ্রীর ব্যবহারই ক্যাল্‌কোলিথিক্ সংস্কৃতি-পর্বের বৈশিষ্ট্য। অনেক উৎখনকের মতে তাম্র/ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহারের ফলে সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। অতএব এই যুগকে তাম্র/ব্রোঞ্জ আখ্যায় অভিহিত করা সঙ্গত। কতিপয় উৎখনক এই সংস্কৃতি-পর্বকে আদি-ধাতু পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। মহেঞ্জোদারোর ধাতব নিদর্শনের অনুশীলন হইতে ধাতুবিদ্যার অগ্রগতি প্রমাণিত হয়। অতএব ক্যাল্‌কোলিথিক্ সংজ্ঞার ব্যবহার অর্থব্যঞ্জক নহে। অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, অপর কোন ব্যাপক ও অর্থবোধক সংজ্ঞার অবর্তমানে ক্যালকোলিথিক্ সংজ্ঞার ব্যবহার অগ্রাহ্য করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমান উৎখনন-বিজ্ঞানে প্রত্ন-ক্ষেত্রের নামানুসারেই সংস্কৃতির নামাঙ্কন-পদ্ধতি প্রচলিত। মহেঞ্জো-দারো প্রত্নক্ষেত্রে আবিষ্কৃত সংস্কৃতির নিদর্শনকে মহেঞ্জোদারো-সংস্কৃতি বা সভ্যতা নামে অভিহিত করা যায়। উপরন্তু, যদি একই প্রবাহিকার উপত্যকায় অবস্থিত একাধিক প্রত্নস্থলে সমসংস্কৃতির অভিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রবাহিকার উপত্যকার নামানুসারেই সংস্কৃতির নামাঙ্কন করা হয়—যেমন, সিন্ধু-সভ্যতা বা সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা। অনেক উৎখনক 'সিন্ধু-সভ্যতা' সংজ্ঞাকে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। বর্তমান উৎখনন-বিজ্ঞানে সংস্কৃতির নামাকরণ-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়াছে। যদি একই প্রবাহিকার উপত্যকার অন্তরাংশের ও বহিরাংশের একাধিক প্রত্নস্থল হইতে সমসংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে আবিষ্কৃত প্রত্নক্ষেত্রের নামানুসারে উক্ত সংস্কৃতির নামাঙ্কণ করাই বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সিন্ধু-উপত্যকার অন্তরাংশের ও বহিরাংশের একাধিক প্রত্নক্ষেত্র হইতে সমসংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল প্রত্নস্থলের মধ্যে হরপ্পা নামধেয় প্রত্নক্ষেত্রই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং একাধিক প্রত্নক্ষেত্রজাত হরপ্পার অনুরূপ সংস্কৃতিকে 'হরপ্পা-সংস্কৃতি' নামে অভিহিত করাই শ্রেয়। এতদ্ভিন্ন হরপ্পা-সংস্কৃতির পূর্ববর্তী ও উত্তরবর্তী সংস্কৃতি-পর্ব দুইটির জন্য প্রাক্-হরপ্পা ও হরপ্পা-উত্তর সংজ্ঞাদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

আদি-ইতিহাস সংজ্ঞা অধিক ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদি-ইতিহাস-পর্ব তাম্র/ব্রোঞ্জ-ধাতুর প্রচলন-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৈদিক সাহিত্যজাত তথাকথিত আর্য-ইতিহাসের আরম্ভকাল পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। সুতরাং তাম্রাশ্মীয় এবং আদি-ইতিহাস সংজ্ঞা-দুইটির তাৎপর্য অনুরূপ। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন

যে, উপরি-উক্ত সংজ্ঞার যথার্থ প্রকৃতি ও কালনিরূপণ সম্যকভাবে নির্ধারিত হয় নাই। তথাপি উল্লিখিত সংজ্ঞা ব্যাপক অর্থেই প্রচলিত হইয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে আদি-ইতিহাস সংজ্ঞা অধিক ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছে। উৎখনন-বিজ্ঞানে ইতিহাসের-বিস্তৃতি লেখ-নিদর্শনের আবিষ্কার-কাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাক্‌-বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রসারিত।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মানবসংস্কৃতির বাস্তব উপাদানভিত্তিক ইতিহাস রূপায়ণ করাই উৎখনন-বিজ্ঞানের মৌলিক উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে ইতিহাস ও উৎখনন-বিজ্ঞানের পারস্পারিক সম্পর্কের আলোচনা প্রয়োজন।

উৎখননতত্ত্বই মানবসমাজের যথার্থ ইতিবৃত্তের সুদৃঢ় ভিত্তি। অনেক বিদগ্ধ উৎখননবেত্তা 'উৎখনিত ইতিহাস' বা 'ইতিহাস-উৎখনন' উক্তি দ্বারা সাধারণ লেখনজীর-ভিত্তিক ও উৎখননজাত ইতিহাসদ্বয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন। উৎখনিত ইতিহাস-উক্তি বৈচিত্র্যমূলক। এই উক্তির তাৎপর্য: ভূগর্ভে বিন্যস্ত মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনের অনাচ্ছাদন, উদ্ধরণ, সনাক্তীকরণ, লিপিকরণ, সমশ্রেণীভুক্তকরণ, অর্থ-নিষ্কর্ষণ, ব্যাখ্যা-প্রদান ইত্যাদির ভিত্তিতে রূপায়িত ইতিহাস। উৎখনিত ইতিহাসের অর্থ, উৎখননজাত উপাদান-ভিত্তিক মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত। বৈজ্ঞানিক উৎখননজাত বাস্তব-নিদর্শনভিত্তিক মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্তই উৎখনিত ইতিহাস। যে বিজ্ঞানের সাহায্যে ইতিহাস-রূপায়ণের জন্য মৃত্তিকা-খননপূর্বক সংস্কৃতির নিদর্শন-উদ্ধরণের কার্যক্রম সাধিত হয়, তাহাই উৎখননতত্ত্ব নামে অভিহিত। ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বা উৎখননতত্ত্ব 'আরামকেদারার' প্রত্নতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আরামকেদারায়-আসীন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রত্ননিদর্শনরাজির অনুশীলনকার্যে ব্রতী। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে

উক্ত প্রত্নুনিদর্শনরাজির প্রাপ্তিস্থল, পরিবেশ, সংশ্লিষ্ট নিদর্শন, কাল-নির্ঘণ্ট ইত্যাদির কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এই সকল নিদর্শন মেদ ও চর্মসারশূন্য কঙ্কালের অনুরূপ। উহাদিগকে প্রাণবন্ত করিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থায় আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত প্রত্নুনিদর্শনের নির্মাণ-পদ্ধতি, ব্যবহার, কার্য, উদ্দেশ্য প্রভৃতি নানা প্রকার তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়াই মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাসের রূপায়ণ সম্ভবপর :

প্রকৃতপক্ষে, উৎখননতত্ত্ব ও ইতিহাসতত্ত্ব অভিন্ন। কিন্তু এই দুই তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী, উপাদান, পর্যালোচনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত-রূপায়ণে উৎখননতত্ত্বীয় কৌশলও ইতিহাসতত্ত্ব হইতে পৃথক। উৎখননতত্ত্ববিদ্ অচেতন জড়বস্তু-উপকরণ অধ্যয়ন করে। কিন্তু ইতিহাসবেত্তা সচেতন অর্থাৎ লিখিত উপাদান বিশ্লেষণ করে। ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে লিখিত উপাদানভিত্তিক। তথাপি, ইতিহাসবিদ কর্তৃক সঙ্কলিত মানবসমাজের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ। লেখনজীর-ভিত্তিক ইতিবৃত্ত অধিকাংশক্ষেত্রে অমৌলিক ও বাস্তবতথ্যবর্জিত। কিন্তু উৎখননতত্ত্বের উপাদানে অবাস্তবতা বা বিশৃঙ্খলতা অবিদ্যমান। লেখনজীর-ভিত্তিক ইতিহাস-বিবরণের সত্যতা বা যথার্থতা সর্বক্ষেত্রে নির্ণয় করা সম্ভব নহে। সাধারণতঃ, ঐতিহাসিক অকুস্থলের অনুসন্ধানী নহে। মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নানাবিধ দলিল-দস্তাবেজ ও পত্রাদি বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই তাঁহার প্রধান কার্য। কিন্তু উৎখননতত্ত্ববিদের কার্যক্রম সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পাহাড়-জঙ্গম-মরুভূমিতে বিচরণ করে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্র উৎখনন করিয়া মানবসংস্কৃতির যথার্থ বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করে। তাঁহার পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়মতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। ঐতিহাসিক মহাফেজখানায়, সরকারী দপ্তরে, সংগ্রহ-

শালায় অথবা কোন ব্যক্তির নিজস্ব সংগ্রহে রক্ষিত সকল প্রকার পুরাতন দলিল-পত্রাদির অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করিয়া ইতিহাস রূপায়ণ করে। আরামকেদারায় আসীন প্রত্নতত্ত্ববিদের কার্যও অনুরূপ। প্রত্নতত্ত্বীয় সংগ্রহশালাই তাঁহার মহাফেজখানা। মূলতঃ প্রত্নতত্ত্বীয় ইতিহাস সাধনা লেখনজীর হইতে মুক্ত। উৎখননতত্ত্ববিদ্ জড়বস্তু-নিদর্শন হইতেই ইতিহাসের মূল উপাদান সংগ্রহ করে।

লেখজাত ইতিহাসের ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। লেখভিত্তিক ইতিহাস অপূর্ণাঙ্গ। ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্বই মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিবৃত্তের সুদৃঢ় ভিত্তি। এমন কি, প্রাচীন লেখ-বহির্ভূত অনেক নূতন তথ্যাদিও উৎখননতত্ত্ব পরিবেশণ করে। মানুষের কার্যকলাপের অনেক তথ্যই লেখনজীর-ভুক্ত নহে। উক্ত তথ্যাদি কেবলমাত্র উৎখননতত্ত্বই সরবরাহ করিতে পারে। উপরন্তু, লেখনজীর পক্ষপাতিত্বদোষে দুষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত নজীরাদি বাস্তব তথ্যবর্জিত। লিখিত উপাদানজাত ইতিহাস প্রত্যয়জনক উপকরণ দ্বারা পরিপুষ্ট নহে। লিখিত উপাদানের মধ্যে রাষ্ট্রীয় দলিল-পত্রাদি, রাজকীয় অনুশাসন, ধর্মীয় সংস্থার বিধান, ধর্মগ্রন্থ, জীবন-চরিত, ভ্রমণবৃত্তান্ত, প্রাচীন লেখমালা, ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৌলিকত্ব-বিহীন মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত কাহিনীও ইতিহাসে সঙ্কলিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে লিখিত উপাদান স্মৃতি ও শ্রুতিবাহক। উক্ত প্রকার লেখজাত ইতিহাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর ও অমৌলিক চিত্রের পরিবেশক। ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্বই একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থা যাহার সাহায্যে মানুষের কার্যাবলীর যথার্থ রূপায়ণ সম্ভবপর।

লেখজাত ইতিহাস আংশিক ও অসম্পূর্ণ। লিখিত উপাদানে রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষিত সমাজের কার্যাবলীর নির্দেশ পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণী মানবসমাজের এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। লিখন-পদ্ধতি

আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে অদ্যাবধি মানবসমাজের এক ক্ষুদ্রাংশের মধ্যেই উক্ত জ্ঞানসীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে, লেখ-নজীর বিশেষ অধিকার-প্রাপ্ত ও অভিজাত শ্রেণীর চিন্তাধারা ও কার্যাবলীর চিত্র পরিবেশন করে। শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক বর্ণিত সাধারণ ও অশিক্ষিত মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যাদির বিবরণও বহুলাংশে অমৌলিক। সুতরাং লেখ-নজীরজাত বৃত্তান্ত সাধারণ মানবসমাজের ইতিহাস নহে। এই ইতিহাস রাজকীয়, অভিজাত বা শিক্ষিত সমাজের বিবরণ।

উৎখননতত্ত্বই একমাত্র বিজ্ঞান যাহার সাহায্যে ধনী, অভিজাত এবং জনসাধারণের যথার্থ ইতিহাস রূপায়ণ করা সম্ভবপর। এই ইতিহাসের উপাদান মানুষের নির্মিত বা ব্যবহৃত সর্বপ্রকার বাস্তব নিদর্শন। নগর-প্রত্নক্ষেত্রের উৎখননজাত উপকরণ হইতে রাজন্যবর্গ, নাগরিক, সরকারী কর্মী, ব্যবসায়ী, প্রভৃতির প্রকৃত ইতিহাস রূপায়ণ করা সম্ভব। গ্রামীণ প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার সামগ্রিক তথ্য-নিদর্শন পরিবেশন করে। নগর ও গ্রামের অধিবাসিগণের জীবনযাত্রার সহিত যুক্ত সকল প্রকার বাস্তব নিদর্শন হইতেই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রূপায়ণ করা সম্ভবপর। এই প্রসঙ্গে উলী কর্তৃক উর নামক প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন উল্লেখ্য। উরের সমাধি-ক্ষেত্রের উৎখনন রাজকীয় ও অভিজাতশ্রেণীর এবং সাধারণ মানুষের ইতিহাস-রূপায়ণের মৌলিক নিদর্শন সরবরাহ করিয়াছে। রাজকীয় ও সাধারণ সমাধি-ক্ষেত্রজাত উপাদান হইতে উভয় শ্রেণীর জীবনযাত্রার বিবরণ রূপায়িত হইয়াছে। এই ইতিবৃত্ত লেখজাত ইতিবৃত্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমন কি, এই সকল তথ্যাদির সন্ধানও লেখ-নজীরে পাওয়া যায় না।

লেখভিত্তিক এবং বাস্তব নিদর্শন-ভিত্তিক ইতিহাস-লিখনের কৌশল-সংক্রান্ত অনুসৃত প্রণালী এবং উপাদান-সংগ্রহ সম্পূর্ণ পৃথক।

উৎখননবিদ্ ও ইতিহাসবিদ্ উভয়েই শল্যশাস্ত্রবিশারদ। ইতিহাসবিদ্ দলিলপত্রাদির অস্ত্রোপচার করে; উৎখননবিদ্ মৃত্তিকার অস্ত্রোপচার করে। ইতিহাসবিদ্ লেখ-নজীরের অস্ত্রোপচার করিয়া ইতিহাস সঙ্কলন করে; উৎখননবিদ্ মৃত্তিকার অস্ত্রোপচারজাত মানবসংস্কৃতির নিদর্শন হইতে ইতিহাস রূপায়ণ করে। তথাকথিত ইতিহাসবিদ্ লেখ-নজীরের সঙ্কলক। ইতিহাস লেখ-নজীরের অনুশীলন ও বিশ্লেষণজাত আখ্যান। কিন্তু এই আখ্যান সর্বক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক মূলবর্জিত সঙ্কলন। মানুষের শ্রমশিল্প-নিদর্শনই উৎখনন-তত্ত্বজাত ইতিহাসের ভিত্তি। এই নিদর্শনই মানুষের চিন্তাধারার ও কার্যাবলীর যথার্থ পরিচয় প্রদান করে। উৎখনিত বাস্তব নিদর্শনভিত্তিক ইতিহাসের কাঠামো সুদৃঢ় ও তাহার বিবরণ সন্দেহাতীত। এতদ্ব্যতীত ইতিহাসের ন্যায়, প্রত্নতত্ত্ব ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নহে। প্রত্নতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় জনসমাজ—কোন এক নির্দিষ্ট শ্রেণীর সমাজ নহে। ইতিহাসতত্ত্ব অপেক্ষা প্রত্নতত্ত্ব অধিক বস্তুগত। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা বাস্তব নিদর্শনভিত্তিক।

লিখিত উপাদানজাত ইতিহাসের পরিধি অতীব সীমিত। ভূপৃষ্ঠে মানবকুলের আবির্ভাব-কাল হইতেই মানবসমাজের ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করিতে হইবে। কিন্তু ইতিহাস এই মানবসমাজের কার্যাবলীর এক শতাংশও রূপায়ণ করিতে পারে না। ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্বের পরিধি অধিক ব্যাপক। ইতিহাসের ব্যাপ্তি পাঁচ সহস্র বৎসরের অধিক নহে। কিন্তু শত সহস্র বৎসরের পূর্বে মানব-প্রজাতির অভিব্যক্তির এবং মানব-সংস্কৃতির আবির্ভাব-কাল নির্ধারিত হইয়াছে। শ্রমশিল্পের বাস্তব নিদর্শনজাত ইতিহাসের ব্যাপ্তি লিখজাত ইতিহাসের বহুগুণ অধিক। অক্ষরবিদ্যার সূচনাকাল হইতেই মানবসভ্যতার জন্ম। সভ্যতার বিকাশের সহস্র সহস্র বৎসরের পূর্ববর্তী ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে উৎখননজাত বাস্তব নিদর্শনভিত্তিক। মানবসংস্কৃতির জন্ম ও

ক্রমবিকাশ এবং সভ্যতার আত্ম-প্রকাশ সংক্রান্ত যথার্থ বৃত্তান্ত উৎখননতত্ত্বেরই অবদান।

উৎখননবিদ্‌ই প্রকৃত ঐতিহাসিক। উৎখননবেত্তাই ইতিহাসের বাস্তব তথ্যের ভিত্তি বিন্যাস করিতে সক্ষম। উৎখননবিদ্ কেবলমাত্র ইতিহাস-কঙ্কালের উদ্ধারক নহে; ইতিহাস-কঙ্কালকে আবিষ্কার করিয়া প্রাণবন্ত করে। অস্থি, মেদ প্রভৃতি সন্নিবেশ করিয়া উৎখননতত্ত্ব ইতিহাস-কঙ্কালে প্রাণসঞ্চার করে এবং আলঙ্কারিক বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া মানবসংস্কৃতির জীবন্ত ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করে। ইতিহাসের তথা মানবসংস্কৃতির সুদৃঢ় বাস্তব নিদর্শন মৃত্তিকাগর্ভে বিন্যস্ত। যে বৈজ্ঞানিক তন্ত্রের সাহায্যে উক্ত নিদর্শনসমূহকে আবিষ্কার ও উদ্ধার করিয়া মানবসংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা যায়, তাহাই উৎখনন-বিজ্ঞান। বর্তমান গ্রন্থে উৎখনন-বিজ্ঞান-সম্পর্কিত সর্বপ্রকার পর্যালোচনাই নিবেদিত হইয়াছে।

সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উৎখননের হাতিয়ারই মানবসংস্কৃতির প্রারম্ভিক কাল হইতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত সভ্যতার সামগ্রিক চিত্র পরিবেশন করিয়াছে। উৎখননের হাতিয়ারই মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন এবং ভারতবর্ষের সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রদান করিয়াছে। উৎখননের হাতিয়ারই সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরম্ভ-কাল কতিপয় শতাব্দী পূর্বে নির্ধারিত করিয়াছে। এমন কি, উৎখনন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক সমস্যারও সমাধান করিয়াছে। ভারত-রোমক বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান দুর্লভ নহে। কিন্তু বহুদিন যাবৎ রোমক বাণিজ্য-কেন্দ্র ও উপনিবেশ, জিনিষপত্র প্রভৃতির কোন বাস্তব নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিচেরীর নিকট-বর্তী আরিকামেডু নামক প্রত্নক্ষেত্রে উৎখননের ফলে একটি রোমক

বাণিজ্য-কেন্দ্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এমন কি, কাল-নির্দিষ্ট রোমক মৃৎপাত্র যথা, এরিটাইন্ ও কুণ্ডলীকৃত মৃৎপাত্র, অ্যাম্ফোরা প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল আবিষ্কারের ফলে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের ভিত্তি বহুলাংশে সুদৃঢ় হইয়াছে। ব্রহ্মগিরির উৎখনন দ্বারা দক্ষিণ ভারতে লৌহযুগের পূর্বে তাম্রযুগের বিদ্যমানতা-স্থিরীকৃত হইয়াছে। তক্ষশীলার বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয়-তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের লেখ-নজীরবর্জিত অনেক মৌলিক উপাদান সরবরাহ করিয়াছে। উৎখননের হাতিয়ারজাত নিদর্শনের সাহায্যেই চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ কর্তৃক বর্ণিত অনেক নগর, মহানগর, রাজধানী, বৌদ্ধবিহার প্রভৃতির বর্তমান ভৌগোলিক স্থিতি নির্ধারিত হইয়াছে। রত্নগিরি, নালন্দা, বৈশালী, রাজবাড়ীডাঙা, ময়নামতী, পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ মহাবিহার সম্পর্কে সর্বপ্রকার তথ্যই উৎখনন সরবরাহ করিয়াছে। উৎখননের হাতিয়ার অনেক মৌলিক ঐতিহাসিক উপাদান পরিবেশন করিয়া ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যজাত ইতিহাস অপরিপূরক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ইতিহাসের উক্ত অভাব উৎখননতত্ত্বই দূরীভূত করিয়াছে। উৎখনন ইতিহাসের বিভিন্ন ছেদসূত্রকে সংযুক্ত করিয়াছে। স্বীকার করিতে হইবে যে, ইতিহাসের অনেক ছেদ-সূত্রকে উৎখনন অদ্যাপি গ্রন্থন করিতে সক্ষম হয় নাই। বর্তমানে ইতিহাসে বিদ্যমান ছেদসূত্র-সমূহকে সংযুক্ত করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যাপক উৎখননের প্রয়োজন সর্বাধিক

ভূগর্ভে বিন্যস্ত মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনরাজি ইতিহাসের সুদৃঢ় বনিয়াদ। উৎখনিত বাস্তব নিদর্শনের মর্মার্থ উদ্ঘাটন করিয়াই

ইতিহাস রূপায়িত হয়। স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎখনিত নিদর্শনের বিকৃত বা ভ্রান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া অপসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। বাস্তব নিদর্শনের বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা উদ্ভট বক্তব্য পেশ করাও সম্ভবপর। কাল্পনিক ও অপ্রকৃত বক্তব্য ইতিহাসকে বিকারগ্রস্ত করে। অতএব বাস্তব নিদর্শনের মর্মার্থের বৈজ্ঞানিক বিন্যাসই সর্বাধিক প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাস্তব তথ্যাদির আবিষ্কার ও মর্মার্থ বিন্যাস করিয়াই মানবসংস্কৃতির অগ্রগতির, যাত্রাপথের ও ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত যথাযথভাবে রূপায়িত হইয়াছে।

উৎখননতত্ত্ব গতিশীল বিজ্ঞান। অপর বিজ্ঞানশাখা অপেক্ষা উৎখননের গতি অধিক ত্বরিৎ ও তীব্র। কাল ও ক্ষেত্র উৎখননের অগ্রগতিকে সীমিত করিতে পারে না। উৎখননের ক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী এবং তাহার আলোচ্য বিষয় বিশ্বমানবসমাজ।

উৎখননতত্ত্ব ইতিহাস-রূপায়ণতত্ত্বের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। উৎখননতত্ত্ব ইতিহাস-ক্ষেত্রের দিগন্তকে সম্প্রসারিত করিয়াছে; ইতিহাসের প্রারম্ভিক কাল সহস্রগুণে প্রলম্বিত করিয়াছে; এমন কি, ইতিহাসের পটভূমি ও ধারাকে নবরূপে রূপায়িত করিয়াছে। উৎখননতত্ত্ব মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত, কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে নহে। উৎখননতত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু লোকজীবনতত্ত্ব বা লোকতত্ত্ব। প্রকৃতপক্ষে, উৎখননতত্ত্বই প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রবাহের সহিত ইতিহাস ও প্রাক্-ইতিহাসকে সংযুক্ত করিয়াছে। ঐতিহাসিক অতীতের অনুসন্ধানী। 'ইতিহাস সত্যপরায়ণ। উৎখননের হাতিয়ারই এই সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসের উন্মেষক, উদ্ঘাটক এবং রূপকারক। উৎখননতত্ত্বজাত ইতিবৃত্তই মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস। উৎখননের হাতিয়ার লেখনী অপেক্ষা

অধিক শক্তিশালী। লেখজাত তথ্য অপেক্ষা উৎখননের হাতিয়ারজাত তথ্যাবলীই মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস-রূপায়ণের মৌলিক বনিয়াদ। উৎখননতত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই মানবসংস্কৃতির ইতিহাসের অনুক্রমিক সৌধ নির্মিত হইয়াছে। উৎখনন-বিজ্ঞানই ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ভিতন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উৎখনন পরিচিতি

। ১ ।

প্রাক্-কথন

মানবসংস্কৃতি ও সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন বা প্রত্নবস্তুর অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিজ্ঞানই প্রত্নতত্ত্ব বা প্রত্নবিজ্ঞান। ভূপৃষ্ঠের, ভূগর্ভের ও জলগর্ভের প্রত্নবস্তুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রত্নবিজ্ঞান দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত : (ক) সাধারণ প্রত্নতত্ত্ব অর্থাৎ সাধারণ প্রত্নবস্তুর অধ্যয়ন এবং (খ) ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ব অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে রক্ষিত প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার ও অধ্যয়ন। উৎখনন-বিজ্ঞান ক্ষেত্রীয় প্রত্নবিজ্ঞানের প্রধান অংশ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে মৃত্তিকা খনন করিয়া মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন বা প্রত্নবস্তুর অনুসন্ধান ও পুনরুদ্ধার বিষয়ক কার্যক্রমই উৎখনন। সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসারে মৃত্তিকা খননের, প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের ও ইতিহাস লিখনের নিয়মনিষ্ঠাকেই উৎখনন-বিজ্ঞান বলা যায়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎখনন করিয়া মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনসমূহ আবিষ্কারপূর্বক ইতিহাস লিখনের পদ্ধতিও উৎখনন-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

কোন প্রত্নবস্তুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে। এই উপাদান ও তথ্য কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক উৎখনন দ্বারা উদ্‌ঘাটন করা যায়। উৎখনন একটি চমকপ্রদ খেলা বা বিনোদন নহে। যে কোন প্রকারে খনন করিয়া

প্রত্নবস্তুর সংগ্রহ-কার্য উৎখনন নহে। উৎখনন বলিতে একটি অতীব দায়িত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্বলিত খননকার্যকেই বুঝায়। উৎখনন মৌলিক কার্যপ্রণালী। একমাত্র বৈজ্ঞানিক উৎখনন দ্বারাই বিশ্বসনীয় অবস্থায় মানবসংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কার সম্ভব। প্রত্ন-বস্তুর প্রণালীবদ্ধ আবিষ্কার ও অধ্যয়নই উৎখনন। মনুষ্যনির্মিত যে কোন বস্তু নির্মাতার ও তাহার সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচায়ক। ইমারত, সমাধি, হাতিয়ার, গৃহস্থালীর সরঞ্জাম ইত্যাদির সুনিয়ন্ত্রিত খননকার্য দ্বারা আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ হইতে মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিবৃত্ত গ্রন্থন করাই উৎখনন।

উৎখনন প্রকৃত বিজ্ঞানরূপে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠা দ্বারা উৎখনন পরিচালিত হয় এবং উৎখননকারীকে একজন বিজ্ঞানী বলা যাইতে পারে। কিন্তু উৎখনক শুধু বৈজ্ঞানিক বা কুশলী নহে। প্রকৃতপক্ষে উৎখন্তা একজন মানবতত্ত্ববাদী।

উৎখননকারী মানব সংস্কৃতির ও সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া তাহাদের প্রকৃত রূপ প্রদান করেন। এই তথ্য আবিষ্কারের কৌশল যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্বলিত। তথাপি উৎখননকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা যায় না। তবে একথা স্বীকার্য যে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শাখা হইতে তথ্য আহরণ করিয়া উৎখনন একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-শাখায় পরিণত হইয়াছে। যে সকল বিজ্ঞান-শাখা হইতে উৎখনন তথ্য ও সাহায্য গ্রহণ করে তাহার মধ্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন-শাস্ত্র, সমাজবিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা, ভূগোল, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রারম্ভিক মানুষের ইতিবৃত্ত ভূবিদ্যার সহিত জড়িত। উৎখননে মৃত্তিকাস্তর নির্ণয় ভূবিদ্যার সাহায্যেই করিতে হয়। প্রাচীন মানবজীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জলবায়ু প্রভৃতির পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ভূগোলবিদ্যার অধীন। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর নিদর্শন-অধ্যয়ন উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও জীববিদ্যার অন্তর্গত। উৎখনিত প্রত্নবস্তুর অপক্ষয় নির্ধারণ ও সংরক্ষণ-প্রণালী রসায়ন-শাস্ত্রের

অন্তর্ভুক্ত। আবিষ্কৃত নরকঙ্কাল হইতে নরগোষ্ঠীর পরিচিতি লাভ নৃবিজ্ঞানের বিষয়। প্রত্নবস্তুর যথার্থ ব্যাখ্যা ও সংস্কৃতির ইতিহাস-রূপায়ণ সমাজবিদ্যার অধীন। বর্তমানে পদার্থবিদ্যায় বিবিধ যন্ত্র ও প্রণালী আবিষ্কারের ফলে উৎখনন- বিজ্ঞান বহুলাংশে উন্নত ও প্রসারিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, উৎখনন-কার্যে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক শাখা ও প্রশাখার দান বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ। এইরূপে বিভিন্ন বিজ্ঞান শাখার দানে পরিপুষ্ট হইয়াই উৎখনন একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-শাখায় পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে উৎখনন-বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই ইতিহাস প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তে রূপায়িত।

মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস রূপায়ণই উৎখনন- বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে উৎখনন মানবসভ্যতার সত্য ও সুন্দর রূপের অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রণালী দ্বারাই এই বিবর্তনকে বা ইতিহাসকে রূপায়িত করা হয়। সুতরাং উৎখনন মানবতত্ত্বের এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়ভিত্তিক বিদ্যা।

। ২ ।

উৎখননের উদ্দেশ্য

যে কোন প্রকারে খনন করিয়া মৃত্তিকাগর্ভ হইতে প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করাকে উৎখনন বলা যায় না। এই প্রকার খননকার্য প্রত্নবস্তু-লুণ্ঠনেরই নামান্তর। মূল্যবান শিল্পকলার নিদর্শন এবং অন্যান্য বস্তু সংগ্রহ ও বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করাই প্রত্নবস্তু-লুণ্ঠকের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রত্নবস্তু লুণ্ঠনকারী মূল্যবান বাস্তব নিদর্শন সংগ্রহ

করিয়া নিরস্ত থাকে। কিন্তু উৎখননকারী প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করিয়া নিবৃত্ত হন না। তিনি ঐ বিষয়বস্তুর সমুদয় তথ্য অনুসন্ধান করিয়া উহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন। এই পরিচয়ের রূপায়ণ একমাত্র বৈজ্ঞানিক উৎখনন দ্বারাই সম্ভব। উৎখনন বলিতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর নিরীক্ষণ, লিপিবদ্ধকরণ ও যথার্থ ব্যাখ্যান বুঝায়। কোন একটি প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব উহার স্থিতির উপরই নির্ভরশীল। প্রত্নবস্তুর প্রকৃত অবস্থান এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপর বস্তুর স্থিতি ও সম্পর্ক নির্ধারণ করাই উৎখননের মূল উদ্দেশ্য।

মানবসভ্যতার অমূল্য সম্পদ মৃত্তিকাগর্ভ হইতে আবিষ্কার করিয়া সংগ্রহশালায় সযত্নবিন্যাস উৎখনকের মূল উদ্দেশ্য নহে। মনোরম শিল্পকলার নিদর্শন বা প্রত্নবস্তু উদ্ধার করিয়া সুসজ্জিত রাখা সংগ্রহশালার অধ্যক্ষের প্রধান অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় ফলপ্রসূ করিবার নিমিত্ত সংগ্রহশালা উৎখনন-কার্যে অর্থ সাহায্য করে এবং কখনও কখনও উৎখনন পরিচালনাও করে। পৃথিবীতে এই প্রকার সংগ্রহশালার সংখ্যা কম নহে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী অবৈজ্ঞানিক। উক্ত অভিপ্রায়ে প্রণোদিত হইয়া খনন করিলে উৎখননের মূল উদ্দেশ্যে কুঠারাঘাত করা হয়। ইহার অর্থ এই নহে যে, উৎখনন-বিজ্ঞানে মনোজ্ঞ শিল্প নিদর্শনের কোন স্থান নাই। বস্তুতঃ উৎখনন-বিজ্ঞানে সকল প্রত্নবস্তুরই গুরুত্ব বর্তমান। এমন কি অতি সামান্য বা সাধারণ প্রত্নবস্তুর মূল্যও উৎখনকের নিকট অত্যধিক। উৎখনক প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ চিত্র প্রদান করেন। তাহার নিকট সর্বপ্রকার প্রত্ন-বস্তুই গুরুত্বপূর্ণ। উৎখনক উৎখনিত প্রত্নবস্তুর সাহায্যেই মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস সৃষ্টি করেন। বৈজ্ঞানিক উৎখননকারীদের আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ হইতেই মানবসভ্যতার ক্রমিক অগ্রগতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রত্নস্থলে খনন ধ্বংসাত্মক কার্য। যাহা মৃত্তিকাগর্ভে যুগযুগান্তর ধরিয়া সুরক্ষিত তাহা খনন করিয়া ধ্বংস করা হয়। মৃত্তিকাগর্ভে

রক্ষিত মানবসভ্যতার নিদর্শন ধ্বংস বা নষ্ট বা বিকৃত করিবার অধিকার কাহারও নাই। যিনি ইহা করেন, তিনি একজন গুরুতর অপরাধী। কিন্তু একটি মাত্র শর্তে প্রত্নবস্তু-সন্ধানে প্রত্নস্থলে খননকার্য বিধেয়। এই শর্ত হইল—মৃত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত অবস্থান ও তথ্য নির্ধারণ করিয়া তাহাদের যথার্থ পরিচয় প্রদানপূর্বক মানবসভ্যতার ইতিবৃত্ত রূপায়ণ, অর্থাৎ মানবসভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থন। এই ইতিহাস- রূপায়ণ একমাত্র বৈজ্ঞানিক উৎখনন দ্বারাই সম্ভব। সাধারণ খননকার্য উক্ত তথ্য বা উপাদান সরবরাহ করিতে অপারগ। উপরন্তু সাধারণ খনন বলিতে মূল্যবান প্রত্নবস্তুর উদ্ধারকার্যকে বুঝায়। কিন্তু উৎখনন প্রত্নবস্তুর বৈজ্ঞানিক আবিষ্করণ ও ইতিহাস লিখন। একমাত্র বৈজ্ঞানিক উৎখননই প্রত্নস্থলের প্রকৃত ইতিহাস রূপায়িত করিতে সমর্থ।

উৎখনন এমন একটি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা যাহা ইতিহাসকে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা ও পুনরুদ্ধার করে। উৎখনিত প্রত্নবস্তুই ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য-পরিবেশক। যদি কোন পুকুর বা নালা খুঁড়িবার সময় একটি পুরাতন শিল্প দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা হইলে সাধারণতঃ উদ্ধারক অর্থলোভে দ্রব্যটি প্রত্নবস্তু ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে এবং তাহা হস্তান্তরিত হইয়া অবশেষে কোন সংগ্রহশালায় স্থান পায়। এই সময়ের মধ্যেই উক্ত প্রত্নবস্তুটির প্রকৃত অবস্থান এবং তৎসম্পর্কিত সর্বপ্রকার তথ্য লুপ্ত হয়। কোন ঐতিহাসিক ঐ প্রত্নবস্তুর শিল্প-কলার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়া হয়ত সিদ্ধান্ত করিবেন যে, তাহা মেসোপটামিয়া অথবা মিশরদেশের সভ্যতার নিদর্শন। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি সম্ভবতঃ ইতিহাসে নূতন তথ্য-রূপায়ণে সাফল্য লাভ করিবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্নবস্তুটি ভারত-বর্ষের বা অপর কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইতিহাস- লিখন যে কি প্রকারে বিকৃত হয় তাহা এই প্রকার একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিয়া উলী সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইতিহাসকে

এই বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করাই উৎখননের প্রধান উদ্দেশ্য।

উপরন্তু প্রত্নবিজ্ঞানে ভূপৃষ্ঠ হইতে সংগৃহীত প্রত্নবস্তুর কোন বিশেষ মূল্য বা গুরুত্ব নাই। এইরূপ সংগৃহীত প্রত্নবস্তু মানবসভ্যতার যথার্থ ইতিহাস রূপায়ণকার্যে সম্পূর্ণ অর্থহীন। কোন কলাবিদের নিকট উক্ত প্রত্ননিদর্শনের মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্নবিদের নিকট তাহার কোন গুরুত্ব নাই। ভূপৃষ্ঠ হইতে সংগৃহীত প্রত্নবস্তুর উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাসকে বিকৃত করিবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, উৎখনন- বিজ্ঞানে প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বাস্তব নিদর্শনের উপর নির্ভর করে। অধিকন্তু প্রত্নবস্তুর ব্যাখ্যা তাহার লিপিবদ্ধ করিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর নির্ভরশীল।

উল্লিখিত তথ্য হইতে বৈজ্ঞানিক উৎখননের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। উৎখননকারী আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর অন্তর্নিহিত ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যাখ্যা করিয়া তাহার কাল নির্ণয় করিতেও সমর্থ। জনসাধারণের, নিকট প্রত্নবস্তুর প্রাচীনত্বই বিস্ময়কারক। কিন্তু উৎখনকের নিকট কোন প্রত্নবস্তুই পুরাতন নহে। তাহার নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শনই নূতন। কারণ উৎখনিত নূতন প্রত্নবস্তুর তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াই মানবসভ্যতার প্রকৃত পরিচয় প্রদান সম্ভব। অতীত হইতে মানুষ কখনই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। উৎখন্তার বিষয়বস্তু মানবসমাজ। মানুষের হস্তনির্মিত বাস্তব সম্পদই উৎখননকারীর ইতিহাস রূপায়ণের মূল উপকরণ। মানবসভ্যতার বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া তাহার ক্রমবিকাশ ও বিস্তার নির্ধারণ করা উৎখননের মূল উদ্দেশ্য।

উৎখননকারী জীবন্ত মানুষকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে পরিবেশন করেন না। তিনি মানুষের হস্তনির্মিত বিষয়বস্তুকে পরিবেশন করেন। উৎখনকের নিকট কোন বিষয়বস্তুই সাধারণ বা নগণ্য নহে। প্রতিটি উৎখনিত বস্তুকে যথারীতি পরীক্ষা করিয়া

লিপিবদ্ধ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। উৎখন্তা অতীতের দুর্লভ প্রত্নবস্তু দ্বারাই লাভবান হন। অতীতের মৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জড়বস্তু-সমূহকে উৎখনক জীবন্ত করিয়া তোলেন। উৎখননকারী মৃত ও জড় পদার্থকে সঞ্জীবিত করিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন। উৎখনকের বিধ্বংসী হস্ত আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুকে অমরত্ব প্রদান করিয়া মানবসভ্যতার প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করে। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে খনন করিয়া প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার, নিরূপণ, লিপিবদ্ধ-করণ এবং প্রত্নস্থলে বিকশিত সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রকৃত পরিচয় প্রদান, অর্থাৎ মানব-সভ্যতার ইতিহাস গ্রন্থনই উৎখননের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে উৎখননকারী ইতিহাস রূপায়ণে অপারগ তাহাকে প্রকৃত উৎখনক বলা যায় না। উপরন্ত তিনি সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন-বিধ্বংসী। মানব-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ও বিস্তারের ইতিহাস লিখনই উৎখননের প্রকৃত লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎখনিত প্রত্নবস্তুই ইতিহাসের যথার্থ উপাদান।

ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করা উৎখননের অপর একটি প্রধান অন্বিষ্ট। যদি কোন উৎখনন ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করিতে না পারে বা ইতিহাসে কোন নূতন তথ্যের সন্ধান প্রদানে অপারগ হয় তাহা হইলে উক্ত খননকার্যকে উৎখনন বলা যায় না। বিস্মৃত অতীতের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করিয়া উৎখনক ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করেন। উৎখননই একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থা, যাহার সাহায্যে মানব-সমাজের বিবর্তন ও বিস্তার সম্যকরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব। বহু প্রাচীন কাল হইতে মানুষ বিভিন্ন সংস্কৃতির স্তর অতিক্রম করিয়া বর্তমান যুগে পৌঁছিয়াছে। উৎখনন-বিজ্ঞান উক্ত প্রাচীন সভ্যতার পথ ও স্তরের বিশ্লেষণ করিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংকট ও সমস্যার তাৎপর্য উপলব্ধি ও সমাধানের উপায় নির্ধারণ করে। সমস্যাবিহীন উৎখনন অর্থহীন। ইতিহাসের বিবিধ সমস্যা সমাধানের নিমিত্তই উৎখনন।

উৎখননে বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতির প্রয়োগ বাধ্যতামূলক। নানা কারণে উৎখনন আরম্ভ করা হয়। অনেক সময় প্রাকৃতিক কারণে কোন প্রত্নস্থল ধ্বংসোন্মুখ হয়। ধ্বংস হইবার পূর্বে যাহাতে ইতিহাসের উপাদান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে উদ্ধৃত হয় তাহার জন্যই উৎখনন। উক্ত উৎখননেও ইতিহাসের সমস্যা সমাধানই প্রধান অভিপ্রায়। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া যথার্থ তথ্য উদ্‌ঘাটন করাই উৎখননের উদ্দেশ্য। উৎখনিত উপাদান হইতেই প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক পর্বের মানব-সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ সম্ভবপর হইয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের জ্ঞাত প্রত্নস্থলে উৎখনন আকর্ষণীয়, কারণ ঐতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির সহিত জনসাধারণের সম্যক পরিচয় বর্তমান। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ অবিদিত। এই ক্ষেত্রে উৎখননই একমাত্র বিজ্ঞান- শাখা যাহার সাহায্যে আদি মানবসংস্কৃতির পরিচয় প্রদান সম্ভব।

বস্তুতঃ উৎখনক একজন দক্ষ সন্ধানী। উৎখনন এই কুশলী সন্ধানীর কর্মকৃতি। যেমন সত্যসন্ধানী মানুষের কার্যক্রম অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করে, সেইরূপ উৎখন্তাও মানব-সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন উদ্ধার করিয়া তাহাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেন। বর্তমানে উৎখনন- বিজ্ঞান প্রত্নবস্তুর গুণাত্মক অপেক্ষা পরিমাণাত্মক অধ্যয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উৎখননের দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হইয়াছে। অধুনা কেবলমাত্র প্রত্নবস্তু উদ্ধারের নিমিত্ত উৎখনন পরিচালন অবৈজ্ঞানিক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইতিহাসের সমস্যা সমাধানের জন্য উৎখনন অত্যাবশ্যক। যে কোন প্রত্নস্থল খনন করা বর্তমানে অপরাধজনক। যে প্রত্নস্থলে ইতিহাস-সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা বর্তমান, উক্ত স্থানেই উৎখনন পরিচালনা কর্তব্য। এই কার্যে উৎখনন- বিজ্ঞান অপর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও তথ্যের উপর নির্ভরশীল। সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন

যে, ইতিহাস-সমস্যার সমাধান ও মানব সংস্কৃতির যথার্থ ইতিবৃত্ত রূপায়ণই উৎখননের মূল উদ্দেশ্য। উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধিত না হইলে কোনও উৎখননকে বিজ্ঞানসম্মত কার্য বলা যায় না।

। ৩ ।

উৎখননের ইতিহাস

প্রত্নবস্তু-লুণ্ঠন এবং অবৈজ্ঞানিক খনন কার্যক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিক উৎখনন প্রণালীর অনুক্রম বিবরণই উৎখননের ইতিবৃত্ত। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গেই প্রাচীনতম বিষয়বস্তুর প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। ইহার ফলেই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংগ্রহ করিবার আগ্রহ জাগ্রত হয়। গ্রীক ও রোমকগণ প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। গ্রীক পণ্ডিতগণই প্রত্নবস্তুর অন্বেষণের পথপ্রদর্শক। থুকিডাইডিস প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। কেহ কেহ থুকিডাইডিসকে প্রথম প্রত্নবিদ্ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। থুকিডাইডিসের পর খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ ভৌগোলিক স্ট্রাবো প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে পৌসানিয়াস গ্রীস দেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। গ্রাম ও শহর পরিদর্শন করিয়া তিনি বহু বাস্তব নিদর্শন সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। গ্রীক ললিত-কলার অধ্যয়নেও তাঁহার বিবরণ বিশেষ মূল্যবান। হেলেনিস্টিক যুগে প্রাচীন গ্রীক ললিতকলার নিদর্শন সংগ্রহ করা বিলাসী-সমাজে আকর্ষণীয় ছিল। রাজপুরুষগণ কর্তৃক গ্রন্থাগার ও শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনের জন্য গৃহ বা চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। অ্যারিস্টটলের মৃত্যুর পর তাঁহার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ও ললিতকলার সংগ্রহ নীলাম করা হয়।

একটি চিত্রের মূল্য আনুমানিক দশ-হাজার পাউণ্ডের ঊর্ধ্বে উঠিলে মুম্মিয়াস মনে করিলেন যে, ঐ চিত্রের নিশ্চয় কোন বিশেষ গুণ রহিয়াছে। তিনি নীলাম বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সংগ্রহবস্তু বাজেয়াপ্ত করিলেন। উক্ত সময় হইতেই পুরাদ্রব্য নিদর্শন সংগ্রহ করিবার আগ্রহ ও স্পৃহা জাগরিত হয়। এই আগ্রহ হইতেই প্রাচীন লুপ্ত ললিতকলা-নিদর্শন অন্বেষণ করিবার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। ইহার ফলে রোমে ও আলেক্‌জেন্দ্রিয়ায় একদল প্রত্নবস্তু ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়। কোরিন্থ প্রত্নবস্তু-লুণ্ঠনকারীদের একটি বিশিষ্ট পরিবেশন-কেন্দ্রে পরিণত হইল। কোরিন্থের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র খনন করিয়া ললিতকলার নিদর্শন, মৃৎপাত্র প্রভৃতির লুণ্ঠন আরম্ভ হয়। গ্রীসে 'নেক্রোরিন্থিয়া' (অর্থাৎ কোরিন্থের সমাধিক্ষেত্র হইতে লুণ্ঠিত প্রত্নবস্তু) শব্দ সুপ্রচলিত। কিন্তু গ্রীকদিগের নিকট প্রাগৈতিহাসিক বা ক্রীট ও মাইসেনিয়ান সভ্যতার কোন গুরুত্ব ছিল না। কেবলমাত্র মাইনোয়ানদিগের সম্বন্ধে কতিপয় উপকথার প্রচলন ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্লুটার্কই হালিয়ারটসের সমাধি-স্মৃতিমন্দির আবিষ্কারের ও খননের বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। উক্ত খননের ফলে একটি বর্তলোহনির্মিত (ব্রঞ্জ) লেখ-ফলক উদ্ধৃত হয়। স্থানীয় প্রত্নতত্ত্ব-সমিতি এই লেখর পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত মিশর দেশের পুরোহিতদিগের নিকট প্রেরণ করে। পুরোহিতগণের মতে উক্ত লেখ ট্রোজান যুদ্ধের সমসাময়িক এবং তাহাতে যুদ্ধের পরিবর্তে সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য গ্রীকদিগের নিকট আবেদন করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফলকটি মাইনোয়ানদিগের লেখ-ফলক। বর্তমানেও মাইয়োনিয়ান-লেখর সন্তোষজনকভাবে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। থেব্‌স্-এর নিকট হালিয়ারটস্ অবস্থিত। সম্প্রতি উক্ত স্থান হইতে মাইনোয়ান সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রোমক যুগেও বর্তমান ক্রীটের প্রত্নস্থল হইতে অনেক লেখ-ফলক

আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ডিক্‌টীসের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, নস্‌সসে দৈবাৎ ইতিহাসের বাস্তব উপাদান পাওয়া গিয়াছিল। ভূমিকম্পের ফলে একটি সমাধি-মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং স্থানীয় মেষপালকগণ এক গুরুত্বপূর্ণ লেখ-ফলক আবিষ্কার করে। রোমক কনসালগণ সম্রাট নেরোর নিকট উক্ত লেখ প্রেরণ করে। সম্রাট উহার পাঠোদ্ধারের জন্য পণ্ডিতদের নিকট আবেদন জানাইলেন। পাঠোদ্ধার হইতে প্রমাণিত হইল যে, লেখ-ফলকটি একটি মূল গ্রন্থ। কোন-কোন পণ্ডিত এই লেখ-ফলকটিকে জাল দলিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতগণই মনে করেন যে, উক্ত লেখ-ফলক প্রাক্‌-হোমার যুগের নিদর্শন।

রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর পোপতন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে এবং পুণ্যভূমি প্যালেষ্টাইনে ভ্রমণের জন্য তীর্থ-পর্যটকদের মধ্যে নূতন উদ্দীপনা দেখা যায়। এই তীর্থ-পর্যটনের ফলেই বাইবেল সম্বন্ধীয় পুরাতত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু এমনা কোন পণ্ডিত বা লেখক ছিলেন না, যিনি সকল দ্রষ্টব্য নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম। কেবল-মাত্র আনকোনার, সাইরিয়াক এবং লেভান্ত্‌ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে পর্যবেক্ষণ করিয়া সৌধমালা এবং লেখমালা লিপিকরণের প্রয়োজ-নীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ শতাব্দী হইতেই প্রত্নতত্ত্ব বা উৎখনন-বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ জাগরিত হয়। বাইজান্‌টাইন সাম্রাজ্য পশ্চিম জগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হইল। ফলে উহার সংস্কৃতির সহিত পশ্চিমের দেশসমূহ পরিচিত হইতে লাগিল। সংগৃহীত প্রাচীন গ্রীক ও রোমক ভাস্কর্য-নিদর্শন, ধনদৌলত, চিত্র প্রভৃতির প্রতি ইউরোপীয়গণ আকৃষ্ট হয়। সর্বপ্রথমে ইতালী এই সুযোগ গ্রহণ করে। বাইজানটিয়ামের অমূল্য সম্পদ ভেনিসে হস্তান্তরিত হইল। চতুর্থ ধর্মাভিযানের সময় হইতে প্রাচীন চারুকলার প্রতি অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়। ইহার ফলে ইউরোপে নবজাগরণ দেখা দিল। এমন কি

বাইজানটিয়ামের পতনের পরেও ইউরোপের বহু লোক মহানগরী দর্শনের জন্য গমন করিত। এই সকল ভ্রমণকারীদের মধ্যে ফরাসী পিয়েরে গাইলিসই কনস্টান্টিনোপলের প্রথম উৎসাহী বিদ্যার্থী। তিনি কনস্টান্টিনোপল মহানগরীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রতিটি বাস্তব নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার পুস্তকের ন্যায় তথ্যবহুল গ্রন্থ বর্তমান যুগেও বিরল। উক্ত পুস্তকই ইউরোপের প্রত্নবস্তু-সংগ্রহকারীদের লিপ্সা বর্ধিত করে। সাধারণ লোকও জানিতে পারিল যে, কনস্টান্টিনোপল, রোম প্রভৃতি প্রাচীন মহানগরী ধনদৌলত-গচ্ছিত মৃত্তিকা স্তূপের উপরই নির্মিত। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, প্রাচীন সৌধ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক ধনদৌলত, মর্মরমূর্তি প্রভৃতি লুক্কায়িত রহিয়াছে। ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায় তাহাদের প্রাসাদ ও উদ্যান সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত প্রত্নবস্তু ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। ইহার ফলে বহু প্রত্নবস্তু-ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হয়। অধিকন্তু চোর, ডাকাত ও লুণ্ঠনকারীদের কর্মব্যস্ততাও বৃদ্ধি পায়। প্রত্নবস্তু সংগ্রহের নিমিত্ত ইউরোপ তাণ্ডবলীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশের রাজপ্রতিনিধিগণও প্রাচীন শিল্পকলা- নিদর্শন সংগ্রহ করিবার জন্য যে কোন পন্থা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

ষোড়শ শতাব্দীতে রাজপুত্রগণের এবং সাধারণ লোকের মধ্যে প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল আকারে দেখা দিল। এট্রাস্কান সমাধিমন্দির এই শতাব্দীতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। উক্ত মন্দিরের প্রাচীর-চিত্রণ নবজাগরণের ললিতকলাকে প্রভাবান্বিত করে। প্রকৃতপক্ষে মিকেলাঞ্জেলো তাঁহার চিত্রণে এট্রাস্কান প্রতীক ব্যবহার করিয়াছেন। ক্রমে রোমে ও ফ্লোরেন্সে ভ্রমণকারী ও দর্শকদিগের সংখ্যা বর্ধিত হইবার সঙ্গেই প্রত্নবস্তু-ব্যবসায়ীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এমন কি কারুশিল্প- বিশারদগণও প্রত্নবস্তু- সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। অনেক পুস্তকও প্রকাশিত হইল।

পিয়েরে গাইলিসের কনস্টান্টিনোপল সম্বন্ধে লিখিত পুস্তক সর্বাপেক্ষা তথ্যপূর্ণ। আরও অনেক পুস্তকে কনস্টান্টিনোপলের স্মৃতিসৌধের মনোরম বিবরণ বর্তমান।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভূপর্যটন শিক্ষার অংশ রূপে গণ্য হয়। ইংলণ্ডের বিত্তবানগণ তাহাদের সংগ্রহশালায় প্রত্নবস্তু সংগ্রহের জন্য আকৃষ্ট হইলেন। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ডিলেট্যান্টি সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সময়ে পেটওয়ার্থের প্রত্নবস্তু সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। অষ্টম শতাব্দীর শেষে হ্যামিলটন নেপল্‌সে প্রাচীন গ্রীক মৃৎপাত্র সংগ্রহ করেন। এই সংগৃহীত মৃৎপাত্রই ইংলণ্ডের আলংকারিক কারুশিল্পকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। পম্পাইর দেওয়ালচিত্র আবিষ্করণে ইউরোপের শিল্পকলায় এক নূতন প্রণালীর আবির্ভাব ঘটে। ফরাসী ও ইংলণ্ডের চিত্রপ্রণালী এবং কারুশিল্প পম্পাইর চিত্র হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

পম্পাই এট্রাস্‌কান সমাধিমন্দির-গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পম্পাই ও হারকিউলানেয়াম আগ্নেয়গিরি দ্বারা ধ্বংস হইয়াছিল। ফলে সকল প্রত্নবস্তুই ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া সুরক্ষিত থাকে। লুণ্ঠক ও খননকারীগণ ভস্মের মধ্য হইতে প্রত্নবস্তু উদ্ধার করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই খননকার্য প্রকৃত উৎখনন নহে। প্রত্নবস্তু লুণ্ঠনের নিমিত্তই এই খননকার্য পরিচালিত হইয়াছিল। এই লুণ্ঠনকারীদল প্রত্নস্থল সমূহের অপরিমেয় ক্ষতি করিয়াছে। সৌধমালার ধ্বংসাবশেষ সমূলে উচ্ছেদিত হইয়াছে। তাহাদের ধ্বংসকার্য এত ব্যাপক যে, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎখনন করিয়াও উক্ত ক্ষতির সংস্কার সম্ভব নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রত্নবস্তুর অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও উদ্ধারকার্যের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। 'ডিলেট্যান্টি সমিতি' সৌধমালার নক্সা ও চিত্রাঙ্কনের নিমিত্ত এথেন্স ও এশিয়ামাইনরে বাস্তুবিদ্যাবিশারদদিগকে প্রেরণ

করে। অনুরূপভাবে 'ফরাসী একাডেমী' কর্তৃক প্রাচীন লেখমালা ও বাস্তুনিদর্শন অধ্যয়নের নিমিত্ত অপর একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলগিন গ্রীসে প্রত্নবস্তু সংগ্রহের জন্য অভিযান পরিচালনা করেন। এলগিন একজন দক্ষ প্রত্নবস্তু সংগ্রহকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও প্রবল ছিল। তিনি যাহা অপসারণ করিয়াছেন তাহার বিস্তারিত বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এলগিন অনেক অমূল্য প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। উক্ত সংগ্রহকে প্রত্নবস্তু-লুণ্ঠন আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মুসলমান তুর্কীগণের আধিপত্যের ফলে সকলপ্রকার প্রাচীন সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন প্রায় লুপ্ত হইতেছিল। এলগিন যদি উক্ত নিদর্শন অপসারণ না করিতেন তাহা হইলে গ্রাসের অমূল্য ভাস্কর্য-নিদর্শন চিরতরে বিলুপ্ত হইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান ও সংগ্রহণ ইতালীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তুর্কী সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রত্নবস্তু অন্বেষণ বা উদ্ধার করিবার কোন সুযোগ ছিল না। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ও তুর্কীদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর কতিপয় প্রত্নবস্তু-অন্বেষণের ও খননকার্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। উক্ত সময়েই মিশর দেশে নেপোলিয়নের পৃষ্টপোষকতায় প্রত্নতত্ত্ব অধ্যয়ন আরম্ভ হয়।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে গ্রীকবিদ্রোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাহার ফলে বিদেশী পণ্ডিতগণ গ্রীসের প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ পায়। গ্রীস উহার প্রাচীন নিদর্শন অধ্যয়ন করিবার জন্য বৈদেশিকগণকে যে সুযোগ প্রদান করিয়াছে তাহার জন্য সমগ্র বিশ্ব চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। উক্ত গবেষণা বা অধ্যয়নের ফলেই প্রত্নবিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তার সম্ভবপর হইয়াছে। ১৮৩০ হইতে ১৮৩৫ এর মধ্যে গ্রীক শাসকবর্গ নগর-দুর্গের উপর তুর্কী নির্মিত ইমারত পরিষ্কার করিবার সময় তিনটি

বিখ্যাত সৌধ আবিষ্কার করে, যেমন পার্থেনন, এরেকথাইয়াম ও প্রপাইলাইয়া। এই সময়েই তুর্কীনির্মিত বুরুজ ধ্বংস করা হয়। উক্ত বুরুজের নিম্নে 'নিকে' মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে রাজা ওথোর পৃষ্ঠপোষকতার তিনজন বিদেশী পণ্ডিত প্রত্নতত্ত্ব পর্যালোচনা ও গবেষণার পন্থা উদ্ভাবন করেন। রস্, সাওবার্ট, হানসেন ও অন্য পণ্ডিতগণের সহায়তায় প্রত্নবিজ্ঞানের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। উক্ত সময়েই প্রত্নতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে রূপায়িত হয়। প্রত্নবস্তুর ও প্রাচীন সৌধমালার পরিবীক্ষণ ও লিপিকরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী উদ্ভূত হয়। গ্রীক কর্তৃপক্ষগণের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পরিষ্করণের প্রণালী প্রকৃতই প্রশংসনীয়। এথেন্সের নগরদুর্গ পরিষ্করণ ও সংরক্ষণ বৈজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠারই পরিচায়ক।

কিন্তু গ্রীসের তুলনায় ইতালী বা অন্য দেশে প্রত্নবস্তু অন্বেষণের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় না। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে রোমে হট্টভূমির খনন ও পরিষ্করণ সাধিত হয় নাই। পম্পাই ও হেরকুলানেয়াম ব্যতীত কোন প্রত্নস্থলের খননকার্য চালনার সুযোগ ছিল না। প্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞান অনুশীলন গ্রীসেই উদ্ভাবিত হয় ও গ্রীস হইতেই প্রসার লাভ করে। নগরদুর্গের পরিষ্করণ সমগ্র ইউরোপকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। এক নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগরিত হয়। প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের অধ্যয়নের সূত্রপাতও গ্রীস দেশেই আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী কালে জার্মানীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরীক্ষণ ও অনুসন্ধান প্রণালীর উদ্ভব হয়। গ্রীক লেখমালার অধ্যয়ন ও গবেষণারও সূত্রপাত হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সারস্বত-সমাজ গ্রীক লেখমালার সংগৃহীত সংকলন সংরক্ষণ আরম্ভ করে।

প্রকৃতপক্ষে ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে প্রত্নবস্তু সংগ্রহের বিশেষ তৎপরতা দেখা যায় এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী হইতে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সংগৃহীত হয়। কিন্তু এই

সংগ্রহকারীদের কৌতূহল বা আগ্রহ প্রত্নবস্তু সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অধিকন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ধর্মীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিনে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শৃঙ্খলমুক্ত হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার ও ইতিহাসের প্রকৃত রূপ প্রদান করিবার রীতি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হয়।

খননকার্য দ্বারা প্রাচীন সভ্যতার অমূল্য নিদর্শনের উদ্ধার একটি সুপ্রাচীন পন্থা। কিন্তু অতীতে খননকার্যের দ্বারা প্রত্নবস্তু ও ধন-দৌলত সংগ্রহ করাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ফলে খননকার্যের নিমিত্ত কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল না। যে কোন প্রকারে খনন করিয়া প্রত্নবস্তু ও ধনদৌলত সংগ্রহ করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ফলে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে খননকার্য দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর তথ্য নির্ধারণ করিয়া ইতিহাস-লিখন সম্ভব হয় নাই। এই প্রকার খননকার্য প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার বহু নিদর্শনকে ধ্বংস করিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে অনেক প্রখ্যাত উৎখনকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহাদের মধ্যে মাসপেরো, সক্লিমান, ক্রুঞ্জ, ল্যেয়ার্ড, বোট্টা, এডেল, পেট্রি, পিট্ রিভার্স, ঈভান্স্, উলী, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লখযোগ্য। এই সকল উৎখনকদিগের মধ্যে সক্লিমানের নাম সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়। তিনিই সর্বপ্রথম সাধারণভাবে উৎখনন-পদ্ধতির অবতারণা করেন। প্রকৃতপক্ষে সক্লিমানই উৎখনন- বিজ্ঞানের জনক।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে প্রত্নবস্তুর বিশ্লেষণ ও আবিষ্করণের ইতিহাস সক্লিমানের পর্যবেক্ষণ ও খননকার্যের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। তিনিই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, হোমারের মহাকাব্য কল্পনা-প্রসূত বা অবাস্তব নহে। সুতরাং মহাকাব্যে বর্ণিত বাস্তব-নিদর্শন আবিষ্কারের জন্য তিনি তৎপর হইলেন। হোমারের মহাকাব্যে উল্লিখিত ট্রয়, মাইসেনি, ইথিকা প্রভৃতির সন্ধানের নিমিত্ত সক্লিমান নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে

প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনিই আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ পদ্ধতি, আলোকচিত্র গ্রহণ, নকৃশা ও চিত্র অঙ্কন প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও নিয়মাবলীর উদ্ভাবক। যদিও তাঁহার খননপদ্ধতির সহিত বর্তমান উৎখননের তুলনা করা সঙ্গত নহে, তবে একথা স্বীকার্য যে, সক্‌লিমানই বৈজ্ঞানিক উৎখনন- প্রণালার প্রকৃত স্রষ্টা।

সক্‌লিমানের প্রচেষ্টার ফলেই হিসারলিকে ট্রয়ের স্থিতি নিধারিত হইয়াছে। এ কথা সত্য যে, সুপ্রসন্না ভাগ্যদেবীই তাঁহার কৃতকার্যের জন্য দায়ী। কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য যে, সক্‌লিমান প্রত্নস্থল-নির্ধারণ-কার্যেও সুনিপুণ ছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবেই তিনি প্রিয়ামের ধন-দৌলত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনে হয়, লুণ্ঠনকারী-দের দৃষ্টি ও প্রয়াসের অন্তরালেই সক্‌লিমানের জন্য এই অমূল্য সম্পদ সুরক্ষিত ছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সক্‌লিমান মাইসেনি আবিষ্কারের জন্য তৎপর হইলেন। এই ক্ষেত্রেও ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না ছিলেন এবং তিনি অতুলনীয় ধনদৌলত আবিষ্কারে সাফল্য অর্জন করেন। এই আবিষ্কারের ফলে সমগ্র বিশ্বে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল।

সক্‌লিমানের উৎখনন- বিবৃতিও চিত্তাকর্ষক। ইহা স্বীকার্য যে, তিনি অনেক অমৌলিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যেমন আগামেমননের সমাধি-আবিষ্কার। কিন্তু গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত সমাধি পরবর্তী যুগে নির্মিত। তাঁহার অনেক অনুমান এবং সিদ্ধান্ত ও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ, সক্‌লিমান স্তরবিন্যাসের সাহায্যে কালানুক্রম- সংস্কৃতির পর্ব-নির্ধারণ করিতে পারেন নাই।

সক্‌লিমানের উৎখননকার্য ঈভান্‌স অনুসরণ করিয়াছেন। ঈভান্‌স্ কর্তৃক নসস্‌-রাজপ্রাসাদ আবিষ্কারের ফলে ক্রীটের গুরুত্ব প্রতিপন্ন হয়। ক্রীটের প্রত্নবস্তু ও শিল্পকলা-নিদর্শন বিশ্বের অমূল্য সম্পদ। এই আবিষ্কারের ফলেই গ্রীক সভ্যতার উৎপত্তির সম্যক পরিচয়

পাওয়া গিয়াছে। নসস্ আবিষ্কারের পরেই ক্রীটের অপর প্রত্নস্থলেও পর্যবেক্ষণ ও উৎখনন আরম্ভ হয়। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশের প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনেক প্রত্নস্থল নির্ণয় করেন। উক্ত সময়েই এশিয়ামাইনরে হিট্টাইট সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বোগাজ্কই লেখমালার আবিষ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই লেখতে যে দেবতাগণের নাম লিখিত আছে তাহাদের বিস্তারিত তথ্য আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদে বর্তমান। উক্ত তথ্য হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, পশ্চিমদেশ হইতেই এশিয়ামাইনরের মধ্য দিয়া আর্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিল। অধুনা কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, বোগাজ্কই লিপিই আর্যগণের ভারতবর্ষ হইতে বহির্গমনের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। একথা স্বীকার্য যে, উক্ত আবিষ্কার প্রাচীন ইতিহাস- লিখনের অমূল্য সম্পদ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে আরও অনেক প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কর্তৃক উৎখননের ফলে মিশর, মেসোপটামিয়া প্রভৃতি দেশে মানব সমাজের প্রাচীন ইতিহাসের অমূল্য বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পেট্রি, পিট্ রিভার্স, উলী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে উৎখনন বৈজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠায় রূপায়িত হইয়াছে। পিট্ রিভার্স উৎখনন- প্রণালীর আমূল পরিবর্তন করিয়া বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতির প্রবর্তন করিয়াছেন। পিট্ রিভার্সের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী উৎখনন একটি কঠোর অনুশাসনে পর্যবসিত হইয়াছে। বর্তমানে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক এই উৎখনন- প্রণালীর উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খননকার্য দ্বারা প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের প্রয়াস আরম্ভ হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম জোন্সকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া

ওঠে। উইলিয়াম জোন্‌স, প্রিন্সেপ প্রমুখের অনুসন্ধানের ফলে প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের ও উহাদের তথ্য নিরূপণের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রসঙ্গে কানিংহামের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম প্রত্নবস্তুর অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের নিমিত্ত সরকারের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আবেদনের ফলেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৬১) এবং কানিংহাম সামরিক বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া উহার সর্বপ্রথম অধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কানিংহাম চৈনিক পর্যটক হিউয়েন-সাঙ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন নগর, মহানগরী ও বৌদ্ধ কেন্দ্রস্থলের বর্তমান ভৌগোলিক স্থিতি নির্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি খননকার্য পরিচালনা করিয়াও অনেক প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম সুদক্ষ উৎখনক। তাঁহার সহকর্মী বেগলার, ফার্গুসন, মার্টিন প্রমুখও খনন করিয়া অনেক প্রত্নবস্তু উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা কেহই খননকার্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিতে পারেন নাই। ফলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অনেক অমূল্য সম্পদ এবং ইতিহাসের প্রামাণিক তথ্য চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মার্শাল (১৯০২) প্রত্নতত্ত্ব- বিভাগের প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন। মার্শাল নানা স্থানে খননকার্য করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নে অনেক অমূল্য উপাদান আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার পরিচালনায় প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। মোহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পার আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন পর্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মার্শালের সহকারিবৃন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাট্‌স, সাহানী, মজুমদার, ম্যাকাই, স্টাইন প্রমুখও বিবিধ স্থানে উৎখনন পূর্বক আদি-ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের বহু বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় পথ সুগম করিয়াছেন। কিন্তু

তাঁহাদের খননকার্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী যথাযথভাবে অনুসৃত হয় নাই। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর কাল নিরূপণ এবং সংস্কৃতির পর্ব নির্ধারণ অসম্ভব হইয়াছে।

পেট্রি ও পিট্ রিভার্স বর্তমান উৎখননের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর স্রষ্টা। হুইলার পিট্ রিভার্সের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উৎখননের নিমিত্ত যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার ফলে প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের ও ব্যাখ্যা প্রদানের পথ অনেক সুগম হইয়াছে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার যে সকল নিদর্শন খননকার্য দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশেরই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বিরল। তাহার ফলে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অনেক তথ্য- বিশ্লেষণ সম্ভবপর হয় নাই। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হুইলার ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎখনন আরম্ভ করেন। প্রাচীন ইতিহাসের অনেক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ত তিনি নূতন সন্ধান-পথও উদ্ভাবন করিয়াছেন। হুইলার ভারতবর্ষের একাধিক প্রত্নস্থলে উৎখনন করিয়া সিন্ধু-সভ্যতার উত্থান ও পতন, আর্য-সভ্যতার বিকাশ, দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতার কাল নিরূপণ, ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের স্বরূপ এবং রোমক সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

প্রত্নবিদ্গণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও নিরীক্ষণের ফলে খননপদ্ধতি এত উন্নত হইয়াছে যে, বর্তমানে উৎখনন একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞানরূপে পরিগণিত। অধুনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্নস্থলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎখনন চালনা করিয়া ভারতীয় উৎখনকগণ প্রাচীন ভারতের অমূল্য সম্পদ আবিষ্কারে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন এবং ফলে ইতিহাসের অনেক সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উৎখননই ইতিহাস- সমস্যার সমাধান করিয়া ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তে অনুক্রমিক সংস্কৃতি-পর্বের কাঠামো সুদৃঢ় করিতে সাফল্য লাভ করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রত্নস্থল

। ১ ।

স্তূপোৎপত্তি

যুগ-যুগান্তর হইতে মৃত্তিকাগর্ভে মানবসভ্যতার বাস্তব জড়পদার্থ-সমূহ লুক্কায়িত রহিয়াছে। মানুষের বাসগৃহ, নগর, গ্রাম, মন্দির, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সামগ্রী প্রভৃতি কালের তাণ্ডবলীলায় ভূতলে লোকদৃষ্টির অন্তরালে সুপ্ত রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাস্তু বা সৌধমালা এবং প্রত্নবস্তু ভূতলে নিমগ্ন হয় নাই। বরঞ্চ ঐ সকল নিদর্শন মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে। নানা কারণে মানবসংস্কৃতির নিদর্শন মৃত্তিকার দ্বারা আবৃত হইয়া মৃৎস্তূপে পরিণত হয় (চিত্র নং ১ক)।

অতি প্রাচীনকালে মানুষ মৃত্তিকার সাহায্যেই বাসগৃহ নির্মাণ করিত। আবর্জনা নিক্ষেপ করিবার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং সদর রাস্তাতেই জঞ্জাল নিক্ষিপ্ত হইত এবং তাহার ফলে পথের উচ্চতা ক্রমে-ক্রমে বর্ধিত হইত। মৃত্তিকানির্মিত বাসগৃহ পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হইলে, গৃহতল ও রাস্তা সমতল না করিয়া বাস্তুনির্মাণ সম্ভব ছিল না। এই প্রকার পুনঃ পুনঃ গৃহনির্মাণের ফলে আবাসস্থলের উচ্চতা বর্ধিত হইয়া ক্রমশঃ মৃত্তিকাস্তূপে বা ঢিবিতে পরিণত হয়। উক্ত কারণেই এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে অধিকাংশ গ্রাম উচ্চ মৃৎস্তূপের বা ঢিবির উপর প্রতিষ্ঠিত। সিরিয়া ও ইরাকে অনেক ঢিবি সমতল-ভূমি হইতে প্রায় ৬০-১০০ ফুট উচ্চ এবং তাহার উপরেই বর্তমান বসতি সংস্থাপিত। কিন্তু যে স্থলে কোন স্থায়ী বসতি ছিল না, অথবা

কেবলমাত্র শিবির-বসতি ছিল, সেই সকল পরিত্যক্ত স্থানে কোন লোকবসতি স্থাপিত না হইবার ফলে বায়ুবাহিত ধূলি ও মৃত্তিকাকণা উক্ত আবাসস্থলসমূহকে আবৃত করিয়া ঢিবিতে পরিণত করিয়াছে। অনেক প্রাচীন সহর ও গ্রাম আক্রমণকারীদের দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে। আক্রমণকারীরা অগ্নি সংযোগ করিয়াও অনেক মানববসতি নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। এই প্রকারে নগর ও গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন স্বস্থানেই অবস্থান করে এবং ক্রমান্বয়ে মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ঢিবিতে পর্যবসিত হয়। অনেক সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অধিবাসিগণ গ্রাম ও নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসস্থান নির্মাণ করে। এইরূপ ক্ষেত্রে জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া অধিবাসিগণের অন্যত্র প্রস্থান করাই স্বাভাবিক। ফলে উক্ত পরিত্যক্ত স্থান ক্রমে ঢিবিতে পরিবর্তিত হয়। এই প্রকার ঢিবি-গর্ভে গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ব্যতিরেকে সংস্কৃতির বিশেষ কোন প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না।

জলবায়ুর পরিবর্তন, মহামারীর প্রকোপ, ইত্যাদির জন্যও গ্রাম এবং নগর পরিত্যক্ত হইয়া কালক্রমে ঢিবিতে পর্যবসিত হয়। উক্ত ঢিবির গর্ভেও প্রত্নবস্তুর পরিমাণ খুবই অল্প। ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির ফলেও নগর এবং গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কিন্তু সভ্যতার নিদর্শন ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই রক্ষিত থাকে। পম্পাই মহানগরী আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলেই অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সভ্যতার সকল নিদর্শন ভস্ম দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত হইয়া সুরক্ষিত আছে। এই প্রকার বিধ্বস্ত অঞ্চলও ক্রমশঃ মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ঢিবিতে রূপান্তরিত হয়।

প্রাচীনকালে মানুষের আবাসস্থল সাধারণতঃ নদীর তীরে গড়িয়া উঠিত (চিত্র নং ১খ)। কালক্রমে অনেক সময় পলিমাটি পড়িয়া নদী বন্ধ হইয়া যায় অথবা তাহার স্রোতোধারা অন্যদিকে ধাবিত হয়। নদীর প্রবাহ বা গতির পরিবর্তনের জন্য অধিবাসিগণ বাধ্য হইয়া

আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসস্থান নির্মাণ করে। ক্রমে পরিত্যক্ত বাসস্থান মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হইয়া ঢিবিতে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন নগর ও মহানগরী উক্ত কারণে পরিত্যক্ত হইয়া মৃত্তিকাস্তূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর সংখ্যাও অপ্রচুর। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলপ্রবাহই প্রাচীন আবাসস্থল ধ্বংস করিয়া মৃত্তিকাগর্ভে নিমজ্জিত করিবার জন্য দায়ী। এই প্রকার প্রত্নস্থলে সভ্যতার নিদর্শনের সংখ্যা পর্যাপ্ত, কারণ অধিবাসিগণ জিনিসপত্র লইয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে সমর্থ হয় না। ভারতবর্ষের অনেক প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর ও গ্রাম জল-প্রবাহের ফলেই মৃত্তিকাগর্ভে আশ্রয় লইয়াছে। অনেক প্রাচীন গ্রাম ও নগর অদ্যাপি নদীগর্ভে বিলুপ্ত। প্রাচীন সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক ছিল, কিন্তু নদীই তাহার ধ্বংসকারী। যে নদী মানবকীর্তিকে সম্ভব করিয়া তোলে সেই নদীই আবার হয় কীর্তিনাশা।

উল্লিখিত কারণে প্রাচীন সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন ভূতলে লুক্কায়িত থাকে। অধিকাংশ প্রাচীন নগর ও গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পরে উক্ত স্থানেই পুনরায় মানববসতি স্থাপিত হয়। এই প্রকারে যুগ-যুগান্তরের মানববসতির নিদর্শন অধিকাংশ প্রত্নস্থলে উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত রাজবাড়িডাঙা নামক প্রত্নস্থলে উৎখননের ফলে অনুক্রমিক ছয়টি পর্যায়ের সৌধ-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর্বশেষ বসতির পরে অপর কোন বাসস্থান পুনর্বার গড়িয়া ওঠে নাই। ফলে উক্ত স্থান ঢিবিতে পর্যবসিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে অনেক প্রাচীন মহানগরীর মৃত্তিকা-স্তূপের উপরও গ্রামের বসতি নির্মিত হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রত্নস্থলের উপরই বর্তমান সময়ের গ্রাম ও নগরের অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বহুক্ষেত্রে প্রত্নস্থলের উপর কোন বসতির সন্ধান পাওয়া যায় না। উক্ত স্থলসমূহ জঙ্গল ও বালুকণা দ্বারা আচ্ছাদিত। মৃত্তিকাস্তূপ বা ঢিবি সমতল ভূমি হইতে উচ্চতর হয়। প্রাচীন নগর

ও গ্রামের প্রত্নস্থল-ঢিবি সাধারণতঃ সমতল। কিন্তু মন্দির বা উচ্চ সৌধমালাযুক্ত প্রত্নস্থলের ঢিবি অসমতল ও উচ্চতর হয়। উক্ত প্রকার মৃত্তিকা-স্তূপসম্বলিত অঞ্চলই প্রত্নাঞ্চল বা প্রত্নস্থল।

। ২ ।

ভূগর্ভস্থ নিদর্শন

মৃৎস্তূপ বা ঢিবিই মানবসংস্কৃতির নিদর্শনের প্রাচীন আধার। কি কারণে ও প্রকারে অজস্র প্রত্নবস্তু ভূগর্ভে রক্ষিত থাকে তাহার জ্ঞান উৎখননকার্যে বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্নস্থলের কোন্ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এবং কোন্ পদ্ধতি অনুসারে খনন করিতে হইবে তাহাও এই জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। প্রত্নবস্তুর পরীক্ষা, নিরীক্ষা এবং ব্যাখ্যা উক্ত জ্ঞানের সাহায্যেই করিতে হয়।

ভূগর্ভে প্রত্নবস্তুর স্থিতি ও সংরক্ষণ, পদার্থ বা বস্তুবিশেষের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ পদার্থ দুই প্রকার: (ক) জৈব পদার্থ এবং (খ) অজৈব পদার্থ। অজৈব পদার্থ, যেমন প্রস্তর, ইষ্টক, প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র, মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির জিনিসপত্র, ধাতুদ্রব্য (তাম্র, লৌহ, স্বর্ণ এবং রৌপ্য) ইত্যাদি বহুদিন ভূতলে সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু জৈব পদার্থ অল্প সময়ের মধ্যে রূপান্তরিত হয়। এমন কি জৈব পদার্থের প্রত্নবস্তু অদৃশ্যও হইয়া যায়। জীবজন্তুর অস্থি, গজদন্তনির্মিত দ্রব্য, চর্ম, কাষ্ঠ, বল্কল, কৃষিজাত শস্য প্রভৃতি অচিরেই বিনষ্ট হয়। পক্ষান্তরে জৈব পদার্থনির্মিত প্রত্নবস্তুও অঙ্গারীকৃত এবং তৈলসিক্ত হইলে সুরক্ষিত থাকে।

যে সকল কারণে প্রত্নবস্তু বিনষ্ট হয়, তাহার মধ্যে জলবায়ুর প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জলবায়ু জৈব পদার্থ ধ্বংসের জন্য বহুলাংশে

দায়ী। অতীব তপ্ত বা আর্দ্র জলবায়ু জৈব পদার্থকে অতি সহজে বিনষ্ট. করে (বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-সমূহে)। কিন্তু শুষ্ক জলবায়ুতে ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ অনেকদিন সুরক্ষিত থাকে। শুষ্ক জলবায়ু উৎখনকের কার্যে প্রধান সহায়ক। কারণ উক্ত জলবায়ুতেই জৈব পদার্থসমূহ সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা যায়। সংযত এবং মধ্যম জলবায়ুতেও জৈব পদার্থ রক্ষিত থাকে। অতীব শীতল জলবায়ুই প্রত্নবস্তু সংরক্ষণের জন্য বিশেষ উপযোগী। উৎখনকের নিকট শীতল জলবায়ু সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়।

ভূমি বা মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের উপরও প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণ নির্ভর করে। মৃত্তিকার বিশেষ গুণ বা প্রকরণ জৈব পদার্থকে রক্ষা করে। তৈলাক্ত মৃত্তিকায়, আগ্নেয়গিরির ভস্মে এবং অগ্নিদগ্ধ আচ্ছাদনে প্রত্নবস্তু সুরক্ষিত থাকে। মানুষের নানাবিধ আচরণ এবং অনুষ্ঠানও মৃত্তিকাগর্ভে প্রত্নবস্তুর রক্ষণ-সহায়ক। এই সকল আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে শব সমাধিস্থ করিবার বিভিন্ন প্রথা, স্মৃতিমন্দির নির্মাণ, মৃৎপাত্রে অস্থি সমাধি, আবাসস্থল নির্মাণ, অগ্নিদগ্ধ জৈব পদার্থ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত কারণসমূহের জন্যই মৃৎস্তূপের গর্ভে প্রাচীন মানবসংস্কৃতির নিদর্শন রক্ষিত থাকে। সুরক্ষিত অবস্থানের জন্যই প্রত্ন-বস্তুর উদ্ধার এবং উহাদের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিয়া মানবসংস্কৃতির ইতিহাস গ্রন্থনকার্য সম্ভব হইয়াছে।

। ৩ ।

পর্যবেক্ষণ

সরেজমিন-পর্যবেক্ষণ উৎখননের প্রারম্ভিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য। প্রত্নাঞ্চল আবিষ্কার এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহণ এবং সংরক্ষণ প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষকের প্রধান কর্তব্য।

ভূপৃষ্ঠ-পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন প্রকারে চালিত হয়। কোন অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত মানচিত্রের অবর্তমানে পর্যবেক্ষণ করা অতীব দুরূহ কার্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহের নির্ভরযোগ্য অথবা প্রাথমিক মানচিত্র বিরল। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের দিক হইতে এই ভূখণ্ড সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত অঞ্চলে সরেজমিন-পর্যবেক্ষণই প্রত্নস্থল আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা। ভবিষ্যতে অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রত্নস্থলের পৃষ্ঠ হইতে সংগৃহীত প্রত্নবস্তু সংগ্রহশালায় সুরক্ষণ অতীব প্রয়োজনীয়। সরেজমিন-পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা চালিত হওয়া আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে আকাশ-আলোকচিত্র (এরিয়াল ফটোগ্রাফি) গ্রহণ উল্লেখযোগ্য (চিত্র নং ২ক)। বর্তমানে আকাশ-আলোকচিত্রের সাহায্যে অনেক প্রত্নাঞ্চল আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আকাশ-আলোকচিত্র গ্রহণ ও পঠন পর্যবেক্ষণের প্রারম্ভিক কার্য। আকাশ-আলোকচিত্রণ হইতে অনেক অজ্ঞাত প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থিরীকৃত হইবার পর প্রত্নস্থলে সরেজমিন-পর্যবেক্ষণ অত্যধিক প্রয়োজন। ভূপৃষ্ঠ হইতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুই প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির প্রকৃত রূপের পরিচয় প্রদান করে। আকাশ-আলোকচিত্রণ দুর্গম প্রত্নাঞ্চল নির্ধারণ করে, কিন্তু তাহার প্রকৃত রূপের সন্ধান ও পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। এই কার্যের নিমিত্ত কঠোর পরিশ্রমী ও অভিজ্ঞ সরেজমিন- পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যবেক্ষণ করিয়া পর্যবেক্ষকগণ প্রত্নতত্ত্বের অমূল্য সম্পদ সংগ্রহের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের পর্যবেক্ষণ-ইতিহাসে কানিংহামের নাম[1] বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উত্তর ভারতের জঙ্গল, গিরি ও মরুভূমির বিপদ-সঙ্কুল স্থানসমূহের পর্যবেক্ষণই কানিংহামের অতুলনীয় কৃতিত্ব। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙের ভ্রমণ-বিবরণই কানিংহামের পর্যবেক্ষণ- কার্যের পথপ্রদর্শক। হিউয়েন-সাঙের

পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই তিনি প্রাচীন ভারতের অনেক নগর ও মহা-নগরী এবং বৌদ্ধকেন্দ্রের বর্তমান ভৌগোলিক স্থিতি নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহার পর্যবেক্ষণ-বিবরণী ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের অমূল্য সম্পদ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্টাইনের নাম সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়। স্টাইন বেলুচিস্তান ও মধ্য এশিয়ার দুর্গম গিরিকান্তার পর্যবেক্ষণ করিয়া অনেক প্রত্নাঞ্চল সনাক্ত করিয়াছেন এবং বহু অমূল্য প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। উক্ত সময়েই বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মজুমদার সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে বহু প্রত্নাঞ্চল এবং প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মোহেঞ্জোদাড়ো-প্রত্নাঞ্চল আবিষ্কার করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নূতন গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযুক্ত করিয়াছেন। বেলুচিস্তান এবং সিন্ধুদেশের অভ্যন্তরে পর্যবেক্ষণ পরিচালনার সময়ে মজুমদার আততায়ীর হস্তে নিহত হন। প্রত্ন-তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের ইতিহাসে বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং মজুমদারের দান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুতানায় পর্যবেক্ষণ করিয়া ঘোষ সিন্ধু-সভ্যতার অনেক প্রত্নস্থল নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রত্নাঞ্চলে উৎখননের ফলে তাহার সনাক্তকরণও স্থিরীকৃত হইয়াছে।

পর্যবেক্ষণের জন্য শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রয়োজন। মৃত্তিকাস্তূপের আকার ও প্রকার সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যাবশ্যক। প্রত্নবস্তু সম্বন্ধেও প্রভূত জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার। বসতিবিহীন প্রত্নাঞ্চলের স্থিতি নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। অতীতের আবাসস্থল সাধারণতঃ সম-তলভূমিতে পরিণত হয়। হলকর্ষণের জন্য প্রত্নস্থলের উচ্চতা হ্রাস পায় এবং ঢিবি সমোন্নতি ক্ষেত্রে পর্যবসিত হইয়া পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে প্রত্নস্থল প্রাকৃতিক মৃত্তিকাস্তূপ বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন সৌধ, ভিত, খানা প্রভৃতির কোন নিদর্শনও পাওয়া যায় না এবং প্রত্নাঞ্চল জঙ্গল বা বৃক্ষ-গুল্মাদি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। কিন্তু মানুষ তাহার আবাসস্থল পরিত্যাগ করিতে সর্বদাই অনিচ্ছুক। সেই জন্যই মানুষ

বাসস্থল পরিত্যাগ করিলেও তাহার বসতির ও অবস্থানের বিবিধ নিদর্শন থাকিয়া যায়। ঐ সকল বাস্তব নিদর্শনই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট অতীব অমূল্য সম্পদ। প্রত্নাঞ্চলের পৃষ্ঠে উক্ত বাস্তব নিদর্শনের অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন প্রত্নতাত্ত্বিকের একটি প্রধান কার্য। যে সকল প্রত্নবস্তু প্রত্নাঞ্চলের পৃষ্ঠ হইতে উদ্ধার করা হয় তাহাদের মধ্যে প্রস্তর-হাতিয়ার, খোলামকুচি, পোড়ামাটির মূর্তি, পাথর ও পোড়ামাটির পুঁতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রকার নিদর্শন হইতে প্রত্নাঞ্চলেরপ্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। পর্যবেক্ষক প্রত্নাঞ্চল হইতে ঐ সকল প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্‌ঘাটন করেন। প্রত্নতত্ত্বে ভূপৃষ্ঠ হইতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুই প্রত্নাঞ্চল নির্ধারণের প্রধান সহায়ক।

পর্যবেক্ষণের সময় আলোকচিত্র গ্রহণ আবশ্যক। আলোকচিত্রই প্রত্নস্থলের প্রকার ও আকারের সম্যক পরিচয় প্রদান করে (চিত্র নং ১ক, ১খ)। বর্তমানে রঙিন আলোকচিত্রও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র আলোকচিত্র হইতে প্রত্নাঞ্চলের সামগ্রিক তথ্য অনুধাবন করা সম্ভব নহে। সুতরাং পর্যবেক্ষণকার্যে নক্‌শা ও সমোন্নতি রেখা অঙ্কন বিশেষ প্রয়োজন। প্রত্নাঞ্চলের বাস্তু-নক্‌শা প্রত্নস্থল নিরূপণে অনেক সাহায্য করে (চিত্র নং ২খ)। সমোন্নতি রেখা-অঙ্কন হইতে প্রত্নস্থলের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব প্রত্নবিজ্ঞানে অনস্বীকার্য। সরেজমিন- পর্যবেক্ষণ দ্বারাই প্রত্নস্থল নির্ধারণ সম্ভব। পর্যবেক্ষণ প্রাক্‌-উৎখনন কার্যক্রম। উৎখনন আরম্ভ করিবার পূর্বে সরেজমিন-পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্নস্থলের সকল তথ্য সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক।

। ৪ ।

প্রত্নস্থল আবিষ্কার পথনির্দেশ

মানবসংস্কৃতির বাস্তবনিদর্শন মৃত্তিকাগর্ভে রক্ষিত থাকে। সাধারণতঃ প্রত্নস্থল এবং প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার আকস্মিক বা দৈব। কিন্তু প্রাকৃতিক ও মানবীয় কার্যক্রমের ফলেও ভূগর্ভে রক্ষিত প্রত্নবস্তু উদ্‌ঘাটিত হয় এবং প্রত্নাঞ্চল নির্ধারণকার্যে উৎখনককে বিশেষ সাহায্য করে। প্রাকৃতিক কারণেই ভূগর্ভ হইতে প্রত্নবস্তু প্রকটিত হয়, যেমন নদ-নদীর ও সমুদ্রের ভাঙন, বায়ু ও নদীর গতি পরিবর্তন, বর্ষণ, ভূমিকম্পন প্রভৃতি। অনাবৃষ্টির ফলে বহুক্ষেত্রে নদী ও সরোবর শুষ্ক হইয়া যায় এবং প্রত্নাঞ্চলের প্রত্নবস্তু উদ্‌ঘাটিত হয়। এতদ্‌ব্যতীত মানুষের ও পশুদের কার্যক্রমের ফলেও অনেক প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানবীয় কার্যপ্রণালীর মধ্যে হলকর্ষণ, বাস্তু নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালী ও পুষ্করিণী বা নালা খনন, মৃত্তিকা খনন, নগর, গ্রাম বা বসতি স্থাপন, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ, প্রস্তর ও ইষ্টক আহরণ, পোতাশ্রয় নির্মাণ এবং যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভূগর্ভস্থ ধনদৌলত লুণ্ঠনকারীদিগের কার্যকলাপের জন্যও অনেক প্রত্নাঞ্চল নির্ধারণ অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। বহুবিধ কারণে ভূতলে রক্ষিত মানবসভ্যতার উদ্‌ঘাটিত নিদর্শনই উৎখননকারীদের প্রত্নস্থল নির্ধারণকার্যে প্রভূত সাহায্য করে।

প্রত্নাঞ্চলের পৃষ্ঠ হইতে সংগৃহীত প্রত্নবস্তু অধ্যয়ন করিয়াও প্রত্নস্থল সনাক্ত করা সম্ভব। মৃত্তিকার বন্ধুরতা ও অন্য চিহ্ন, কৃষিজাত পণ্য, পশুদের কার্যক্রম, প্রভৃতিও প্রত্নাঞ্চল নির্ধারণে সাহায্য করে। প্রাচীন সাহিত্য, কিংবদন্তী, অঞ্চল-নক্‌শা ইত্যাদি হইতেও উৎখনক অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রত্নস্থল নির্ণয় করিতে পারেন।

উপরি-উক্ত পথনির্দেশ প্রত্নস্থলের ও প্রত্নবস্তুর আবিষ্করণ-কার্যে উৎখনকের প্রধান সহায়ক।

। ৫ ।

প্রত্নস্থল নির্ধারণ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ও উৎখননের নিমিত্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শাখা ও প্রশাখা বিবিধ পদ্ধতি ও যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়া উৎখননের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে এবং উৎখননের সহিত জড়িত অনেক সমস্যার সমাধানও সাধিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে প্রত্নাঞ্চল ও উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নস্থলাংশ নির্ধারণ করিবার জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(ক) আকাশ-আলোকচিত্রণ (এরিয়াল ফটোগ্রাফি) অন্তর্ভূমি একবার আলোড়িত হইলে উহাকে আদি অবস্থায় পুনঃস্থাপন সম্ভব নহে। যুগ-যুগান্তর পরেও বৃক্ষ এবং গুল্মাদি উক্ত স্থানে উৎপন্ন হয়। আলোড়িত স্থানে বৃক্ষাদির রূপ, আকার ও প্রকৃতি অনালোড়িত অন্তর্ভূমি হইতে ভিন্ন। বহু পূর্ব হইতেই পুরাতত্ত্ববিদ্গণ বৃক্ষাদির উৎপত্তির এই অসামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ সাধারণতঃ অন্তর্ভূমির আলোড়নের নিদর্শন অন্বেষণ করেন। উক্ত নিদর্শনই প্রাচীন মানববসতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আকাশ-আলোকচিত্র হইতে উক্ত নিদর্শন নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। প্রত্নবিজ্ঞানে সাধারণতঃ দুই প্রকার আকাশ-আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়—(১) উর্ধ্বাধ আলোকচিত্রণ এবং (২) বক্র আলোকচিত্রণ। উভয় প্রকার আকাশ-আলোকচিত্রণ হইতে প্রত্নাঞ্চলের প্রয়োজনীয় নিদর্শন নির্ণয় করা যায় (চিত্র নং ২ক)। এই নিদর্শন তিন প্রকার : (ক) ছায়াযুক্ত প্রত্নস্থল (খ) মৃত্তিকাযুক্ত প্রত্নস্থল এবং (গ) শস্যফলিত প্রত্নস্থল।

ছায়াযুক্ত প্রত্নস্থলের পৃষ্ঠ অসমতল হয় এবং গর্ত, খানা, ধাপ প্রভৃতির সহিত যুক্ত থাকে। ছায়াযুক্ত ভূপৃষ্ঠের আকার ও প্রকার নির্ণয়

করিয়া প্রত্নস্থল স্থিরীকৃত করা যায়। আলোড়নের ফলে মৃত্তিকাযুক্ত প্রত্নস্থল-পৃষ্ঠের বর্ণ পরিবর্তিত হয়। মরুভূমি ব্যতীত মৃত্তিকাযুক্ত প্রত্নস্থল শস্যবিহীন ক্ষেত্ররূপে নির্দেশিত হয়। আকাশ- আলোকচিত্রে শস্যফলনের নিদর্শন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

আকাশ-আলোকচিত্রে ফসলের চিহ্ন বা নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া প্রত্নস্থল সনাক্ত করা হয়। প্রথমতঃ, ভূতলে সৌধমালা বা ইষ্টকের ধ্বংসাবশেষের উপর ফসল অকালে পাকিয়া উঠে। কিন্তু ভূগর্ভস্থ কোন পরিখার উপরের ফসল কৃষ্ণবর্ণ এবং উহার বৃদ্ধিও অধিক হয়। উক্ত নিদর্শন হইতে ভূনিম্নস্থ সৌধমালার নির্দেশ পাওয়া যায় এবং প্রত্নস্থল সনাক্তকরণ সহজ হয়। দ্বিতীয়তঃ, আকাশ-আলোকচিত্রের সাহায্যেই প্রত্নস্থলের পরিধিও নির্ণয় করা সম্ভব। তৃতীয়তঃ, উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নাঞ্চলের নক্শা ও মানচিত্র আকাশ-আলোকচিত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করা যায়। সুতরাং আকাশ-আলোকচিত্রের সহায়তায় প্রত্নস্থলাংশের পরিধি-নির্ধারণও সম্ভবপর হইয়াছে।

স্টেরিওস্কোপ বা ঘনচিত্রদর্শক যন্ত্রদ্বারা আকাশ-আলোকচিত্রে পরিবেশিত নিদর্শন নির্ণয় করিতে হয়। ক্রফোর্ড সর্বপ্রথম প্রত্ন-স্থলের অস্তিত্ব নির্ধারণের জন্য আকাশ-আলোকচিত্র ব্যবহার করিয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। অ্যালান ও ক্রফোর্ড আকাশ-আলোকচিত্র গ্রহণ ও পঠন সংক্রান্ত পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ব্রাড্ফোর্ড (১৯৫৭) আকাশ-আলোকচিত্র হইতে প্রত্নস্থল নিরূপণ করিবার পদ্ধতির অধিক উন্নতি করিয়াছেন। বর্তমানে পর্যবেক্ষণ উৎখননকার্যে আকাশ-আলোকচিত্রণ একটি প্রকৃষ্ট সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। উৎখনন সমাপন করিবার পরও আকাশ-আলোকচিত্র-গ্রহণ আবশ্যক। আকাশ-আলোকচিত্রই উৎখনিত বা অনাবৃত প্রত্নাঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ চিত্র পরিবেশন করে।

(খ) বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ-পদ্ধতি : প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ-পদ্ধতি ভূবিদ্যা-অনুশীলনকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

কিন্তু প্রত্নবিজ্ঞানে উক্ত পদ্ধতির ব্যবহার ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সর্বপ্রকার মৃত্তিকা বৈদ্যুতিক শক্তিকে বাধা প্রদান করে। এই পদ্ধতি অনুসারে বৈদ্যুতিক শক্তিকে মৃত্তিকায় চালনা করিয়া বাধা প্রদানের মান নির্ণয় করা যায়। মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে বাধা প্রবলতর হয়। কিন্তু সিক্ত মৃত্তিকায় বৈদ্যুতিক বাধার প্রবলতা ক্ষীণ হয়। এই বৈদ্যুতিক বাধার মান মানযন্ত্রে (মিটারে) নির্ণয় করা যায়। উক্ত মান-নির্ণয় হইতে প্রত্নাঞ্চলের কোন্ বিশেষ ক্ষেত্রের বা অংশের মৃত্তিকা শুষ্ক বা আর্দ্র তাহা নির্ধারণ করা সহজ হইয়াছে। এই পদ্ধতির সাহায্যেই প্রত্নাঞ্চলের সৌধ-ধ্বংসাবশেষের ও পরিখার প্রকৃত স্থিতি সনাক্ত করাও সম্ভব। পূর্বোক্ত যন্ত্রের দ্বারা উৎখনক প্রত্নস্থলের কোন্ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে খননকার্য আরম্ভ করিবেন তাহাও স্থির করা যায়। জন মার্টিন একটি সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত বৈদ্যুতিক শক্তিকে বাধাপ্রদানের মান-নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ক্লার্ক এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়া উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নস্থলাংশ নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(গ) পেরিস্কোপ- আলোকচিত্র : পেরিস্কোপ আলোকচিত্রের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভবপর হইয়াছে। লেভিসি এবং তাঁহার সহকারিবৃন্দ এই আলোকচিত্র গ্রহণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু পেরিস্কোপ- আলোকচিত্র গ্রহণ সময়-সাপেক্ষ ও জটিল। সেই জন্যই লেভিসি অপর একটি যন্ত্র এবং পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ হইতে মৃত্তিকা-গর্ভে লুক্কায়িত প্রত্নবস্তুও অবলোকন করা যায়। এই যন্ত্রের সহায়তায় উৎখননের জন্য প্রকৃষ্ট প্রত্নস্থলাংশ নির্ধারণ সহজতর হইয়াছে।

(ঘ) চৌম্বক-মান-নির্ধারণ-যন্ত্র বা চৌম্বক-স্থিতি (প্রোটন-ম্যাগ্-নিটোমিটার বা ম্যাগনেটিক লোকেশন) : প্রোটন-ম্যাগ্নিটোমিটার যন্ত্র প্রত্নস্থলাংশ আবিষ্কার ও নির্ধারণের প্রধান সহায়ক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুইডেনের ভূগর্ভে পচ্ছিত লৌহময় দ্রব্যাদির অবস্থান

চৌম্বক মান-যন্ত্র দ্বারা নির্ণয় আরম্ভ হয়। ভূ-আকৃতির বিবর্তন এই যন্ত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করা সম্ভব। কুম্ভকারের পোয়ানের অবস্থানও চৌম্বক পদ্ধতি দ্বারা সনাক্ত করা যায়। এমনকি এই চৌম্বক-মান-যন্ত্রের সাহায্যে ভূগর্ভে রক্ষিত রাস্তা, ইমারত প্রভৃতির অবস্থানও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা সহজ হইয়াছে।

(ঙ) যান্ত্রিক গর্তকারক (মেকানিক্যাল ড্রিল): যান্ত্রিক গর্তকারকের সাহায্যে ক্রমান্বয়ে গর্ত করিয়া প্রত্নস্থলের নিম্নে বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। আমেরিকাতে এই পদ্ধতি বহুলাংশে ব্যবহৃত হইয়াছে। মেক্সিকোর প্রত্নতাত্ত্বিক কার্লোরাজ্ এবং পেন্সিলভ্যানিয়ার অধ্যাপক ইয়ং এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বহুক্ষেত্রে কৃতকার্য হইয়াছেন।

(চ) খনি-নির্দেশক (মাইন-ডিটেক্‌টর): খনি-নির্দেশক প্রণালীর সাহায্যে ভূগর্ভস্থ ধাতুর অবস্থান করা নির্ণয় সহজসাধ্য। (ছ) প্রোবিং বা শলাকা যন্ত্র দ্বারা গভীরতা নির্ণয় পদ্ধতি, (জ) অগরিং বা বর্মা (তূরপুন) দ্বারা মৃত্তিকা খনন, (ঝ) বসিং ইত্যাদির সাহায্যে পরিখা ও প্রত্নবস্তুর অবস্থান নির্ণয় সহজতর হইয়াছে। বসিং পদ্ধতিতে হাতুড়ি দ্বারা ক্রমাগত আঘাত করিলে যে শব্দ ধ্বনিত হয় উহার সাহায্যেই পরিখা বা প্রত্নবস্তুর অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। (ঞ) উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের সহায়তায়ও প্রত্নাঞ্চল ও প্রত্নস্থলাংশ-স্থিরীকরণ সম্ভব। (ট) মৃত্তিকাবিজ্ঞানের সাহায্যে আলোড়িত মৃৎস্তরের সন্ধানও সম্ভবপর হইয়াছে। প্রাচীন আবাসিক প্রত্নস্থলের ভূমি আলোড়িত থাকে এবং উহার সংযোগ ও প্রকার ভিন্ন রকমের হয়। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্যে অগ্রবর্তী। মৃত্তিকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়াও প্রত্নস্থল নির্ধারণ করা যায়। মৃত্তিকায় ফুস্ফুরকজাতীয় পদার্থের পরিমাণাত্মক বিশ্লেষণ করিয়াও প্রত্নস্থল নির্দিষ্ট করা সম্ভব হইয়াছে।

এতদ্‌ব্যতীত আরও অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যন্ত্রের সাহায্যে

প্রত্নবস্তু, বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতির ভূগর্ভে অবস্থান নির্ণয় করা যায়। মৃত্তিকার ফস্‌ফেট বা ফুস্ফুরক পদার্থ এবং পরাগ বিশ্লেষণ করিয়াও প্রত্নস্থলের নিম্নে উদ্ভিদরাজির অস্তিত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আর্হেনিয়াস এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। উক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে অনেক প্রাচীন আবাসস্থল নির্ধারিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগে প্রত্নবিজ্ঞানে অন্তঃসাগরীয় (সাব-মেরিন) প্রত্নতত্ত্ব নামে একটি নূতন শাখা প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রত্নবস্তু সন্ধানে ক্লিওর সমুদ্রতলে নিমজ্জনের সময় হইতেই এই বৈজ্ঞানিক শাখার ক্রমোন্নতি আরম্ভ হয়। কার্থেজের (উত্তর আফ্রিকা) নিকটবর্তী মাডি নামক স্থানে ধনদৌলত বোঝাই একটি রোমক জাহাজের ভগ্নাংশ এবং উহার অভ্যন্তরস্থ জিনিস সমুদ্রগর্ভে আবিষ্কৃত হয়। এক ডুবুরী ১৩০ ফুট সাগরতলে বৃহৎ কামানের অবস্থান লক্ষ্য করে। ডুবুরীর উক্তির উপর নির্ভর করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমুদ্রতলে অনুসন্ধান-কার্য পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত অনুসন্ধান পুনরায় আরম্ভ করা হয়। মাডির আবিষ্কারই অন্তঃসাগরীয় প্রত্নবিজ্ঞানের পথ-নির্দেশক। ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে টাইবেরের পোতাশ্রয় ও বন্দর আবিষ্করণ উল্লেখযোগ্য। ফরাসী ও ইতালী দেশের সংলগ্ন ভূমধ্য-সাগরের উপকূল হইতেও অনেক প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। হল্যাণ্ড অন্তঃসাগরীয় প্রত্নতত্ত্বের প্রধান কেন্দ্র। বর্তমানে অন্য দেশেও সমুদ্রতল হইতে প্রত্নবস্তুর উদ্ধারকার্যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। এই অনুসন্ধানের জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও প্রবর্তিত হইয়াছে। বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যেই সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত প্রাচীন পোতাশ্রয়, নগর, পোত এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার ও উদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু সমুদ্রতলে প্রত্নবস্তুর অনুসন্ধান ও উৎখননকার্যে অনেক প্রতিবন্ধক বর্তমান, যথা—ক্ষণস্থায়ী নিমজ্জন, জলতলে পর্যবেক্ষণ পরিচালনার কঠিনতা এবং সুবিস্তৃত কর্দম ও

চূনের জমাট দ্বারা আবৃত প্রত্নবস্তু প্রভৃতি। বর্তমানে অনেক বাধা ও বিপদ তুচ্ছ করিয়া কতিপয় নির্ভীক ডুবুরী-উৎখনক সাগরতলে প্রত্নবস্তুর অন্বেষণকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। ফরাসী সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া সমুদ্রতলবর্তী প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছে।

উল্লিখিত বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে ও অন্যদেশে উৎখননকার্য অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে অদ্যাপি উপরি-উক্ত কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা প্রণালী প্রয়োগ করা হয় নাই। ভারতবর্ষে অন্তঃসাগরীয় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকার্যও সুদূরপরাহত। ভারতবর্ষের সাগরত্রয়ের তলদেশ হইতে প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যপূর্ণ অনেক বাস্তব নিদর্শন উদ্ধারণের সম্ভাবনা বর্তমান। সুতরাং ভারতবর্ষ অন্তঃসাগরীয় প্রত্নবিজ্ঞান-অনুশীলন-কার্যের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাক্-উৎখনন কার্যক্রম

। ১ ।

পর্যবেক্ষণ ও উদ্‌যোগ

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও পদ্ধতি প্রত্নাঞ্চল ও প্রাচীন সভ্যতার বাস্তব নিদর্শনের অবস্থান নির্ধারণ করিতে সাহায্য করে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্নস্থল এবং উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নস্থলাংশ স্থিরীকরণ-কার্যে সরেজমিন-পর্যবেক্ষণ ও জরিপের প্রয়োজন অত্যধিক।

প্রাক্-উৎখনন কার্যক্রমের মধ্যে পর্যবেক্ষণ অত্যাবশ্যক। পূর্বেই সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম আলোচিত হইয়াছে। প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের সমস্যা সমাধান করাই উৎখননের প্রধান উদ্দেশ্য। সমস্যাবিহীন উৎখনন সমস্যা সৃষ্টি করে এবং ইতিহাস রূপায়ণের কার্যে বিঘ্ন ঘটায়। যে কোন প্রত্নস্থলে উৎখনন পরিচালনা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক। সুতরাং ইতিহাসের সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত প্রত্নস্থল নির্ধারণ করা প্রথম কর্তব্য। প্রত্নস্থল নির্ধারণের জন্যই পর্যবেক্ষণ-কার্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্নস্থলে উৎখনন আরম্ভ করিবার পূর্বে পর্যবেক্ষণ করিয়া ইতিহাস-সমস্যার সহিত জড়িত তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। সংগ্রহশালায় রক্ষিত তদ্‌বিষয়ক প্রত্নবস্তুর অধ্যয়নও আবশ্যক। প্রসঙ্গত: পর্যবেক্ষণ ও সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রত্নবস্তু অধ্যয়নের গুরুত্ব সম্পর্কিত দৃষ্টান্তও বিরল নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক খননকার্য আরম্ভ হয়। কিন্তু কোন খননকার্যই ইতিহাসের

সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত চালিত হয় নাই। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে হুইলার ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে উৎখনন পরিচালনার্থে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির কালানুক্রমিক বিকাশের প্রবাহ অজ্ঞাত। দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির সহিত আবিষ্কৃত অসংখ্য রোমক মুদ্রার সম্পর্কও অবিদিত। এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত হুইলার সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারতে রোমক মুদ্রার প্রাপ্তিস্থলসমূহ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পর্যবেক্ষকদল প্রেরণ করেন। পর্যবেক্ষণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতির অনুক্রম-পর্ব স্থিরীকৃত করিবার জন্য একটি প্রত্নস্থল নির্ধারণ করাও এই পর্যবেক্ষকদলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু উক্ত কার্যে পর্যবেক্ষকদল কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সেই সময়েই হুইলার স্বয়ং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রত্নবস্তুর অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের ফরাসী-শাসনাধীন পণ্ডিচেরীর সংগ্রহশালায় ইতালীয় 'অ্যারিটাইন' মৃৎপাত্রের নিদর্শন দেখিতে পাইলেন। অনুসন্ধান করিয়া হুইলার জানিতে পারিলেন যে, পণ্ডিচেরীর নিকটবর্তী আরিকামেডু নামক প্রত্নস্থল হইতে উক্ত মৃৎপাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। অ্যারিটাইন মৃৎপাত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এতদিন ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল। হুইলারই সর্বপ্রথম উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আরিকামেডুতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে উৎখনন আরম্ভ করেন। এই উৎখননের ফলে আরিকামেডুতে রোমক সংস্কৃতির অনেক বাস্তব নিদর্শন, যেমন 'অ্যারিটাইন' মৃৎপাত্র, মৃণ্ময় পানাধার ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়। এই সকল প্রত্নবস্তু হইতে হুইলার দক্ষিণ ভারতের সহিত রোমক জগতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক নির্ণয় করেন। উৎখনিত রোমক প্রত্নবস্তুর উপর ভিত্তি করিয়াই দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির কালানুক্রমিক বিকাশের পর্ব নির্ধারিত হইয়াছে। তদুপরি আরিকামেডুতে একটি

প্রাচীন রোমক বাণিজ্যকেন্দ্রের স্থিতিও প্রমাণিত হইয়াছে। তৎপরে হুইলার পর্যবেক্ষণ করিয়া দক্ষিণ ভারতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল সুনির্দিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ব্রহ্মগিরি নামক প্রত্নস্থলে উৎখননের ফলে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারা নির্ধারিত হইয়াছে। উৎখননের নিমিত্ত এই প্রকার পর্যবেক্ষণ ইতিহাসের অনেক সমস্যার সমাধান করে। হুইলারের পরিকল্পনা অনুসারে ইতিহাস-সমস্যা সমাধানের জন্য হস্তিনাপুরে উৎখনন পরিচালিত হয়। উৎখনিত চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র বর্তমানে প্রাচীনতম ইতিহাসের সমস্যা সমাধানের গবেষণায় একটি প্রধান বিষয়বস্তু।

সম্প্রতি পর্যবেক্ষণের ফলে বাংলাদেশে অনেক প্রত্নবস্তু ও প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সমস্যাবহুল। সমসাময়িক সাহিত্যে ও লেখমালায় উল্লিখিত প্রাচীন বাংলার অনেক নগর ও মহানগরীর বর্তমান ভৌগোলিক স্থিতি অদ্যাপি অবিদিত। এমন কি বাংলার সর্বপ্রথম সার্বভৌম নৃপতি শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের বর্তমান অবস্থানও নির্ধারিত হয় নাই। এই সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক স্থিতি নির্ধারণের জন্য পূর্বের মনোনীত প্রত্নস্থলসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া রাজবাড়িডাঙ্গা নামক একটি প্রত্নাঞ্চল সুনির্দিষ্ট করিতে সক্ষম হয় (চিত্র নং ১ক)। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উক্ত প্রত্নাঞ্চলে উৎখনন করিয়া প্রাচীন বাংলার রাজধানী কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান স্থিরীকৃত করিতে কৃতকার্য হইয়াছে। উক্ত প্রকার পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর যথার্থ তথ্য নিরূপণ করিয়াই প্রত্নস্থল নির্ধারণ পূর্বক উৎখননকার্য আরম্ভ করা কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে জরিপকার্যের প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখযোগ্য। প্রত্না-ঞ্চলের পারিপার্শ্বিক স্থানসমূহ জরিপ করিয়া নকশা তৈয়ার করিতে

হয়। ব্যাপক জরিপের প্রয়োজনও অত্যধিক। অঙ্কিত সমোন্নতি রেখা ও বন্ধুরতার সাহায্যে প্রত্নাঞ্চলের প্রকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত অঙ্কন হইতেই উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নস্থলাংশ নির্ধারণ করা সহজসাধ্য হয়। প্রত্নস্থলের উচ্চতা সাগরাঙ্ক হইতে অবধান করিতে হইবে। উৎখননের সময় নির্ধারিত সাগরাঙ্ক হইতেই সর্বপ্রকার পরিমাপ গ্রহণ করিতে হয়।

প্রত্নস্থলের জরিপ ও নক্‌শার সাহায্যেই প্রত্নস্থলাংশ নির্ণয় করিয়া উৎখনন আরম্ভ করিতে হইবে। সাধারণতঃ প্রত্নস্থলের পার্শ্বে সৌধমালার ধ্বংসাবশেষ রক্ষিত থাকে। যে অংশে হলকর্ষণ দ্বারা কৃষিকার্য করা হয়, সেই স্থানের সৌধমালা বিনষ্ট হয় এবং কেবলমাত্র ক্ষীণ নির্দেশ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু অভিজ্ঞ উৎখনক উক্ত ইঙ্গিত বা নির্দেশ হইতেই সৌধমালার অবস্থান ও স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন। প্রত্নস্থলের আকার, প্রকৃতি এবং উক্ত ক্ষীণ নির্দেশ হইতেই উৎখননের জন্য প্রত্নস্থলাংশ নির্ধারণ করাও সম্ভব।

এতদ্‌ব্যতীত প্রত্নাঞ্চল সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য বা উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। নির্ধারিত প্রত্নস্থল সংক্রান্ত সর্বপ্রকার প্রকাশিত উপাদানের বিশ্লেষণও আবশ্যক। প্রত্নাঞ্চল হইতে সংগৃহীত প্রত্নবস্তুর অধ্যয়ন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল প্রত্নবস্তু সাধারণতঃ সংগ্রহশালায় বা অঞ্চল-অধিবাসীদিগের গৃহে রক্ষিত থাকে। অনুসন্ধান করিয়া উক্ত প্রত্নবস্তু সম্পর্কিত উপাদান নির্ণয়, বিশ্লেষণ এবং অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই অধ্যয়নের সাহায্যেই প্রত্নস্থলের প্রকৃত স্বরূপের উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর। তদুপরি প্রত্নাঞ্চলে প্রচলিত লোকগাথা বা কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া বিশ্লেষণ করিতে হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রচলিত লোকগাথার মধ্যেই প্রত্নাঞ্চলের ইতিবৃত্তের মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

কোন প্রত্নস্থলে উৎখনন আরম্ভ করিবার পূর্বে সরকারের নিকট হইতে অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। জমির মালিকের নিকট

হইতেও অনুমতি গ্রহণীয় এবং প্রয়োজনমত প্রত্নস্থল ক্রয়ও করিতে হয়। মালিককে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিপূরণ করাও কর্তব্য।

উৎখননে অর্থসংগ্রহ এবং সহকারী ও শ্রমিকনির্বাচন অতীব গুরুত্ব-পূর্ণ কার্য। উৎখনন অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং সরকার এবং বিত্তশালীদিগের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, সংগ্রহশালা এবং সারস্বত প্রতিষ্ঠান-সমূহই উৎখননকার্য পরিচালনায় সাহায্য করে। ভারতবর্ষে উৎখননকার্য কেন্দ্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন। বর্তমানে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সারস্বত প্রতিষ্ঠান উৎখনন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নও প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রত্নতত্ত্ব অধ্যয়নের ও গবেষণার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্নাত-কোত্তর বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্নাতকোত্তর শিক্ষণ-প্রবর্তনের ফলে বিদ্যার্থীদের প্রশিক্ষণের নিমিত্ত উৎখনন-পরিচালনা আরম্ভ হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উৎখননকার্যেও অগ্রণী। বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যই উৎখনন-পরিচালনায় উৎসাহী।

যদি উৎখননের নিমিত্ত শ্রমিক ও সহকারীদিগের বেতন বা মজুরী দিতে হয়, তাহা হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। উৎখনন স্বতঃ-প্রবৃত্তিমূলক কার্য। কৌতূহল-উদ্রিক্ত জনসাধারণই উৎখননকার্যের প্রধান সহায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণও উৎখননকার্যে সাহায্য করিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশের সময় বিদ্যার্থিগণের উৎখননকার্যে অংশগ্রহণ করাও সম্ভবপর। বিভিন্ন দেশে বিদ্যার্থিগণই উৎখননের প্রধান অংশীদার। কিন্তু ভারতবর্ষে উৎখননকার্যে বিদ্যার্থি-গণের উৎসাহের ও উদ্দীপনার অভাব বেদনাদায়ক। উৎখননের জন্য উৎসাহী, নিয়মনিষ্ঠানুবর্তী, কঠোর পরিশ্রমী এবং আত্মোৎসর্গী-বিদ্যার্থীর প্রয়োজন। উক্ত গুণসম্পন্ন ইচ্ছুক শিক্ষানবীশ বা বিদ্যার্থি-গণকে উৎখননকার্যে নিযুক্ত করা কর্তব্য।

উৎখননের নিমিত্ত হাতিয়ার ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া উৎখনন-প্রস্তুতি ও প্রাক্‌-উৎখননকার্য সমাপন করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে উৎখননে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও সরঞ্জাম উল্লেখযোগ্য।

। ২ ।

উৎখনন : হাতিয়ার ও সরঞ্জাম

উৎখননের নিমিত্ত বিবিধ হাতিয়ার ও সরঞ্জামের প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিবিধ আকার ও প্রকারের হাতিয়ার ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ উৎখনন-হাতিয়ার ও সরঞ্জামসমূহকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়: (ক) উৎখনন-অধিনায়ক ও সহকারিগণের হাতিয়ার এবং (খ) শ্রমিকদিগের হাতিয়ার (চিত্র নং ৩, ৪)।

জরিপকার্য এবং আলোকচিত্র-গ্রহণ সংক্রান্ত সকলপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ অধিনায়কবৃন্দের হাতিয়ার ও সরঞ্জাম। এই সকল সরঞ্জাম প্রত্যেক খাদতদারকের নিকট থাকিবে। উৎখননে ছুরিকা অধিনায়কদিগের এবং খাদতদারকের অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার। এই ছুরিকার সাহায্যেই যাবতীয় সুশ্রী ও সূক্ষ্ম কাজ করিতে হয়। প্রত্নবস্তুর উত্তোলনকার্যেও এই ছুরিকাই প্রধান অস্ত্র। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উৎখননও একপ্রকার অস্ত্রোপচার। মৃত্তিকা-অস্ত্রোপচার বিদ্যাই উৎখনন। প্রকৃতপক্ষে উৎখনক একজন দক্ষ শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ এবং উক্ত ছুরিকাই মৃত্তিকা-অস্ত্রোপচারের প্রধান অস্ত্র। খাদতদারক এই অত্যাবশ্যকীয় অস্ত্রটি সর্বদা সঙ্গে রাখিবে।

শ্রমিকদিগের হাতিয়ার খননকার্যের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ঐ সকল হাতিয়ারের প্রকার ও রূপ স্থানবিশেষের উপর নির্ভরশীল। যে সকল হাতিয়ার এবং সরঞ্জাম সাধারণতঃ খননকার্যে ব্যবহৃত হয়

তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : (ক) গাঁইতি (বড় ও ছোট), (খ) বেলচা (বড় ও ছোট), (গ) মৃত্তিকা পরিচ্ছন্ন করিবার হাতিয়ার বা ট্যারফ্-কাটার ও ট্রিমার, (ঘ) ছুরিকা, (ঙ) কর্ণিক, (চ) ঝুড়ি (ছ) তক্তা, (জ) লৌহদণ্ড, (ক) হাতুড়ি, (ঞ) দাউলি, (ট) কুড়াল, (ঠ) কোদাল, (ড) শাবল, প্রভৃতি (চিত্র নং ৩)। এই সকল হাতিয়ারের মধ্যে গাঁইতি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। শ্রমিক-দিগকে গাঁইতির প্রশস্তাংশ দ্বারা খনন করিতে দেওয়া কখনই যুক্তি-যুক্ত নহে। কারণ ইহাতে প্রত্নবস্তু অতি সহজেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সকল সময়েই গাঁইতির সূক্ষ্মাংশ দ্বারা খননকার্য পরি-চালনা করা কর্তব্য। ছোট গাঁইতির ব্যবহার কেবলমাত্র খাদতদারকগণই করিবে। উৎখনক ড্রুপের মতে খননকার্যের জন্য গাঁইতি বা কোদাল অতীব অমার্জিত ও কদাকার হাতিয়ার। তিনি মনে করেন যে, প্রত্নবস্তুকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উৎখননকার্যে ছুরিকাই সর্বোৎকৃষ্ট শস্ত্র। অধুনা অনেক প্রত্নস্থলে (প্রধানতঃ বালুকাদ্বারা আবৃত স্থানসমূহে) ব্রুশ দ্বারাই ভূগর্ভে রক্ষিত প্রত্নবস্তু বা বাস্তুনিদর্শন অনাবৃত করিবার প্রণালী অনুসৃত হয়।

বর্তমানে বিস্তৃত উৎখননকার্যে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও ব্যবহৃত হয়, যেমন বৈদ্যুতিক পাম্প বা জলনিষ্কাশন যন্ত্র, উইলফোর্ড ইউনিট, শাবল ও ক্ষেপণী এবং ভারোত্তলন যন্ত্র। শৃঙ্খলিত বালতি বা গ্রাসহপ্পারও ব্যবহার করা হয়।

উৎখননের নিমিত্ত উপরি-উক্ত হাতিয়ার ব্যতীত আরও অনেক সরঞ্জামের (চিত্র নং ৪) প্রয়োজন, যেমন (ক) বড় ও ছোট বাক্স, (খ) দারুনির্মিত বারকোষ বা খানচী, (গ) কাপড়ের থলি ও কুলো, (ঘ) পেরেক (ছোট ও বড়), (ঙ) রজ্জু ও সুতলী, (চ) নিষ্পেষণ কাগজ, (ছ) টাব (ছোট ও বড়), (জ) অঙ্কন ও ছাপ গ্রহণের কাগজ, (ঝ) চিত্রিত ও রঞ্জিত করিবার জন্য নানা প্রকার রং, (ঞ) কালি, (ট) প্রত্নবস্তুর পুনর্গঠনের ও জীর্ণতা উদ্ধারণের জন্য বিভিন্ন

রাসায়নিক উপাদান, (ঠ) প্রত্নবস্তুর শোধনের নিমিত্ত রাসায়নিক দ্রবণ, (ড) বিভিন্ন আকার ও প্রকারের লেবেল, (ঢ) বিবিধ প্রকার ও আকারের ব্রুস ও তুলি, (ণ) লেফাফা, (ত) মই, (থ) ক্রমাঙ্কিত পরিমাপদণ্ড, (দ) ওলন, (ধ) বুদ্‌বুদ-লেভ্‌ল, (ন) নোটবুক, (প) ছক-কাগজ সম্বলিত নোটবুক, (ফ) সমতলদর্শক বুদ্‌বুদ-নিবদ্ধ ত্রিভুজাকার হাতিয়ার, (ব) চিত্রাঙ্কন-কাগজ ইত্যাদি। এতদ্‌ব্যতীত পরিমাপ-গ্রহণ এবং জরিপকার্য সংক্রান্ত সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি, যেমন পরিমাপ-ফিতা, সমবীক্ষণ-যন্ত্র, কোণমাপক যন্ত্র (থিওডোলাইট), সমতল নির্ণায়ক যন্ত্র (ডাম্‌পি- লেভ্‌ল), পরিমাপ-দণ্ড প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। জরিপকার্য ও আলোকচিত্র-গ্রহণের নিমিত্ত সর্বপ্রকার সরঞ্জাম সর্বদাই সজ্জিত রাখিতে হইবে। তদুপরি প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ঔষধপত্রও প্রয়োজনীয়। সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, উৎখনন-সরঞ্জামের অভাব উৎখননকার্য পরিচালনার প্রতিবন্ধক।

। ৩ ।

উৎখনন-নীতি ও উৎখনক

প্রত্নাঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রূপায়ণ করাই উৎখননের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কার্যের নিমিত্ত প্রত্নস্থলের নির্ধারিত ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বাস্তব নিদর্শনেরই গুরুত্ব বর্তমান। অনেক উৎখন্তা লেখমালা বা মুদ্রা আবিষ্কারের জন্যই খননকার্য চালনা করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু এই প্রকার খননকার্য অপরাধজনক। সর্বপ্রকার উৎখনিত বাস্তব নিদর্শনই ইতিহাস রূপায়ণের যথার্থ উপাদান।

কোন প্রত্নস্থলে উৎখনন অসমাপ্ত রাখা অনুচিত। প্রত্নস্থলে

একবার খননকার্য আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখাও উচিত নহে। উৎখনক স্তরবিন্যাসের সাহায্যেই প্রত্নবস্তুর যথার্থ পরিচয় প্রদান করেন। উৎখনন অনেকদিন স্থগিত রাখিলে প্রত্নস্থলের অখনিত অংশের গুরুত্ব লোপ পায়। প্রথম উৎখননেই সর্বপ্রকার প্রত্নবস্তুর তথ্য সম্যক প্রণিধানযোগ্য না হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তী উৎখননে উহাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে। অনেক সময় প্রাথমিক উৎখনন অপেক্ষা পরবর্তী উৎখননে প্রত্নবস্তুর পরিমাণ অধিক হয়। প্রত্নবস্তুর আধিক্য এবং পরবর্তী স্তরবিন্যাসই পূর্বতন উৎখননের উপাদানসমূহকে সমর্থন করে।

উৎখননকার্য দ্রুত পরিচালনা করা অন্যায়। উৎখনন-দলের সদস্য-সংখ্যার উপর খননকার্যের গতি নির্ভর করে। অতীতে বহু শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তৃত খননকার্য সমাপন করিবার জন্য এক বা দুইজন পরিচালক নিযুক্ত থাকিত। এই প্রকার খননকার্যকে উৎখনন বলা যায় না। অতীতে রোমাঞ্চকর প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া খননকার্য নির্বাহ করা হইত। চাঁদাদাতাদিগকে উৎসাহিত করিবার প্রয়াসে রোমাঞ্চকর শিল্পকলা-নিদর্শন আবিষ্কারের জন্য দ্রুতগতিতে খননকার্য সমাপ্ত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। 'ধনদৌলত ও মনোরম শিল্পকলার নিদর্শন উদ্ধার করাই এই প্রকার খননকার্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল। যদি রমণীয় প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইত, তাহা হইলেই খননকার্য সফল হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিত। উক্ত 'প্রকার খননকার্য প্রত্নবস্তু-লুণ্ঠনের অনুরূপ এবং বৈজ্ঞানিক উৎখনন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইতিহাস রূপায়ণের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে খনন করিয়া বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার ও তথ্য উদ্‌ঘাটন করাই উৎখননের প্রধান উদ্দেশ্য। উপরি-উক্ত পূর্বতন খননকার্য ধ্বংসাত্মক। বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্বলিত উৎখনন দ্বারাই ইতিহাসের বাস্তব উপাদান উদ্ধার করা সম্ভব। ইহার জন্য সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা

কর্তব্য। উৎখননকার্যের সমাপ্তি ও সাফল্য প্রধান পরিচালক বা উৎখনকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

উৎখনন-দলের বিভিন্ন সদস্যবর্গের মৌলিক কার্যপ্রণালী ও কর্তব্য-সম্পর্কিত আলোচনা প্রয়োজন। উৎখনন-দলের সদস্যগণের মধ্যে প্রধান পরিচালক, সহকারী পরিচালক, খাদতদারক, শিক্ষিত শ্রমিক-প্রধান বা সর্দার, ক্ষুদ্র প্রত্নবস্তু- লিপিকারক, মৃৎপাত্র- সহকারী, আলোকচিত্র গ্রহণকারী, জরিকপারী, নক্শাকারী, অক্ষরবিদ্যা-বিশারদ, মুদ্রাতত্ত্ব-বিশারদ, রাসায়নিক, ভূবিদ্যা-বিশারদ, নৃতত্ত্ববিদ্, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ এবং শ্রমিকবৃন্দ উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক ও সহকারিবৃন্দ সকলেই একাত্মবোধে উৎখনন পরিচালনা করিবে। এই প্রসঙ্গে উৎখননকার্যে মহিলাদিগের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত মতবাদ আলোচ্য। সাধারণতঃ মহিলাগণের পক্ষে উৎখননকার্যে অংশগ্রহণ কষ্টদায়ক। উৎখননের কঠোর নিয়মনিষ্ঠা ও শারীরিক পরিশ্রম মহিলাদিগের নিকট অসহনীয়। উপরন্তু উৎখনন-দলে মহিলা সদস্যর উপস্থিতি অনেক সময়ই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অভিজ্ঞ উৎখনক ড্রুপ বলিয়াছেন যে, পুরুষ ও মহিলা মিশ্রিত দল কর্তৃক উৎখনন পরিচালনা অবাঞ্ছনীয়। উক্ত উৎখনন সাধারণতঃ বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত হয়। যদি সম্ভব হয়, মহিলারা স্বকীয় উৎখননকার্য পরিচালনা করিতে পারেন। উক্ত মতবাদ ভারতবর্ষের উৎখনন-পরিচালনাকার্যেও স্বীকার্য। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর অন্য দেশে মহিলা ও পুরুষ সংমিশ্রিত দল কর্তৃক উৎখনন পরিচালনার উদাহরণ বিরল নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে, উৎখননকার্যে মহিলারাই সর্বাধিক উপযুক্ত। বর্তমানে অনেক দেশে মহিলারাও উৎখননকার্যে পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছেন।

উৎখননের সফলতা সর্বতোভাবে প্রধান পরিচালকের উপর নির্ভর করে। উৎখনকের বা প্রধান পরিচালকের বিবিধ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু পুঁথিবিদ্যায় পারদর্শিতাই তাঁহার একমাত্র সদ্‌গুণ নহে। উৎখনকের প্রবল চিন্তাশক্তি ও দূরদৃষ্টি থাকা অত্যাবশ্যক। প্রধান

পরিচালকের দূরদৃষ্টির উপরই উৎখননের বৈজ্ঞানিক রীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ ও খননকার্য পরিচালন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সর্বপ্রথমে প্রধান পরিচালক ইতিহাস-অনুরাগী হইবেন। তাঁহার অনুসন্ধান এবং পর্য-বেক্ষণ করিবার দৃঢ়তা ও উদ্যম থাকাও আবশ্যক। ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা নৃতত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তাঁহার ব্যুৎপত্তি থাকা প্রয়োজন। তিনি উৎখননের নিমিত্ত অর্থ-সংগ্রহ ও পন্থা নির্ণয় করিবার অধিকারী হইবেন। উৎখনক একজন দক্ষ জরিপকারী, নক্‌শাকারী এবং আলোকচিত্র-গ্রহণকারী হইবেন। উৎখন্তার বাস্তু-বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করাও বিশেষ প্রয়োজন। সৌধ বা ইমারত অনাবৃতকরণ এবং উহার পুনর্গঠন ও সংরক্ষণ উৎখনকের বাস্তুবিদ্যায় পারদর্শিতার উপর নির্ভরশীল। প্রধান পরিচালকের সাংবাদিক গুণাবলী থাকাও প্রয়োজন। তিনি একজন কুশলী এবং সামাজিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন। উৎখনন-দলের সদস্যগণের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতির বিদ্যমানতা উৎখনকের কার্যক্রমের উপর নির্ভর করে। উৎখনন-দলে এবং উৎখননকার্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখাও উৎখনকের প্রধান কর্তব্য। উৎখনক রাগদ্বেষবর্জিত হইয়া উৎখননকার্য পরি-চালনা করিবেন। পরিচালকের ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের উপরই উৎখননের সাফল্য নির্ভরশীল।

উৎখনক তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা দ্বারাই প্রত্নবস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া ইতিহাস রূপায়ণ করিবেন। প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব নির্ণয় করিবার জন্য উৎখনকের শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। উৎখননের সময় প্রধান পরিচালকের নিজস্ব মতবাদ ও সিদ্ধান্তকে বিসর্জন দিয়া উৎখনিত নিদর্শনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। উৎখনকের এইরূপ সততা, বিশ্বাস ও ধৈর্য থাকা প্রয়োজন যাহাতে স্বীয় মতবাদ-বিরুদ্ধ প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইলেও খননকার্য ব্যাহত না হয়। তাঁহার প্রবল চিন্তাশক্তির ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃত তথ্য-উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর।

উৎখননকার্য অতীব সন্তর্পণের ও সতর্কতার সহিত মন্দগতিতে পরিচালনা করিতে হইবে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে উৎখনন-দলের সদস্যগণ কর্মের চাপে ভারাক্রান্ত না হইয়া পড়ে। কর্মের চাপে পীড়িত সদস্যবৃন্দ সাধারণতঃ অকর্মণ্য হয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কোন প্রত্নস্থলে একবার উৎখনন আরম্ভ করিলে উহাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করা গুরুতর অপরাধ। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে কোন প্রত্নবস্তু ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। প্রত্নবস্তুর লেবেল্ বা অঙ্ক-পট্টি যাহাতে সংমিশ্রিত না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রত্নবস্তুর অঙ্ক-পট্টি একবার মিশ্রিত হইলে, উহা সংশোধন করা সম্ভবপর নহে। প্রত্নবস্তুর উদ্ধারকার্য অতীব সন্তর্পণের ও নিয়মনিষ্ঠার সহিত সাধিত করিতে হইবে এবং উহার দ্রুত উত্তোলন-কার্যও অবৈজ্ঞানিক। ত্বরিত উদ্ধৃত প্রত্নবস্তু উহার সহিত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও নিদর্শন হইতে বঞ্চিত হয়। উৎখনন-বিজ্ঞানে একক প্রত্নবস্তুর বিশেষ গুরুত্ব অবর্তমান। উপরন্তু কোন প্রত্নবস্তুই অবহেলনীয় বা অগ্রাহ্য নহে।

উৎখনকের পক্ষে প্রকৃত তথ্য গোপন রাখাও গুরুতর অপরাধ। স্বীয় মতবাদ-বিরুদ্ধ কোন প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইলে উহা অস্বীকার বা ধ্বংস করাও দণ্ডনীয় অপরাধ। অধিকন্তু স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে অপরের আবিষ্কৃত তথ্যের উপর গুরুত্ব অর্পণ না করাও সমতুল্য অপরাধ। স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অসদুপায় অবলম্বনও দণ্ডনীয় কার্য। উৎখনকের পক্ষে ইতিহাস বিকৃত করিবার প্রয়াস অমার্জনীয়।

উৎখনন-সংবিধানে আরও অনেক বিধি সংযোগ করা যায়। খননকার্য পরিচালনার সময় উৎখননের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে কতিপয় নীতি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ কোন অনাবৃত সৌধমালা ধ্বংস-বা অপসারিত করা উচিত নহে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে অনাবৃত সৌধ অপসারণ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সৌধমালার

গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। যদি কোন আবিষ্কৃত সৌধের নিম্নে অপর সৌধের বা সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনের আবিষ্কার সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে নিদর্শনসমূহের বিস্তারিত তথ্য লিখন, নক্‌শা অঙ্কন ও আলোকচিত্র-গ্রহণ, প্রভৃতি কার্য সমাপন করিয়া উক্ত সৌধের অপসারণ বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ প্রত্নস্থলে বিভিন্ন যুগের বা পর্যায়ভুক্ত সৌধের ধ্বংসাবশেষের অবস্থান অনুমেয়। প্রথমে একটি পর্যায়ের গৃহাদির ভগ্নাংশ অনাচ্ছাদনকার্য সমাপন করিতে হইবে। তৎপরে উহা অপসারণ করিয়া নিম্নস্তরে উৎখনন পরিচালনা করিতে হয়। কিন্তু অপসারণ করিবার সময় উহার প্রকৃত অবস্থান নির্ধারণের জন্য কিয়দংশ অক্ষত রাখা প্রয়োজন। আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ সৌধের অপসারণ বাঞ্ছনীয় নহে। উপরন্তু উক্ত পর্যায়ের সৌধশ্রেণী সম্পূর্ণ অনাবৃত করা কর্তব্য। প্রয়োজনবোধে একাংশ সংরক্ষণ করিয়া অপরাংশে অধঃ উৎখনন পরিচালন করা যুক্তিসঙ্গত। সৌধের কোন অংশ অপসারণ করিবার পূর্বে উক্ত নিদর্শন সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। অপসারিত সৌধের প্রকৃত রূপ ও স্থিতি রূপায়ণের ও নির্ধারণের জন্য এই তথ্য-সংগ্রহ অত্যাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে উৎখনকের সৌধমালার পুনর্গঠন ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত কর্তব্য উল্লেখনীয়। সৌধমালার পুনর্গঠন ও সংরক্ষণকার্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পুনর্গঠনের জন্য যাহাতে প্রাচীন সৌধের অংশ বিলুপ্ত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রয়োজনমত ব্যবহৃত ইষ্টকে বা প্রস্তরে সন তারিখ উৎকীর্ণ করা বাঞ্ছনীয়। এমন কি যে অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে উহার পুনর্গঠনও সম্ভবপর। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে উক্ত পুনর্গঠন ললিতকলা ও সৌন্দর্যতত্ত্বের বা চিত্তরঞ্জনের পরিপন্থী না হয়। সংগ্রহশালায়ও প্রত্নবস্তুর পুনর্গঠন আবশ্যক। কোন গুরুত্বপূর্ণ মৃৎপাত্রের পুনর্গঠন এইরূপ ভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রতারণার কোন অবকাশ না থাকে। পুনর্গঠন ও সংস্কারকার্য অতীব কৌশল ও দক্ষতার সহিত পরিচালন করাই উৎখনকের অন্যতম কর্তব্য।

উৎখনন সমাপ্তির পর উৎখনন-বিবরণ প্রকাশন উৎখনকের অত্যাবশ্যক এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্য। উৎখনন-বিবরণ প্রকাশের নিমিত্ত নক্‌শা ও রেখাচিত্র অঙ্কন করা সর্বাধিক প্রয়োজন। অঙ্কনকার্য এমন-ভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রত্নবস্তুর প্রকৃত রূপ ও আকার সহজেই নির্ধারিত ও বোধগম্য হয়। চিত্রাঙ্কনই ভঙ্গুর প্রত্নবস্তুর যথার্থ রূপের পরিচয় প্রদান করে। প্রত্নবস্তুর চিত্রাঙ্কনের সহিত উহাদের আলোক-চিত্র পরিবেশনও আবশ্যক। সাধারণভাবে বলা যায় যে, উৎখনক স্বীয় স্বার্থেই প্রত্নস্থলের ও প্রত্নবস্তুর অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য নির্ধারণ করিয়া উৎখনন-বিবরণ লিখন ও প্রকাশন অবিলম্বে সম্পাদন করিবেন।

উৎখনন বৈজ্ঞানিক নীতি ও নিয়মাবলী দ্বারা চালিত হয়। উৎখননই আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত তথ্য পরিবেশক। ইতিহাসের কাঠামো পুনর্গঠন এবং উহার প্রকৃত রূপের পরিচয় প্রদান করাই প্রত্নবিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিহাসকে বিকারের হাত হইতে রক্ষা করাও উৎখনকের অপর একটি প্রধান দায়িত্ব। একমাত্র উৎখনিত বাস্তব নিদর্শনই ইতিহাসকে বিকারের হাত হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম। উৎখনন-বিবরণে অপ্রয়োজনীয় মতবাদের কোন স্থান থাকিতে পারে না। যথার্থ ইতিহাস-রূপায়ণই উৎখনকের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য। উৎখননের সফলতা এবং ইতিহাস-লিখন উৎখনকের জ্ঞান, শিক্ষণ, অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রণালী অনুসরণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উৎখনন-কার্যক্রম

। ১ ।

প্রত্নস্থল : বৈলক্ষণ্য ও খনন-নীতি

সকল প্রত্নস্থলের ও মৃৎস্তূপের প্রকার ও রূপ একই রকম নহে। বিভিন্ন প্রকার প্রত্নস্থল বিদ্যমান। উৎখনন-পদ্ধতির অনুসরণ প্রত্ন-স্থলের বা মৃৎস্তূপের বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভর করে। মৃৎস্তূপের বিশিষ্টতা ও মৃত্তিকাগর্ভে রক্ষিত প্রত্ননিদর্শনের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে উৎখনকের সম্যক জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। সাধারণতঃ চতুর্বিধ প্রত্নস্থল বা মৃত্তিকাস্তূপ উল্লেখযোগ্য : (ক) ঐতি-হাসিক পর্বের আবাসিক প্রত্নস্থল, (খ) প্রাগৈতিহাসিক পর্বের প্রত্নস্থল, (গ) উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ বা ঢিবিসম্বলিত প্রত্নস্থল এবং (ঘ) সমাধিক্ষেত্র-প্রত্নস্থল।

(ক) ঐতিহাসিক পর্বের আবাসিক প্রত্নস্থল : ঐতিহাসিক পর্বের আবাসিক প্রত্নস্থলে সাধারণতঃ বিভিন্ন যুগে নির্মিত সৌধের ধ্বংসাব-শেষের অবস্থান আবিষ্কৃত হয়। একটি দেওয়াল অনাবৃত হইলে উহার আকার ও প্রকৃতি নির্ণয় করা প্রয়োজন। সর্বপ্রথমে দেওয়ালের ভিত-খাত নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রায়শঃ তিন প্রকার ভিত-খাতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যেমন (১) প্রশস্ত খাত, (২) দেওয়াল- পরিসরসম খাত, (৩) দেওয়াল- পরিসরসম খাততল এবং উর্ধ্বতন- প্রসারিত খাত। ভিত-খাততল সুদৃঢ় করিবার জন্য রাবিশ, ইষ্টকখণ্ড ও সুরকি দ্বারা সমতল করা হয়। প্রথম ভিত-খাতের উর্ধ্বতন

মৃত্তিকাস্তর প্রাক্-দেওয়াল-নির্মাণযুগের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, উক্ত মৃত্তিকাস্তর কর্তন করিয়াই ভিত-খাত খনন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভিত-খাতের প্রকার ভিন্ন। ভিততল সাধারণতঃ অসমতল। অতএব প্রস্তর-খণ্ড বা সুরকি দেওয়ালের প্রান্তে সংস্থাপন করা প্রয়োজন। এই প্রকার ভিত-খাত সনাক্ত করা আয়াসসাধ্য। তৃতীয় ভিত-খাত অতীব সাধারণ। এই ভিত-খাতে দেওয়াল নির্মাণ করা সহজসাধ্য (চিত্র নং ৫)।

গৃহতল বা মেঝ নির্ধারণের পদ্ধতিও অতীব সন্তর্পণের সহিত অনুসরণ করা কর্তব্য। অতীতে বিভিন্ন প্রকার মেঝ-নির্মাণ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল: (১) শক্ত মৃত্তিকা-দুরমুজ-কৃত মেঝ; (২) ইষ্টকখণ্ড-সংস্থাপিত মেঝ; (৩) সুরকি দুরমুজ-কৃত মেঝ; (৪) চুনের পলেস্তারাবৃত মেঝ ইত্যাদি। অধিকন্তু মেঝের বা দেওয়ালের পলেস্তারার উপর রং-প্রলেপের নিদর্শনও পাওয়া যায়। অতীব সতর্কতার সঙ্গে খনন করিয়া মৃত্তিকাস্তরের সহিত মেঝের সম্বন্ধ নির্ধারণ করা আবশ্যক।

এই সকল মেঝের ভিতস্তর হইতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু প্রাক্-মেঝ-নির্মাণ-যুগের অথবা সমসাময়িক যুগের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কোন দুইটি দেওয়ালের মিলনস্থানে ইষ্টক-বন্ধন থাকিলে উক্ত দেওয়ালদ্বয় সমসাময়িক বলিয়া নির্ণেয়। কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে মিলনস্থানের বন্ধন নিরূপণ করা সহজসাধ্য নহে। অনেক সময় পূর্বতন দেওয়ালের অংশ ভঙ্গ করিয়া উহার উপরই নূতন দেওয়াল নির্মিত হইত। এই প্রকার অলীক বন্ধনের নিদর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির করা যায়। অধিকন্তু দেওয়ালের মিলনস্থানের ইষ্টক-বন্ধন বর্তমান থাকিলেই সমকালীন দেওয়াল-নির্মাণ প্রমাণিত হয় না। কারণ, মিলনস্থল-বন্ধন ব্যতিরেকেও দুইটি দেওয়াল একই সময়ে নির্মিত হইতে পারে। কোন সময়ে ভিত-খাতেও দুইটি দেওয়ালের ইষ্টক বন্ধনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৌধ সংযোজিত ও পরিবর্তিত করা হইত। অতীতে গৃহতল বা মেঝ-সংযোজন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সংযোজিত মেঝের নিম্নে প্রাক্-মেঝযুগের বা দেওয়াল-নির্মাণ-যুগের প্রত্নবস্তুর অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভগ্ন মেঝের উপর অপর একটি মেঝ নির্মিত হইলে উহার সনাক্তকরণ কষ্টসাধ্য। এই ক্ষেত্রে মৃত্তিকাস্তর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। উপরন্তু মেঝ কর্তন করিয়াও দেওয়াল সংযোজিত করা হইত। এই প্রকার নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয় যে, দেওয়াল পরবর্তী যুগেই নির্মিত হইয়াছে। দেওয়ালের ইষ্টকের আকার ও গঠন-প্রণালী, মিলনস্থল-বন্ধন অথবা অলীক বন্ধন প্রভৃতি নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া মেঝের পরবর্তী দেওয়াল-নির্মাণ স্থির করা যায়। পুনর্নির্মিত দেওয়াল নির্ধারণ করিতে হইলে উক্ত দেওয়ালের নির্মাণ-পদ্ধতি, বন্ধন-রীতি, ইষ্টকের আকার ও প্রকার ইত্যাদি নিরীক্ষণ করা কর্তব্য। স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করিয়াও দেওয়াল নির্মাণের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। দেওয়াল নির্মাণের পদ্ধতি বিশ্লেষণের গুরুত্ব স্তরবিন্যাসতত্ত্ব হইতে ন্যূন নহে। এমন কি স্তরবিন্যাসের সামঞ্জস্যের অবর্তমানে দেওয়ালের নির্মাণ-পদ্ধতির বিশ্লেষণই একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য।

অনেক সময় প্রাথমিক সৌধ ধ্বংস করিয়া মেঝ তৈয়ার করা হইত। এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র লুণ্ঠন-গর্তের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়। কিন্তু উল্লম্বচ্ছেদে বা লম্বচ্ছেদে দেওয়ালের নিদর্শন সরল রেখার চিহ্নে বর্তমান থাকিবে। এই বিধ্বস্ত দেওয়ালের চিহ্ন অনাবৃত করিবার সময় স্তরায়ণের অনৈক্য সম্পর্কিত কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি উত্তর-দক্ষিণ দিকে প্রলম্বিত কোন দেওয়ালের সমসাময়িক মেঝ দুইটি ভিন্ন স্তরে অবস্থিত থাকে তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, পূর্ব-পশ্চিম দিকে অপর একটি প্রলম্বিত দেওয়াল বিদ্যমান ছিল। সুতরাং উক্ত দেওয়ালের নিদর্শন অনুসন্ধেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে সৌধ-নির্মাণ-পদ্ধতি, ইষ্টক, গাথুনির

উপাদান প্রভৃতির পার্থক্যও বর্তমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৌধের ছাউনি দারু বা অপর ক্ষণভঙ্গুর উপাদান দ্বারা নির্মিত হইত। অতএব ছাউনির নিদর্শনের আবিষ্কার সম্ভবপর নহে। কিন্তু সকলক্ষেত্রেই স্তম্ভগর্তের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্তম্ভগর্ত নির্ধারণ করা আয়াসসাধ্য। অতীব সন্তর্পণের সহিত ছুরিকা দ্বারা মৃৎস্তর মসৃণ করিয়া গর্তের তল ও পার্শ্বদ্বয় নির্ণয় করিতে হয় (চিত্র নং ৫)। স্তম্ভগর্তের আকার ও প্রকার অনুশীলন করিয়া ছাউনির প্রকৃত রূপের অনুমান করাও সম্ভবপর। বহু ক্ষেত্রে পূর্বতন সৌধমালা ধ্বংস করিয়া নূতন ইমারত নির্মাণ করা হইয়াছে। এই নূতন ইমারত পূর্বতন মেঝ কর্তন করিয়াই নির্মিত হইত। স্তরবিন্যাসের সাহায্যে উক্ত দেওয়ালের নির্মাণকার্য নির্ধারণ করা যায়। অনেক সময় নিম্নস্থ সৌধের ইষ্টক অপসারণ করিয়া পরবর্তী ইমারত নির্মিত হইত। এমন কি পূর্বতন সৌধের অলঙ্কৃত ইষ্টক পরবর্তী যুগের দেওয়ালের ভিত-খাতে সংস্থাপনের প্রমাণও দুর্লভ নহে। প্রায় সকল প্রত্নস্থলেই বিভিন্ন পর্যায়ের সৌধশ্রেণীর নিদর্শন পাওয়া যায়। অনুক্রমিক পর্যায়ভুক্ত দেওয়ালের নিদর্শনও পৃথগ্‌বিধ।

প্রথমতঃ, একটি পর্যায়ের সৌধ ধ্বংস হইবার পর মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হয়। উক্ত গচ্ছিত মৃত্তিকার উপরই পরবর্তী দেওয়াল নির্মাণ করা হইত। গচ্ছিত মৃত্তিকার পরিসরের মান নির্ণয় করিয়া নিম্নস্তরের দেওয়াল হইতে পরবর্তী দেওয়ালের মধ্যবর্তী কাল নিরূপণ করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, একটি পূর্বতন দেওয়ালের উপরই পরবর্তী দেওয়াল নির্মাণের নিদর্শনও পাওয়া যায়। এই প্রকার একাধিক সৌধ-পর্যায়ের অস্তিত্ব অনেক প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সর্বক্ষেত্রেই স্তরায়ণ ও সৌধের গঠন-প্রণালী বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন দেওয়াল-পর্যায়ের বিদ্যমানতা নির্ধারণ করিতে হয়।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উৎখননের নিয়মানুসারে একটি পর্যায়ের সৌধমালা অনাবৃত করিয়া অধঃ-উৎখনন করা কর্তব্য। প্রয়োজন অনুসারে

সর্বপ্রকার নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ দেওয়ালের অংশবিশেষ রক্ষা করাও বিধেয়। উক্ত প্রকারে খনন করিয়া প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত উৎখনন পরিচালনা করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিটি অনাবৃত দেওয়াল, মেঝ প্রভৃতি ক্রমিক সংখ্যায় নির্দেশ প্রদান করা কর্তব্য। এমন কি লুণ্ঠন-গর্ত, মৃৎপাত্র-খানা প্রভৃতিও ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত করিতে হইবে। সাগরপৃষ্ঠ হইতে প্রত্যেক দেওয়াল ও মেঝের উপরাংশের ও নিম্নাংশের পরিমাপ লিপিবদ্ধ করাও অত্যাবশ্যক। সৌধমালার অনুক্রমিক পর্যায়ের এবং প্রত্নুনিদর্শনের যথার্থ পরিচয়ের রূপায়ণ উক্ত তথ্যসমূহের উপরই নির্ভরশীল।

(খ) প্রাগৈতিহাসিক আবাসস্থল: প্রাগৈতিহাসিক আবাসস্থলের উৎখনন ঐতিহাসিক আবাসস্থল-উৎখননের অনুরূপ নহে। প্রাগৈতিহাসিক আবাসস্থলের উৎখনন আয়াসসাধ্য। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থলে অকুস্থানের প্রত্ননিদর্শন অপ্রচুর। মৃত্তিকা তুরমুজ করিয়া গৃহতল বা মেঝ নির্মিত হইত। গৃহ বা কুটীর সাধারণতঃ ক্ষণভঙ্গুর উপকরণ সংযোগে তৈয়ার করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। একটি খাদে সীমাবদ্ধ উৎখনন চালনা করিয়া উক্ত নিদর্শনের আবিষ্কার সম্ভবপর নহে। উহার জন্য বিস্তৃত অনুভূমিক উৎখননের প্রয়োজন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গৃহ সাধারণতঃ অসমতল বা উচ্চাবচ। যে কোন একটি নির্দিষ্ট খাদে উহার নিদর্শন আবিষ্কার করা অসম্ভব। এমন কি একটি খাদে গৃহের অস্তিত্ব অনাবৃত হইলেও সংলগ্ন অন্য খাদে উহার বিস্তার সম্পর্কিত নিদর্শনের অবিদ্যমানতা অসম্ভব নহে। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থলে উৎখনন করিয়া সমগ্র ক্ষেত্র অনাবৃত করাই বিধেয়।

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থলে উৎখনন আরম্ভ করিবার পূর্বে আবাসস্থলের আকার ও প্রকার এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রকার নিদর্শনের সহিত সম্যক পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সাধারণতঃ প্রাগৈতিহাসিক আবাসস্থলে কুটীর, শস্যভাণ্ডার-খানা, জলাধার, প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর

সরঞ্জাম ইত্যাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। শস্যভাণ্ডার-খানার এবং জলাধারের রূপ ও আকার বিভিন্ন। কখনও গর্ত বা খানা চর্ম দ্বারা বেষ্টিত থাকে। তদুপরি খানায় অনেক স্তম্ভগর্তের প্রমাণও পাওয়া যায়। স্তম্ভগর্তের আকার ও প্রকার হইতে শস্যভাণ্ডার-খানার উপরের ছাউনির প্রকৃত রূপের অনুমান করা সম্ভবপর। এতদ্ব্যতীত শস্য ভর্জিত করিবার জন্য চুল্লীর নিদর্শনও পাওয়া যায়। শস্য পেষণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তর-পেষণীর আবিষ্কারও অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বাস্তুর আকার সমকোণে বা বৃত্তাকারে প্রকটিত। গৃহের কেন্দ্রস্থলে লম্বিত স্তম্ভ থাকিত এবং ছাউনি ঢালু হইয়া দেওয়ালের সহিত সংযুক্ত হইত। খড় ও গুল্মাদি দ্বারা ছাউনি নির্মাণের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই প্রকার গৃহ ক্ষণস্থায়ী। গৃহ বা কুটীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে উক্ত স্থানেই পুনরায় বাস্তু নির্মিত হইত। কিন্তু শস্যভাণ্ডার-খানার পুনঃকর্তনের প্রয়োজন ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জঞ্জাল-গর্ত সাধারণতঃ অকর্তিত থাকিত। অনেক সময় চুল্লীও জঞ্জালখানায় পরিণত হইত। এতদ্ব্যতীত গৃহের সংলগ্ন খামার বা গোলাবাড়ি ও প্রাঙ্গণ সম্পর্কিত নিদর্শনের আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ মুক্তাঙ্গন মৃত্তিকানির্মিত বৃতির দ্বারা বেষ্টিত থাকিত।

প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থলের উৎখনন একটি নির্দিষ্ট অংশে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত এবং উহার সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদন করাও বিধেয়। পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, স্ট্রীপ-পদ্ধতি অনুসারে এই উৎখনন পরিচালনা করা কর্তব্য। কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসারে উৎখনন করিলে লম্বচ্ছেদ বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নহে। এমন কি গৃহের সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদন করাও অসম্ভব। সুতরাং উক্ত ক্ষেত্রে জালাকার (গ্রীড) খাদবিন্যাস করিয়া অনুভূমিক উৎখননের পরিচালন বিধিসম্মত। কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষণমূলক খাদ খনন করিয়া আবাসস্থলের স্থিতি অনুধাবন করা যায়। কিন্তু উক্ত পরীক্ষণ-খাদ

এমনভাবে বিন্যস্ত করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনমত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে জালাকার খাদসমষ্টিতে পরিণত করা সম্ভব হয়। খননকার্য প্রতি খাদে সীমাবদ্ধ থাকিবে। প্রত্নস্থল-পৃষ্ঠের মৃত্তিকা অপসারণ করিয়া অধঃ-উৎখনন করিতে হইবে। কোন গৃহতলের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলে উহা সম্পূর্ণ অনাবৃত করিয়া সংলগ্ন খাদে মেঝের প্রান্ত পর্যন্ত অনাচ্ছাদন করা কর্তব্য। খাদদ্বয়ের মধ্যবর্তী আল বা বক্ সংরক্ষণও বিধেয়। প্রয়োজনমত উক্ত আল অপসারণ করাও যায়।

আবিষ্কৃত গৃহপ্রান্ত এবং মেঝপ্রান্ত স্থির করা আবশ্যক। দেওয়ালের চিহ্নের সনাক্তকরণ নিদর্শনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তৃণস্তর অতি সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু উহার নিদর্শন ধূসর বা কৃষ্ণবর্ণের চিহ্নে বর্তমান থাকে। ছুরিকা দ্বারা উত্তমরূপে চাঁচিয়া পরিচ্ছন্ন করিলে দেওয়ালের মৃত্তিকা-তালের চিহ্নও নির্ণয় করা যায়। খানা-উৎখননও অতি সন্তর্পণের সহিত চালনা করিতে হয়। খানার আকারের উপরই উৎখনন- পরিচালনা করিবার পদ্ধতি নির্ভরশীল। খানার মৃত্তিকাস্তরও সযত্নে চিহ্নিত করিতে হইবে। উক্ত স্তরায়ণ হইতেই খানার বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের নিদর্শন নির্ধারণ করা সম্ভব। প্রথমে খানার অর্ধাংশে খননকার্য সীমাবদ্ধ থাকিবে। পরে অপরাংশে উৎখনন করিয়া মৃত্তিকাস্তর নির্ণয় করিতে হয়। ক্ষুদ্র খানার উৎখনন ক্রমান্বয়ে পরিচালনা করা কর্তব্য। ভূপৃষ্ঠ হইতে কর্তন আরম্ভ করিয়া খানার প্রারম্ভিক মৃত্তিকাস্তর নির্ণয়পূর্বক অধঃ-উৎখনন পরিচালনা করাই বিধিসম্মত (চিত্র নং ৯খ)।

বাস্তুখানা, স্তম্ভগর্ত প্রভৃতির উপরাংশ ও নিম্নাংশ সনাক্ত করিয়া ছেদস্তর-নকশা- অঙ্কন, আলোকচিত্র-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য সমাপন করিতে হইবে। তৎপরে উর্ধ্বাধ উৎখনন করা বিধেয়। নিম্নে অপর সৌধের অবস্থান বোধগম্য হইলে উপরিস্থ নিদর্শন অপসারণ করিয়া অধঃ-উৎখনন করা কর্তব্য। একটি বাস্তুর উপর অপর বাস্তু নির্মিত হইলে স্তরবিন্যাস ও দেওয়ালের গঠন-প্রণালী বিশ্লেষণ

করিয়া উক্ত তথ্য নির্ণয় করা যায়। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর অনুশীলনের সাহয্যেও গৃহের এবং আবাসস্থলের সংস্কৃতির পৌর্বাপর্য নির্ধারণ করাও সম্ভব। একই সংস্কৃতি-পর্বভুক্ত ক্ষেত্রাংশে অনুরূপ প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার স্বাভাবিক।

(গ) ঢিবি-উৎখনন: আরবীয় ভাষায় মৃত্তিকাচ্ছাদিত প্রাচীন আবাসস্থল বা ঢিবিকে 'তেল' বলা হয়। সাধারণতঃ এই তেল-ঢিবি অধিকতর উচ্চ। ঢিবি-উৎখনন অভিজ্ঞ উৎখনক দ্বারা পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পশ্চিম এশিয়াখণ্ডে একটি প্রত্নস্থলেই নবাশ্মীয় পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের গ্রাম বা নগরের অবস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি পর্বের আবাসস্থল ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ধ্বংসাবশেষ সমতল করিয়া উহার উপরই নূতন আবাস নির্মিত হইত। এই কার্যক্রমের ফলে প্রাচীনতম আবাসস্থল বর্তমান সমতলভূমিসম এবং সাম্প্রতিক বাসস্থান ৬০-১০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত থাকিবে। এই প্রকার আবাসস্থলের গৃহ সাধারণতঃ মৃত্তিকা-তাল সংযোগে নির্মিত হইত। পরবর্তী সময়ে প্রস্তরখণ্ড বা ইষ্টক দ্বারা গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

মৃৎতালনির্মিত গৃহের অনুসন্ধান অতীব সতর্কতার সহিত পরিচালনা করিতে হয় (চিত্র নং ৬ক)। প্রথমতঃ, অদগ্ধ বা কাঁচা ইষ্টক বা মৃত্তিকা-তাল একাধিকবার ব্যবহার্য নহে। উক্ত উপকরণ দ্বারা নির্মিত গৃহ ক্ষণস্থায়ী এবং উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পর ধ্বংসাবশেষ সমতল করিয়া পুনরায় গৃহ নির্মিত হইত। সুতরাং গৃহ নির্মাণের জন্য নিম্নস্তর কর্তন করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, অদগ্ধ ইষ্টকনির্মিত গৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সর্বপ্রকার বাস্তব নিদর্শন ধ্বংসাবশেষ দ্বারা আবৃত থাকে। উক্ত আবৃত মৃত্তিকার পরিসরও অধিক হয়। এই আচ্ছাদিত মৃত্তিকাস্তরের উপরই পরবর্তী গৃহ নির্মিত হইত। সুতরাং বিভিন্ন পর্যায়ের বা পর্বের বিচ্ছেদ নির্ণয় আয়াসসাধ্য। এমন কি একই 'লেভ্‌লে' বা সমতল ভূমিতে

একটি পর্যায়েরই সৌধমালার স্থিতি স্বীকার্য নহে। প্রত্নস্থলের একাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে উক্ত ক্ষেত্রেই গৃহাদি পুনর্নির্মিত হইত, কিন্তু অপরাংশের সৌধ অপরিবর্তিত থাকিত। উপরন্তু কোন মন্দির অবিকৃত থাকিলেও উহার পার্শ্বস্থ অংশ পরিবর্তিত হইতে পারে। সমৃদ্ধিবিহীন সংস্কৃতি-পর্বের বসতি ক্রমশঃ নগরকেন্দ্রিক হইয়া উঠে এবং অপরাংশ ধ্বংসাবশেষ দ্বারা আবৃত থাকে। ফলে প্রত্নস্থলের কেন্দ্রাংশের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। এই সকল ক্ষেত্রে সাগরপৃষ্ঠ হইতে পরিমাপ গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতির পর্ব নির্ণয় করা সম্ভব নহে। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে উৎখনন করিয়া স্তরবিন্যাসের সাহায্যেই সৌধ-পর্যায় ও সংস্কৃতির পর্ব নির্ধারণ করা সম্ভবপর।

মৃৎতাল-নির্মিত গৃহের নিদর্শন নির্ণয়ের প্রসঙ্গও আলোচনীয়। মৃৎ-তাল-স্থিরীকরণ আয়াসসাধ্য (চিত্র নং ৬ক)। কারণ, মৃৎতালের ও গচ্ছিত মৃত্তিকার বর্ণ অভিন্ন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত কক্ষের ক্ষেত্রও মৃৎতালের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা আবৃত থাকে। এই ধ্বংসাবশেষের অনাচ্ছাদনকার্য অতীব কষ্টসাধ্য। মৃত্তিকা-তালনির্মিত দেওয়াল অনু-সরণের এবং নির্ণয়ের পদ্ধতি উৎখনকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সামঞ্জস্যতা, সংস্থাপক চিহ্ন, দৃঢ়তা, অনুভূতি, গাঁইতি বা অন্য হাতিয়ার দ্বারা আঘাতকৃত ধ্বনির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া মৃত্তিকাতালের স্থিতি সনাক্ত করা সম্ভবপর। এই কার্যের জন্য উৎখনকের প্রশিক্ষণ ও প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা থাকা অত্যাবশ্যক।

প্রস্তরনির্মিত দেওয়াল-সনাক্তকরণের অনেক প্রতিবন্ধক বর্তমান (চিত্র নং ৬খ)। সাধারণতঃ পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলেই প্রস্তরনির্মিত গৃহসম্বলিত প্রত্নস্থলের নিদর্শন পাওয়া যায়। পর্বতশীর্ষেই উক্ত প্রস্তর-সৌধের অবস্থিতি উল্লেখনীয়। প্রথমতঃ, গৃহের ভিতভলের বন্ধুরতার জন্য বিভিন্নাংশের পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে অদগ্ধ ইষ্টক-নির্মিত গৃহের ন্যায় কোন গর্ত বা খানার সন্ধানও পাওয়া যায় না। অধিকন্তু

পূর্বতন প্রস্তরখণ্ড পুনরায় ব্যবহৃত হয়। অতএব বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল- নির্মাণকালের ব্যবধানের স্বরূপ এবং উহাদের পর্যায়ান্তরের নিদর্শনও সুস্পষ্ট নহে। তৃতীয়তঃ, পরবর্তী সৌধ নির্মাণ করিবার জন্য নিম্নস্থ পূর্বতন' দেওয়ালের প্রস্তরখণ্ড লুণ্ঠন করা হইত। উক্ত প্রকার লুণ্ঠন-গর্ত অনুধাবন করাও আয়াসসাধ্য। চতুর্থতঃ, প্রস্তর-নির্মিত সৌধের ভিত-খাত অদগ্ধ ইষ্টকনির্মিত গৃহের ভিত-খাত হইতে গভীরতর হয়। সাধারণতঃ দেওয়ালের ভিতস্তর শিলার উপর বা পূর্বতন দেওয়ালের উপর ন্যস্ত থাকে। অতএব বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত সৌধ নির্মাণের সময়েই পূর্বতন দেওয়াল কর্তিত হইত। এই কার্যের ফলে বিভিন্ন যুগভুক্ত দেওয়ালের ভিত সমতলবর্তী হওয়া স্বাভাবিক।

প্রস্তরনির্মিত গৃহের ধ্বংসাবশেষের উৎখননের উল্লিখিত প্রতিবন্ধক ইষ্টকনির্মিত ইমারতের অনাচ্ছাদনকার্যের অনুরূপ। কিন্তু দগ্ধ ইষ্টক-নির্মিত গৃহেরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। দগ্ধ ইষ্টকনির্মিত সৌধ-সম্বলিত প্রত্নস্থলেও পূর্বতন দেওয়ালের উপর পরবর্তী দেওয়াল-নির্মাণ প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায়। এমন কি নিম্নস্থ দেওয়ালের ইষ্টক লুণ্ঠন করিয়া পরবর্তী ইমারত নির্মাণের প্রমাণও বিরল নহে। ইষ্টকের আকার ও প্রকার হইতেও উক্ত লুণ্ঠনকার্য প্রমাণিত হয়। রাজবাড়ি-ডাঙায় উৎখননকালীন পূর্বতন সৌধের অলঙ্কৃত ইষ্টক পরবর্তী পর্যায়ভুক্ত ইমারতের ভিতে সন্নিবেশের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে দুইটি পর্যায়ের দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে মৃত্তিকা গচ্ছিত থাকে (চিত্র নং ৭, ১০ক)। এই নিদর্শন হইতে অনুমান করা যায় যে, পূর্বতন দেওয়াল ধ্বংস হইবার পরে উহা মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। অধিকন্তু একটি পূর্বতন দেয়ালের উপরই পরবর্তী দেওয়াল নির্মাণ করিবার রীতির প্রমাণও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উক্ত সৌধসম্বলিত প্রত্নস্থলের উৎখননকার্য অতীব সন্তর্পণের সহিত চালনা করা কর্তব্য। সাধারণতঃ একটি পর্যায়ভুক্ত সৌধসম্বলিত প্রত্ন-স্থলের বৃহদংশ অনাবৃত করা উচিত। নিম্ন স্তরে বিন্যস্ত সৌধের সম্পূর্ণ-

রূপে অনাচ্ছাদন করা সম্ভব নহে। উচ্চ প্রত্নস্থলের নিম্নাংশে সংস্কৃতির পর্ব নির্ধারণের নিমিত্ত বহুক্ষেত্রে 'সন্‌ডেজ' পদ্ধতি অনুসারে উৎখনন-করা বাঞ্ছনীয়। এই পদ্ধতিতে প্রত্নস্থলের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত খননকার্য পরিচালনা করিতে হয়। সংস্কৃতির অনুক্রমিক পর্ব এবং বসতির স্থিতিকাল নির্ণয় করিবার জন্য উক্ত প্রকার উৎখনন আবশ্যক। কিন্তু এই উৎখনন-পদ্ধতি আবাসস্থলের আকার ও রূপের সর্বাঙ্গীণ চিত্র পরিবেশন করিতে অপারগ। সাধারণতঃ জালাকার খাদবিন্যাস করিয়া উৎখনন পরিচালনা করা কর্তব্য। প্রতিটি খাদের মধ্যেই খননকার্য সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং স্তরবিন্যাসের সাহায্যে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত দেওয়ালের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইবে।

একটি পর্যায়ের দেওয়াল অনাবৃত করিয়া সকল প্রকার তথ্য-লিপিকরণ সম্পাদন পূর্বক অধঃ-উৎখনন করা বিধেয়। গুরুত্বপূর্ণ সৌধ অপসারণ করা অনুচিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে খনন করিয়া লুণ্ঠন-গর্ত, আবাসিক ক্ষেত্র, গৃহতলানুক্রমিক ভিত-খাত, দেওয়াল প্রভৃতি অনাবৃত করিতে হইবে। কিন্তু একটি সৌধের উপর অপর সৌধ নির্মিত হইলে উৎখননকার্যে ব্যাঘাত জন্মায় (চিত্র নং ৭খ)। সাধারণতঃ এক পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল অপর সংস্কৃতি-পর্বভুক্ত মৃত্তিকাস্তর কর্তন করিয়া নির্মিত হয়। এমন কি লুণ্ঠন-গর্ত, খানা প্রভৃতিও উক্ত প্রকারে কর্তিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রে এক পর্যায়ের অন্তর্গত সৌধ-নিদর্শনের অনাচ্ছাদন সমাপ্ত করিয়া অপর পর্যায়ভুক্ত ইমারত অনাবৃত করিতে হইবে। দেওয়ালের ভিত-খাত ৫-৮ ফুট গভীর হইলে একটি ক্ষুদ্রখাদে সীমিত খননকার্য চালনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথমেই দেওয়ালের ভিত-খাত বা লুণ্ঠন-গর্ত সনাক্ত করিতে হইবে। খাদের পূর্বতন মৃত্তিকাস্তরসম্বলিত ছেদের সংরক্ষণও কর্তব্য। তাহা হইলেই পূর্বতন সংস্কৃতির চিত্র অনুধাবন করা সম্ভবপর হইবে। উপর্যুপরি সংস্থিত মৃত্তিকার বিভাগ অনুসারে প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত খননকার্য পরিচালন করা বিধেয়।

প্রসঙ্গতঃ চড়াই-মৃৎস্তূপের উৎখনন-পদ্ধতি আলোচনীয়। উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের ও খানার উৎখনন সহজসাধ্য নহে। ভূপৃষ্ঠ চাঁচিয়া মৃত্তিকাস্তূপের প্রকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। কোন ক্ষেত্রে ঢিবি কর্তন করিয়া সমতল করা হয় এবং অপর স্থান হইতে অপসারিত মৃত্তিকা দ্বারা খানা আচ্ছাদনের প্রমাণও বিরল নহে। অনেক উচ্চ-ঢিবি দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এই প্রকার ঢিবির অন্তরাংশে সৌধশ্রেণীর অবস্থান অনুমেয়। উক্ত ঢিবি-প্রত্নস্থলের মৃৎস্তর সমতল আবাসিক প্রত্নস্থলের স্তর হইতে ভিন্ন। উচ্চতর শিখরের মৃত্তিকাস্তর-সমূহ ক্রমান্বয়ে সম্মুখভাগ হইতে পশ্চাদ্‌ভাগ অভিমুখে ধাবিত হয়। উক্ত ঢিবি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক মৃত্তিকায় অথবা অধিবাসিত ক্ষেত্রের উপরেই গড়িয়া ওঠে। কোন কর্তিত খাদ হইতে আনীত মৃত্তিকা বাস্তুর উপর স্তূপীকৃত হইলে প্রথম প্রান্তভাগের মৃত্তিকার উপকরণ ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকার অনুরূপ হইবে এবং ঢিবির মৃৎস্তরের সম্মুখভাগ হইতে পশ্চাদ্‌ভাগ পর্যন্ত ক্রমনিম্ন হইয়া ধাবিত হওয়া স্বাভাবিক।

এই প্রকার প্রত্নস্থলে উৎখনন এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে স্তরায়ণের বিস্তৃত তথ্য-নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। গৃহের ভিত-খাত খননকালীন প্রাক্-খাত পর্যায়ভুক্ত খাতের স্তর- নির্ণয় কার্য অতীব সন্তর্পণের সহিত করিতে হইবে। সাধারণতঃ খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রত্নবস্তু খাতকর্তন- সমকালীন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটি খাতে বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক নিদর্শনের আবিষ্কারও বিরল নহে।

(ঘ) সমাধি-প্রত্নস্থল- উৎখনন : সমাধিভূমির বা গোরস্থানের আকার ও রূপ সদৃশ নহে। বিভিন্ন প্রকার সমাধি-প্রত্নস্থল বিদ্যমান, যথা : (১) দীর্ঘ অথবা বৃত্তাকার সমাধিক্ষেত্র এবং মহাশ্মীয় সমাধিক্ষেত্র, (২) মোচাকার অসমতল-মৃৎস্তূপ, (৩) সমাধিস্তম্ভ, (৪) একক সমাধি বা পূর্ণকবর ও শবদাহ, এবং (৫) শবাংশগচ্ছিত মৃৎপাত্র-সম্বলিত সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি।

বৃত্তাকার বা মৌচাকার সমাধির উৎখনন আয়াসসাধ্য। সর্বপ্রথমে উক্ত সমাধিস্থলের পূর্ণাঙ্গ সমোন্নতি-রেখা অঙ্কিত নক্‌শা তৈয়ার করিতে হইবে। এই নক্‌শা অধ্যয়ন করিয়াই উৎখননের পদ্ধতি নির্ণয় করা কর্তব্য। সমাধিক্ষেত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা সরু ফালির ন্যায় কর্তন করিতে হইবে (চিত্র নং ৮ক)। কিন্তু এই প্রকার খননকার্যের অনেক প্রতিবন্ধক বিদ্যমান। কেহ কেহ মনে করেন যে, বিভিন্ন দিকে সন্ধান-পথ রাখিয়া বিবিধ খণ্ডে বা পাদে উৎখনন পরিচালন করা বিধেয়। প্রতিখণ্ডে প্রত্ন-বস্তুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ- পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে। দীর্ঘ সমাধির সম্পূর্ণরূপে উৎখনন প্রয়োজন। সাধারণতঃ তুই প্রকার শবকক্ষ পরিলক্ষিত হয়, যেমন প্রাকৃতিক গুহা এবং মৃত্তিকা-কর্তিত কক্ষ। কোন কোন কক্ষে একাধিক শব সমাধিস্থ করা হইত। এই প্রকার সমাধিক্ষেত্রে উৎখনন বৃত্তখণ্ডাকারে পরিচালনা করিতে হয়। সর্বপ্রকার প্রত্নবস্তু এবং অনাবৃত নরকঙ্কালের বিস্তৃত তথ্য প্ল্যানেও (নক্‌শা) অঙ্কিত করা কর্তব্য।

একক শবকবর- উৎখননে শবাধার সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত করিতে হইবে (চিত্র নং ৯ক)। নরকঙ্কাল-সমাধি-স্তর পর্যন্ত উৎখনন পরি-চালনা করা প্রয়োজন। নরকঙ্কালের উপর আচ্ছাদিত মৃত্তিকা অতি সন্তর্পণের সহিত অপসারণ করিয়া কঙ্কালকে আবরণমুক্ত করিতে হইবে। ছুরিকা এবং ক্রুশ ও তুলি দ্বারা কঙ্কাল পরিচ্ছন্ন করিয়া স্তরায়ণের সহিত উহার সম্পর্ক স্থিরীকৃত করা কর্তব্য। 'প্ল্যানে' (নক্‌শা) যথাস্থিত কঙ্কালের চিত্রাঙ্কন অত্যাবশ্যক। প্ল্যান অঙ্কন সমাপন করিয়া আলোকচিত্র তুলিতে হইবে। সর্বশেষে সকলপ্রকার নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া অতীব সন্তর্পণের সহিত কঙ্কাল অপসারণ করা উচিত। এতদ্‌ব্যতীত শবাংশগচ্ছিত মৃৎপাত্র বা ভস্মপাত্রসম্বলিত সমাধি-স্থলে উৎখনন করিয়া উক্ত পাত্রসমূহ অনাবৃত করিতে হয়। তৎপরে প্ল্যানে অঙ্কনকার্য সমাপ্ত করিয়া আলোকচিত্র গ্রহণ করা বিধেয়।

প্রত্নস্থলের উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে অপর কতিপয় সাধারণ বৈলক্ষণ্য উল্লেখযোগ্য : (ক) গর্ত বা খানা (খ) জলকূপ (গ) কাষ্ঠ-নির্মিত গৃহের ধ্বংসাবশেষ (ঘ) স্তম্ভগর্ত (ঙ) ইষ্টক ও প্রস্তরনির্মিত ভিত (চ) লুণ্ঠনগর্ত (ছ) গৃহতল বা মেঝ এবং (জ) সৌধ-ধ্বংসাবশেষ। এই সকল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতিপয় বৈলক্ষণ্য পূর্বেই আংশিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু উহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও প্রয়োজন।

(ক) গর্ত ও খানা : সকল প্রত্নস্থলেই গর্ত বা খানার অস্তিত্ব বর্তমান (চিত্র নং ৯খ)। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া জনসাধারণ অনাবাসিক স্থানেই গর্ত করিয়া আবর্জনা বা জঞ্জাল সন্নিবেশ করে। ইহার ফলে উক্ত গর্ত একটি আবর্জনা-স্তূপে পরিণত হয়। আবর্জনা-স্তূপেই ভস্ম, অঙ্গার, গৃহস্থালী দ্রব্যের ভগ্নাংশ প্রভৃতি গচ্ছিত থাকে। অধিকাংশ গর্তস্তূপে মৃৎভাণ্ডারাংশের আধিক্য বিদ্যমান। বহু ক্ষেত্রে অগণিত মৃৎভাণ্ডারাংশ-গচ্ছিত খানার সন্ধানও পাওয়া যায়। সাধারণত এই সকল আবর্জনাস্তূপ ও খানা হইতেই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়।

আবর্জনা-খানার খননকার্য অতীব সতর্কতার সহিত চালনা করা প্রয়োজন। খানা নির্ধারণ করিবার পর সর্বপ্রথম উহার একাংশ খনন করিয়া ছেদের স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করা কর্তব্য। একটি খানায় বিভিন্ন পর্বের বা যুগের প্রত্নবস্তু পাওয়া যায়। অতএব খানা-উৎখনন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খানার প্ল্যান (নক্শা) ও উপর্যুপরি স্তর অঙ্কন করিয়া উহাদের আকার, প্রকার এবং কালানুক্রমে গচ্ছিত প্রত্নবস্তু নির্ধারণ করিতে হইবে। খানার আকৃতি এবং মৃত্তিকাস্তরের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনও আবশ্যক। এমন কি একটি খানা অপর খানায় বিস্তৃত হওয়াও স্বাভাবিক। এই সকল গর্ত বা খানা হইতে উদ্ধৃত প্রত্ন-বস্তুর যথার্থ বিশ্লেষণ ও অধ্যয়ন প্রয়োজন।

(খ) জলকূপ : সকল প্রকার আবাসিক প্রত্নস্থলে জলকূপের প্রাধান্য বিদ্যমান। জলকূপ-উৎখননও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই উৎখনন-

হইতে অতীত ও বর্তমানের জলসমের মান নির্ণয় করা সম্ভব। কূপের অধঃতল হইতে কূপ- ব্যবহারকালীন অধঃপতিত প্রত্নবস্তু উদ্ধার করা যায়। এই সকল প্রত্নবস্তুই উক্ত কূপ-ব্যবহারকালীন সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচায়ক। কূপের মৃত্তিকার আবরণ বিভিন্ন যুগে ও পর্যায়ে গচ্ছিত হয়। জলকূপ-উৎখনন হইতে উক্ত যুগসমূহের সংস্কৃতির বাস্তব-উপাদান উদ্ধার করা সম্ভব।

(গ) কাষ্ঠনির্মিত গৃহের ধ্বংসাবশেষ : অতীতে কাষ্ঠনির্মিত গৃহের প্রচলন ছিল। কিন্তু কাষ্ঠ মৃত্তিকাগর্ভে ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং উক্ত গৃহের ধ্বংসোত্তর কালে কেবলমাত্র কাষ্ঠের নিম্নাংশের নিদর্শন বা ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু আংশিক অগ্নিদগ্ধ বা জলগর্ভস্থ কাষ্ঠনির্মিত সামগ্রী সুরক্ষিত থাকে। দারুনির্মিত গৃহক্ষেত্র- উৎখনন অতীব সন্তর্পণের সহিত পরিচালনা করিতে হইবে। সাধারণতঃ উক্ত ক্ষেত্র ধ্বংসাবশেষ ও রাবিশ দ্বারা আবৃত থাকে। অতি সতর্কতার সহিত রাবিশ অপসারণ করিয়া উক্ত স্থান পরিষ্কার করিতে হয়। তৎপরে মন্দ গতিতে খনন করিয়া গৃহের সুরক্ষিতাংশ অনাবৃত করিতে হইবে। সর্বপ্রকার অনাচ্ছাদিত প্রত্ননিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া সৌধ সম্পর্কে মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রয়োজন।

(ঘ) স্তম্ভগর্ত: উৎখননের সময় প্রত্নস্থলে স্তম্ভগর্ত নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য (চিত্র নং ৫ঙ, চ, ছ)। সাধারণতঃ দারুস্তম্ভের অস্তিত্ব বা নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু যে গর্তে উক্ত স্তম্ভ নিবিষ্ট ছিল, উহার যথার্থ নিদর্শনের অনাচ্ছাদন সম্ভব। এই অনাচ্ছাদনকার্য অতীব সতর্কতার সহিত চালনা করিতে হয়। স্তম্ভগর্তের মৃত্তিকা উহার পার্শ্বদ্বয়ের গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তর হইতে ভিন্ন। উপরন্তু উক্ত গর্ত একটি সুনিয়ন্ত্রিত উর্ধ্বাধ গহ্বর হইবে। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্তিকানির্মিত মেঝে পর্যন্ত গর্তের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্তম্ভগর্তের আয়তন ও বিস্তার নির্ণয় করিয়া গৃহের আকার ও প্রকার রূপায়ণ করাও সম্ভবপর।

(ঙ) প্রস্তর এবং ইষ্টকনির্মিত ভিত-খাত: সকল আবাসিক প্রত্ন-স্থলেই উৎখনন দ্বারা গৃহনির্মাণের প্রণালী নির্ণয় করা যায়। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, গৃহের স্তম্ভ যাহাতে অধোগামী না হইতে পারে তাহার জন্য কাষ্ঠনির্মিত স্তম্ভগর্তের তলদেশে প্রস্তর বা ইষ্টকখণ্ড স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রস্তর বা ইষ্টক দ্বারা নির্মিত সৌধের ভিত-খাতেও প্রস্তর বা ইষ্টকের সংস্থাপন উল্লেখযোগ্য (চিত্র নং ৫)। উৎখননের সময় উক্ত ভিত-খাতের বৈশিষ্ট্য, আকার এবং প্রকার-ভেদ নির্ণয় করিয়া সৌধের বৈলক্ষণ্য নির্ধারণ করা সম্ভবপর। সাধারণতঃ গৃহের ভিত-খাতের ইষ্টক বা প্রস্তর সুরক্ষিত থাকে (চিত্র নং ৫)। এই খাতের সহিত পার্শ্বস্থ মৃত্তিকাস্তরের সম্পর্ক এবং যে স্তরের উপর ভিত-খাতের ইষ্টক বা প্রস্তর ন্যস্ত হইয়াছে উহার যথার্থ সম্বন্ধ নির্ণয় করা কর্তব্য।

(চ) লুণ্ঠনগর্ত: মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত প্রাচীন গৃহের অংশে প্রত্নবস্তু লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে কর্তিত গর্ত বা খানা লুণ্ঠনগর্ত নামে পরিচিত। প্রায় সকল আবাসিক প্রত্নস্থলেই লুণ্ঠনগর্তের সন্ধান পাওয়া যায় (চিত্র নং ৫জ)। অধিকন্তু লুণ্ঠক প্রত্নস্থলকে একটি প্রস্তর-বা ইষ্টক- খানাতেও পরিণত করে। এক পর্যায়ের সৌধমালা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে উক্ত স্থল কালক্রমে মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হয়। পরবর্তী কালে অপর এক জনগোষ্ঠী উক্ত ক্ষেত্রেই পুনরায় বসতি স্থাপন করে। বাস্তুনির্মাণের নিমিত্ত ভিত-খাত খনন করিবার সময় নিম্নস্থ ইমারতের ইষ্টকও লুণ্ঠন করা হয়। উক্ত লুণ্ঠিত ইষ্টক দ্বারা পরবর্তী সৌধ-নির্মাণের নিদর্শনও বিরল নহে। পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে, প্রায় সকল প্রত্নস্থলেই পূর্বতন দেওয়ালের ইষ্টক-লুণ্ঠনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি পরবর্তী কালের সৌধের ভিত-খাতেও পূর্বতন সৌধের অঙ্কিত ও সজ্জিত ইষ্টক সংস্থাপনের নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। অতীব সতর্কতার সহিত স্তরায়ণ বিশ্লেষণ করিয়া লুণ্ঠনগর্তের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(ছ) মেঝে বা গৃহতল : গৃহতল বা মেঝে বিবিধ উপকরণ দ্বারা নির্মিত হয়। প্রথমতঃ, মৃত্তিকা দুরমুজ পূর্বক মেঝে তৈয়ার করিবার রীতিই অধিক প্রচলিত। এই প্রকার মেঝের সনাক্তকরণ আয়াসসাধ্য। অতীব সন্তর্পণের সহিত খনন করিয়া মৃত্তিকাস্তরের সঙ্গে মেঝের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রস্তর বা ইষ্টকখণ্ড সংস্থাপন করিয়াও মেঝে নির্মিত হয় (চিত্র নং ১০খ)। এই প্রকার গৃহতল-উৎখনন সহজ-সাধ্য। তৃতীয়তঃ, সংস্থাপিত ইষ্টকের উপর সুরকি দুরমুজ করিয়া মেজ সুদৃঢ় করিবার প্রথাও প্রচলিত আছে (চিত্র নং ১০খ)। চতুর্থতঃ, উক্ত সুরকির উপর চুনের পলস্তারা লেপনের প্রমাণও পাওয়া যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার গৃহতলের অনাচ্ছাদনকার্য কষ্টসাধ্য। ইহার জন্য সতর্কতাপূর্ণ উৎখনন পরিচালনা করা প্রয়োজন। অধিকন্তু মেঝে বা দেওয়ালের পলস্তারার উপর রঙের প্রলেপের নিদর্শনও উল্লেখনীয়।

(জ) দেওয়াল ও সৌধের ধ্বংসাবশেষ : সকল ঐতিহাসিক আবাসিক প্রত্নস্থলেই সৌধের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ইমারতের ধ্বংসাবশেষের অনাচ্ছাদনকার্যও সহজসাধ্য নহে। সাধারণতঃ সৌধের অক্ষতাংশ ভগ্নাবশেষ বা গচ্ছিত আবর্জনা দ্বারা আবৃত থাকে (চিত্র নং ১০)। উৎখননের সময় উক্ত ভগ্নাবশেষ অতীব সন্তর্পণের সহিত অনাবৃত করিয়া সৌধের অবস্থানের প্রকৃত রূপ ও আকার সম্পর্কিত সকল তথ্য নির্ণয় করিতে হইবে। ভগ্নাবশেষ সনাক্ত করিয়া উহা অপসারণ করা কর্তব্য। প্রায়শঃ ভগ্নাবশেষের নিম্নেই দেওয়াল বা সৌধের অক্ষতাংশ রক্ষিত থাকে। অনেক প্রত্নস্থলে বিভিন্ন পর্বের বা পর্যায়ের দেওয়াল ও সৌধের সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত উৎখনন পরিচালনা করা বিধেয়। সর্বশেষ পর্যায়ভুক্ত (উৎখননকালীন সর্বপ্রথম) ইমারত অনাচ্ছাদন-পূর্বক উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া আলোকচিত্র তুলিতে হইবে। এই কার্য সমাপ্ত হইবার পর উক্ত ইমারত অপসারণ করিয়া অধঃ উৎখনন পরিচালন করা কর্তব্য।

এই প্রকার খননকার্যের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত সৌধের সন্ধান পাওয়া যায়।

এতদ্‌ব্যতীত নগর-প্রত্নস্থলের বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ নগর-আবাসস্থল প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকে। মন্দির ও রাজপ্রাসাদ আবাসস্থলের কেন্দ্রাংশে অবস্থিত থাকে এবং উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীরের উপর গচ্ছিত মৃত্তিকা উচ্চ এবং মধ্যাংশের আবাসস্থল নিম্ন হয়। কিন্তু নগরের প্রবেশদ্বারের অংশ ক্রমনিম্ন হইবে। পক্ষান্তরে মন্দিরের ও উচ্চ সৌধের ভগ্নাংশসম্বলিত প্রত্নস্থল মোচাকারে পরিণত হয়। কিন্তু বারো বা মহাশ্মীয় সমাধি-প্রত্নস্থলের আকার ও রূপ ভিন্ন (চিত্র নং ১১ক)। উক্ত বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

প্রত্নস্থলের উপরি-উক্ত সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য এবং খননকার্যক্রম নির্ণয় করিয়া উৎখননের নিমিত্ত কৌশল অবলম্বনের এবং উৎখনন-পদ্ধতি অনুসরণের নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে।

। ২ ।

উৎখনন-কৌশল

উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নাঞ্চল নির্দিষ্ট হইবার পর কোন দিক এবং গতি হইতে এবং কোন কৌশল অবলম্বনে 'উৎখনন-আক্রমণ' পরিচালনা করিতে হইবে তাহা সর্বপ্রথমেই নির্ধারণ করা কর্তব্য। উৎখনন-আক্রমণের পদ্ধতির অনুসরণ প্রত্নস্থলের বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে পঞ্চ প্রকার প্রত্নস্থল উল্লেখনীয়: (ক) সমতল প্রত্নস্থল, (খ) প্রাচীর-বেষ্টিত প্রত্নস্থল, (গ) প্রশস্ত আবাসিক প্রত্নস্থল, (ঘ) মোচাকার প্রত্নস্থল এবং (ঙ) মহাশ্মীয় প্রত্নস্থল। এই সকল প্রত্নস্থলে উৎখননের নিমিত্ত বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করা আবশ্যক।

জনসাধারণের বিশ্বাস যে, উৎখননের সফলতা অপ্রত্যাশিত বা দৈব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উৎখননের সাফল্য উৎখনন-কৌশলের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উৎখনকের উৎখনন-কৌশল সম্পর্কিত বিশদ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অত্যধিক। হুইলার উৎখননকে সামরিক অভিযানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সামরিক অভিযানের ন্যায় উৎখননের সাফল্যও আক্রমণের কৌশল রূপায়ণের এবং অনুসরণের উপর নির্ভর করে। হুইলার বলিয়াছেন যে, বায়ু এবং তরঙ্গ যেরূপ সর্বদাই কৃতী নাবিকের কার্যে সহায়তা করে, তদ্রূপ উৎখননের সাফল্যও কৃতী উৎখনকের সুপরিকল্পিত কৌশল রূপায়ণের ও অবলম্বনের উপর নির্ভরশীল।

উৎখননের কৌশল-পরিকল্পনা রূপায়ণের নিমিত্ত জরিপ ও নক্শা অঙ্কনের প্রয়োজন সর্বাধিক। উৎখননের সহিত বিবিধ সমস্যা বিজড়িত। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিয়া প্রত্নস্থলের যথার্থ ইতিবৃত্ত লিখনই উৎখননের প্রধান উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির দুইটি প্রধান সমস্যা বর্তমান : (ক) সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও অনুক্রম পর্ব নির্ধারণ এবং (খ) সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ ও বিস্তার নির্ণয়। উৎখনন-কৌশলের পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ এই দুইটি সমস্যার সহিত যুক্ত। উৎখনকের অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতার উপরই উৎখনন-কৌশলের পরিকল্পনা বহুলাংশে নির্ভর করে। আবাসিক প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবার জন্য প্রত্নস্থলের উচ্চাংশে একপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া উৎখনন পরিচালনা করিতে হয়। প্রাচীর-বেষ্টিত আবাসিক প্রত্নস্থলের নির্দিষ্টাংশে প্রাচীর-আবরণের উপর আড়াআড়িভাবে উৎখননের নিমিত্ত অন্য কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। পরে দুইটি উৎখনিত অংশকে সংযুক্ত করিলে উপরি-উক্ত দুইটি সমস্যারই সমাধানের পথ সুগম হইবে। কিন্তু প্রত্নস্থলে কোন উচ্চ মন্দির বা সৌধমালার ধ্বংসাবশেষের বর্তমানে অন্য কৌশল অবলম্বন করা বিধেয়। মহাশ্মীয় প্রত্নস্থলের উৎখনন-কৌশলও ভিন্ন।

প্রকৃতপক্ষে সুপরিকল্পিত এবং সুস্পষ্ট কৌশলবিহীন খননকার্যকে প্রত্নবস্তু শিকারের কার্যক্রম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত উৎখনন বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্বলিত নহে এবং প্রত্নস্থলের ইতিহাস-রূপায়ণও ভ্রমাত্মক হইবে। সুতরাং সুপরিকল্পিত উৎখনন-কৌশল অনুধাবন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে খননকার্য পরিচালনা করা আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে উৎখননের অপর একটি কৌশল ও নীতির উল্লেখ প্রয়োজন। আবাসিক প্রত্নস্থলের সামগ্র্য বা আংশিক উৎখনন সম্পর্কিত পরিকল্পনা সর্বপ্রথমেই রূপায়ণ করিতে হইবে। সমগ্র প্রত্নস্থলে উৎখনন-কার্যের কতিপয় প্রতিবন্ধক বর্তমান। প্রথমতঃ, এই প্রকার উৎখনন সময়সাপেক্ষ এবং খননকার্য পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজনও অত্যধিক। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি বৎসরেই নূতন প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার স্বাভাবিক। এই আবিষ্কারের ফলে পূর্বতন উৎখননের মূল সিদ্ধান্তের পরিবর্তনও অস্বাভাবিক নহে। তৃতীয়তঃ, প্রত্নস্থলের বিভিন্ন পর্যায়ের সৌধমালার সামগ্র্য অনাচ্ছাদন সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে। চতুর্থতঃ, উপরিতন পর্যায়ের ইমারত অনাবৃত করিয়া উহার অপসারণও করিতে হয়। তৎপরে নিম্নস্থ সৌধ অনাচ্ছাদিত করিতে হইবে। এই প্রকার উৎখননে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সৌধমালার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

উপরি-উক্ত কারণ বশতঃ সমগ্র প্রত্নস্থল উৎখনন যুক্তিসিদ্ধ নহে। অনেক অভিজ্ঞ উৎখনক মনে করেন যে, প্রত্নস্থলের নির্ধারিত অংশেই খননকার্য সীমাবদ্ধ রাখিয়া সংস্কৃতির অনুক্রমিক পর্ব নির্ণয় করা কর্তব্য। কিন্তু এই প্রকার উৎখনন কোন একটি সাংস্কৃতিক পর্বের সর্বাঙ্গীণ চিত্র পরিবেশন করিতে অপারগ। সুতরাং মধ্যপন্থা অবলম্বনীয়। প্রত্নস্থলের আয়তন ক্ষুদ্র হইলে সামগ্র্য উৎখনন যুক্তিসঙ্গত। বিশাল আয়তনের প্রত্নস্থলে একটি বিস্তৃত অংশে বা একাধিক সীমাবদ্ধ অংশে উৎখনন পরিচালনা করা বিধেয়। কিন্তু সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সকল প্রত্নস্থলেরই সাকল্য উৎখনন আদর্শস্বরূপ।

সামগ্রা উৎখনন দ্বারাই সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্বের সর্বাঙ্গীন চিত্র রূপায়ণ করা সম্ভবপর।

উৎখননের নিমিত্ত বিভিন্ন কৌশলের ও খনননীতির অনুসরণ সম্পর্কিত সকল তথ্য পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রতিভাত হইবে। উৎখননের কৌশল-পরিকল্পনা এবং উৎখনন-নীতি অনুধাবন পূর্বক প্রত্নস্থলের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে খাদবিন্যাস করিয়া খননকার্য আরম্ভ করাই বিধিসম্মত।

। ৩ ।

খাদবিন্যাস

উৎখনন- কৌশলের পরিকল্পনা স্থির করিয়া প্রত্নস্থলের কোন অংশে সর্বপ্রথম খননকার্য আরম্ভ করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। সাধারণতঃ প্রত্নস্থলাংশ সুনির্দিষ্ট করিবার পদ্ধতির অনুসরণ উৎখননকের অধ্যয়ন ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। বহু ক্ষেত্রে প্রত্নস্থলাংশের নির্ধারণ-কার্য উৎখননকের অনুমান দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু উক্ত অনুমানেরও সুদৃঢ় ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। প্রত্নস্থলের আকার, প্রকার ও অপর বৈশিষ্ট্য এবং উহার সহিত জড়িত সমস্যার পর্যালোচনা করিয়া উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নস্থলাংশ নির্ধারণ করা কর্তব্য।

প্রত্নস্থলাংশ সুনির্দিষ্ট করিয়া উৎখননের নিমিত্ত খাদবিন্যাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। অতীতে খননকার্যের জন্য কোন খাদবিন্যাসের প্রয়োজন ছিল না। যে কোন প্রকারে খনন করিয়া প্রত্নবস্তু উদ্ধার ও সৌধমালা অনাবৃত করা হইত। এই প্রকার খননকার্য অবৈজ্ঞানিক এবং উহা বিশৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়। প্রত্নস্থলের বিভিন্ন অংশে বিশৃঙ্খলভাবে খননকার্য পরিচালন করা

বৈজ্ঞানিক নিয়মবিরুদ্ধ ও অপরাধজনক। বিশৃঙ্খল খননকার্য দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু ইতিহাসকে বিকৃত করে।

অতীতে প্রত্নস্থলে একটি 'পরীক্ষণ-খাদ' (ট্রাইল ট্রেন্‌শ্) খনন করিবার সময় কোন দেওয়ালের অংশ অনাবৃত হইলে উক্ত দেওয়াল অনুসরণ করিয়াই খননকার্য পরিচালিত হইত। এই প্রকার খনন-কার্যই 'দেওয়াল- অনুসরণ-পদ্ধতি' নামে অভিহিত। ভারতবর্ষে এবং অন্যদেশেও দেওয়াল- অনুসরণ-পদ্ধতি অনুযায়ী অনেক প্রত্নস্থলে খননকার্য পরিচালিত হইয়াছে। কিন্তু এই পদ্ধতির অনুসরণ অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রমাত্মক। পরবর্তী আলোচনা হইতে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণের অসাড়তা প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু পরীক্ষণ-খাদ-উৎখননেরও প্রয়োজনীয়তা বর্তমান। প্রত্নস্থলাংশের একটি নির্দিষ্ট খাদে খনন করিয়া প্রত্নস্থলের বাস্তবতা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু বহুক্ষেত্রে পরীক্ষণ- খাদ-উৎখনন নিষ্ফলও হইয়াছে। এমন কি পরীক্ষণ-খাদে কোন প্রকার প্রত্ননিদর্শন অনাবিষ্কারের ফলে অনেক প্রত্নস্থলে উৎখনন পরিত্যক্তও হইয়াছে। পরীক্ষণ- খাদ- উৎখনন সর্বদাই প্রত্ন-স্থলের একটি ক্ষুদ্রাংশে সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং উক্ত অংশে প্রত্ন-নিদর্শনের অপ্রাপ্তি অস্বাভাবিক নহে। তৎসত্ত্বেও পরীক্ষণ-খাদ-উৎখননের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। কিন্তু উক্ত পরীক্ষণ-খাদ-উৎখনন সর্বদা স্বল্পপরিসর অংশে সীমাবদ্ধ রাখা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় প্রত্নস্থলের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত উৎখননের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত খাদবিন্যাস অত্যাবশ্যক। সুনির্দিষ্ট খাদের মধ্যেই খননকার্য সীমাবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত উৎখননে খাদবিন্যাস রূপায়ণ করা সর্বপ্রথম কার্য। প্রত্নস্থলের বৈশিষ্ট্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া খাদবিন্যাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রয়োজনমত প্রারম্ভিক খাদবিন্যাসের আয়তনক্ষেত্র প্রসারিত করাও সম্ভব। প্রধানতঃ দুই প্রকার খাদবিন্যাস প্রচলিত : (ক) জালাকার

(গ্রীড) খাদবিন্যাস এবং (খ) অস্তিত্বব্যঞ্জক (সাবস্ট্যানটিব) প্রলম্বিত খাদবিন্যাস। অনুভূমিক (হরাইজন্‌টল) এবং উধ্বর্-অধঃ (ভারটিকাল) উৎখননের জন্য যথাক্রমে জালাকার ও অস্তিত্বব্যঞ্জক দীর্ঘ খাদবিন্যাসই প্রকৃষ্ট পন্থা। (চিত্র নং ১১, ১২, ১৩)।

(ক) জালাকার (গ্রীড) খাদবিন্যাস : জালাকার খাদবিন্যাস কতিপয় সমচতুর্ভুজবিশিষ্ট খাদসমষ্টি। সমচতুর্ভুজাকার খাদসমষ্টির বিন্যাস উৎখননকার্যে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। অভিজ্ঞ উৎখনকগণ মনে করেন যে, সমচতুর্ভুজাকার খাদের পরিধি-নির্ণয় খননকার্যের আনুমানিক গভীরতার উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ একটি খাদের পরিধি ১৫ × ১৫ ফুট অথবা ২০ × ২০ ফুট এবং ন্যূনপক্ষে ১০ × ১০ ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্নস্থলের নির্ধারিত বর্গক্ষেত্রাংশকে কতিপয় সমচতুর্ভুজাকার খাদে বিভক্ত করিতে হয়। প্রতি খাদদ্বয়ের অন্তর্বর্তী তিন বা দুই ফুট প্রস্থের আল (বক্‌) রাখিতে হইবে। বিভিন্ন কারণে খাদবিন্যাসে আল-রক্ষণ প্রয়োজন : (ক) চতুষ্পার্শ্বস্থ উল্লম্বচ্ছেদ-নির্ধারণ ও অধ্যয়ন, (খ) বিবিধ মৃত্তিকাস্তরের সম্বন্ধ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ, (গ) যাতায়াতের সুবিধা, (ঘ) মিতব্যয়িতা ইত্যাদি। প্রয়োজনমত আল-অপসারণ করাও বিধেয়। অতীব সতর্কতার সহিত এই খাদ-বিন্যাস করিতে হইবে। সম্ভব হইলে অনুমিত দেওয়ালের অবস্থান-নিদর্শনের প্রধান ধারার ৪৫ ডিগ্রি কোণে খাদবিন্যাস করা কর্তব্য।

প্রতিটি চতুর্ভুজাকার খাদের চতুষ্কোণে কোণাকোণি কাষ্ঠনির্মিত সমপরিসর এবং চতুষ্পার্শ্ববিশিষ্ট কীলক (পেগ : পার্শ্ব ১ ইঞ্চির কম নহে এবং ১ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা) প্রোথিত করিতে হইবে। কীলক খাদের কোণাকোণিভাবে প্রোথিত করা বিধেয়। যথার্থ কোণ-বিন্দু চিহ্নিত করিবার জন্য কীলকের উপর একটি পেরেক নিবদ্ধ করিতে হয়। কোণমাপক যন্ত্রের (থিঅড্যালাইট) এবং সমতল নির্ণায়ক যন্ত্রের (ডাম্‌পি লেভ্‌ল্) সাহায্যে প্রতিটি খাদের সমকোণ নির্ধারণ করিয়া কীলক প্রোথিত করা উচিত। উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের সহায়তায় কীলকের

সমতলতা নির্ণয় করা দরকার। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে কীলক সমতলবর্তী হয়। তৎপরে প্রতিটি কীলকের নির্ধারিত লেভ্‌ল লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

খাদ সনাক্ত করিবার জন্য ক্রমিক খাদ-সংখ্যা কীলকের সম্মুখ-পার্শ্বে লিখিয়া রাখিতে হয়, যথা $ক^{১}$, $ক^{২}$, $ক^{৩}$, $ক^{৪}$, $ক^{৫}$; $খ^{১}$, $খ^{২}$, $খ^{৩}$, $খ^{৪}$, $খ^{৫}$ ইত্যাদি ($এ^{১}$, $এ^{২}$, $এ^{৩}$, $এ^{৪}$, $এ^{৫}$; $বি^{১}$, $বি^{২}$, $বি^{৩}$, $বি^{৪}$, $বি^{৫}$, প্রভৃতি ; চিত্র নং ১১খ)। প্রাথমিক খাদবিন্যাসের আয়তনক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইলে আরম্ভিক খাদ-সংখ্যার সহিত সমন্বয় রাখিয়া সংখ্যা নির্দেশ করা কর্তব্য, যেমন $ক'^{১}$, $ক'^{২}$, $ক'^{৩}$, $ক'^{৪}$, $ক'^{৫}$ প্রভৃতি। প্রতিটি সংখ্যা-শ্রেণীর (যেমন ক, খ, গ ইত্যাদি) প্রথম এবং শেষ কীলকদ্বয়কে একটি ভূপৃষ্ঠ সমতলবর্তী রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিতে হইবে। এই নির্দিষ্ট রজ্জুই উৎখননকার্যের ভিত্তিক রেখা। উক্ত রেখা এবং লেভ্‌লকৃত কীলক হইতেই প্রতিটি খাদের জরিপকার্য এবং প্রত্ন-বস্তুর পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে।

জালাকার (গ্রীড) খাদবিন্যাসের সম্যক পরিচয় লাভের জন্য উদাহরণমূলক চিত্র নং ১২ সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই চিত্রে ১০০ × ১০০ ফুট বর্গক্ষেত্র নির্দিষ্ট রহিয়াছে। উক্ত বর্গক্ষেত্র ২০ × ২০ ফুট পরিধির বিংশতি সমচতুর্ভুজাকার খাদে বিভক্ত। এই বর্গক্ষেত্র সর্বসমেত পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতি শ্রেণীর নামকরণ করিয়া ক্রমিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পঞ্চ শ্রেণী, ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ (এ, বি, সি, ডি, ই) নামে অঙ্কিত। প্রতিটি শ্রেণী পঞ্চ খাদ-বিশিষ্ট এবং প্রতি ২০ ফুট অন্তর কীলক প্রোথিত আছে। কীলকের পার্শ্বে শ্রেণীর নাম ও ক্রমিক সংখ্যা যেমন, ক শ্রেণী : $ক^{১}$, $ক^{২}$, $ক^{৩}$, $ক^{৪}$, $ক^{৫}$ $ক^{৬}$; খ শ্রেণী : $খ^{১}$, $খ^{২}$, $খ^{৩}$, $খ^{৪}$, $খ^{৫}$ $খ^{৬}$; গ শ্রেণী : $গ^{১}$, $গ^{২}$, $গ^{৩}$, $গ^{৪}$, $গ^{৫}$ $গ^{৬}$; ঘ শ্রেণী : $ঘ^{১}$, $ঘ^{২}$, $ঘ^{৩}$, $ঘ^{৪}$, $ঘ^{৫}$ $ঘ^{৬}$; ঙ শ্রেণী : $ঙ^{১}$, $ঙ^{২}$, $ঙ^{৩}$, $ঙ^{৪}$, $ঙ^{৫}$, $ঙ^{৬}$; চ শ্রেণী : $চ^{১}$, $চ^{২}$, $চ^{৩}$, $চ^{৪}$, $চ^{৫}$, $চ^{৬}$ লিখিত রহিয়াছে। পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রতিটি শ্রেণীর ১ নং এবং ৬ নং

কীলকদ্বয়কে ভূপৃষ্ঠসমতল রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছে। এই রজ্জুই ভিত্তিক রেখা। উক্ত ভিত্তিক রেখা হইতেই সর্বপ্রকার পরিমাপ গ্রহণ করিতে হয়। লেভ্‌লকৃত কীলক প্ল্যান (নক্‌শা) চিত্রণ ও জরিপকার্য করিবার জন্য প্রয়োজন। পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রতি খাদদ্বয়ের অন্তর্বর্তী তিন ফুট আল রক্ষিত আছে। প্রত্যেক খাদের চতুষ্পার্শ্বের কীলক হইতে দেড় ফুট ছাড় রক্ষণ করিয়া খননকার্য পরিচালনা করিতে হয়। ফলে খাদদ্বয়ের অন্তর্বর্তী আল তিন ফুট হইয়াছে। আল রক্ষণের জন্য চতুষ্পার্শ্বে দেড় ফুট ছাড় রাখিলে উৎখননের নিমিত্ত খাদের পরিধি ১৭ × ১৭ ফুট হইবে। প্রাথমিক খাদবিন্যাস প্রসারিত করিবার জন্য প্রারম্ভিক খাদবিন্যাসের সহিত সমন্বয় রাখিয়া চতুর্ভুজাকার খাদ বিন্যস্ত করিতে হয়। প্রতিটি শ্রেণী অনুযায়ী খাদসমষ্টি প্রসারিত করিতে হইবে। উল্লিখিত চিত্রে (চিত্র নং ১২) প্রাথমিক খাদবিন্যাসের উত্তরে খাদসমষ্টি প্রসারিত হইয়াছে। প্রসারিত খাদবিন্যাস প্রাথমিক খাদবিন্যাসের অনুরূপ। প্রাথমিক খাদবিন্যাসের শ্রেণী এবং প্রসারিত খাদ-শ্রেণীর পার্থক্য জ্ঞাপন করিবার জন্য শেষোক্ত খাদ-শ্রেণীর নামকরণ একটি অতিরিক্ত চিহ্নযোগে পৃথক করা হইয়াছে, যেমন ক´১, ক´২, ক´৩, ক´৪, ক´৫, ক´৬ ইত্যাদি।

সমচতুর্ভুজাকার খাদবিন্যাসের প্রতি খাদে উৎখনন করিয়া সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর বৈজ্ঞানিক প্রণালী- অনুসৃত আবিষ্কার ও উদ্ধার সম্ভবপর। সমচতুর্ভুজাকার খাদে খনন পরিচালনা এবং প্রত্নবস্তু উদ্ধার করিবার প্রণালী সুনির্দিষ্ট অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রত্নবস্তুর যথার্থ অবস্থান নির্ধারণ এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপর বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত তথ্য-নির্ণয়ও সমচতুর্ভুজাকার খাদের চতুষ্পার্শ্বের স্তরায়ণের উপরই নির্ভর করে। সুনির্দিষ্ট সমচতুর্ভুজাকার খাদের উপর্যুপরি গচ্ছিত বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তর বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলানুসারে নির্ণয়পূর্বক চিহ্নিত করাও সহজসাধ্য। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর প্রকৃত

অবস্থান লিপিকরণও সমচতুর্ভুজ বিশিষ্ট খাদে সহজতর। উক্ত খাদে প্রত্নবস্তুর স্তর অর্থাৎ যে স্তরে প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিয়া লিপিবদ্ধ করাও অধিকতর সহজ। এমন কি সমচতুর্ভুজাকার খাদে অনাবৃত ইমারতের ও অপর বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত সন্ধানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করাও খাদতদারককারীদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য। কারণ, প্রত্ননিদর্শনের বিস্তৃত বর্ণনা একটি সুনির্দিষ্ট খাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

(ঘ) অস্তিত্বব্যঞ্জক প্রলম্বিত খাদবিন্যাস : প্রত্ননিদর্শনের অস্তিত্ব-বিশিষ্ট ক্ষেত্রাংশে ঊর্ধ্বাধ উৎখননের উদ্দেশ্যে কৃত প্রলম্বিত খাদ-বিন্যাসকেই অস্তিত্বব্যঞ্জক খাদবিন্যাস বলা যায়। পরীক্ষামূলক খাদ এবং জালাকার খাদবিন্যাস হইতে অস্তিত্বব্যঞ্জক খাদবিন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন। অস্তিত্বব্যঞ্জক প্রলম্বিত খাদ প্রত্নস্থলের প্রাচীরের উপর আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত করিতে হয়। এই খাদবিন্যাসে খাদের পরিধির (দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ) নির্ণয় উৎখননের লক্ষ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ খাদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ এইরূপ হইবে যাহাতে প্রত্নস্থলের বহিরাংশ ও অন্তরাংশ খাদবিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। খাদের পরিধি নিম্নস্থ প্রাকৃতিক মৃত্তিকার সন্ধানের উপর নির্ভরশীল। যাহাতে খাদের মধ্যে খননকার্যের কোন অসুবিধা না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেমন, সূর্যের আলো পৌঁছিতে কোন বাধা না পায় অথবা খননকার্যে স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব না ঘটে। দীর্ঘ খাদবিন্যাসকে দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বদ্বয়ে বিভক্ত করিতে হয়। ভাগদ্বয়ের অন্তর্বর্তী তিন ফুট প্রশস্ত আল রাখিতে হইবে। এই দীর্ঘ খাদবিন্যাসে (পরিমাপ প্রয়োজনমত, যথা ১০০ × ৫০ ফুট ; উক্ত পরিমাপ ন্যূন ও অধিক হইতে পারে) কীলক তিন ফুট অন্তর প্রোথিত করিতে হয়। অস্তিত্বব্যঞ্জক খাদবিন্যাসের কীলক প্রোথিত করিবার রীতি ভিন্ন এবং খাদের নামকরণ-পদ্ধতিও পৃথক্ হইবে। অন্যথায় উৎখননকার্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ,

প্রায়শঃ একই প্রত্নস্থলে উভয় প্রকার খাদবিন্যাস করিয়া উৎখনন পরিচালনা করিতে হয়। সুতরাং খাদবিন্যাসদ্বয়ের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের নিমিত্ত পৃথক নামকরণ বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু অস্তিত্বব্যঞ্জক খাদবিন্যাসের পার্শ্বদ্বয়ের পার্থক্য রাখিবার জন্য এক পার্শ্বের নামকরণ অতিরিক্ত চিহ্নযোগে ভিন্ন করিতে হয়। এক পার্শ্বের কীলকের উপর ক্রমিক সংখ্যা ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি এবং অপর পার্শ্বে ০´, ১´, ২´, ৩´, ৪´, ৫´ প্রভৃতি লিখিতে হইবে। শূন্য লিখিত কীলক এবং খাদের শেষ কীলককে একটি দীর্ঘ ভূপৃষ্ঠসমতলবর্তী রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিতে হয়। এই রজ্জু ঊর্ধ্বাধ উৎখননে জরিপ ও পরিমাপ গ্রহণের ভিত্তিক রেখা। দীর্ঘ খাদবিন্যাস এক বা ততোধিক খাদে (যেমন ০ হইতে ৩ পর্যন্ত কীলক) খননকার্য সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। প্রয়োজনমত এক বা একাধিক খাদ ছাড় রাখিয়া অপর খাদে খনন করাও বিধি-সম্মত। খননকার্য প্রত্নস্থলের বহিরাংশ হইতে অন্তরাংশ অভিমুখে পরিচালন করা বাঞ্ছনীয়। অস্তিত্বব্যঞ্জক খাদবিন্যাসের খাদে প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত ঊর্ধ্ব হইতে অধঃ উৎখনন পরিচালনা করিতে হইবে। ঊর্ধ্বাধ উৎখননের নিমিত্ত এই দীর্ঘ খাদবিন্যাসই আদর্শ-স্বরূপ।

চিত্র নং ১৩ অস্তিত্বব্যঞ্জক খাদবিন্যাসের উদাহরণমূলক আলেখ্য। ইহা একটি প্রলম্বিত খাদবিন্যাস। নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ৩০ × ১৫ ফুট (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) দুইটি অংশে বিভক্ত। অংশদ্বয়ের অন্তর্বর্তী তিন ফুট আল রক্ষিত আছে। জালাকার (গ্রীড) খাদবিন্যাসের প্রণালীর অনুরূপ কোণমাপক ও সমতল-নির্ণায়ক যন্ত্রদ্বয়ের সাহায্যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের লেভ্‌ল নির্ণয় করিয়া ক্ষেত্রের উভয় পার্শ্বে তিন ফুট অন্তর কীলক প্রোথিত হইয়াছে। কীলকের নামকরণ ও ক্রমিক সংখ্যালিখন গ্রীড খাদবিন্যাসের পদ্ধতি হইতে ভিন্ন। বাম পার্শ্বের প্রথম কীলকের ক্রমিক সংখ্যা ০ হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ পর্যন্ত লিখিত আছে, যথা , ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ১০। খাদের পার্শ্বদ্বয়ের পার্থক্য নির্দিষ্ট

করিবার জন্য দক্ষিণ পার্শ্বের নামকরণ একটি চিহ্নযোগে লিখিত হইয়াছে, যেমন ০´, ১´, ২´, ৩´, ৪´, ৫´, ৬´, ৭´, ৮´,৯´ এবং ১০´। উভয় পার্শ্বেই শূন্য লিখিত কীলক এবং সর্বশেষ ১০ নং কীলককে একটি রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছে। এই রজ্জুই পরিমাপ গ্রহণের ভিত্তিক রেখা। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে এই প্রলম্বিত খাদের চতুষ্কোণ সমকোণিক হয়। উৎখনন করিবার সময় দীর্ঘ খাদের মধ্য স্থানেই উভয় পার্শ্বে দেড় ফুট মৃত্তিকা ছাড় রাখিতে হইবে। সুতরাং তিন ফুট (১½´+১½´) আল নির্দিষ্ট হইয়াছে। পার্শ্বদ্বয়ের প্রতিটি খাদের পরিধি ৩×৬ ফুট হইয়াছে। দীর্ঘ খাদের (৩০ × ১৫ ফুট) চতুষ্পার্শ্বে দেড় ফুট ছাড় সংরক্ষণের জন্য উৎখননের নিমিত্ত উভয় পার্শ্বের প্রতি খাদ ৩×৪½ ফুট হইবে। উৎখনন এক বা একাধিক খাদে সীমাবদ্ধ রাখা দরকার। প্রয়োজনমত রক্ষিত আল অপসারণ করাও বিধেয়।

কবরস্থান (বারো) এবং মহাশ্মীয় (মেগালিথিক) সমাধি-প্রত্নস্থলে দুই প্রকার খাদবিন্যাস প্রচলিত : (ক) লম্বা ও সরু ফালিকৃত খাদবিন্যাস (ষ্ট্রীপ পদ্ধতি) এবং (খ) পরিধির সমচতুর্থাংশ বা চতুষ্পাদ খাদবিন্যাস (কোয়াড্রাণ্ট পদ্ধতি)। ষ্ট্রীপ পদ্ধতি অনুসারে সমাধি- প্রত্নস্থল তিন বা ততোধিক সমান্তরাল রেখাদ্বারা বিভক্ত করিতে হয়। একটি রেখার অভ্যন্তরে স্তরানুসারে খননকার্য সমাপন করিয়া অন্য রেখায় উৎখনন আরম্ভ করা উচিত। চিত্র নং ৮ গ, ষ্ট্রীপ খাদবিন্যাসের প্রতিকৃতি। বৃত্তাকার প্রত্নস্থলাংশ নয়টি লম্বা ও সূক্ষ্ম সমান্তরাল রেখা দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। প্রতি ফালিতে মৃত্তিকাস্তরানুক্রমে খননকার্য পরিচালনা করা কর্তব্য।

কোয়াড্রাণ্ট পদ্ধতি অনুসারে মহাশ্মীয় সমাধিক্ষেত্রকে তিন ফুট আল ছাড়িয়া সমচতুর্থাংশে বা চতুষ্পাদে বিভক্ত করিতে হয়। যথারীতি এক ফুট অন্তর কীলক প্রোথিত করিয়া রজ্জু দ্বারা ক্ষেত্রকে চতুষ্পাদে বিভক্ত করিতে হইবে। একটি পাদে খননকার্য শেষ করিয়া অপর পাদে

উৎখনন আরম্ভ করা বিধেয়। প্রতিপাদেই বহিরাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তরাংশ পর্যন্ত খননকার্য চালনা করিতে হয়। প্রোথিত কীলক হইতে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে। চিত্র নং ৮ কোয়াড্রাণ্ট খাদবিন্যাসের উদাহরণমূলক আলেখ্য। উক্ত চিত্রের নং ক ও নং খ বৃত্তাকার প্রত্নস্থল চতুষ্পাদে বিভক্ত করা হইয়াছে। চতুষ্পাদের অন্তর্বর্তী (তিন ফুট) আলও রক্ষিত আছে। একটি পাদে খনন শেষ করিয়া অপর পাদে উৎখনন আরম্ভ করিতে হয়। প্রথমে যথাক্রমে পাদ নং ১- এবং ২- এর খননকার্য সমাপ্ত করিয়া অপর পাদদ্বয়ে উৎখনন পরিচালনা বিধেয়। এই নিয়মানুসারে উৎখনন করিলেই শবাধার অনাবৃত করা সহজ হইবে এবং স্তরবিন্যাসের নির্ধারণ-কার্যও আয়াসসাধ্য হইবে। চিত্র নং ১৪ ক-তে ব্রহ্মগিরি প্রত্নস্থলের সমাধি-খাদ উৎখননের প্রতিকৃতি পরিবেশিত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে বৃত্তাকারে উৎখনন করিয়া প্রস্তরখণ্ড অনাচ্ছাদিত করা হইয়াছে। তৎপরে খাদের প্রতিপাদে অধঃ উৎখনন করিয়া সমগ্র/ক্ষেত্রাংশ অনাবৃত করা হইয়াছে। চিত্রে প্রতি পাদ একটি ত্রিভুজাকার খাদে রূপায়িত। এই উৎখননে উল্লম্বচ্ছেদের স্তর নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করা সহজতর। অস্থি-পাত্রসম্বলিত সমতল সমাধিক্ষেত্রে সাধারণতঃ গ্রাড্ খাদবিন্যাস করিয়া উৎখনন পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্নস্থলের প্রকৃত স্বরূপ ও আকারের এবং উৎখননের সমস্যার প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়া খাদবিন্যাস করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত উৎখননকার্য খাদবিন্যাসের মধ্যেই সীমা-বদ্ধ থাকিবে। খননকার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে বাস্তু-নক্শা এবং জরিপকার্য সমাপন করা প্রয়োজন। নগর-প্রত্নস্থল সাধারণতঃ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকে এবং সমতলভূমি হইতে উহার উচ্চতা ৩০-৩৫ ফুট বা অধিকও হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চতা ১০ বা ১২ ফুটও হয়। নগর বিভিন্ন যুগে নির্মিত হইলে উহার নিদর্শন অনাবৃত প্রাচীরের নির্মাণ-পদ্ধতি হইতে নির্ধারণ করা যায়।

বহিরাগত বা আক্রমণকারিগণ কর্তৃক প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও উহার গাত্রে উক্ত নিদর্শন বর্তমান থাকিবে। পুনঃ পুনঃ নির্মিত প্রাচীরের প্রামাণিক চিহ্নও নির্ণয় করা সম্ভব। নগর জলপ্রবাহ বা ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ধ্বংসাবশেষের প্রত্যক্ষ নিদর্শনও বর্তমান থাকে। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, নগরের উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্তের সহিত প্রাচীর-নির্মাণ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

সর্বপ্রথম উৎখননকারী প্রাচীরের পৌর্বাপর্য্য নির্ধারণ করিবার জন্য প্রত্নস্থলের বহিরাংশের ও অন্তরাংশের উপর আড়াআড়িভাবে প্রলম্বিত অস্তিত্বব্যঞ্জক খাদবিন্যাস করিবে। প্রাচীর-দেওয়ালের অনাচ্ছাদনকার্য সম্পূর্ণ করিয়া খাদবিন্যাস প্রত্নস্থলের কেন্দ্রস্থলাংশাভিমুখে প্রসারিত করা প্রয়োজন। প্রত্নস্থলের কেন্দ্রভুক্ত আবাসস্থলের সহিত বহিরাংশের সম্পর্ক নির্ণয় করিবার জন্য প্রাচীর-গাত্রের উপর খাদ-বিন্যাস এমন একটি সুনির্দিষ্ট অংশে করিতে হইবে যাহাতে নগর-প্রবেশদ্বারের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীর গাত্রের সহিত যুক্ত বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তর নির্ণয় করিয়া প্রবেশদ্বারের সহিত কেন্দ্রাংশের যোগা-যোগের রাস্তা অনাবৃত করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়াও প্রয়োজন। নগর-প্রত্নস্থলে উৎখননের নিমিত্ত প্রথমেই অস্তিত্বব্যঞ্জক লম্বাকৃতি খাদবিন্যাস করিয়া খননকার্য আরম্ভ করিতে হইবে। এই অস্তিত্ব-ব্যঞ্জক খাদে উৎখননের ফলে প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ নির্ধারণ করা সহজসাধ্য। সংস্কৃতি-পর্ব নির্ণয়কার্য সমাপনপূর্বক প্রত্নস্থলের কেন্দ্রাংশে গ্রীড-খাদবিন্যাস করিয়া উৎখনন পরিচালনা করিতে হয়। নগর বা কোন আবাসিক প্রত্নস্থলে প্রথমে গ্রীড-খাদবিন্যাস যুক্তি-সঙ্গত নহে। তবে বিশেষ প্রয়োজনবোধে উক্ত প্রত্নস্থলেও গ্রীড--খাদবিন্যাস-উৎখনন অবৈধ নহে। সাধারণতঃ কোন প্রত্নস্থলের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনুধাবন করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র অংশে গ্রীড-খাদবিন্যাস করিয়া খননকার্য পরিচালনাও বিধিসঙ্গত। প্রত্নস্থলের

প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য অবধারণ করিয়াই খাদবিন্যাসকার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

প্রত্নস্থলের প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কারের নিমিত্ত বিশৃঙ্খলভাবে খনন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। একটি সুনির্দিষ্ট প্রত্নস্থলাংশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে খনন করিয়া প্রত্ননিদর্শন উদ্ধৃত হইলেই ইতিহাসের যথার্থ রূপের উদ্ঘাটন সম্ভবপর হইবে। প্রকৃতপক্ষে অনেক প্রত্নস্থল বিশৃঙ্খলভাবে খননকার্যের ফলে বিনষ্ট হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসৃত উৎখননে খননকার্য সুনির্দিষ্ট খাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্যই খাদবিন্যাস আবশ্যক।

। ৪ ।

উৎখনন - পদ্ধতি

উৎখননের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট বা সর্বসম্মত পদ্ধতি অবর্তমান। কিন্তু ভ্রমাত্মক ও ত্রুটিপূর্ণ উৎখনন-পদ্ধতির অনুসরণ বিরল নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ উৎখনন পরিচালনার ফলে মানবসভ্যতার অনেক অমূল্য সম্পদ চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই প্রকার খনন-কার্য ধ্বংসাত্মক। মানব-সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন উদ্ধার করিয়া ইতিহাস গ্রন্থন করাই উৎখনকের প্রধান উদ্দেশ্য। বাস্তব তথ্যবহুল ইতিহাস রূপায়ণের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্বলিত উৎখননই একমাত্র পন্থা।

অতীতে বৈজ্ঞানিক উৎখনন-প্রণালীর অনুসরণ করিবার কোন অবকাশ ছিল না। যে কোন প্রকারে খনন করিয়া প্রত্ননিদর্শন উদ্ধার করাই একমাত্র কাম্য ছিল। ফলে প্রায় সকল প্রত্নস্থলেই ব্যাপক খননকার্য পরিচালনা করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে উক্ত ব্যাপক খননকার্যের ফলে অনেক

প্রত্নক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষেও ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপক উৎখনন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অনেক প্রত্ন-স্থলের বৃহত্তরাংশ আবরণমুক্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদারো, তক্ষশিলা, নালন্দা, সারনাথ প্রভৃতি প্রত্নস্থলের খননকার্য উল্লেখ-যোগ্য। অধিকন্তু অতীতে দেওয়াল-অনুসরণ-পদ্ধতি উক্ত ব্যাপক উৎখননের প্রধান সূত্র ছিল। কিন্তু বর্তমান উৎখনন-বিজ্ঞানে এই পদ্ধতির অনুসরণ বিধিসম্মত নহে।

উৎখননের নিমিত্ত অভিজ্ঞ উৎখনকগণ বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই সকল পদ্ধতির মধ্যে দুইটি প্রধান: (১) সামগ্র্য-উৎখনন এবং (২) মনোনীত বা সঙ্কুচিত উৎখনন। সামগ্র্য-উৎখননই অনুভূমিক উৎখনন নামে পরিচিত। উপরন্তু এই প্রকার উৎখননকে সমতলক্ষেত্র উৎখননও (এরিয়া এক্সক্যাভেসন) বলা হয়। মনোনীত বা সঙ্কীর্ণ উৎখনন বলিতে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঊর্ধ্ব-অধঃ খননকার্যকেই বুঝায়। পূর্বে আলোচিত গ্রীড-খাদ-বিন্যাসের সাহায্যে অনুভূমিক উৎখনন পরিচালনা করা বিধেয়। প্রত্নস্থলের বৃহত্তরাংশ খনন করিয়া প্রত্ননিদর্শনের সামগ্রিক অনাচ্ছাদন-কার্যই অনুভূমিক উৎখনন। এই অনাচ্ছাদনকার্য একক বা একাধিক পর্যায়ে করা যায়। উৎখনন-খাদে কোন সৌধমালার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত না হইলে প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত খননকার্য পরিচালনা করাও বিধিসঙ্গত।

ঊর্ধ্বাধ উৎখনন অর্থে ঊর্ধ্ব হইতে অধঃ খননকার্য বুঝায়। কালানুক্রমিক সংস্কৃতির পর্ব নির্ধারণের নিমিত্ত প্রত্নস্থলের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত স্তরায়ণ অনুসৃত উল্লম্ব খননকার্যকেই ঊর্ধ্বাধ উৎখনন বলা হয়। ঊর্ধ্বাধ উৎখননই সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ ও ক্রমিক কালনির্ণয়ের নিমিত্ত বাস্তব নিদর্শন পরিবেশন করে। কেবলমাত্র উল্লম্ব উৎখননই প্রত্নস্থলের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের মৌলিক তথ্য উদ্ধার করিয়া ইতিহাসের কালানুক্রমিক ভিত্তি

সুদৃঢ় করিতে সমর্থ। কিন্তু উর্ধ্বাধ উৎখনন বিভিন্ন পর্বভুক্ত সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্র পরিবেশনকার্যে অপারগ। যদি প্রত্নস্থলের কালানুক্রম সংস্কৃতির বিবর্তনের চিত্র রূপায়ণ করাই উৎখননের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে উর্ধ্বাধ উৎখননই প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস রূপায়ণ ও সম্পাদনকার্যে অনুভূমিক উৎখননই আদর্শস্বরূপ।

প্রসঙ্গতঃ অনুভূমিক ও উর্ধ্বাধ উৎখনন-পদ্ধতিদ্বয়ের সম্পর্ক ও গুরুত্ব আলোচনীয়। সর্বপ্রথমেই প্রত্নস্থলের বাসস্থানের অনুক্রম-কালনির্ণয় করা আবশ্যক। উর্ধ্বাধ উৎখননই উক্ত কালনিরূপণকার্যের যথার্থ নিদর্শন পরিবেশন করে। গচ্ছিত প্রাকৃতিক মৃত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্নস্থলের বাসস্থানের সর্বশেষ পর্যায় পর্যন্ত অনুক্রমিক কালনির্ণয় উর্ধ্বাধ উৎখনন দ্বারাই সম্ভব। উর্ধ্বাধ উৎখনন বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত বাস্তু-নিদর্শনের প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করে। কিন্তু উর্ধ্বাধ উৎখনন প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ চিত্র, অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রভৃতির বাস্তব উপাদান পরিবেশন করিতে পারে না। এই কারণবশতঃ হুইলার উর্ধ্বাধ উৎখননকে রেলগাড়ির সময়-নির্দেশক তালিকার সহিত তুলনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উর্ধ্বাধ উৎখনন সময়-নির্দেশক। কিন্তু উক্ত উৎখনন গাড়ির অর্থাৎ সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিচয়ের রূপায়ণকার্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ।

প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয়ের জন্য অনুভূমিক উৎখননই আদর্শস্বরূপ। অতীতে ভারতবর্ষে ও অন্যত্র অনুভূমিক উৎখনন-পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। যে কোন প্রকারে প্রত্নস্থলের বৃহত্তরাংশ খনন করিয়া প্রত্ননিদর্শন উদ্ধার করাই উক্ত খননকার্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অভিজ্ঞ উৎখনক এই প্রকার খননকার্যকে 'গোল আলু-উত্তোলন' প্রচেষ্টার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুভূমিক পদ্ধতিঅনুসারেই খননকার্য পরিচালিত হইয়াছে। মহেঞ্জোদারো,

তক্ষশিলা প্রভৃতি প্রত্নস্থলের খননকার্য উল্লেখনীয়। যে কৌশল ও পদ্ধতি অনুসারে মার্শাল ও ম্যাকাই কর্তৃক মহেঞ্জোদারোতে খনন-কার্য পরিচালিত হইয়াছে তাহা বর্তমানে 'আন্তর্জাতিক লজ্জাকর কুকীর্তি' বলিয়া হুইলার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। স্তরবিন্যাসের অবর্তমানে মহেঞ্জোদারোর কালানুক্রমিক সংস্কৃতি-পর্বের চিত্র অস্পষ্ট। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্যাপক অনুভূমিক খননকার্যের ফলেই মহেঞ্জোদারোর সংস্কৃতির সম্পূর্ণ চিত্র রূপায়িত হইয়াছে। উক্ত প্রকার খননকার্যের জন্যই মহেঞ্জোদারো বা সিন্ধু সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ রূপ ও প্রকারের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। হুইলারও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, মহেঞ্জোদারো প্রত্নস্থলে অবৈধ এবং ভ্রমাত্মক খননকার্য পরিচালনা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার সম্যক্ পরিচয় চিত্রিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সিলবেস্টরের খননকার্যও উল্লেখযোগ্য। যদিও উক্ত প্রত্নস্থলে 'গোল-আলু-উত্তোলনের' অনুরূপ খননকার্য চালিত হইয়াছিল তথাপি প্রাচীন রোমক নগরীর প্রকৃত চিত্র পরিবেশিত হইয়াছে।

অনেক অভিজ্ঞ উৎখনক অনুভূমিক উৎখননের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ড্রূপ বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র অনু-ভূমিক উৎখনন হইতেই সংস্কৃতির সম্পূর্ণ চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মতে ঊর্ধ্বাধ উৎখনন স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। ড্রূপ নস্‌স্ রাজ-প্রাসাদের উৎখননের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে, ঊর্ধ্বাধ উৎখনন করিয়া উক্তস্থানে সুফল অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং তিনি অনুভূমিক উৎখননকেই বরণীয় বলিয়া মনে করেন। অনুভূমিক উৎখননেই বিভিন্ন স্তর সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করা সম্ভবপর। কিন্তু অনুভূমিক উৎখনন কখনও কখনও ভ্রমাত্মক হয় এবং কালানুক্রমিক সংস্কৃতির যথার্থ রূপের পরিচয় প্রদান করিতে পারে না। অর্থাৎ অনুভূমিক উৎখনন দ্বারা সন-তারিখসম্বলিত সংস্কৃতির যথার্থ ক্রম-বিকাশ নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। উক্ত কারণবশতঃ হুইলার

ঊর্ধ্বাধ উৎখননের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এতদ্-ব্যতীত অনুভূমিক উৎখনন অর্থ ও সময়সাপেক্ষ। অধিকন্তু ঊর্ধ্বাধ উৎখনন অল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্নস্থলের বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম।

কিন্তু উভয় প্রকার পদ্ধতিই উৎখননকার্যে অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হুইলার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কোন প্রত্নস্থলের সর্বাঙ্গীণ চিত্র রূপায়ণের নিমিত্ত উভয় পদ্ধতি অনুসারে উৎখননকার্য পরিচালনা করা আবশ্যক। রেলগাড়ির সময়-নির্দেশক তালিকা কেবলমাত্র গাড়ির প্রস্থান, উপস্থিতি ও বিরামস্থলের সময়ের নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু গাড়ি সম্পর্কিত সর্বপ্রকার তথ্য যেমন, সংযুক্ত গাড়িসংখ্যা, যাত্রীসংখ্যা, জিনিসপত্র প্রভৃতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না ঊর্ধ্বাধ উৎখনন ক্রমিক কালনির্দেশক। সংস্কৃতির সর্বাত্মক চিত্র পরিবেশনকার্য সম্পাদন করিতে ঊর্ধ্বাধ উৎখনন অসমর্থ। অনুভূমিক উৎখননই সর্বপ্রকার উপাদান সরবরাহ করিয়া ইতিহাসের সম্যক চিত্র রূপায়ণ করিতে সমর্থ। কিন্তু ইতিহাস রূপায়ণের জন্য কালানুক্রমিক সংস্কৃতির সকল প্রকার তথ্য উদ্ধার করাও আবশ্যক। সুতরাং সময়-নির্দেশক তালিকা এবং রেলগাড়ি উভয়েরই প্রয়োজন স্বীকার্য। অর্থাৎ ঊর্ধ্বাধ ও অনুভূমিক উভয় প্রকার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উৎখনন পরিচালনা করা কর্তব্য। তাহা হইলেই প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির প্রকৃত ইতিহাস রূপায়ণ করা সম্ভব হইবে।

এই উৎখনন- পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সর্বপ্রথম অনুসরণীয় তাহা উৎখনকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং প্রত্নস্থলের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। হুইলার মনে করেন যে, নগর-প্রত্নস্থলে সর্বপ্রথম ঊর্ধ্বাধ উৎখনন করিয়া সংস্কৃতির অভিব্যক্তির কাঠামো সুদৃঢ় করিতে হইবে। হুইলারের মতে প্রথমে ঊর্ধ্বাধ এবং অনন্তর অনুভূমিক উৎখনন পরিচালন করাই শ্রেষ্ঠ নীতি। ঊর্ধ্বাধ উৎখনন সমাপনান্তে অনুভূমিক উৎখনন-পদ্ধতি অনুসরণ করা বিধেয়। তবে প্রয়োজনমতো

প্রথমেও অনুভূমিক উৎখনন-পরিচালন অযৌক্তিক নহে। সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উক্ত উৎখনন-পদ্ধতিদ্বয় বিরুদ্ধবাদী নহে। অধিকন্তু উহারা পরস্পরের সহায়ক। আদর্শ ও নীতির দিক হইতে উভয় প্রকার উৎখনন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ চিত্র অঙ্কন করা সম্ভবপর।

বর্তমানে অভিজ্ঞ উৎখনকগণ আরও অনেক উৎখনন-পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। অধুনা প্রত্নস্থলের অতি দ্রুত ও সুলভ পরিচিতির প্রত্যাশায় 'সাউণ্ডিং' নামক এক প্রকার উৎখনন-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। শলাকা প্রোথিত করিয়া মৃত্তিকাগর্ভে বিভিন্ন স্তরের অবস্থান নির্ণয় করিবার পন্থা ভূবিদ্যার অনুশীলনে বহুদিন যাবৎ অনুসৃত হইতেছে। রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া জলের গভীরতার পরিমাপ গ্রহণ করিবার প্রথাও প্রচলিত। উভয় প্রকার প্রণালীই সাউণ্ডিং নামে পরিচিত। উৎখনন-বিজ্ঞানে সাউণ্ডিং অর্থে প্রত্নস্থলের নির্দিষ্টাংশে পরীক্ষণমূলক খননকার্য বুঝায়। ব্যাপকার্থে সাউণ্ডিং উৎখননেরই উপনাম। পশ্চিম এশিয়ার ভূখণ্ডে এই পদ্ধতি বহুক্ষেত্রে অনুসৃত হইয়াছে। সাউণ্ডিং উৎখনন-পদ্ধতি দ্বিবিধ : (১) একাধিক খাদ-খনন, (২) একক প্রলম্বিত খাদ-খনন। প্রথম পদ্ধতি অনুসারে বিভিন্ন কোণ হইতে ঢিবির উপর একাধিক খাদে খননকার্য পরিচালিত হয়। এই সকল খাদে অধঃ-উৎখনন করিয়া প্রত্ননিদর্শন উদ্ধারপূর্বক কালনিরূপণ করা সহজসাধ্য। দেওয়াল, মেঝ প্রভৃতির সহিত সম্পর্কিত আংশিক তথ্য উদ্ঘাটন করাও সম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতি অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিপূর্ণ। উক্ত উৎখননে স্তরবিন্যাস-নির্ধারণ এবং উহার বিশ্লেষণ আয়াসসাধ্য। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয় নহে। তবে কোন প্রত্নস্থলের প্রারম্ভিক পরীক্ষণের জন্য উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলে এই পদ্ধতির অনুশীলন অনুচিত। দ্বিতীয় সাউণ্ডিং পদ্ধতি অর্থে উচ্চ বা সীমিত ঢিবির শিখর হইতে পাদস্থল পর্যন্ত একক দৈর্ঘ্য খাদ-

উৎখনন বুঝায়। এই উৎখননকার্য ক্রীষ্টমাস্ পুডিং কাটিবার প্রথার সহিত তুলনীয়। উক্ত উৎখনন দ্বারা চিত্তাকর্ষক এবং বিভিন্ন লেভেল-এর বাসস্থানের নিদর্শন অনাবৃত করা সম্ভব। কিন্তু কোন নিদর্শনের বাস্তব তথ্যের সম্পূর্ণ অনুশীলন অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে সাউণ্ডিং পদ্ধতি অনুসৃত উৎখনন মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের নিমিত্ত মৌলিক উপাদান পরিবেশন করিতে অসমর্থ।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গ্রীড খাদবিন্যাস দ্বারা অনুভূমিক উৎখনন অর্থ ও সময়সাপেক্ষ। এই পদ্ধতি অনুসারে একই পর্যায়-ভুক্ত আবাসস্থল অনাবৃত করিয়া নিম্নপর্যায়ে খননকার্য পরিচালনা করিতে হয়। অধিকন্তু এই উৎখনন অতীব মন্দগতিতে চালিত হয়। সুতরাং অধুনা প্রসার্য এবং ব্যাপক উৎখনন (এক্সটেন্‌ডেড্ সাউণ্ডিং) নামক উৎখনন-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্নস্থলের নির্দিষ্ট অংশে একটি খাদে উৎখনন আরম্ভ করিতে হয়। এই খাদে সৌধমালার বা দেওয়ালের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলে উহার উভয় পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা অনাবৃত করিতে হইবে। উক্ত প্রকারে খাদান্তরে উৎখনন করিয়া সমগ্র সৌধমালা অনাচ্ছাদিত করা প্রয়োজন। এই উৎখনন-পদ্ধতি অতীতের দেওয়াল-অনুসরণ-প্রণালীর অনুরূপ। ব্যাপক উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নস্থলের বিভিন্নাংশে খননকার্য পরিচালন করাও দরকার। প্রয়োজনানুসারে অনাবৃত বিভিন্ন অংশ একত্র করাও যায়। এমন কি অনাবৃত দেওয়াল অপসারণ করিয়া অধঃ-উৎখনন করাও সম্ভব। এতদ্ব্যতীত প্রত্নস্থলের একাধিক ক্ষেত্রে সীমিত পরীক্ষণ-খাদে প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত খনন করাও বিধি-সম্মত। এই পরীক্ষণ-খাদ উৎখনন হইতেই প্রত্নস্থলের অনুক্রম সংস্কৃতির আংশিক চিত্র রূপায়ণ করা সম্ভবপর। কিন্তু পরীক্ষণ-খাদ-উৎখনন সীমিত। উপরন্তু প্রাসাদ, মন্দির এবং সাধারণ আবাসিক সৌধসম্বলিত প্রত্নস্থলে পরীক্ষণ-খাদ-উৎখনন ব্যর্থ হইবে। উক্ত প্রকার উৎখনন হইতে প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করাও

অসম্ভব। এতদ্‌ব্যতীত, সমাধি-প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন-পদ্ধতি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

উপরি-উক্ত বিবিধ উৎখনন-পদ্ধতির আলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, অধুনা অল্প সময়ের মধ্যে এবং স্বল্প অর্থব্যয়ে উৎখনন করিয়া কোন প্রত্নস্থলের অনুক্রম সংস্কৃতির চিত্র অঙ্কন করা উৎখনকের প্রধান অভিসন্ধি। কিন্তু ইতিহাস রূপায়ণ করাই উৎখনকের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিহাস-রূপায়ণকার্যে তথ্যবহুল বাস্তব নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য অনুভূমিক উৎখনন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সংস্কৃতির অনুক্রমিক অভিব্যক্তির নিমিত্ত উর্ধ্বাধ উৎখনন প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্নস্থলের সর্বাঙ্গীণ ঐতিহাসিক চিত্র রূপায়ণের জন্য অনুভূমিক এবং উর্ধ্বাধ উভয় প্রকার উৎখনন-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উৎখননকার্য পরিচালনা করা আবশ্যক।

বিভিন্ন উৎখনন-পদ্ধতি সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রত্নস্থলের আকার ও প্রকারের উপরই উৎখনন-পদ্ধতির অনুসরণ নির্ভর করে। বিশেষজ্ঞ উৎখনক উপরি-উক্ত যে কোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারেন। প্রয়োজনানুসারে একই প্রত্নস্থলে একাধিক উৎখনন-পদ্ধতি অনুসরণ করাও যুক্তিসঙ্গত। যে উৎখনন-পদ্ধতি অনুসরণ করিলে প্রত্নস্থলের ইতিহাস রূপায়ণের কার্য সাফল্য-মণ্ডিত হইবে, তাহাই অনুবর্তনীয়। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রত্নস্থলের সহিত জড়িত সমস্যা ও তথ্য নির্ণয় করিয়া পারদর্শী উৎখনক উৎখনন-পদ্ধতি স্থির করিবেন।

। ৫ ।

অপসারিত মৃত্তিকা-স্তূপীকরণ

উৎখনন-পদ্ধতির সহিত খাদের অপসারিত মৃত্তিকার স্তূপীকরণ-প্রণালী নির্ধারণ করা প্রয়োজন। খননকার্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই

অপসারিত মৃত্তিকা স্তূপীকৃত করিবার জন্য যথার্থ স্থান নির্দিষ্ট করিতে হইবে। অপসারিত মৃত্তিকার স্তূপীকরণ প্রণালী খাদবিন্যাস এবং উৎখননের উদ্দেশ্য, আয়তন এবং পদ্ধতি অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। সর্বপ্রথম লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, অপসারিত মৃত্তিকা-স্তূপীকরণ উৎখননকার্যে কোন প্রকার বিঘ্ন না ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ, ধ্বংসাবশেষের উপর মৃত্তিকা-স্তূপীকরণ সঙ্গত নহে। তৃতীয়তঃ, সমগ্র প্রত্নক্ষেত্র অনাবৃত করিতে হইলে অপসারিত মৃত্তিকা-স্তূপীকরণ সুদূরবর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় মৃত্তিকা উৎখনন-খাদের সন্নিকটে স্তূপীকৃত করিতে হইবে। উৎখনিত খাদ পুনরাবৃত করিতে হইলে অপসারিত মৃত্তিকার স্তূপ খাদবিন্যাসের নিকটবর্তী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু প্রারম্ভিক খাদবিন্যাসের আয়তনক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইলে অথবা অনাবৃত সৌধমালার সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অপসারিত মৃত্তিকা খাদবিন্যাস হইতে দূরবর্তী স্থানে স্তূপীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উৎখনন-ক্ষেত্রের বহিরাংশেই মৃত্তিকা অপসারণ করা বিধেয়। কিন্তু দূরবর্তী স্থানে মৃত্তিকা স্তূপীকরণ ব্যয়সাপেক্ষ।

উৎখনিত খাদের সন্নিকটে অপসারিত মৃত্তিকা স্তূপীকৃত হইলে বহুক্ষেত্রে উৎখননকার্যে ব্যাঘাত জন্মায়। খাদের সন্নিকটে অপসারিত মৃত্তিকাস্তূপ আলোকচিত্র গ্রহণের পরিপন্থী। অধিকন্তু শ্রমিকদিগের গমনাগমনও ব্যাহত হইবে। এমন কি খাদের নিকটবর্তী অপসারিত মৃত্তিকাস্তূপ হইতে উৎখনন-খাদে প্রত্নবস্তুর সন্নিবিষ্ট বা প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনাও বর্তমান। সুতরাং উৎখনন সম্পর্কিত সকল প্রকার সুবিধা ও অসুবিধা বিচার করিয়া অপসারিত মৃত্তিকা স্তূপীকরণ-নীতি গ্রহণ করিতে হইবে।

সাধারণতঃ প্রতিটি খাদের মৃত্তিকা একটি নির্দিষ্ট স্থানে স্তূপীকৃত হওয়া প্রয়োজন। সম্ভব হইলে খাদের অপসারিত মৃত্তিকা স্তরানুক্রমে পৃথক্‌ রাখাও বাঞ্ছনীয়। অতএব কোন প্রত্নবস্তু বা প্রত্নবস্তুর ভগ্নাংশ দৈবাৎ অপসৃত মৃত্তিকার সহিত স্তূপীকৃত হইলে উহার

পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, অপসারিত মৃত্তিকার স্তূপীকরণ-পদ্ধতি খাদবিন্যাসের প্রণালীর সহিত জড়িত। এমন কি পরবর্তী উৎখননের জন্য খাদবিন্যাসের ক্ষেত্রমান প্রসারিত করিবার সময়ও গচ্ছিত মৃত্তিকা অপসারণ করিতে হয়। সুতরাং খাদবিন্যাস ও ভবিষ্যতের উৎখনন-পরিকল্পনা বিচার করিয়াই খাদের অপসৃত মৃত্তিকা স্তূপীকরণ সম্পর্কিত পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

। ৬ ।

বকশিশ-প্রদান

উৎখননে নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বকশিশ-প্রদান করিবার নীতি সাধারণতঃ অনুসরণ করা হয়। আবিষ্কৃত প্রত্ন-বস্তুর গুরুত্ব বা মূল্যায়নের উপর বকশিশের মান-নির্ধারণ নির্ভর করে। অতীব মূল্যবান প্রত্নবস্তু উদ্ধৃত হইলে শ্রমিককে এক বা একাধিক মুদ্রা বকশিশ প্রদান করা হয়। বকশিশ প্রদান-নীতি অনুসরণের ফলে শ্রমিকগণ অতীব সতর্কতার সহিত খননকার্য চালনা করে এবং অভিনিবিষ্ট হইয়া প্রত্নবস্তুর অনুসন্ধানকার্যে ব্যাপৃত থাকে। তাঁহারা কর্তিত মৃত্তিকা অতীব সন্তর্পণের সহিত পরীক্ষা করিয়া প্রত্নবস্তু উদ্ধার করিতে উৎসাহিত হয়। সুতরাং খাদের অপসারিত মৃত্তিকার সহিত প্রত্নবস্তুর নিরুদ্দেশ হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। উক্ত কারণবশতঃ বকশিশ প্রদান-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

কিন্তু বকশিশ- প্রদান-নীতি অনুসরণের অনেক প্রতিবন্ধক বর্তমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণের জন্য বিপরীত ফল হইয়াছে। প্রথমতঃ, বকশিশ প্রাপ্তির লোভের বশবর্তী হইয়া শ্রমিকগণ অসদুপায় অবলম্বন করে। তাহারা অন্য স্থান হইতে প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করিয়া খননকালে মৃত্তিকায় সন্নিবেশ করে এবং

মৃত্তিকা কর্তন বা পরীক্ষা করিবার সময় উক্ত প্রত্নবস্তু উদ্ধার করে। খাদ-তদারককারীর অনবধানের সুযোগেই উক্ত কার্য সাধিত হয়। ইহার পরিণামে ইতিহাসের তথ্য বিকৃত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বকশিশ-প্রদান অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ফলে উৎখননকার্য ব্যাহত হয়। উৎখননকালীন এই প্রকার বিশৃঙ্খলার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য উৎখননকার্য পরিত্যক্তও হইয়াছে। সুতরাং উৎখননকালীন বকশিশ প্রদান-প্রথা সর্বক্ষেত্রেই বর্জনীয়। শ্রমিকগণ যাহাতে অসদুপায় অবলম্বন করিতে না পারে সেইদিকেও সর্বদা দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বিশেষ ক্ষেত্রে উৎখননকার্য সমাপ্তির পর বকশিশ প্রদান বিধেয়।

। ৭ ।

খননকার্যক্রম ও স্তরবিন্যাস

প্রত্ননিদর্শন কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। তাহা সমগ্র মানব-সমাজের সম্পদ। উৎখনিত প্রত্ননিদর্শনের অনুসন্ধান, উদ্ধার এবং উহাদের সর্বাত্মক পরিচয় প্রদান করিয়া ইতিহাস রূপায়ণ করাই উৎখনকের গুরুতর দায়িত্ব। কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে উৎখনন করিয়াই প্রত্নবস্তুর প্রকৃত সন্ধান ও সম্যক্ বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর।

বৈজ্ঞানিক উৎখননের কার্যপ্রণালী সাধারণতঃ দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত : (ক) প্রাকৃতিক এবং (খ) রাসায়নিক। প্রাকৃতিক প্রণালীর মধ্যে উপর্যুপরি গচ্ছিত মৃত্তিকার বর্ণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিচার, মৃত্তিকান্তর নির্ণয় এবং প্রস্থচ্ছেদ, উল্লম্বচ্ছেদ, লম্বচ্ছেদ প্রভৃতির স্তরায়ণ নির্ধারণ, স্তরবিন্যাস স্থিরীকরণ, অনুবীক্ষণ, পরীক্ষণ ইত্যাদি

উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় প্রণালীর মধ্যে রাসায়নিক সামগ্রীর বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

খননকার্যের নিমিত্ত প্রতি খাদে একজন অভিজ্ঞ খাদতদারককারী ও সহকারী শিক্ষানবীশ এবং চারজন শ্রমিক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। চারজন শ্রমিকের মধ্যে দুইজন মৃত্তিকা-কর্তন এবং অপর দুইজন কর্তিত মৃত্তিকা অপসরণকার্যে নিযুক্ত থাকিবে। খাদতদারককারীর পরিচালনাতেই খননকার্য চালিত হইবে। অতীতে বহু শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া খননকার্য পরিচালিত হইত। এমন কি ৪০০-৫০০ জন শ্রমিক কর্তৃক সবিস্তারে খননকার্য পরিচালনার অনেক দৃষ্টান্ত বর্তমান। এই প্রকার খননকার্যের পরিণাম অনুকূল নহে এবং উৎখননের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। অধিকসংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করিলে উৎখনন-কার্যের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উৎখননের কার্যক্রম বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত না হয়। বিশৃঙ্খলাপূর্ণ উৎখনন প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার এবং স্তরবিন্যাস-নির্ণয়কার্যে ব্যাঘাত জন্মায়। সুনিয়ন্ত্রিত শ্রমিক দ্বারাই উৎখনন পরিচালনা করিতে হইবে। সাধারণতঃ স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগ করা কর্তব্য। কর্তিত মৃত্তিকা আঞ্চলিক প্রথা অনুযায়ী ঝুড়িতে করিয়া অপসারণ করিতে হয়। গভীরতর খাদ হইতে মৃত্তিকা অপসারণের জন্য সিঁড়ি-সংরক্ষণ বিধেয়, অথবা মই ব্যবহার করা প্রয়োজন। সিঁড়ি রাখিলে স্তরায়ণ-নির্ণয় এবং আলোকচিত্র-গ্রহণকার্য ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা বর্তমান।

খননকার্য সম্পর্কিত কতিপয় মৌলিক নীতি সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন; যথা উপর্যুপরি গচ্ছিত মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এবং পৃথকী করণ, গচ্ছিত মৃত্তিকার সংস্তর-নির্ধারণ ও চিহ্নিত-করণ, স্তরায়ণের সহিত অনাবৃত সৌধের এবং লেভ্‌ল-এর সম্পর্ক স্থিরীকরণ এবং আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের স্তরায়ণের লেভ্‌ল নির্ধারণ এবং লিপিবদ্ধকরণ। এতদ্‌ব্যতীত সর্বক্ষেত্রেই উর্ধ্বাধ অর্থাৎ উর্ধ্ব হইতে নিম্নে খনন করিতে হইবে। উর্ধ্বাধ খননকার্য যাহাতে কোন প্রকারে

ব্যাহত না হয় সেইদিকেও সর্বদা লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ভূপৃষ্ঠ হইতে নিম্নে অবলোকন করিয়া উর্ধ্বাধ ছেদের বন্ধুরতা নির্ণয় করিতে হয়। ছুরিকা এবং পরিচ্ছন্নকারক হাতিয়ারের সাহায্যে ছেদ সমতল এবং মসৃন করিতে হইবে। উর্ধ্বাধ খননকার্য ব্যতিরেকে উল্লম্বচ্ছেদের স্তরায়ণ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব নহে। উপরন্তু ছেদ ঢালু ও অসমতল হইলে অধঃ-উৎখননকার্য ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রথমে নির্দিষ্টাংশে উর্ধ্বাধ খনন করিয়া অনুভূমিক খননকার্য চালনা করিতে হয়।

সর্বপ্রথম নির্ধারিত খাদের ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকা অপসারণ করিয়া একটি নির্দিষ্ট কোণে ২×২ ফুট ক্ষুদ্র সমচতুর্ভুজাকার খাদ নির্দিষ্ট করিতে হইবে। উক্ত খাদেই প্রথম খননকার্য সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই ক্ষুদ্র সমচতুর্ভুজ খাদটিকে 'নিয়ন্ত্রণ-খাদ' (কন্‌ট্রোল-পিট) বলা হয়। অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র খাদই খাদের অপরাংশের খননকার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ-খাদে খননকার্য ১-১½ ফুটের অধিক গভীর হওয়া অনুচিত। খাদতদারককারী এবং তাঁহার সহকারী এই নিয়ন্ত্রণ-খাদে ছোট গাঁইতি দ্বারা খনন করিবেন। উক্ত খাদে এক বা দেড় ফুট পর্যন্ত খনন করিয়া চতুষ্পার্শ্বের উল্লম্ব ছেদের মৃত্তিকাস্তর নির্ণয় করিতে হইবে।

মৃত্তিকার বর্ণ, গঠন এবং অন্যান্য প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া উপর্যুপরি গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তর নির্ণয় করিতে হয়। মৃত্তিকাস্তর নির্ধারণ করা অতীব কষ্টসাধ্য। খাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ ছেদ ছুরিকাদ্বারা সমতল ও পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। তৎপরে প্রতিটি গচ্ছিত স্তর নির্ণয় করিয়া ছুরিকাদ্বারা চিহ্নিত করিতে হয়। খননকার্যের মসয় গচ্ছিত মৃত্তিকার রূপান্তর অবলোকন এবং উপলব্ধি করা অতীব প্রয়োজন। সাধারণতঃ ২-৩ ইঞ্চি বা ১ ফুট (বা তদূর্ধ্বে) গচ্ছিত মৃত্তিকার রূপের ও প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সদৃশ রূপ ও প্রকৃতি-যুক্ত গাচ্ছত মৃত্তিকাকেই মৃত্তিকাস্তর বলা হয়। পুষ্করিণী, নালা

প্রভৃতি খনন করিবার সময়ও বিবিধ বর্ণের ও প্রকৃতির উপর্যুপরি গচ্ছিত মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়। উৎখননকার্যে অংশগ্রহণকারী ও উৎখননকার্যক্রমদর্শী উক্ত গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তরের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম। ছুরিকা দ্বারা ক্রমাগত পরিচ্ছন্ন করিয়া গচ্ছিত মৃত্তিকার রূপ ও প্রকার এবং বিন্যস্ত বস্তু নির্ণয় করিয়া স্তর নির্ধারণ করিতে হইবে। মৃত্তিকাস্তর নির্ণয় এবং চিহ্নিতকরণ উৎখন্তার অভিজ্ঞতার উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

নিয়ন্ত্রণ-খাদের স্তর নির্ণয় ও চিহ্নিত করিয়া খাদের অপরাংশে ধাবিত মৃৎস্তর অনুসরণ পূর্বক অনুভূমিক খননকার্য পরিচালনা করিতে হয়।। সাধারণতঃ নিয়ন্ত্রণ-খাদ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে নির্দিষ্ট খাদের অর্ধাংশে অথবা চতুরাংশে অনুভূমিক খননকার্য সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। সর্বদাই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাহাতে খননকার্য ক্ষুদ্র বর্গ-ক্ষেত্রানুরূপে পরিচালিত হয়। প্রয়োজনানুসারে সমতল স্বল্পপরিসর বর্গক্ষেত্র সূতলিদ্বারা নির্দিষ্ট করিতে হইবে। উক্ত অংশেই মৃত্তিকা-কর্তন সীমাবদ্ধ রাখিয়া খননকার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করা কর্তব্য। যাহাতে খনিতাংশ সর্বদাই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অন্যথায় প্রত্নবস্তুর অন্বেষণ, স্তরায়ণ-নির্ধারণ, জরিপ ও আলোকচিত্র-গ্রহণ প্রভৃতির কার্যক্রম ব্যাহত হইবে। একটি স্তরের গচ্ছিত মৃত্তিকার খননকার্য নির্দিষ্ট খাদ্যাংশে সমাপ্ত করিয়া পুনরায় নিয়ন্ত্রণ-খাদে খননকার্য আরম্ভ করিতে হয়। এই প্রকার স্তরানুসারে খনন করিয়া প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত উৎখনন পরিচালনা করাই বিধিসঙ্গত।

উৎখননে অল্প পরিমাণ মৃত্তিকা কর্তন আবশ্যক। একই সময়ে অধিক পরিমাণ মৃত্তিকা কর্তিত বা গচ্ছিত হইলে স্তরায়ণ-নির্ধারণ ও প্রত্নবস্তুর স্তর-স্থিরীকরণ এবং অপর কার্যক্রম বিফলীকৃত হইবে। সর্বদা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাহাতে দুই বা ততোধিক স্তরের গচ্ছিত মৃত্তিকা সংমিশ্রিত না হয়। অন্যথায় প্রত্নবস্তুর স্তর-নির্ণয় করা

সম্ভবপর হইবে না এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন পর্ব নির্ধারণ করাও দুঃসাধ্য হইবে। প্রতিটি স্তরের প্রত্নবস্তুর যথার্থ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা অত্যাবশ্যক। উপরন্তু সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে অধিক পরিমাণ মৃত্তিকা খাদের খনিতাংশে স্তূপীকৃত না হয়। মৃত্তিকান্তরানুসারে মন্দগতিতে খননকার্য চালনা করিয়া অল্প পরিমাণ মৃত্তিকা কর্তন করাই বিধেয়। বৃহদাকার মৃত্তিকাপিণ্ড সর্বদা বিদীর্ণ এবং চূর্ণ করিতে হইবে। কারণ উক্ত পিণ্ডের মধ্যেও প্রত্নবস্তু বিন্যস্ত থাকা স্বাভাবিক। কর্তিত মৃত্তিকার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণকার্য সমাপন করিয়া উক্ত মৃত্তিকা অপসারণ করিতে হয়।

মৃত্তিকান্তর সনাক্ত ও চিহ্নিত করিয়া প্রতিটি মৃৎস্তরের চিহ্নিত রেখায় একটি ক্ষুদ্র অঙ্কপট্টি নিবিষ্ট করা আবশ্যক। উক্ত পট্টিতে প্রত্নস্থলের সংক্ষিপ্ত নাম, খাদের ক্রমিক সংখ্যা এবং মৃত্তিকান্তরের অনুক্রম সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে হয়। পট্টিতে একটি বৃত্তের মধ্যে মৃৎস্তরের ক্রমিক সংখ্যা লিখিত থাকিবে, যেমন ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি। উক্ত পদ্ধতি অনুসারে প্রতি স্তরে স্তরে খননকার্য পরিচালনা করা কর্তব্য (চিত্র নং ১৭)। খনন করিবার সময় প্রতি স্তর হইতে উদ্ধৃত প্রত্ন-বস্তুর সর্বাত্মক বর্ণন নিয়মানুসারে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্নবস্তু-সহকারীর নিকট প্রেরণ করা বিধেয়। উক্ত বিষয় পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে। একটি মৃত্তিকান্তর অপর স্তরদ্বারা আবৃত থাকিলে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, ঊর্ধ্বতন স্তর পরবর্তী সময়ে গচ্ছিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত স্তরদ্বয় সমকালবর্তী হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। উপর্যুপরি গচ্ছিত মৃত্তিকার রূপ ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করিয়া স্তরায়ণ নির্ণয় করিতে হইবে (চিত্র নং ১৬)।

এই প্রসঙ্গে সৌধসম্বলিত প্রত্নস্থলের খননকার্যক্রম আলোচনীয়। প্রায় সকল ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নস্থলে বাস্তু-নিদর্শনের অস্তিত্ব বর্তমান। অতীব সাধারণ একক পর্যায়ভুক্ত সৌধসম্বলিত প্রত্নস্থলে উৎখনন সহজতর। এই আবাসস্থলের গৃহ সাধারণতঃ প্রাকৃতিক

মৃত্তিকার উপর নির্মিত থাকে। উক্ত বসতির ধ্বংস-পরবর্তী নিদর্শন বর্তমান থাকা স্বাভাবিক। ক্রমান্বয়ে খনন করিয়া প্রথমে ধ্বংস-পরবর্তী সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করিতে হইবে। ধ্বংসাবশেষের নিম্নেই বসতির ভগ্নাবশেষের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নিদর্শনের নিম্নে গৃহতল বা মেঝের স্থিতি স্বাভাবিক। বসতির ভগ্নশেষ অপসারণ করিয়া গৃহতল আবরণমুক্ত করা প্রয়োজন। গৃহতল সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়ালের ভিত-খাত অনাবৃত করিবার জন্য খনন-কার্য চালনা করিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেঝ অপসারণ করিয়াই অধঃ-উৎখনন সম্ভবপর। আবরণমুক্ত ভিত-খাতের সীমারেখা চিহ্নিত করিয়া দেওয়ালের গঠন-প্রণালী অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। চিত্র নং ১৫ক-তে উক্ত একক পর্যায়ভুক্ত দেওয়ালের প্রতি-কৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই চিত্র হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাকৃতিক মৃত্তিকায় ভিত-খাত খনন করিয়া দেওয়াল নির্মিত হইয়াছে। দেওয়াল-এর সংশ্লিষ্ট (স্তর নং ৪) মৃত্তিকা চুরমুজকৃত মেঝ। মেঝের উপরে (স্তর নং ৩) বসতির ধ্বংসশেষ বর্তমান। এই বসতির ধ্বংসশেষের উপরই ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং উহার উপরিস্থ স্তরই হিউমসের নিদর্শন।

কিন্তু উপর্যুপরি একাধিক সৌধ-পর্যায়ভুক্ত বসতির নিদর্শনসম্বলিত প্রত্নস্থলের উৎখনন আয়াসসাধ্য। সাধারণতঃ পরবর্তী বসতি সংস্থাপকগণ পূর্বতন সৌধ ধ্বংস করিয়াই নূতন বাস্তু নির্মাণ করিত। মানবীয় ও প্রাকৃতিক তৎপরতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গৃহ পরিত্যক্ত হইত। দেওয়ালের অপসারণ বা লুণ্ঠন সাধারণতঃ মেঝের উপরাংশেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং মেঝের এবং উহার নিম্নস্থ দেওয়ালের নিদর্শন বর্তমান থাকিবে। উক্ত ক্ষেত্রে সৌধমালার সম্পূর্ণ বাস্তু-নক্শা-অঙ্কন সম্ভবপর। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লুণ্ঠনকার্যের ফলে ভিত-খাত পর্যন্ত দেওয়াল ধ্বংস করা হইত। এই ক্ষেত্রে সৌধমালার বাস্তু-নক্শা অঙ্কন করা সম্ভবপর নহে। বহু ক্ষেত্রে লুণ্ঠনগর্ত গচ্ছিত রাবিশ দ্বারা

আবৃত থাকে। অতএব বহিরাগত পুরাবস্তু বিন্যস্ত হইবার সম্ভাবনাও বর্তমান। এই সকল ক্ষেত্রে খননকার্য অতীব সাবধানতার সহিত চালনা করিতে হয়। চিত্র নং ১৫খ-তে উক্ত প্রত্নস্থলের খনন-পদ্ধতি নির্দিষ্ট হইয়াছে। চিত্রের উত্তর দিক হইতে পঞ্চ লুণ্ঠনগর্ত (নং ক, খ, গ, ঘ, ঙ) বর্তমান। লুণ্ঠনগর্ত নং ক বর্তমানকালেই পূর্বতন দেওয়াল কর্তন করিয়া খনিত হইয়াছে। লুণ্ঠনগর্ত নং গ অধিকতর গভীর। প্রথম আবরণমুক্ত বসতির নিদর্শনের (নং ৩) নিম্নে মেঝ নং ১ বিদ্যমান। উহার নিম্নদেশে অপর দুইটি লুণ্ঠনগর্ত এবং পূর্বতন মেঝের উপর বসতির নিদর্শন অনাবৃত হইয়াছে। এই মেঝের (নং ২) নিম্নে অপর একটি বসতির স্থিতি লক্ষণীয়। এবং উহার নিম্নে অপর একটি মেঝ (নং ৩) বর্তমান। প্রাকৃতিক মৃত্তিকায় কর্তিত স্তম্ভগর্তের নিদর্শনের আবিষ্কারও গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত চিত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রথম গৃহ দারুনির্মিত ছিল। তৎপরে ইষ্টকের দেওয়াল উক্ত মেঝ কর্তন করিয়া নির্মিত হইয়াছে। দেওয়াল নং অ এবং আ-এর সমসাময়িক মেঝদ্বয়ের (নং ১, ২) উপর বসতির নিদর্শন বিদ্যমান। মেঝ নং ৩ সর্বশেষ বসতির প্রমাণ। অতএব এই চিত্রে তিনটি উপর্যুপরি বসতির নিদর্শন পাওয়া যায়। উপরি-উক্ত নিয়মানুসারে উৎখনন করিয়াই বিভিন্ন যুগের প্রত্ননিদর্শন আবরণমুক্ত করা বিধেয়। এই প্রসঙ্গে স্তরায়ণ বা স্তরবিন্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কিত আলোচনা প্রয়োজন।

। ৮ ।

স্তরবিন্যাসের গুরুত্ব

উৎখননতত্ত্বে স্তরবিন্যাস বলিতে মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন-সম্বলিত উপর্যুপরি গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তরের সীমারেখা নির্ধারণ ও কালানু-

-ক্রম নির্ণয় এবং সংস্কৃতির পৌর্বাপর্ব অবধারণ বুঝায়। প্রত্নস্থলে মানব-বসতির নিদর্শন কালানুক্রমিক গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তরে বিন্যস্ত থাকে। প্রাচীনতম মানববসতি প্রাকৃতিক ও মানবীয় কর্মতৎপরতায় বিলুপ্ত হয় এবং ধ্বংসোত্তর পর্যায়ে মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হয়। উক্ত প্রকার মৃত্তিকাচ্ছাদিত ভূপৃষ্ঠেই পুনরায় মানববসতি সংস্থাপিত হইত। এই প্রকারে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া একই স্থলে একাধিক মানববসতির বাস্তব নিদর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায়। আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শন এক বা একাধিক মৃত্তিকাস্তর বা সংস্কৃতি-পর্বভুক্ত হইবে। স্তরবিন্যাসতত্ত্বে সর্বনিম্নস্থ প্রত্ননিদর্শন প্রাচীনতম এবং উর্ধ্বস্থ নিদর্শন সর্বশেষ যুগভুক্ত বলিয়া নির্ণীত। অধঃ হইতে উর্ধ্বে অনুক্রমিক সংস্কৃতির কালও নিরূপণীয়। লুণ্ঠনগর্ত, আবর্জনা-খানা, খাত প্রভৃতির পৌর্বাপর্য নির্ধারণও স্তর-বিন্যাসতত্ত্বের অন্তর্গত। একই সংস্কৃতিভুক্ত প্রত্নাভিজ্ঞান সদৃশ হইবে এবং ভিন্ন বাস্তব নিদর্শন অপর সংস্কৃতির পরিচায়ক। অন্য এক স্থানের কাল-নির্ধারিত নিদর্শনের সহিত উৎখনিত সন-তারিখ-সম্বলিত এবং সন-তারিখ-বিহীন পুরাবস্তুর তুলনামূলক বিশ্লেষণও স্তরবিন্যাসের ভিত্তি স্বরূপ। অধিকন্তু একই সংস্কৃতির পর্বভুক্ত উপর্যুপরি একাধিক সৌধ-মালার অস্তিত্বও অস্বাভাবিক নহে।

স্তরবিন্যাস (ষ্ট্রাটিফিকেশন্) নির্ধারণ- প্রণালী ভূবিদ্যার অন্তর্গত। উৎখনক ভূবিদ্যার সাহায্যেই স্তরবিন্যাস নির্ণয় করেন। কিন্তু ভূতাত্ত্বিক প্রাকৃতিক স্তরবিন্যাস অনুশীলন করেন। উৎখনক মানবীয় তৎপরতায় গচ্ছিত মৃত্তিকার স্তরবিন্যাস নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করেন। খননকার্যের সময় উপর্যুপরি মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন পূর্বক স্তরায়ণ নির্দিষ্ট করিতে হয়। ছেদের স্তর-নক্শা অঙ্কন করিয়া অনালোড়িত বা আলোড়িত মৃত্তিকাস্তর অনুশীলন ও নির্ধারণ করিয়াই স্তরবিন্যাস স্থির করা সম্ভবপর।

স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক নীতি উল্লেখযোগ্য। অতীতে ভূবিদ্যায় অনুসৃত নীতির অনুকরণে সংস্কৃতি-

পর্বের অনুক্রম- সংখ্যা বা নামকরণ উর্ধ্ব হইতে অধঃ অঙ্কিত হইত। এমন কি বিভিন্ন সৌধ- পর্যায়ের ক্রমিক সংখ্যাও উর্ধ্বাধ নিয়মানুসারে লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ উর্ধ্বাধ খনন-কার্যে সর্বপ্রথম অনাবৃত দেওয়াল ও সংস্কৃতি- নিদর্শন যথাক্রমে-পর্যায় নং ১ এবং সংস্কৃতি- পর্ব নং ক এবং পরবর্তী পর্যায়ের দেওয়াল ও অন্য সংস্কৃতিভুক্ত নিদর্শন যথাক্রমে দেওয়াল- পর্যায় নং ২ এবং সংস্কৃতি- পর্ব নং খ নামে অঙ্কিত হইত। কিন্তু উৎখননের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উক্ত নীতি অনুসরণ করা ভ্রমাত্মক। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত উৎখননের নীতি সম্পূর্ণ বিপরীত। দেওয়ালের পর্যায়ের এবং সংস্কৃতি-পর্বের অনুক্রম সংখ্যা অধঃ হইতে উর্ধ্বগামী হইবে। মেসোপটামিয়ায় ও অন্যত্র উপরি-উক্ত ভ্রমাত্মক নীতি অনুসারে উর্ধ্ব হইতে অধঃ অনুক্রমিক সংস্কৃতির সংখ্যামান নির্দিষ্ট হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো প্রভৃতি প্রত্নস্থলের খননকার্যও উল্লেখনীয়। হরপ্পার সমাধিক্ষেত্র এইচ-এ শব সমাধিস্থ করিবার দ্বিবিধ প্রচলিত প্রথার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে—অস্থিসম্বলিত মৃৎপাত্র-সমাধি এবং প্রলম্বিত শব-সমাধি বা একক শব-সমাধি। স্তরবিন্যাসানুসারে সর্বপ্রথম অনাবৃত অস্থিসম্বলিত মৃৎপাত্র-সমাধির সংস্কৃতি-পর্ব এবং নিম্নস্থ একক শব-সমাধির সংস্কৃতি-পর্ব যথাক্রমে ক ও খ হইবে। কিন্তু বর্তমান উৎখননের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃতি-পর্ব যথাক্রমে অধস্তন পর্ব ক এবং উর্ধ্বতন পর্ব খ হইবে। অর্থাৎ বিভিন্ন সৌধের পর্যায় ও সংস্কৃতির পর্ব প্রাচীনতম হইতে সর্বশেষ নিদর্শন পর্যন্ত অনুক্রমিক সংখ্যায় অঙ্কিত করিতে হইবে।

উৎখনন-বিজ্ঞানের ও ভূতত্ত্বের স্তরবিন্যাস সর্বক্ষেত্রে অনুরূপ নহে। ভূবিদ্যায় উর্ধ্বস্থ নদীর ধাপের বিন্যাস সর্বপ্রথম ও প্রাচীনতম। উৎখনন-বিজ্ঞানে সর্বপ্রথম ও প্রাচীনতম স্তরায়ণ নিম্নতম হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে উৎখননকার্যে সর্বদাই উৎখনিত অধস্তন

প্রত্নিদর্শন প্রাচীনতম বলিয়া ধার্য করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অতীতে উপর্যুপরি গচ্ছিত মৃত্তিকার খননকার্য স্তরানুসারে পরিচালিত হইত না। সুতরাং স্তরায়ণ সম্পর্কিত সকল তথ্য অবিদিত ছিল। বর্তমানে আবিষ্কৃত প্রত্নিদর্শন অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতি-পর্ব নির্ধারণ করা হয়। একের বেশি মৃত্তিকাস্তর একক সংস্কৃতি- পর্বভুক্ত হওয়াও স্বাভাবিক। একাধিক মৃৎস্তরে সদৃশ প্রত্নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলেই উক্ত স্তরসমূহ একই সংস্কৃতির পর্বভুক্ত হইবে। ভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলে অপর সংস্কৃতির অস্তিত্ব বা প্রভাব সূচিত হয়। প্রত্নবস্তুর পরিমাণাত্মক বিশ্লেষণের সাহায্যেও ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব নির্ধারণ করা যায়। এই সকল প্রণালী অনুসরণ করিয়াই সংস্কৃতি-পর্ব সুনির্দিষ্ট করিতে হয়। অধিকন্তু স্তর-বিন্যাস ও সন- তারিখসম্বলিত প্রত্নবস্তুর সাহায্যেও প্রত্যেক স্তরের এবং লেভলের কালনির্ণয় করা সম্ভবপর। প্রত্নিদর্শনের কালনির্ণয় উহার সহিত সংশ্লিষ্ট লেভ্‌ল্‌ দ্বারাও নির্ধারণ করা যায়। সন-তারিখ-সম্বলিত প্রত্নবস্তুর অবর্তমানে নির্ধারিত স্তরবিন্যাসের সাহায্যেও কালনির্ণয় করা সম্ভব। প্রয়োজন অনুসারে মৃৎস্তরের বেধ ও স্থূলতা অনুশীলন করিয়া প্রতি স্তর গচ্ছিত হইতে কত সময় ব্যয়িত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায়। উক্ত নির্ণয়কার্যে প্রত্নস্থলের বর্তমান বায়ুর ধাবন-গতির মাত্রা এবং মৃত্তিকা বহনের ও ধারণের শক্তির মান নির্ধারণ করিয়া প্রতি মৃৎস্তরের কাল নিরূপণ করাও সম্ভব। এতদ্‌-ব্যতীত অপর প্রত্নস্থলের নির্ধারিত যুগভুক্ত পুরাবস্তুর সহিত আবিষ্কৃত নিদর্শনের তুলনামূলক তত্ত্ব হইতেও বিভিন্ন পর্যায়ের ও পর্বের কাল নির্ণয় করা যায়। এই প্রকার অনুশীলন করিয়াই স্তরবিন্যাসের কাল-নির্ণয়কার্য সম্পাদন করা বিধেয়। উপরি-উক্ত তথ্যসম্বলিত ছেদ-স্তরায়ণের চিত্র হইতে স্তরবিন্যাস নির্ধারণ-কার্যক্রমের সম্যক পরিচিতি লাভ করা যায়।

স্তরবিন্যাস সুনির্দিষ্ট না হইলে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিকৃত হইবে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অতীতে পরীক্ষণ-খাদ নখন

করা হইত। এই খাদে কোন ইষ্টকনির্মিত দেওয়াল অনাবৃত হইলে উক্ত নিদর্শন অনুধাবন করিয়া খননকার্য পরিচালনা করিবার নীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিলে সকল প্রকার ঐতিহাসিক নিদর্শন বিনষ্ট হইবে। অনাবৃত সৌধের সন-তারিখসম্বলিত প্রত্নবস্তু দ্বারা কালনিরূপণ করা অসম্ভব হইলে, উক্ত সৌধের নির্মাণকাল এবং অপর প্রত্ননিদর্শনের কালনির্ধারণ স্তর-বিন্যাসের সাহায্যেই নির্ণয় করিতে হয়। মৃত্তিকাস্তরের বৈশিষ্ট্যের উপরই সৌধের ধারাবাহিক ইতিহাসের রূপায়ণকার্য নির্ভর করে। বাস্তুনির্মাণ ও ধ্বংসের ইতিবৃত্তও স্তরবিন্যাসের সাহায্যে রূপায়িত করা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি- অনুসৃত উৎখননই স্তরবিন্যাস নির্ধারণ করিয়া প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃত অবস্থান ও পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ। স্তরবিন্যাসের সাহায্যেই সংস্কৃতির বিবর্তনের এবং উহার প্রকৃত রূপের ও বৈলক্ষণ্যের তথ্য নিরূপণ করা সম্ভবপর।

সৌধ-ধ্বংসাবশেষের এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনের স্তরানুক্রম কাল-নির্ণয় তিন প্রকার অনাবৃত এবং উদ্ধৃত প্রত্নাভিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল: (১) প্রাক্-ইমারত গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তর ও প্রত্ন-নিদর্শন; (২) সৌধের সমসাময়িক মৃৎস্তর ও প্রত্ননিদর্শন; (৩) ইমারত-উত্তর মৃত্তিকাস্তর ও প্রত্ননিদর্শন। এই প্রকার তথ্য হইতেই প্রাক্-ইমারত, সমসাময়িক ইমারত এবং ইমারত-উত্তর পর্যায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব।

কিন্তু অনধ্যুষিত অবস্থান-ভূমিতে বাস্তু নির্মাণকালীন বাস্তব নিদর্শ-নের প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতীতে অবস্থানভূমি সমতল করিয়াই গৃহ নির্মিত হইত। উক্ত গৃহের ভিত্-খাত কর্তনের সময়ই মৃত্তিকা সর্বপ্রথম আলোড়িত হইয়াছিল। সাধারণতঃ অসমতল অবস্থানভূমি অপর স্থান হইতে আনীত মৃত্তিকা দ্বারা সমতল করা হইত। এই মৃত্তিকায় প্রত্ননিদর্শনের স্থিতির সম্ভাবনাও বর্তমান। এই প্রত্ননিদর্শন সাম্প্রতিক বা পূর্বতন যুগভুক্ত হইবে। এমন কি দেওয়াল নির্মাণ-

কালীনও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, মুদ্রা প্রভৃতি ভিত-খাতে বা আলোড়িত মৃত্তিকায় প্রক্ষিপ্ত বা দৈবাৎ ভূপতিত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। এই প্রকার পুরাবস্তু হইতে দেওয়ালের নির্মাণকাল স্থির করা যায়। কিন্তু উক্ত পুরাবস্তু অনেক দিন যাবত প্রচলিত থাকার সম্ভাবনাও বর্তমান। তবে কোন প্রত্নবস্তুরই দেওয়াল নির্মাণের পরবর্তী যুগভুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং সর্বশেষ যুগভুক্ত প্রত্ন-বস্তুর সময়েই বা উক্ত যুগের পূর্বে দেওয়াল নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্তিকাস্তর, লুণ্ঠনগর্ত, খানা, স্তম্ভগর্ত প্রভৃতি দ্বারা মৃত্তিকা আলোড়িত হইলে দেওয়ালের নির্মাণোত্তর যুগের পুরাবস্তুর আবিষ্কারও অসম্ভব নহে। স্তরায়ণ অনুশীলন করিয়াই উক্ত প্রকার সকল তথ্য নির্ণয় করা সম্ভবপর।

অধিকন্তু বসতির ভগ্নশেষোত্তর গৃহ ব্যবহারকালীন পুরাবস্তুর আবিষ্কারের সম্ভাবনাও অধিক। সাধারণতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগে মৃৎপাত্র-ভগ্নাংশ, খাদ্যদ্রব্যের প্রক্ষিপ্তাংশ, অলঙ্কার-সামগ্রী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ মেঝের উপরই গচ্ছিত থাকে। উক্ত নিদর্শনসমূহ আলোড়িত মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত থাকিলে মেঝের ব্যবহারকাল উহাদের সমসাময়িক হইবে। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের মেঝ প্রায়শঃ পরিচ্ছন্ন থাকে। সুতরাং মেঝের উপর পুরাবস্তুর অনাবিষ্কার স্বাভাবিক। কিন্তু জঞ্জাল-খানার বিদ্যমানতার প্রমাণ বিরল নহে। উক্ত খানা হইতে আবিষ্কৃত পুরাবস্তুর অনুশীলন করিয়া মেঝ-ব্যবহারের কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর। দেওয়াল-আবৃত-মৃত্তিকা-স্তরের অভ্যন্তরস্থ পুরাবস্তু হইতেও দেওয়াল-ধ্বংসপ্রাপ্তির কাল নির্ণয় করা যায়। গৃহ পরিত্যক্ত হইলে পুরাবস্তু-নিদর্শনের আবিষ্কার অস্বাভাবিক। কিন্তু প্রাকৃতিক ও মানবীয় সক্রিয়তায় গৃহ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে প্রত্ননিদর্শন বর্তমান থাকিবে। এই নিদর্শন হইতেও গৃহের ধ্বংস-প্রাপ্তির কাল নির্ণয় করা যায়।

ধ্বংসপ্রাপ্ত সৌধ ক্রমান্বয়ে মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হয়। বায়ু বাহিত ধূলিকণাযোগে আচ্ছাদিত হইলে উক্ত স্তরে প্রত্নবস্তুর বিদ্যমানতা স্বাভাবিক নহে। কিন্তু ঐ স্তরেই দৈবাৎ কোন ভূপতিত বা প্রক্ষিপ্ত পুরাবস্তুর আবিষ্কার স্বাভাবিক। অধিকন্তু পরবর্ত্তী সময়ে মানবীয় কর্মতৎপরতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তর আলোড়িত হইলে উহার অভ্যন্তরস্থ প্রত্নবস্তু প্রত্নস্থলের হিউমসের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়াও স্বাভাবিক। সাধারণতঃ কৃষিকার্যের ফলেই নিম্নস্থ নিদর্শন উপরে গচ্ছিত স্তরের সহিত সংমিশ্রিত হয়। এই প্রকার পুরাবস্তুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবর্ত্তমান। সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অকুস্থলে বা যথাস্থানে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুই স্তরবিন্যাস নির্ণয়কার্যে সকল প্রকার তথ্য পরিবেশন করে। এতদ্ব্যতীত অনেক প্রত্নস্থলে একাধিক সৌধ-পর্যায়, স্তম্ভগর্ত, লুণ্ঠন-গর্ত প্রভৃতির বিদ্যমানতাও উল্লেখনীয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পূর্বতন সৌধের ইষ্টক লুণ্ঠন করিয়া পরবর্ত্তী দেওয়াল নির্মাণ করিবার প্রমাণও বিরল নহে। এই প্রকার কার্যের পরিণামে প্রত্নবস্তু আলোড়িত হইয়া বিভিন্ন যুগের ও সংস্কৃতি-পর্বের নিদর্শনের সহিত মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রণের ফলে কাল-নিরূপণ ও সংস্কৃতির পর্ব নির্ধারণ করা আয়াসসাধ্য। উক্ত প্রকার প্রত্নস্থলে গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তর অনুধাবন পূর্বক ক্রমান্বয়ে খননান্তে নিদর্শনসমূহের বাস্তব তথ্য নির্ণয় করিয়াই স্তরবিন্যাসের কাল নিরূপণ করা সম্ভব। পরবর্ত্তী দৃষ্টান্তে এবং পর্যালোচনায় স্তরবিন্যাসের সর্বপ্রকার তথ্য নির্ণয় করিবার পদ্ধতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, একই স্তরে ও লেভ্লে বিভিন্ন যুগের প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইলে উহার সহিত মৃৎস্তরের সম্পর্ক নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক। হুইলার দুইটি চিত্রের সাহায্যে একই লেভ্লে বা স্তরে বিভিন্ন সময়ের প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার সম্পর্কিত সমস্যা ব্যাখ্যা করিয়া উৎখননকার্যে স্তরবিন্যাসের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। অতীতে সমুদ্রপৃষ্ঠ (সী-লেভ্ল্) হইতে আবিষ্কৃত সৌধের ও প্রত্নবস্তুর

পরিমাপ গ্রহণ করা হইত। এমন কি একই সমতল ভূমিতে বা সমস্তরে বিভিন্ন যুগের প্রত্নবস্তু সমসাময়িকরূপে বর্ণিতও হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উৎখনক ম্যাকাই-এর বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, মহেঞ্জোদারোতে সকল প্রকার প্রত্ননিদর্শনের পরিমাপ সমুদ্র-সমতল হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রতিদিন প্রত্যুষে পরিমাপ-গ্রহণ-যন্ত্র একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে সংস্থাপন করিয়া সংখ্যামান নির্ধারণ করা হইত। ম্যাকাই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাঙ্গণের বা গৃহের প্রবেশ-দ্বারের উপরে ও নিম্নে কোন প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইলে উহার সংস্কৃতি-পর্ব নির্ধারণকার্য দুঃসাধ্য। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কোন সৌধের ভিতখাতে এবং উহার সন্নিকটে কোন প্রকার প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইলে, উহা সৌধের সমকালবর্তী হইবে। কারণ উক্ত প্রত্নবস্তু সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই পদ্ধতি অনুসরণ করা ভ্রমাত্মক। চিত্র নং ১৮ক লেভলকৃত স্তরায়ণের প্রতীক। এই চিত্রে হরপ্পার সংস্কৃতির সীলমোহর (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রক), কুষাণযুগের মুদ্রা (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী) এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা একই দেওয়াল-সমতল স্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত প্রত্ন-বস্তুত্রয় সমসাময়িক হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ। এই প্রকার অনেক ভ্রান্ত ও অবাস্তব তথ্যও পরিবেশিত হইয়াছে। স্তর-বিন্যাস অনুশীলন করিয়াই উক্ত ভ্রম সংশোধন করা যায়। চিত্র নং ১৮খ-তে উল্লম্বচ্ছেদের প্রকৃত স্তরায়ণের প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই স্তরায়ণ বিশ্লেষণ করিয়া উপরি উক্ত প্রত্নবস্তুত্রয়ের আবিষ্কার সম্পর্কিত যথার্থ তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। উক্ত চিত্রে (চিত্র নং ১৮খ) প্রত্ন-নিদর্শনেরও সর্বপ্রকার তথ্য নির্দেশ করা হইয়াছে। পশ্চিম ও পূর্ব পার্শ্বদ্বয়ে হরপ্পা এবং কুষাণ যুগের দেওয়াল সুনির্দিষ্ট। কেন্দ্রাংশে একটি ঊর্ধ্বাধ গর্ত বর্তমান। স্তরায়ণ অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সম্প্রতি কালেই উক্ত গর্ত কর্তিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ গর্তের অভ্যন্তরস্থ প্রত্নবস্তু বর্তমান যুগভুক্ত হইবে। হরপ্পার

সীলমোহর ৮নং মৃৎস্তরের মধ্যাংশে বিন্যস্ত। কিন্তু কুষাণ যুগের মুদ্রা ৯ নং স্তরের উপরাংশে গচ্ছিত ধ্বংসাবশেষের অভ্যন্তরে ন্যস্ত। এই ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বে একটি লুণ্ঠন-গর্তও বিদ্যমান। উক্ত লুণ্ঠন-গর্ত ও ধ্বংসাবশেষ বা রাবিশ পরবর্তীকালে কর্তিত ও গচ্ছিত হইয়াছে। বামদিকস্থ হরপ্পা যুগের দেওয়ালের উপরিভাগেও লুণ্ঠন-গর্ত বর্তমান। এই লুণ্ঠন-গর্ত সংস্তর নং ৪ দ্বারা আবৃত। দক্ষিণ-দিগ্‌বর্তী কুষাণ যুগের দেওয়ালের উপরিভাগেও লুণ্ঠন-গর্ত ও ভগ্নাবশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু উক্ত লুণ্ঠন-গর্ত এবং ভগ্নাবশেষ সংস্তর নং ২ দ্বারা আবৃত এবং সংস্তর নং ৪ লুণ্ঠন-গর্তের পূর্বতন। অধিকন্তু হরপ্পা যুগের দেওয়ালের উপরের গর্ত সংস্তর নং ৪ দ্বারা আবৃত। এই তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, বামদিকস্থ লুণ্ঠন-গর্ত দক্ষিণদিকস্থ গর্ত হইতে অধিকতর পুরাতন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, কুষাণ যুগের মুদ্রা ও দেওয়াল হরপ্পাযুগের পরবর্তী। এই প্রকার স্তরবিন্যাসের অনুশীলন ব্যতিরেকে প্রত্ননিদর্শনের কাল নির্ণয় এবং সংস্কৃতির পৌর্বাপর্ব নির্ধারণ করা সম্ভব নহে।

হুইলার অপর দুইটি চিত্রের সাহায্যে স্তরবিন্যাসের গুরুত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। চিত্র নং ১৯খ-তে দেওয়াল অনুসরণ পদ্ধতি দ্বারা অনাবৃত দেওয়াল ও ছেদস্তর নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই চিত্র হইতে স্তর-বিন্যাসের সহিত দেওয়ালের সম্পর্ক নির্ণয় করা অসম্ভব। ফলে অনুক্রম সংস্কৃতির সকল প্রকার তথ্যই বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাও সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে উক্ত অংশেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎখনন করিবার ফলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র পরিবেশিত হইয়াছে। চিত্র নং ১৯ক-তে দেওয়াল ও অপর ধ্বংসাব-শেষের সহিত সংশ্লিষ্ট স্তরায়ণের সম্পর্ক ও গুরুত্ব বোধগম্য। উক্ত চিত্রে দেওয়ালের দক্ষিণ পার্শ্বের স্তরবিন্যাসের দুইটি স্তরে (নং ৯ এবং ১০) গ্রাম্য সংস্কৃতির বসতি ছিল (সংস্কৃতি-পর্ব ক)। এই সংস্তরদ্বয়ে স্তম্ভগর্ত, খোলামকুচি প্রভৃতি প্রত্ননিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স্তম্ভগর্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে, কাষ্ঠ দ্বারা ছাউনি নির্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই স্তরদ্বয়কে (নং ৯ এবং ১০) কর্তন করিয়া দেওয়াল নং খ-এর ভিতখাত খনন করা হইয়াছে। এই খাতের পার্শ্বদ্বয় মৃত্তিকাস্তর নং ৮ দ্বারা আবৃত। মেঝ নং আ-এর ভিত উক্ত স্তরের (নং ৮) উপরই বিন্যস্ত। উপরাংশে গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তর (নং ৭) দেওয়ালের সমসাময়িক সংস্কৃতি-পর্ব নং খ হইবে। মর্দিত মেঝ নং অ এই অধ্যুষিত স্তরের উপরিভাগের নিদর্শন। ইহার উপর অপর একটি অধ্যুষিত স্তর (নং ৬) বর্তমান। কিন্তু এই মৃত্তিকাস্তর হইতেও সংস্কৃতি-পর্ব নং খ-এর অন্তর্ভুক্ত স্তরে উন্নত ধরনের প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত অধ্যুষিত স্তরের উপর সৌধের ধ্বংসাবশেষ ও রাবিশ, অগ্নিদগ্ধ দারু এবং মৃত্তিকা অনাবৃত করা হইয়াছে। এই সকল উপাদান হইতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত পর্যায়ের বাস্তু-নিদর্শন অগ্নিকাণ্ডের ফলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। দেওয়াল ধ্বংস হইবার পর ভিত খনন করিয়া অগ্নিদগ্ধ-ইষ্টক দ্বারা অপর একটি দেওয়াল (নং ক) নির্মিত হইয়াছিল। ইহার সহিত মৃত্তিকাস্তর নং ৩ সংশ্লিষ্ট। উক্ত স্তর হইতেও এক নূতন সংস্কৃতিভুক্ত প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব এই নূতন সংস্কৃতিকে পর্ব নং গ-তে নির্ধারিত করা যায়।

উল্লিখিত অনাবৃত প্রামাণিক নিদর্শন হইতে প্রতিপাদিত হয় যে, সংস্কৃতি-পর্ব নং খ-এর অন্তর্ভুক্ত আবাসস্থল অগ্নিদগ্ধ হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পরে এক বহিরাগত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সংস্কৃতিভুক্ত নরগোষ্ঠী উক্ত স্থানেই বসতি স্থাপন করিয়াছিল। দেওয়ালের বামপার্শ্বে (চিত্র নং ১৯ক) প্রাক্-দেওয়াল-নির্মাণ-কালের স্তরত্রয় (নং ৮, ৯ ও ১০) অনাবৃত হইয়াছে। স্তর নং ৮-এর উপর একটি রাস্তা (রা নং এ) বিদ্যমান। স্তর নং ৫ন রাস্তাকে (রা নং এ) স্থানচ্যুত করিয়াছে। এই রাস্তাটি দুইবার নির্মিত হইয়াছিল (রাস্তা নং ঐ, ও)। কিন্তু উপরের সংস্তরে নির্মিত রাস্তা নিম্নস্থ সংস্তরের রাস্তা হইতে নিকৃষ্টতর।

এই নিদর্শন হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, তৎকালীন নগরের পৌরসংস্থার কার্যক্রমের অবনতি ঘটিয়াছিল। সংস্কৃতি-পর্ব নং খ-এর এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট দেওয়ালের সংস্তরের রাস্তাকে সুদৃঢ় করিবার প্রচেষ্টাও পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। ক্রমাগত লোক ও যানবাহন চলাচলের ফলে রাস্তা (রা নং ও) গর্তে বা গহ্বরে পরিণত হইয়াছিল। এই প্রকার পরিবর্তন অধুনা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেও লক্ষ্য করা যায়।

স্তরবিন্যাসের সাহায্যে অনুক্রমিক কাল নির্ণয় ও সংস্কৃতির পর্ব-নির্ধারণ অপর একটি চিত্রের অনুশীলন হইতে অধিকতর সহজবোধ্য হইবে। সন-তারিখসম্বলিত প্রত্নবস্তুর অনুক্রম সংস্কৃতির পর্ব নির্ধারণ-কার্য বর্তমানে অতীব সহজেই সম্পাদন করা যায়। চিত্র নং ১৪খ-তে ব্রহ্মগিরি প্রত্নস্থলের উল্লম্বচ্ছেদের স্তরায়ণ অঙ্কিত হইয়াছে। ব্রহ্মগিরিতে তিনটি বিভিন্ন সংস্কৃতি পর্বের বিদ্যমানতা বিদিত ছিল—প্রত্নাশ্মীয় (প্যালিওলিথিক), মহাশ্মীয় (মেগালিথিক) এবং আন্ধ্র সংস্কৃতি। কিন্তু এই সংস্কৃতি-ত্রয়ের কালানুক্রম বিবর্তনের কোন বাস্তব বা প্রত্যক্ষ নিদর্শন বহুদিন যাবৎ অবিদিত ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হুইলার ব্রহ্ম-গিরিতে উৎখনন করিয়া উক্ত প্রকার নিদর্শন আবিষ্কারপূর্বক দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির অনুক্রম-কাঠামো এবং উহার যথার্থ অস্তিত্ব নির্ণয় করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। চিত্র নং ১৪খ-তে অঙ্কিত স্তরবিন্যাসের সাহায্যে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়।

এই স্তরবিন্যাসে কালানুক্রম আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর ভিত্তিতেই সংস্কৃতি-পর্ব নির্ধারিত হইয়াছে। প্রাচীনতম প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির পর্বকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—ক১ এবং ক২। প্রাকৃতিক মৃত্তিকার উপর গচ্ছিত সর্বনিম্নস্থ মৃত্তিকাস্তর (নং ১৮ এবং ১৯) প্রাগৈতিহাসিক পর্ব নং ক১ প্রস্তর নির্মিত কুঠার সংস্কৃতিভুক্ত। মৃত্তিকাস্তর নং ১৭ পর্যন্ত উক্ত সংস্কৃতির সত্তা বর্তমান ছিল। এই সংস্কৃতি-পর্বের কতিপয় বিশিষ্ট নিদর্শনও উল্লেখনীয়। মৃত্তিকাস্তর নং ১৫-১৯ কর্তন করিয়া অস্থিসম্বলিত মৃৎপাত্র সমাধিস্থ করা

হইয়াছিল। এই গর্ত হইতে একটি ব্রঞ্জ-দণ্ডও আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত সমাধি-গর্ত-স্তর নং ১৪এ দ্বারা আবৃত। সুতরাং সমাধি-গর্ত প্রাক্-স্তর নং ১৪এ হইবে। এই স্তরের পরবর্তী স্তরায়ণের উপর দেওয়াল, প্রস্তরখণ্ডবিন্যাস, স্তম্ভগর্ত প্রভৃতি অনাবৃত হইয়াছে। স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত নিদর্শনসমূহের সংস্কৃতি-পর্ব নির্ধারণ এবং কালনিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে। এই পর্বেই (ক২) প্রস্তর নির্মিত আয়ুধের সহিত তাম্র-ব্রঞ্জের নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। সুতরাং এই সংস্কৃতিকে তাম্রাশ্মীয় (প্রস্তর-তাম্র-ব্রঞ্জ) সংস্কৃতি-পর্ব বলিয়াই নির্ধারণ করা যায়। সংস্কৃতি-পর্ব খ মহাশ্মীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত। এই পর্বভুক্ত স্তর হইতে লৌহনির্মিত বস্তুর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃতীয় সংস্কৃতি-পর্ব গ ঐতিহাসিক যুগের আন্ধ্র বা সাতবাহন সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এই পর্বের স্তরায়ণ হইতেই আন্ধ্র নৃপতির মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত মুদ্রা হইতে সর্বশেষ সংস্কৃতি-পর্বের কালনির্ণয় স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় এবং প্রথম সংস্কৃতি-পর্বের অনুক্রম-কাল অবিদিত। কারণ উক্ত পর্বভুক্ত স্তরায়ণ হইতে কোন কাল-নির্দেশক প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। হুইলার স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া মহাশ্মীয় ও প্রাক্-মহাশ্মীয় যুগের সংস্কৃতি-পর্বের কাল নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রহ্মগিরির সংস্কৃতির প্রারম্ভিক পর্বদ্বয় খ্রীষ্টপূর্ব এক সহস্র বর্ষ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। মহাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্ব খ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। আন্ধ্র-সংস্কৃতি (পর্ব গ) প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্তরবিন্যাস অনুশীলন করিয়াই ব্রহ্মগিরির অনুক্রম-সংস্কৃতি-পর্বের কাল নির্ধারিত হইয়াছে।

স্তরবিন্যাসের সাহায্যে অনুক্রমিক কাল নির্ণয় ও সংস্কৃতির পর্ব-নির্ধারণ অপর একটি উল্লম্বচ্ছেদস্তরের চিত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। চিত্র নং ২০-তে রাজবাড়িডাঙা নামক প্রত্নস্থলের একটি খাদের

উল্লম্বচ্ছেদস্তরের প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই চিত্রের স্তর নং ৪ (4)-৭এ (7A) স্তরায়ণ হইতে লেখসম্বলিত পোড়ামাটির সীলমোহর আবিষ্কার উল্লেখনীয়। দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল স্তর নং ৭এ (7A) দ্বারা আবৃত। প্রথম পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল প্রাকৃতিক মৃত্তিকার উপর নির্মিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের দেওয়ালদ্বয় সীলমোহর-সম্বলিত স্তরায়ণের পূর্বতন যুগের অন্তর্ভূক্ত। মৃৎস্তর নং ২-৩ এবং ৮-১১ (2-3, 8-11) হইতে কোন লেখসম্বলিত সীলমোহর আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং ঐ সকল মৃত্তিকাস্তর যথাক্রমে সীলমোহরসম্বলিত স্তরায়ণোত্তর এবং প্রাক্-সীলমোহর যুগের অন্তর্গত। উক্ত তথ্য হইতে প্রত্নস্থলের তিনটি সংস্কৃতি-পর্বের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, যথা পর্ব 'ক' (পিঅ্যার্‌ইঅ্যাড্ I), পর্ব 'খ' (পিঅ্যার্‌ইঅ্যাড্ II) এবং পর্ব 'গ' (পিঅ্যার্‌ইঅ্যাড্ III)। অনুক্রমিক সংস্কৃতি-পর্বের কালনিরূপণের নিমিত্ত সীলমোহরের লেখর অক্ষরতত্ত্ব অনুশীলন করা হইয়াছে। অক্ষরতত্ত্ব-বিচারে সীলমোহরসমুদয় খ্রীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ৯ম-১০ম শতাব্দীতে আরোপণীয়। সুতরাং সংস্কৃতি-পর্ব 'ক' প্রাক্-সীলমোহর এবং সংস্কৃতি-পর্ব 'গ' সীলমোহরোত্তর যুগভুক্ত। স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, প্রথম সংস্কৃতি-পর্ব আনুমানিক ২য়-৩য় শতাব্দী হইতে ৪র্থ-৫ম শতাব্দী, দ্বিতীয় সংস্কৃতি-পর্ব ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ৯ম-১০ম শতাব্দী এবং তৃতীয় পর্ব ৯ম-১০ম শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত অনুক্রমিকভাবে বিস্তৃত ছিল। মৃত্তিকাস্তরায়ণের এবং উহাতে বিন্যস্ত প্রত্নবস্তুর অনুশীলন হইতেই স্তরবিন্যাসের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করা যায়।

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে উপর্যুপরি গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তর নির্ণয় এবং স্তর-বিন্যাস নির্ধারণকার্যের গুরুত্ব সম্যক্‌রূপে যুক্তিপ্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত। স্তরানুসারে মৃত্তিকা খননকার্যের ফলে সকল প্রকার প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃত সন্ধান ও বৈশিষ্ট্যের পরিচিতি লাভ এবং প্রত্নবস্তুর ও সংস্কৃতির যথার্থ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা সম্ভবপর

হইয়াছে। স্তরবিন্যাস ব্যতিরেকে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর প্রকৃত তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নহে। খাদবিন্যাস করিয়া উৎখনন করিলেই সৌধনিদর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট মৃৎস্তরের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভবপর। স্তরবিন্যাসের অনুশীলন ব্যতিরেকে উৎখননের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে এবং প্রত্নস্থলের ইতিবৃত্তান্তের রূপায়ণকার্য বিকৃত এবং ভ্রমাত্মক হওয়াও স্বাভাবিক। স্তর-বিন্যাস অনুশীলন করিয়াই প্রাচীন সভ্যতার উত্থান ও পতনের ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর হইয়াছে।

॥ ১০ ॥

স্তরবিন্যাস ঃ কালনিরূপণ

পূর্বেই স্তরবিন্যাসের ও সংস্কৃতির পৌর্বাপর্বের কালনিরূপণের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। উক্ত আলোচিত তত্ত্ব ব্যতিরেকে অপর কতিপয় তথ্যের ও পদ্ধতির অনুশীলনও প্রয়োজন।

অনুক্রমিক তারিখবিহীন মানব সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত দুর্জ্ঞেয়। ক্রমিক-কালনিরূপণের ভিত্তির উপরই উৎখননের ইতিবৃত্তান্ত প্রতিষ্ঠিত। প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগের স্তরবিন্যাস ও কাল-নিরূপণের প্রণালী ও তথ্য অনুরূপ নহে। ঐতিহাসিক বা লিখনপঠনক্ষম জনসমাজের সংস্কৃতির কালনির্ণয় লিখিত উপাদান ভিত্তিক। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাক্-লিখনপঠন-ক্ষম জনসমাজের সংস্কৃতির পৌর্বাপর্বের কালনির্ণয় আবিষ্কৃত জড়বস্তুর প্রমাণসাপেক্ষ। প্রত্যক্ষ তারিখসম্বলিত প্রত্নবস্তুর অবিদ্যমানতার জন্যই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতিপর্বের কাল সুনির্দিষ্ট

করা সম্ভব নহে। সাহিত্যিক উপাদান, লেখমালা, সীল, মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে ঐতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির কাল নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে উক্ত কালনির্ণয়ও সুনিশ্চিত নহে। কতিপয় বৎসরের ব্যতিক্রম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালনির্ণয়ের ব্যবধান সহস্র বৎসরেরও অধিক হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির উপাদান, যেমন শিল্পকলা, আর্থিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা এবং শব সমাধিস্থ করিবার বিভিন্ন প্রথাসংক্রান্ত তথ্য আবিষ্কার অসম্ভব নহে। কিন্তু তারিখ ব্যতিরেকে উক্ত তথ্যসমূহের গুরুত্ব লোপ পায়। একটি প্রত্নস্থলেই একাধিক সংস্কৃতি-গোষ্ঠীর বসতি স্থাপনের কালনির্ধারণ অসম্পূর্ণ থাকিলে সংস্কৃতির ইতিবৃত্তান্ত ত্রুটিপূর্ণ হইবে। বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগভুক্ত সংস্কৃতির কালনির্ণয় করা উৎখনকের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্য।

উৎখনন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির কালনির্ধারণ সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির পর্বনির্ণয় প্রত্নবস্তুর পদার্থভিত্তিক। অর্থাৎ বিবিধ পদার্থ দ্বারা নির্মিত প্রত্নবস্তুর উপর ভিত্তি করিয়াই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন পর্ব নির্ধারিত হইয়াছে। যেমন অশ্মীয় যুগ (স্টোন এইজ), তাম্রাশ্মীয় যুগ (ক্যালকোলিথিক এইজ), ব্রঞ্জযুগ (ব্রঞ্জ এইজ) এবং লৌহযুগ (আয়রন এইজ)। উপরন্তু বিবিধ পদার্থ দ্বারা নির্মিত বস্তুর কলা-কৌশল নির্ণয় করিয়া প্রতিটি যুগকে পুনরায় বিভিন্ন উপযুগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যেমন প্রত্মাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় (প্যালিওলিথিক, মেসোলিথিক, নিওলিথিক)। অধিকন্তু প্রতিটি উপযুগও বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত, যেমন অধস্তন-প্রত্মাশ্মীয় (লোয়ার প্যালিওলিথিক), মধ্যস্তন-প্রত্মাশ্মীয় (মিডিল্ প্যালিওলিথিক) এবং উর্ধ্বস্তন-প্রত্মাশ্মীয় (আপ্যার প্যালিওলিথিক)। এই পর্বত্রয়কে পুনরায় বিবিধ উপপর্বে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার পদার্থ বা শ্রমশিল্পভিত্তিক যুগনির্দেশ ভ্রমাত্মক।

সর্ব দেশেই উক্ত শ্রমশিল্পনিদর্শন সমকালীন এবং অনুরূপ নহে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে উক্ত শ্রমশিল্পের বিতর্তন সংঘটিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত প্রকার পদার্থগত এবং প্রযুক্তিভিত্তিক যুগ-বিভাজন অবাস্তব। পক্ষান্তরে উক্ত যুগসমূহকে রূপান্তরিত সংস্কৃতির পর্ব বলিয়া অভিহিত' করা যুক্তিসঙ্গত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্তরবিন্যাসের সহিত প্রত্ননিদর্শনের সম্পর্ক-নির্ণয় ভূবিদ্যার অনুশীলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাচীন মানব-সংস্কৃতির নিদর্শনের সহিত গচ্ছিত প্রাকৃতিক উপকরণসমূহের সম্বন্ধ নির্ণয়ও ভূতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। ভূতত্ত্বের সাহায্যেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির পর্বসমূহের কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। সাধারণতঃ উক্ত কাল-নির্ণয় দ্বিবিধ তথ্যভিত্তিক: (১) সাপেক্ষ বা সম্বন্ধযুক্ত তথ্য এবং (২) নিরপেক্ষ বা নিশ্চিত তথ্য। সম্বন্ধযুক্ত প্রত্ন-নিদর্শনের সহায়তায় কাল-নির্ণয় করা যায়। উক্ত দ্বিবিধ কাল-নিরূপণ-পদ্ধতি পরবর্তী পরিচ্ছেদেও আলোচিত হইয়াছে। নিশ্চিত কালনিরূপণ নিরপেক্ষ নিদর্শনভিত্তিক। সাপেক্ষ কাল-নির্ণয় স্তরবিন্যাসের সহিত প্রত্নবস্তুর সংশ্লিষ্ট শ্রমশিল্পের আকার ও প্রকার নিরূপণ, বিভাজন ও বিস্তার নির্ধারণ, অনুরূপ নিদর্শনের সহিত তুলনাত্মক অনুশীলন, জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। তারিখসম্বলিত প্রত্নবস্তুর বিশ্লেষণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুশীলন হইতে নিশ্চিত কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর।

ভূস্তর প্রাকৃতিক ও মানবীয় কর্মতৎপরতায় আলোড়িত হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে আলোড়িত ভূস্তর বিশ্লেষণ করিয়া কালনির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ প্রাগৈ-তিহাসিক যুগের প্রাকৃতিক স্তরবিন্যাসের কালনির্ণয়-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবকাল হইতে জল-বায়ুর পরিবর্তন ও বিভিন্নতা, প্রাণিজগতের বিবর্তন, উদ্ভিদ্‌কুলের রূপান্তর প্রভৃতি বিভিন্ন যুগে সংঘটিত হইয়াছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার

তত্ত্ববিদ্গণ উক্ত বিষয়সমূহ অনুশীলন করিয়া অনেক মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ঐ সকল মৌলিক সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাকৃতিক স্তরবিন্যাসের কালনিরূপণ-কার্য আংশিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

এই অনুশীলনকার্যের প্রধান উৎস ভূতত্ত্বীয়। ভূতত্ত্বীয় স্তরে মনুষ্যনির্মিত প্রাচীনতম শিল্প-নিদর্শনের আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব-পূর্ণ। প্রাক্-ক্যোঅ্যাটারন্যারি (ভূ-গঠনের চতুর্থ যুগ) স্তর সমূহে শ্রমশিল্পের নিদর্শন অবিদ্যমান। ভূতত্ত্বের টারশ্যারি যুগেও (ভূ-গঠনের তৃতীয় যুগ) মানুষের আবির্ভাব সন্দেহজনক। ক্যোঅ্যাটারনারি যুগ পর্বদ্বয়ে বিভক্ত: প্লাইসটোসিন্ এবং হলোসিন্। প্লাইসটোসিন্ যুগে একাধিক হিম-যুগের (গ্লেইসিঅ্যাল পিঅ্যার্ইঅ্যাড্) প্রামাণিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চল তুষারাবৃত ছিল। উপরন্তু বিভিন্ন হিমযুগ উষ্ণ জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসূচক কালদ্বারা সংযোগচ্যুত হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য প্রত্যাবর্তিত তুষার হিমকূটে যথাপূর্বস্থিত অবস্থায় বিন্যস্ত হইয়াছিল। হিমকূট হইতে হিমপ্রবাহের অবতরণ এবং পশ্চাদ্ধাবনের নিদর্শন দুইটি ভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগভুক্ত: হিমযুগ এবং আন্ত-হিমযুগ (গ্লেইসিয়াল ও ইন্টার-গ্লেইসিঅ্যাল)। এই প্রকার তুষারের অবতরণ ও পশ্চাদ্ধাবন ইউরোপে চতুর্বারসংঘটিত হইয়াছিল, যথা গুঞ্জ, মিণ্ডল, রিস্ এবং উর্ম, (সুইজারল্যাণ্ডের আলপস্ গিরিশ্রেণীর সহিত সংশ্লিষ্ট চতুঃস্রোতীর উপত্যকার নামে অঙ্কিত)। প্রতি হিম-যুগদ্বয়ের মধ্যবর্তীকাল আন্ত-হিমযুগ নামে অঙ্কিত, যেমন গুঞ্জ-মিণ্ডল, মিণ্ডল-রিস এবং রিস-উর্ম। তুষারের অবতরণ ও পশ্চাদ্ধাবনের সময়ে বিবিধ ভূতত্ত্বীয় নিদর্শন গচ্ছিত হইয়াছিল, যেমন হিমপ্রবাহের পলিদ্বারা সৃষ্ট প্রান্তিক রেখা-সমষ্টি (মোরেন), সামুদ্র অবক্ষেপ (ম্যারীন্ ডিপোজিট), নদীর ধাপ (রিভার টেরাস্), লোয়েস প্রভৃতি। ভূতাত্ত্বিকগণ এই সকল নিদর্শনের কালনিরূপণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং উক্ত

ভূতত্ত্বীয় উপকরণের সহিত সংশ্লিষ্ট মানুষের, উদ্ভিদকুলের ও প্রাণিকুলের জীবাশ্ম, মনুষ্যনির্মিত বা ব্যবহৃত অবিনশ্বর বস্তুসমূহ (প্রস্তর হাতিয়ার) প্রভৃতির কালনিরূপণও সম্ভবপর হইয়াছে। আবিষ্কৃত প্রকৃত মানুষের জীবাশ্ম এবং মনুষ্য নির্মিত প্রস্তর-হাতিয়ার প্লাইসটোসিন যুগভুক্ত। সুতরাং উক্ত যুগের ভূতত্ত্বীয় বা প্রাকৃতিক স্তরসমূহের নির্ণীতকালের সাহায্যেই মনুষ্যনির্মিত প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণ সম্ভবপর। আবিষ্কৃত প্রাণিকুলের ও উদ্ভিদকুলের প্রামাণিক উপাদান অধ্যয়ন করিয়া উক্ত যুগের জলবায়ু সম্পর্কিত অনেক তথ্য নির্ণয় করা যায়। এমন কি উল্লিখিত তথ্য হইতেও কাল নির্ধারণ করা সম্ভব।

হিমযুগ এবং আন্তঃহিমযুগের প্রাণিকুল ও উদ্ভিদকুল অনুরূপ নহে। আবিষ্কৃত প্রাণিকুলের জীবাশ্ম উক্ত সময়ের জলবায়ুব প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। উপরন্তু শীতল এবং উষ্ণ জলবায়ুর প্রাণিকুলও বিভিন্ন। সুতরাং প্রাণিকুলের নিদর্শন হইতে জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ণয় করা সম্ভবপর। তদ্রূপ উদ্ভিদকুলের নিদর্শনও জলবায়ুব প্রকৃতি নির্ধারণকার্যের সহায়ক। প্রাণী এবং উদ্ভিদকুলের নিদর্শনসমূহ অধ্যয়ন করিয়া ভূতত্ত্বীয় স্তরবিন্যাসের কাল নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল তথ্য হইতেই প্রত্নাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় যুগের শ্রমশিল্প-নিদর্শনের বা সংস্কৃতি-পর্বের কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুশীলনের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের কাল স্থিরীকরণের পথ সুগম হইয়াছে। অধুনা প্যালিনোলজি নামক একটি নূতন উদ্ভিদবিদ্যার শাখার উদ্ভব উল্লেখযোগ্য। এই বৈজ্ঞানিক শাখা বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের উদ্ভিদসমূহের পরাগরেণু (পোলেন) বিশ্লেষণ করিয়া উদ্ভিদকুলের বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ নির্ধারণ করে। পরাগরেণুর (পোলেন) অনুশীলন হইতে কাল নির্দিষ্টকরণও সম্ভবপর। এতদ্ব্যতীত কালনির্ণয়কার্যে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুশীলন পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রতিভাত হইবে।

আবাসস্থলের সহিত বেলাভূমির সম্পর্ক নির্ণয় করিয়াও প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাল নির্ধারিত হইয়াছে। এমন কি ভূকম্পন বা অপর কোন প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে বিপর্যস্ত বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতেও সংস্কৃতির পৌর্বাপর্য নির্ণয় করা সম্ভবপর। প্রসঙ্গতঃ ক্লোডসাফের কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি উল্লেখনীয়। পশ্চিম এশিয়ার অনেক প্রত্নস্থলে ভূকম্পনের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ক্লোডসাফের বিভিন্ন প্রত্নাঞ্চলে ভূকম্পনের সঙ্গে জড়িত স্তরসমূহের সহিত তুলনাত্মক অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতির পৌর্বাপর্যের কাল নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এতদ্‌ব্যতীত পুরাতত্ত্ব ও পুরাউদ্ভিদ বিদ্যার মিলিত অনুশীলনের ফলে স্তরানুক্রমিক কাল নির্ধারণ সুনির্দিষ্ট হইয়াছে। স্তরবিন্যাসের সহিত সংশ্লিষ্ট শস্যের পরাগরেণুর বিশ্লেষণও কালনির্দেশক। উক্ত নিদর্শনের সহিত হিমবাহের সম্পর্ক নির্ধারণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন প্রাকৃতিক স্তরবিন্যাস হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূহ বিশ্লেষণ করিয়াই প্রাগৈতিহাসিক যুগভুক্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের কাল নিরূপণ করিতে হয়।

মানবীয় কর্মতৎপরতায় গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তরের বা স্তরবিন্যাসের কাল নির্ণয়কার্যে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পশ্চিম এশিয়া খণ্ডে 'তেল'-প্রত্নস্থলে আদি-ঐতিহাসিক যুগে মানবীয় কর্মতৎপরতায় গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উৎখনন করিয়া এই গচ্ছিত মৃত্তিকা বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে বিভক্ত করা সম্ভব। ঐতিহাসিক যুগভুক্ত পর্যায়সমূহের কাল নিরূপণ করা সহজসাধ্য। এমন কি আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর কাল অবিদিত হইলেও উহার সহিত অপর প্রত্নস্থল হইতে উদ্ধৃত কালনির্দিষ্ট প্রত্নবস্তুর সহিত তুলনাত্মক অনুশীলন করিয়া কাল নিরূপণ করা যায়। বিভিন্ন প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত সমশ্রেণীভুক্ত প্রত্ননিদর্শনের বিশ্লেষণও স্তরবিন্যাসের কাল নিরূপণকার্যের বিশেষ সহায়ক।

এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ের কালনিরূপণ

উল্লেখযোগ্য। মহেঞ্জোদারোর বিভিন্ন পর্যায়ের সন-তারিখ অজ্ঞাত। সন-তারিখসম্বলিত প্রত্নবস্তুর এবং অন্য তথ্যের অবর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ের কালনিরূপণ সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয় নাই। সৌভাগ্যবশতঃ মহেঞ্জো-দারোর কতিপয় প্রত্নবস্তু যেমন সীলমোহর মেসোপটামিয়ার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে কাল-নির্দিষ্ট স্তরায়ণ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মেসোপটা-মিয়ার স্থিরীকৃত কালানুক্রমিক প্রত্নবস্তু এবং স্তরবিন্যাসের সহিত মহে-ঞ্জোদারোর বিভিন্ন স্তরের ও পর্যায়ের সাদৃশ্যমূলক ও তুলনাত্মক বিশ্লেষণ করিয়া মার্শাল মহেঞ্জোদারো সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ের কাল নিরূপণ করিয়াছেন।

অপর একটি পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া হরপ্পার সমাধিক্ষেত্রের কাল নিরূপিত হইয়াছে। হরপ্পার এইচ্ নামক সমাধিক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শন উল্লেখনীয়। স্তরবিন্যাস অনুসারে নিম্নস্থ স্তরে শব-কবরের এবং উপরি-স্তরে কুম্ভ-সমাধির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুম্ভ-সমাধির নিদর্শন পরবর্তী যুগভুক্ত। অনুমান করা হইয়াছে যে, উক্ত পরবর্তী কুম্ভ-সমাধি অপর একটি বহিরাগত সংস্কৃতির সহিত জড়িত। এই বহিরাগত সংস্কৃতি ও আর্যসংস্কৃতি অভিন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রের মধ্যভাগে আর্যগণ ভারতে আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। সুতরাং উক্ত কুম্ভ-সমাধির সংস্কৃতি-পর্বের কাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্র হইবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদান- ভিত্তিক নহে। আর্য নামক কোন নর-গোষ্ঠীর বা সংস্কৃতি-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অদ্যাপি প্রত্নতত্ত্বের বিচারে অপ্রমা-ণিত। তথাপি উক্ত প্রকার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া স্তরবিন্যাসের কাল নির্ধারণ করা হইয়াছে। পূর্বেই ব্রহ্মগিরি নামক প্রত্নস্থলের আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ আলোচিত হইয়াছে। উক্ত প্রত্নস্থলে সর্বোপরি মৃৎস্তরে বিন্যস্ত কালনির্দিষ্ট প্রত্নবস্তুর সাহায্যে নিম্নস্থ স্তরবিন্যাসের কাল নির্ধারিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ভারতবর্ষের অনেক ঐতিহাসিক প্রত্নস্থলের স্তরবিন্যাসের কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর।

উল্লিখিত বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই স্তরবিন্যাসের কাল নিরূপিত হয়। সন-তারিখসম্বলিত প্রত্নবস্তুর সাহায্যে স্তরবিন্যাসের কাল নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের ক্রমবিন্যাস নির্ধারণ করিতে হইবে। যে মৃত্তিকাস্তর হইতে প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই স্তর উক্ত প্রত্নবস্তুর সমকালভুক্ত। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মৃত্তিকাস্তরে প্রত্নবস্তুর অবস্থান স্বাভাবিক কিনা তাহা সর্বপ্রথমেই নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন কারণে একাধিক যুগভুক্ত প্রত্নবস্তু একই স্তরে বিন্যস্ত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। পরবর্তী সময়ে গর্ত, খানা প্রভৃতি কর্তনের ফলে এবং অন্য মানবীয় ও প্রাকৃতিক কর্ম-তৎপরতার জন্যও উক্ত প্রত্নবস্তুসমূহ নিম্নস্তরে বিন্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। পূর্বেই উক্ত প্রকার তথ্য নির্ধারণের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

মানবীয় বা প্রাকৃতিক কর্মতৎপরতার জন্য মৃত্তিকাস্তর উপর্যুপরি গচ্ছিত হয়। একটি মৃত্তিকাস্তর অপর একটি স্তরদ্বারা আবৃত থাকাই স্বাভাবিক। তারিখসম্বলিত প্রত্নবস্তুর সাহায্যে আবৃত মৃত্তিকাস্তরের কাল নির্ধারিত হইলে নিম্নস্থ স্তরসমূহের কাল নির্ণয় করাও সম্ভব-পর। নিম্নস্থ স্তরসমূহ আবৃত স্তরের পূর্বতন যুগভুক্ত হইবে। এই পদ্ধতি অনুশীলন করিয়াই গর্ত, খানা প্রভৃতির কাল নির্ণয় করা যায়। সৌধের ভিতখাত খননের সময় কর্তিত মৃত্তিকাস্তরসমূহ প্রাক্-ভিতখাতকালীন হইবে। ইমারতের মেঝে বিন্যস্ত প্রত্নবস্তু উহার সমকালীন হওয়াই স্বাভাবিক। ইমারতাবৃত মৃৎস্তর ইমারত ব্যবহার কালোত্তর হইবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নস্থলসমূহের মৃত্তিকাস্তর মানবীয় কর্মতৎপরতায় বিভিন্ন সময়ে আলোড়িত হইয়াছে। উক্ত ক্ষেত্রে নিম্নস্তরে বিন্যস্ত প্রত্নবস্তু আলো-ড়িত উপরি-স্তর হইতেও উহার আবিষ্কার সম্ভব। এই সকল ক্ষেত্রে যে অংশে মৃত্তিকাস্তর অনালোড়িত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই অংশের উপর্যুপরি গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তর অনুশীলন করিয়া স্তরবিন্যাসের কাল নির্ধারণ করা বিজ্ঞানসম্মত।

উপরি-উক্ত বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগের স্তরবিন্যাসের অনুক্রমিক কাল নির্ধারণকার্য সম্পাদন করা সম্ভব। পরবর্তী অধ্যায়ে স্তরবিন্যাস ও প্রত্নবস্তুর কালনির্ণয়ের প্রণালী অনুশীলন-প্রসঙ্গে অনুসৃত বিবিধ পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে।

। ১১ ।

উৎখনন-লেখ্য

উৎখনন মৃত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত মানবসংস্কৃতির প্রত্ননিদর্শনের যথাবস্থানের বিঘ্ন ঘটায় এবং বহুক্ষেত্রে উহাদের ধ্বংস করে। উৎখনকের দায়িত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে খননকার্য পরিচালনা করিলেই উৎখন্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ হয় না। সর্বপ্রকার প্রত্ননিদর্শনের পূর্ণাঙ্গ তথ্য লিপিবদ্ধকরণই উৎখনকের গুরুতর দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে উৎখননকালীন সর্বপ্রকার তথ্যের লিপিকরণ অত্যাবশ্যক। অন্যথায় মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। উৎখনন-সম্পর্কিত লেখ্য বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যে—(১) জরিপকার্য (সার্ভে), (২) আলোকচিত্র-গ্রহণ এবং (৩) উৎখনন-নোট-লিখন উল্লেখযোগ্য। প্রত্নবস্তু সম্পর্কিত লেখ্য পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

(১) জরিপকার্য : উৎখনকের সহিত জরিপকার্যের সম্পর্ক অতীব ঘনিষ্ঠ। সাধারণতঃ জরিপকার্য দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত : (১) নক্শা-অঙ্কন (প্ল্যান) এবং (২) ছেদস্তরায়ণ-চিত্রণ (সেক্‌শন্); বিভিন্ন প্রকার প্ল্যান-অঙ্কন বিধেয় : (ক) প্রত্নস্থল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের ভূসংস্থানের নক্শা ; (খ) সমোন্নতিরেখা সম্বলিত প্রত্নস্থলের নক্শা (কন্টুর প্ল্যান) ; (গ) খাদবিন্যাসের নক্শা ; (ঘ) অনাবৃত

সৌধমালা, মেঝ প্রভৃতির নক্‌শা এবং (ঙ) আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের নক্‌শা। ছেদস্তর-চিত্রণও বিবিধ : (ক) উল্লম্বচ্ছেদ (উর্ধ্বাধচ্ছেদ বা ভারটিক্যাল সেক্‌শ‌ন্‌); (খ) প্রস্থচ্ছেদ (ক্রশ সেক্‌শ‌ন্‌); (গ) লম্ব-চ্ছেদ ও দীর্ঘচ্ছেদ (নর্মাল সেক্‌শ‌ন্‌ এবং লঙ্গিচ্যুডিন্যাল সেক্‌শ‌ন্‌); (ঘ) দেওয়াল-অনুলম্বিকচ্ছেদ প্রভৃতি। সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নক্‌শা (প্ল্যান্‌) ও ছেদস্তর-অঙ্কন্‌ উৎখননের সম্যক প্রতিমূর্তি এবং অন্তঃপ্রকৃতি।

নক্‌শা ও ছেদস্তরের অঙ্কন দক্ষ জরিপকারীর উপর ন্যস্ত করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু উৎখনকেরও জরিপকার্য সম্পর্কিত জ্ঞান ও পারদর্শিতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। উৎখনকের নির্দেশেই জরিপকারী প্ল্যান ও ছেদস্তরের নক্‌শা যথারীতিঅঙ্কন করিবেন। নক্‌শা ও ছেদস্তর-চিত্রণই উৎখননকার্যের প্রত্যয়জনক সাক্ষ্য। নক্‌শা ও ছেদস্তরের অঙ্কন হইতে উৎখনক উৎখনন-বিবরণের সকল প্রকার তথ্য নিষ্কর্ষণ ও লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন। উৎখনন-বিজ্ঞানে নক্‌শা-অঙ্কন ও ছেদস্তর-চিত্রণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্য। নক্‌শা এবং ছেদস্তর-অঙ্কন ভ্রমাত্মক হইলে সমগ্র উৎখননকার্য বিফল হইবে। নক্‌শা-অঙ্কনের ও ছেদস্তর-চিত্রণের নির্ভুলতা সম্পূর্ণরূপে পরিমাপ গ্রহণের যথার্থতার উপর নির্ভর করে। তদুপরি নক্‌শা ও ছেদস্তর অতীব যত্নের সহিত পরিচ্ছন্নাকারে অঙ্কিত করিতে হইবে। অন্যথায় উহাদের অধ্যয়নের ও বিশ্লেষণের কার্যক্রম নিষ্ফল হওয়া স্বাভাবিক।

জরিপকার্যের নিমিত্ত সাগরপৃষ্ঠ হইতে প্রত্নস্থলের উচ্চতা নির্ধারণ করা সর্বপ্রথম কার্য। প্রত্নস্থলের এক নির্দিষ্ট স্থানে সাগরপৃষ্ঠ হইতে উক্ত স্থানের উচ্চতা স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য। ঐ নির্দিষ্ট স্থান হইতেই সর্বপ্রকার পরিমাপ ও সংখ্যামান গ্রহণ করিতে হইবে। সাগরপৃষ্ঠ হইতে লেভ‌ল নির্ণয় করিবার জন্য নিকটবর্তী রেলওয়ে-স্টেশনের লেভ‌লকৃত নির্দিষ্ট স্থান হইতে পরিমাপ গ্রহণ করিয়া প্রত্নস্থলের লেভ‌ল নির্ধারিত করিতে হয়। সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার

১ ইঞ্চি=১ মাইল স্কেলে অঙ্কিত মানচিত্রে সাগরপৃষ্ঠ হইতে বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা নির্দিষ্ট থাকে। উক্ত মানচিত্রের সাহায্যেও সাগরপৃষ্ঠ হইতে প্রত্নস্থলের লেভ্‌ল স্থির করা সম্ভবপর। সাগরপৃষ্ঠ হইতে লেভ্‌ল-নির্ধারণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। প্রথমতঃ, এই লেভ্‌ল হইতে অসমতল প্রত্নস্থলের লেভ্‌ল নির্ণয় করিয়া সমোন্নতিরেখা-সম্বলিত মানচিত্র-অঙ্কন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উক্ত লেভ্‌ল হইতে উৎখনন-ক্ষেত্রের বিভিন্নাংশে অনাবৃত দেওয়াল, মেঝ প্রভৃতির এবং স্তরায়ণের পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণকার্য সম্পাদন করা বিধেয়।

(ক) নক্‌শা-অঙ্কন (প্ল্যান): প্ল্যান্-অঙ্কনের স্কেল নির্ধারণকার্য প্রত্ন-স্থলের এবং উৎখননের আকার ও প্রকারের উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ ১ইঞ্চি=৮ফুট স্কেলে বৃহত্তর নক্‌শা অঙ্কন করা কর্তব্য। কিন্তু প্রত্নস্থল-উৎখননের এবং আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের প্ল্যান-অঙ্কনের জন্য ১ ইঞ্চি=৪ ফুট স্কেল অনুসরণ করা বিধেয়। বৃহত্তর স্কেলে প্ল্যান্-অঙ্কন করা সর্বক্ষেত্রে সঙ্গত নহে। প্ল্যান্-অঙ্কনের নিমিত্ত চিত্রাঙ্কনের কাগজ ব্যবহার করা উচিত। উৎখননকালে পেন্‌সিল দ্বারা নক্‌শা-অঙ্কন সঙ্গত। পরে স্বচ্ছ কাগজে বা চিত্রাঙ্কনের কাগজে উক্ত চিত্রন রূপায়িত করিতে হইবে। উৎখনিত খাদের অভ্যন্তরে কোন প্রত্ননিদর্শনের নক্‌শা অঙ্কনের নিমিত্ত প্রোথিত কীলকের নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে পরিমাপ গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্ন-নিদর্শনের যথাবস্থানের ক্ষেত্র কীলক বিন্দু হইতে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাপ গ্রহণ করিয়া সুনির্দিষ্ট করা যায়। কীলক-বিন্দু হইতে খাদের কোনদ্বয়-ভেদক (ডায়গোন্যাল) পরিমাপ গ্রহণ করিয়াও প্রত্ননিদর্শনের যথাস্থানের নক্‌শা অঙ্কন করা সম্ভব। বাস্তুনিদর্শনের নক্‌শা অঙ্কনের জন্য নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে উক্ত প্রণালী অনুসারে পরিমাপ গ্রহণপূর্বক দেওয়াল, মেঝ, কক্ষ প্রভৃতির আকার ও প্রকার চিত্রণ করিতে হয়। এই প্রকার নক্‌শা-অঙ্কন হইতেই বিভিন্ন খাদে

আবরণমুক্ত সৌধমালার যথার্থ পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর। উক্ত প্রকার পরিমাপ গ্রহণ করিয়া গুরুত্বপূর্ণ পুরাবস্তুর এবং উহার যথাবস্থান নক্শায় অঙ্কিত করাও আবশ্যক। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নক্শা অঙ্কনের উপরই সকলপ্রকার প্রত্ননিদর্শনের অবস্থান-ক্ষেত্র, আকার, প্রকার প্রভৃতির সম্যক নির্ধারণকার্য সর্বতোভাবে নির্ভরশীল।

সর্বপ্রথম প্রত্নাঞ্চলের এবং নির্ধারিত প্রত্নস্থলের প্ল্যান্ অঙ্কন করা প্রয়োজন। এমন কি অধিকতর পরিচিত নির্দিষ্ট স্থান হইতে উৎখননের জন্য নির্ধারিত অপরিচিত প্রত্নস্থল পর্যন্ত প্ল্যান-অঙ্কনও বিধেয় (চিত্র নং ২১)। উক্ত প্ল্যান-অঙ্কন হইতে বর্তমান আবাসস্থলের কৃষিক্ষেত্রের রাস্তার ও প্রত্নাঞ্চলের আকার ও প্রকার সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্যের পরিচয় লাভ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্নাঞ্চলের নক্শা-অঙ্কন সমাপ্ত করিয়া নির্ধারিতপ্রত্নস্থলের প্ল্যান্ অঙ্কন করিতে হইবে। এই নক্শাতেই প্রত্নস্থলের সর্বাত্মক পরিধি নির্ধারিত থাকিবে (চিত্র নং ২২)। উক্ত প্ল্যানে বা অপর একটি প্ল্যানে অসমতল প্রত্নস্থলের সমোন্নতি-রেখা অঙ্কন করা আবশ্যক। এই নক্শায় প্রত্নস্থলের উচ্চতর ও নিম্নাংশের লেভ্ল নির্ণিত থাকিবে। সমোন্নতিরেখাঙ্কিত প্ল্যান হইতেই প্রত্নস্থলের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃত রূপের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় (চিত্র নং ২২)। সমোন্নতিরেখাঙ্কিত নক্শা অধ্যয়ন করিয়াই উৎখননের নিমিত্ত প্রত্নস্থলাংশ নির্ধারণ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, উৎখননের নিমিত্ত নির্দিষ্ট প্রত্নস্থলাংশে খাদবিন্যাসের প্ল্যান্ অঙ্কন করিতে হইবে। সাধারণ সমোন্নতিরেখা সম্বলিত প্ল্যানেও খাদবিন্যাসের ক্ষেত্রাংশ অঙ্কিত থাকিবে (চিত্র নং ২২)। প্রত্নস্থলের কোন অংশে উৎখননকার্য পরিচালিত হইয়াছে তাহাও প্ল্যানে সুনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। উক্ত অঙ্কন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রত্নস্থলের কোন নির্দিষ্ট অংশে উৎখননকার্য পরিচালিত হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত সৌধমালা, গৃহতল, মেঝ, কক্ষ প্রভৃতির প্ল্যান অঙ্কন করাও অত্যাবশ্যকীয়।

কার্য। সর্বপ্রথম একটি প্ল্যানে প্রতি খাদে অনাবৃত সৌধের নক্‌শা অঙ্কিত করিতে হইবে (চিত্র নং ২৩)। তৎপরে সৌধমালার সামগ্রিক প্ল্যান্ অঙ্কন করা কর্তব্য (চিত্র নং ২৪)। এই প্ল্যান্ হইতেই সৌধ, মেঝ, কক্ষ প্রভৃতির বাস্তু-নক্‌শা প্রতিভাত হইবে। উক্ত প্ল্যান্ অধ্যয়ন করিয়া সৌধমালার প্রকৃত রূপ, আকার এবং অবস্থানের সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। এমন কি একটি দেওয়ালের উপর অপর দেওয়াল নির্মিত হইলেও প্ল্যান-অঙ্কন হইতে উক্ত তথ্য নির্ণয় করা সম্ভব (চিত্র নং ২৪)। পঞ্চমতঃ, সর্বপ্রকার আবিষ্কৃত প্রত্নিদর্শনের প্ল্যান্-অঙ্কনও অত্যাবশ্যক। যথাবস্থিত সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শনের নক্‌শা-অঙ্কন করিতে হইবে। এই প্ল্যান্ হইতেই প্রত্নবস্তুর যথার্থ অবস্থান বা আবির্ভাবসুনির্দিষ্ট করা সম্ভবপর। এই প্রসঙ্গে সমাধি-ক্ষেত্র-উৎখননের নকশা-অঙ্কন উল্লেখযোগ্য। সমাধি-প্রত্নস্থলের সামগ্রিক উৎখননের প্ল্যান অঙ্কন করিয়া নরকঙ্কালের অবস্থান সুনিদিষ্ট করিতে হয়। উৎখননের নিয়মানুসারে সকল প্রত্ননিদর্শনের প্ল্যান্-অঙ্কন সমাপন করিয়া পুরাবস্তু উত্তোলন করা কর্তব্য।

(খ), ছেদস্তর-চিত্রণ : নক্‌শা অঙ্কনের অনুরূপ ছেদস্তর-চিত্রণও আবশ্যকীয় উৎখননকার্যক্রম। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ছেদস্তর-নক্‌শার আলোচনা প্রয়োজন। ছেদস্তর-চিত্রণের নিমিত্ত সর্বপ্রথমে খাদের এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্যন্ত (পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ প্রভৃতি) কাষ্ঠ বা লৌহদণ্ড প্রোথিত করিয়া সূত্রদ্বারা আবদ্ধ করিতে হয়। উক্ত সমতলবর্তী সূত্র প্রত্নস্থল-পৃষ্ঠ হইতে ন্যূনপক্ষে ৩-৪ ইঞ্চি উচ্চ হওয়া প্রয়োজন। এই সমতল সূত্রকে উপান্তরেখা বা ভিত্তিক-রেখা বলা হয় (ডেটাম লাইন্)। সাগরপৃষ্ঠ হইতে উপান্তরেখার উচ্চতা লিপিবদ্ধ করাও প্রয়োজন। উক্ত ভিত্তিকরেখা হইতেই সর্বপ্রকার পরিমাপ গ্রহণ করিয়া ছেদস্তর-চিত্রণ করা বিধেয়। চিত্র নং ২৭ ক-তে ছেদস্তর অঙ্কনরত জরিপকারীর আলোকচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

ছেদস্তরের নক্‌শায় বিভিন্ন মৃৎস্তরের গঠন, প্রকৃতি এবং রূপের পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত বিবিধ সাঙ্কেতিক চিহ্নের চিত্রণও আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে হুইলার কর্তৃক নির্ধারিত মৃত্তিকাস্তরের প্রতীকচিহ্ন অনুসরণীয়। চিত্র নং ২৫-তে বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের প্রতীক চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল চিহ্ন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: (১) দগ্ধ ইষ্টক, (২) অদগ্ধ ইষ্টক, (৩) কঙ্কর মিশ্রিত শিথিল মৃত্তিকা, (৪) শিথিল মৃত্তিকা, (৫) শক্ত মৃত্তিকা, (৬) শিথিল কর্দম, (৭) শক্ত কর্দম, (৮) ভস্মাকীর্ণ স্তর, (৯) কর্দমাক্ত রেখা, (১০) খোলাম কুচি, (১১) কঙ্করাকীর্ণ স্তর, (১২) বালুকাকীর্ণ স্তর, (১৩) ইষ্টক খণ্ড এবং (১৪) হিউমস্। সকল ছেদস্তর-নক্‌শায় উক্ত প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা কর্তব্য। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক মৃত্তিকা প্রতীক চিহ্ন বর্জিত থাকে।

ছেদস্তর অঙ্কনের জন্য ছক্‌-কাগজ ব্যবহার করা বিধেয়। সাধারণতঃ ১=৪ইঞ্চি স্কেলে ছেদস্তরের চিত্রণ কর্তব্য। উৎখননকালীন সীসক লেখনীদ্বারা (পেন্সিল) ছেদস্তরের অঙ্কন করা উচিত। তৎপরে উক্ত ছক্‌-কাগজের চিত্রণ হইতে স্বচ্ছ কাগজে কালিদ্বারা রূপান্তরিত করিতে হইবে। সূত্র-সমতল ভিত্তিক রেখার সহিত একটি সংখ্যামান-ফিতা আবদ্ধ করিতে হয়। অপর একটি সংখ্যামান-ফিতার নিম্নে একটি ওলন আবদ্ধ করাও প্রয়োজন। যাহাতে উক্ত ফিতা যথাস্থানে নিক্ষিপ্ত হইলে উহার উর্ধ্বাধ ধারা সুনির্দিষ্ট থাকে। ভিত্তিক রেখা হইতে সর্বপ্রথম ভূপৃষ্ঠের নিম্নতা অঙ্কন করিতে হইবে। তৎপরে চিহ্নিত অধঃস্তরসমূহের চিত্রণ কর্তব্য। ভূপৃষ্ঠে গচ্ছিত মৃত্তিকাকে হিউমস্ বা তৃণমূলাস্তর বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ছেদস্তর চিত্রণের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। বিবিধ ছেদস্তর-চিত্রণের মধ্যে উল্লম্ব ছেদস্তর-অঙ্কন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ (চিত্র নং ১৪খ, ১৮খ, ২০)। জালাকার খাদবিন্যাসের প্রতিখাদের চতুষ্পার্শ্বের উল্লম্বছেদস্তরের অঙ্কন অত্যা-

বশ্যক। ভিত্তিক রেখা হইতে নির্ণীত মৃত্তিকাস্তরের স্কেল অনুসারে যথাযথ চিত্রণ করিতে হইবে। প্রতি স্তরের পূর্ণাঙ্গ বৈলক্ষণ্য রূপায়ণও আবশ্যক। ছেদস্তরে বিন্যস্ত প্রত্ননিদর্শন যেমন ইষ্টকখণ্ড, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, প্রত্নবস্তু ইত্যাদি অঙ্কন করা প্রয়োজন। মেঝ, দেওয়াল প্রভৃতির সম্যক অবস্থানের প্রকৃত পরিচয়ও উক্ত ছেদস্তরের নকশা হইতেই পাওয়া যায়। প্রতিটি স্তরের রূপ, আকার এবং অপর বৈশিষ্ট্যও চিত্রিত করিতে হইবে।

উল্লম্বচ্ছেদস্তরের চিত্রণ ব্যতিরেকে প্রস্তচ্ছেদস্তরের চিত্র অঙ্কনও প্রয়োজন। সৌধমালা, দেওয়াল, কক্ষ, মেঝ প্রভৃতির বর্তমানে প্রস্তচ্ছেদ-স্তরের চিত্র অঙ্কন আবশ্যক। প্রস্তচ্ছেদ-চিত্র অঙ্কনের নিমিত্ত খাদের যে অংশে দেওয়াল অনাবৃত হইয়াছে উক্ত স্থানে আড়াআড়ি ভাবে বাস্তুর ও মৃৎস্তরের চিত্র অঙ্কিত করিতে হইবে। এই চিত্রণের নিমিত্ত খাদের নির্দিষ্ট অংশ হইতে অপরাংশের নির্ধারিত স্থানে ভিত্তিক রেখা সুনির্দিষ্ট করিয়া উপরি-উক্ত নিয়মানুসারে পরিমাপ গ্রহণপূর্বক চিত্র অঙ্কন বিধেয়। প্রস্তচ্ছেদস্তর চিত্রণ হইতে দেওয়ালের যথার্থ রূপ ও গঠন প্রণালীর সম্যক পরিচয় লাভ করা যায়। এমনকি উক্ত চিত্রে দেওয়ালের ইষ্টকের শ্রেণীবিন্যাস এবং পর্যায়ও সুনির্দিষ্ট থাকে। প্রস্তচ্ছেদস্তর-চিত্রণ হইতে দেওয়ালের ভিত-খাত, ভিতস্তর, মেঝের ভিতস্তর এবং অপর মৃৎস্তরের সহিত দেওয়ালের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক তথ্যের অনুশীলন করা সম্ভবপর। এই ছেদ-অঙ্কন্ হইতে একটি দেওয়ালের উপর পরবর্তী দেওয়াল নির্মাণের প্রকৃষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। প্রস্তচ্ছেদ-অঙ্কনের সহিত অপর প্রত্ননিদর্শনের সম্পর্ক পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। প্রস্ত-চ্ছেদের চিত্রণ ব্যতিরেকে দেওয়ালের গঠন, নির্মাণ-পদ্ধতি, ইষ্টকের আকার ওপ্রকার ইত্যাদির সম্যক পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে।

উৎখননকালীন দীর্ঘচ্ছেদস্তরের অঙ্কনও প্রয়োজন। খাদে উৎখনন সমাপনোত্তর আল বা বক' অপসারণ করিতে হয়। উক্ত আল অপসারণের ফলেই সৌধমালার প্রকৃত রূপ উদ্ভাসিত হইবে।

অনাবৃত সৌধমালা সংরক্ষণের নিমিত্তও উক্ত আল অপসারণ করা প্রয়োজন। প্রত্নস্থলের একাংশে একাধিক উৎখনিত খাদ থাকিলে দীর্ঘচ্ছেদস্তর অঙ্কন করিয়া আল অপসারণোত্তর বিভিন্ন খাদের স্তরায়ণের সম্পর্ক নির্ধারণ করা কর্তব্য। উক্ত ছেদস্তর-অঙ্কন হইতে বিভিন্ন খাদের স্তরায়ণ নির্ণয় করা সহজসাধ্য। উপরন্তু অনাবৃত দেওয়ালের অনুলম্বিত ছেদস্তর অঙ্কন করাও আবশ্যক। চিত্র নং ২৫-এ দেওয়ালের অনুলম্বিক চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত চিত্র হইতে দেওয়ালের গঠন-প্রণালী এবং ইষ্টকের আকার ও প্রকৃতির সম্যক পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর। এমন কি বিভিন্ন সৌধের নির্মাণ-পদ্ধতি, ভিতস্তর ইত্যাদির পরিচিতিও পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ অস্পষ্ট বা ভ্রমাত্মক বা দুর্জ্ঞেয় এবং স্পষ্ট ও জ্ঞেয় ছেদস্তরের অঙ্কনও আলোচনীয়। চিত্র নং ১৯-তে হুইলার কৃত ত্রিবিধ ঊর্ধ্বাধ ছেদস্তরের চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। চিত্র নং ১৯ক-তে কতিপয় সরলরেখা ও বক্ররেখা এবং মৃত্তিকাস্তরের সংখ্যামান অঙ্কিত আছে। কিন্তু এই চিত্র হইতে বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের গঠন ও রূপ সম্পর্কিত কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অনাবৃত দেওয়াল, মেঝ এবং ধ্বংসাবশেষ সংক্রান্ত তথ্যের বা নিদর্শনের বাস্তব প্রমাণও অবিদ্যমান। সুতরাং উক্ত প্রকার ছেদস্তরের চিত্রণ নিরর্থক। চিত্র নং ১৯খ অতীব পরিশ্রম ও যত্নসহকারে এবং যথার্থ পরিমাপ অনুসারে অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু এই চিত্রণও ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমতঃ, এই চিত্রে অনাবৃত প্রত্ননিদর্শনের অভিপ্রেত পরিচয় অস্পষ্ট। এমন কি, এই চিত্র হইতে উৎখনিত বিবিধ তথ্য ও প্রত্ননিদর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। হুইলার বলিয়াছেন যে, এই চিত্রে বৃক্ষের মূলাংশ (কাণ্ড) নির্দিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ নক্শাকারী কাণ্ডসম্বলিত বৃক্ষের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি রূপায়ণ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, নক্শাকারী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই যে, কেবলমাত্র যথাযথ পরিমাপ গ্রহণ করিয়া রেখা অঙ্কন করিলেই তাঁহার কার্য সাফল্যমণ্ডিত হয় না।

উপরন্তু ছেদস্তরের যথার্থ ব্যাখ্যা ও পরিচয় জ্ঞাপন করা অত্যধিক প্রয়োজন। কেবলমাত্র যথার্থ পরিমাপ অনুসারে চিত্রিত ছেদস্তর হইতে স্তরবিন্যাসের এবং প্রত্ননিদর্শনের সম্যক পরিচয় লাভ করা সম্ভব নহে। উক্ত ছেদস্তরের সম্যক পরিচিতির নিমিত্ত ইষ্টকখণ্ডের আকার ও প্রকার, অস্থি, খোলামকুচি, মৃৎপাত্র এবং মৃত্তিকাস্তরে বিন্যস্ত অপর প্রত্ননিদর্শনসমূহের যথাবস্থানের যথার্থ অঙ্কন অত্যাবশ্যকীয় কার্য মৃত্তিকাস্তরে বিন্যস্ত প্রত্নবস্তুর আকার ও প্রকার, পরিমাপ প্রভৃতির সুস্পষ্ট চিত্রণ হইতেই স্তরবিন্যাসের অনুধাবন ও অনুশীলন সম্ভবপর। সুস্পষ্ট বা জ্ঞেয় ছেদস্তরের চিত্রণ কেবলমাত্র কতিপয় রেখা-সম্বলিত নহে। চিত্র নং ১৯গ-তে সর্বপ্রকার তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই প্রকার ছেদস্তর চিত্রণই স্তরবিন্যাসের ও প্রত্ননিদর্শনের যথার্থ প্রতিকৃতি। প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মগিরি ও রাজবাড়িডাঙা প্রত্নস্থলদ্বয়ের উৎখননের ছেদস্তর-চিত্রণ উল্লেখযোগ্য। উভয় চিত্রে (চিত্র নং ১৪খ, ২০) প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির প্রকৃতি ও ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য অঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রকার ছেদস্তব-চিত্রণই সংস্কৃতির বাস্তব তথ্য পরিবেশন করিতে সক্ষম।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখনীয় যে, ছেদস্তর-চিত্রে বিভিন্ন গৌণ ও মুখ্য মৃত্তিকাস্তর সম্যকরূপে প্রতিভাত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ছেদস্তরের চিত্রণ এমন ভাবে করিতে হইবে যাহাতে উহার অধ্যয়ন হইতেই প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সকল মৃত্তিকাস্তরের ব্যাখ্যা প্রদান করাই উৎখনকের প্রধান কার্য। যথার্থ ছেদস্তর-চিত্রণই উৎখননের অক্ষরাঙ্কিত বাক্য। এই চিত্রিত বাক্যেই প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির প্রকৃতির ও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হয়। ছেদস্তর এমনভাবে অঙ্কন করিতে হইবে যাহাতে উহার প্রতিটি সাঙ্কেতিক লিপির অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা যায়। কেবলমাত্র যথার্থ ও সুস্পষ্ট ছেদস্তর-চিত্রণ হইতেই উক্ত অধ্যয়ন সম্ভবপর।

উপরি-উক্ত বিবিধ প্ল্যান ও ছেদস্তরের চিত্রণ উৎখননের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্ল্যানের ও ছেদস্তরের চিত্রণ হইতেই আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের যথার্থ রূপ ও আকারের সম্যক পরিচিতি লাভ করা সম্ভব। একমাত্র প্ল্যান ও ছেদস্তরের চিত্রণই প্রত্নবস্তুর ও সৌধ-ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনের তথ্যবহুল প্রমাণ সরবরাহ করিতে সক্ষম। প্ল্যান ও ছেদস্তরের চিত্রণ হইতে সৌধের ক্রমপর্যায় ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ, উত্থান ও পতন প্রভৃতির নির্ণয় এবং উহদের ব্যাখ্যা ও বর্ণন প্রদান করা সম্ভবপর। প্রত্ননিদর্শনের সর্বাত্মক পরিচয় পরিবেশনের নিমিত্তই প্ল্যান ও ছেদস্তর-চিত্রণের প্রয়োজন অত্যধিক। সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উৎখননে প্ল্যান ও ছেদস্তরের অঙ্কন অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম। প্ল্যান ও ছেদস্তরের চিত্রণই যথার্থ প্রামাণিক তথ্য পরিবেশক। উক্ত চিত্রণের সাহায্যেই উৎখনিত প্রত্নস্থলের ইতিবৃত্তের রূপায়ণ সম্ভবপর। প্ল্যান ও ছেদস্তরের চিত্রণই উৎখননের প্রত্যয়জনক সাক্ষ্য।

(২) আলোকচিত্র-গ্রহণ (ফটোগ্রাফী): প্ল্যান ও ছেদস্তর চিত্রণের ন্যায় আলোকচিত্র-গ্রহণও উৎখননকার্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্নস্থলের ও আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের সামগ্রিক আলোক-চিত্র গ্রহণ অত্যাবশ্যক। আলোকচিত্র-গ্রহণই প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃত নজির বা সাক্ষ্য। নকশা ও ছেদস্তর অঙ্কনের ন্যায় আলোকচিত্রণও উৎখনিত প্রত্নস্থলের ইতিবৃত্ত রূপায়ণের প্রত্যক্ষ তথ্য পরিবেশক।

উৎখনকের আলোকচিত্র-গ্রহণ সংক্রান্ত সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। উৎখননের বিবরণ লিখন ও প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃত রূপের ও স্থিতির পরিচয় প্রদান করা উৎখনকের গুরুতর দায়িত্ব। সুতরাং এই দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত উৎখন্তা আলোকচিত্র-গ্রহণসম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকিবেন। উৎখননে আলোকচিত্র-গ্রহণের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়। প্রত্ননিদর্শনের যথার্থ চিত্র প্রতিবিম্বনের জন্য ক্ষেত্রবর্ধক ক্যামেরা ব্যবহার করা উচিত (চিত্র নং ১৯খ)। ক্যামেরার বিবিধ অংশের সহিতও উৎখননের

সম্যক পরিচয় থাকা প্রয়োজন। আলোকচিত্র-গ্রহণের সময় বিভিন্ন প্রকার ফিল্টার, ফিল্ম প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, উৎখনকের আলোকচিত্র সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। সীমিত উৎখননকার্যে উৎখনক স্বয়ং আলোকচিত্র-গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু বিস্তারিত উৎখননে উৎখন্তার পক্ষে সর্বপ্রকার আলোকচিত্র গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু সকল উৎখনকের পক্ষে সুদক্ষ আলোকচিত্রকর হওয়াও সম্ভব নহে। অতএব সুদক্ষ আলোকচিত্রকরের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। আলোকচিত্রকর উৎখনন দলের অন্যতম সদস্য। তিনি সর্বদাই আলোকচিত্র গ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিবেন। উৎখনকের নির্দেশানুসারেই তাঁহাকে আলোকচিত্র তুলিতে হইবে। চিত্র নং ১৯খ-তে আলোকচিত্রকর চিত্রগ্রহণরত।

উৎখননে আলোকচিত্র-গ্রহণের উদ্দেশ্য প্রধাণতঃ দ্বিবিধ: (ক) আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ সূক্ষাংশের বিস্তারিত দৃশ্য এবং (খ) উৎখনন-বিবরণ প্রকাশনের নিমিত্ত প্রত্নাঞ্চলের এবং প্রত্ন-নিদর্শনের সাধারণ দৃশ্য। উৎখনন-বিবরণে প্রত্নাঞ্চলের এবং পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ চিত্র পরিবেশন একান্ত প্রয়োজন। এই দৃশ্যপঠ হইতেই প্রত্নাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন অবস্থায় ও পরিপেক্ষিতে উক্ত আলোকচিত্র-গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। এই সকল চিত্রের মধ্যে মনোনীত মনোরম চিত্রই উৎখনন-বিবরণে সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

অনাবৃত সৌধমালার ও বিবিধ বাস্তু-নিদর্শনের বিস্তারিত আলোক-চিত্র-গ্রহণও অত্যাবশ্যক। এই আলোকচিত্র-গ্রহণ দ্বিপ্রকার: (ক) সন্নিকৃষ্ট দৃশ্য এবং (খ) সুদূর প্রসারিত দৃশ্য। প্রত্ননিদর্শন-সমূহকে বৃহদাকারে মূর্তিমান করিবার জন্যই সন্নিকটবর্তী আলোকচিত্র-গ্রহণ করা হয়। দেওয়ালের গঠন-প্রণালী, মেঝ, কক্ষ, স্তম্ভগর্ত প্রভৃতির সন্নিকৃষ্ট আলোকচিত্র বিভিন্ন কোণ হইতে গ্রহণ করা

প্রয়োজন। অনাবৃত মৃত্তিকাস্তরে বিন্যস্ত প্রত্নবস্তুর নিকটবর্তী চিত্র-গ্রহণও আবশ্যক। এমন কি প্রত্ননিদর্শনের সহিত স্তরায়ণের সম্পর্কও আলোকচিত্রে প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

সন্নিকৃষ্ট আলোকচিত্র ব্যতিরেকে সুদূর প্রসারিত আলোকচিত্র-গ্রহণও আবশ্যক। প্রসারিত আলোকচিত্রণ হইতে উৎখনিত প্রত্ন-স্থলের সর্বাঙ্গীণ চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সৌধমালার সামগ্রিক রূপ, আকার এবং বৈশিষ্ট্য উক্ত আলোকচিত্রণেই প্রতিবিম্বিত হয়। উৎখনন-বিবরণেও সুদূর প্রসারিত আলোকচিত্রের গুরুত্ব ন্যূন নহে। সন্নিকৃষ্ট ও সুদূর প্রসারিত আলোকচিত্রণ উৎখনন-বিবরণে সন্নিবেশ করিয়াই উৎখননের যথার্থ পরিচয় প্রদান করা সম্ভব।

উৎখনন-নজিরের নিমিত্ত আলোকচিত্র-গ্রহণের প্রয়োজন অন-স্বীকার্য। উৎখনন-বিবরণ লিখিবার সময় উক্ত আলোকচিত্রণ হইতেই সকল প্রকার তথ্য নিষ্কাশন করিতে হয়। প্রত্নিদর্শনের সামগ্রিক ও আংশিক আলোকচিত্রই উৎখনন-বিবৃতির প্রামাণিক প্রতিবিম্ব। অধিকন্তু আলোকচিত্রই উৎখননের স্মরণার্থক বিষয়বস্তু। সুতরাং প্রতিটি প্রত্ননিদর্শনের অধিকসংখ্যক আলোকচিত্র-গ্রহণ কর্তব্য। উৎখনিত খাদের ছেদস্তরের এবং স্তরবিন্যাসের আলোক-চিত্র-গ্রহণও অতীব প্রয়োজন।

সুস্পষ্ট, রমণীয় ও প্রত্যয়জনক আলোকচিত্র পরিবেশনের জন্য আলোকচিত্রকরই সর্বতোভাবে দায়ী। কিন্তু আলোকচিত্র-গ্রহণের নিমিত্ত নির্দিষ্ট স্থান সজ্জীকরণ উৎখনকেরই গুরু দায়িত্ব। সর্বপ্রথমে নির্দিষ্ট স্থান অতিশয় সূক্ষ্মভাবে ও সাবধানতার সহিত পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। অপরিচ্ছন্ন স্থানের আলোকচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু অস্পষ্ট বা নিস্প্রভ হইবে এবং প্রকাশনের নিমিত্ত রমণীয় চিত্র পরিবেশন করা সম্ভব হইবে না।

নির্দিষ্ট স্থান পরিচ্ছন্ন করিবার জন্য কতিপয় সাধারণ নীতি

উল্লেখনায় : (ক) খাদ-পরিষ্করণ, (খ) নির্দিষ্ট স্থান এবং উহার সন্নিকটস্থ ক্ষেত্র পরিচ্ছন্নকরণ, (গ) প্রত্নিদর্শন-পরিষ্করণ, (ঘ) উল্লম্বছেদ স্তর-পরিষ্করণ, (ঙ) স্কেল ও ক্রমপর্যায়াঙ্কিত পরিমাপ-দণ্ড সংস্থাপন প্রভৃতি।

(ক) খাদ-পরিষ্করণ : আলোকচিত্রে দৃশ্যমান খাদপ্রান্ত পরিচ্ছন্ন করা সর্বপ্রথম কার্য। খাদপ্রান্ত সূক্ষ্ম এবং অবক্রাকারে রূপায়িত করিতে হইবে। অপসারিত মৃত্তিকাস্তূপ খাদপ্রান্ত হইতে ন্যূনপক্ষে ৩ ফুট পশ্চাদ্‌বর্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। খাদপ্রান্ত- পৃষ্ঠের তৃণ, দূর্বা এবং জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া সমতল করিতে হইবে। খাদের উল্লম্বকোণের প্রান্ত সমকোণে রূপায়িত করা একান্ত প্রয়োজন। ছুরিকা এবং পরিচ্ছন্ন করিবার হাতিয়ার দ্বারা পরিষ্কৃত দৃশ্যমান ভূপৃষ্ঠের অংশ বিবিধ ব্রুশ ও তুলির সাহায্যে পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত করা আবশ্যক। প্রত্ননিদর্শনের সহিত স্তরায়ণের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে হইলে প্রত্নবস্তুবিন্যস্ত মৃৎস্তরও আলোকচিত্রণে প্রদর্শিত হওয়া প্রয়োজন। অতএব প্রত্ননিদর্শন-ক্ষেত্রের এবং স্তরায়ণের পরিষ্করণ ও সুসজ্জিতকরণ বাঞ্ছনীয়।

(গ) প্রত্ননিদর্শন-পরিষ্করণ : প্রত্ননিদর্শন-পরিষ্করণ সংক্রান্ত কার্যক্রম আয়াসসাধ্য। প্রত্ননিদর্শন এমন ভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে যাহাতে উহার প্রকৃত রূপ ও আকার আলোকচিত্রে পরিবেশিত হয়। প্রথমতঃ, দেওয়ালের প্রতিটি ইষ্টক এবং ইষ্টক-ধারার অনুভূমিক ও উর্ধ্বাধ সন্ধিস্থান পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। অন্যথায় আলোকচিত্রে দেওয়ালের প্রকৃত রূপের পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর নহে। মৃত্তিকাতাল দ্বারা নির্মিত দেওয়ালের প্রতিটি তালের আকার চিহ্নিত করাও একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সময়ে নির্মিত দেওয়ালের প্রতিচ্ছবি রূপায়ণের নিমিত্ত দেওয়ালের বন্ধন পরিস্ফুটাকারে রূপায়িত করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, কক্ষের আলোকচিত্র গ্রহণের নিমিত্ত সমগ্র কক্ষ পরিচ্ছন্ন করা আবশ্যক। এই পরিচ্ছন্নতার

উপরই কক্ষের আকার ও প্রকারের যথার্থ দৃশ্যপট নির্ভরশীল। চতুর্থতঃ, মেঝ কর্তন করিয়া কোন দেওয়াল নির্মিত হইলে মেঝের নিম্নস্থ লেভ্‌ল সূক্ষ্মভাবে পরিচ্ছন্ন করা কর্তব্য। পঞ্চমতঃ, মৃত্তিকা-মর্দিত গৃহতলের আলোকচিত্রণের জন্য অনাবৃত মেঝ-প্রান্তসীমা চিহ্নিত করিয়া ব্রুশ দ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে। ষষ্ঠতঃ, স্তম্ভগর্ত, জঞ্জালখানা প্রভৃতির, ঊর্ধ্বাধ ও অনুভূমিক বিস্তার নির্দিষ্ট করিয়া পার্শ্বস্থ স্তরায়ণের সহিত উহার সম্পর্ক নির্ধারণ পূর্বক চিহ্নিত করা আবশ্যক।

এতদ্‌ব্যতীত প্রত্নবস্তুর পরিষ্করণ-কার্যক্রম অধিকতর কষ্টসাধ্য। অতীব সন্তর্পণের সহিত ছুরিকা এবং বিভিন্ন প্রকার ব্রুশ দ্বারা সকল প্রত্নবস্তু পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। পরিচ্ছন্নকরণ এমন ভাবে সম্পাদন করিতে হইবে যাহাতে প্রত্নবস্তুর যথার্থ দৃশ্য আলোকচিত্রে প্রস্ফুটিত হয়। এই প্রসঙ্গে নরকঙ্কাল, অস্থি ও ক্ষণভঙ্গুর প্রত্নবস্তু পরিষ্করণের কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ অনাচ্ছাদিত প্রত্নবস্তু বায়ুর সংস্পর্শে অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। উক্ত নিদর্শনসমূহ উৎখননের সময় বিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনাও অধিক। সুতরাং অস্থি সংরক্ষণের নিমিত্ত রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহারান্তে পরিষ্করণের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। কঙ্কাল বা অস্থির উপর উক্ত দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করিয়া পরিষ্করণ সমাপন করিতে হইবে। পরিষ্করণ এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে কঙ্কালের সামগ্রিক চিত্র পরিবেশিত হয়। পরিষ্করণের উপরই আলোকচিত্রে প্রত্নবস্তুর প্রতিবিম্ব সম্যকরূপে রূপায়িত করা সম্ভবপর।

(ঘ) উল্লম্বছেদ-পরিষ্করণ : উল্লম্বছেদের আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য মৃত্তিকাস্তর মসৃণ করিয়া পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। কৃষ্ণ-শুভ্র (ব্ল্যাক-হোআইট) আলোকচিত্রণে মৃত্তিকাস্তরের বর্ণ দৃশ্যমান নহে। কিন্তু মৃত্তিকাস্তরের আকার ও প্রকার দর্শনীয়। ছুরিকা দ্বারা চাঁচিয়া প্রতি স্তরের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করা প্রয়োজন। মসৃণ মৃত্তিকাস্তর ছুরিকা দ্বারা সমতল করিতে হয়। কিন্তু অমসৃণ মৃৎস্তর (অর্থাৎ যে স্তরে

প্রস্তর, ইষ্টকখণ্ড, মৃৎপাত্র-ভগ্নাংশ প্রভৃতির আধিক্য বর্তমান) ছুরিকা ও ক্রুশ দ্বারা পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। প্রয়োজনমত ইষ্টক বা প্রস্তরখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা পরিচ্ছন্ন করিয়া উহার প্রকৃত অবস্থানের আকার ও প্রকার প্রকাশ করা কর্তব্য। গৃহতলের বা মেঝের চিহ্ন উল্লম্বছেদে বর্তমান থাকিলে উহার উপরস্থ ও নিম্নস্থ চিহ্নিত রেখা সুপরিচ্ছন্ন করা অধিক প্রয়োজন। ছেদস্তরে চিহ্নিত লুণ্ঠন গর্ত, স্তম্ভগর্ত, খানা প্রভৃতির প্রকৃত রূপের দৃশ্যপটের জন্য যথাযথ পরিষ্করণ কর্তব্য।

(ঙ) ক্রমাঙ্কিত পরিমাপ-দণ্ড-সংস্থাপন (স্কেল এবং জরিপকার্যে ব্যবহৃত পরিমাপদণ্ড): আলোকচিত্র গ্রহণের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের পরিষ্করণ সমাপনোত্তর উক্ত ক্ষেত্রে ক্রমাঙ্কিত স্কেল বা ক্রম-পর্যায়াঙ্কিত পরিমাপদণ্ড সংস্থাপন করা অত্যাবশ্যক (চিত্র নং ৭, ১০)। পরিমাপদণ্ড ব্যতিরেকে আলোকচিত্র গ্রহণ করা অনুচিত। এই ক্রম-পর্যায়াঙ্কিত পরিমাপদণ্ড হইতেই প্রত্নুনিদর্শনের বা খাদের পরিমাপ নিরূপণ করা সম্ভব। পরিমাপদণ্ড-সংস্থাপনকার্য বিবিধ প্রকার। সাধারণ মনোরম দৃশ্যের নিমিত্ত লোক-মাপদণ্ড অতীব আকর্ষণীয়। প্রধানতঃ একক ব্যক্তিকে কর্মরত বা দণ্ডায়মান অবস্থায় সংস্থাপন করিতে হয়। বৃহত্তর দৃশ্যে একাধিক ব্যক্তি (তিন জনের অধিক নহে) সংস্থাপন করা যায়। মধ্যাকৃতি দৃশ্যের নিমিত্ত জরিপকার্যে ব্যবহৃত ক্রম-পর্যায়ঙ্কিত পরিমাপদণ্ড (৪ হইতে ৬ ফুট) খাদের উধ্বার্ধ ছেদকোণে প্রোথিত করিতে হয় (চিত্র নং ৭, ১০)। ক্ষুদ্রাকৃতি দৃশ্যের নিমিত্ত কাষ্ঠনির্মিত ক্ষুদ্র পরিমাপদণ্ড সংস্থাপন করা বিধেয়। লোক-মাপদণ্ড সংস্থাপন করা সর্বক্ষেত্রে উচিত নহে।

আলোকচিত্র গ্রহণের পূর্বে দৃশ্যপট নির্দিষ্ট করিতে হইবে। বিষয়বস্তু এবং সূর্যের আলোকপাতের উপর দৃশ্যপট নির্দিষ্টীকরণ নির্ভর-শীল। বিভিন্ন দিক ও কোণ হইতে ক্যামেরার লক্ষ্য-দর্শকে (ভিউ-ফাইণ্ডার) বিষয়বস্তুর সন্দর্শন কর্তব্য। উক্ত সন্দর্শন দ্বারা কোন্

কোণ হইতে আলোকচিত্র তুলিতে হইবে তাহা নির্ণয় করা যায়। বহুক্ষেত্রে উর্ধ্বাধ আলোকচিত্র গ্রহণ আবশ্যক। গভীরতর খাদে উর্ধ্বাধ আলোকচিত্রণই সমগ্র দৃশ্য পরিবেশন করে। উক্ত আলোকচিত্র গ্রহণের নিমিত্ত উচ্চ মঞ্চের প্রয়োজন অধিক। সূর্যের আলোকপাতের উপর আলোকচিত্র গ্রহণের প্রকৃষ্ট সময়ের নির্ধারণ নির্ভর করে। আলোকচিত্রের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনুরূপ আলোকপাত অতীব প্রয়োজন। সুতরাং প্রাক্-সূর্যোদয়ের এবং সূর্যাস্তোত্তর কাল আলোকচিত্র গ্রহণের প্রকৃষ্ট সময়। উক্ত সময়েই অনুরূপ আলোক প্রতিভাত হয়। ছায়াযুক্ত দেওয়ালের বা অপর বাস্তু-নিদর্শনের আলোকচিত্র গ্রহণ করা অনুচিত। আলোকচিত্র গ্রহণোত্তর প্রচ্ছন্নচিত্র পরিস্ফুট করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। চিত্র যথাযথ বা সুস্পষ্ট না হইলে পুনরায় আলোকচিত্র গ্রহণ করা কর্তব্য। সম্ভবমত প্রতিটি প্রত্ন-নিদর্শনের একাধিক আলোকচিত্র গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত।

এই প্রসঙ্গে উৎখননে রঙিন আলোকচিত্র-গ্রহণ উল্লেখনীয়। উক্ত চিত্র আলো-ছায়ায় প্রতিবিম্বন (প্রোজেক্ট) করিয়া উৎখনন-বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান অতীব আকর্ষণীয় হয়। কিন্তু প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃত পরিচিতি প্রদান করিবার নিমিত্ত রঙিন আলোকচিত্র অবাস্তব। রঙিন আলোকচিত্রে প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃত রূপ প্রতিফলিত হয় না। অধিকন্তু রঙিন আলোকচিত্র গ্রহণের কতিপয় প্রতিবন্ধকও বর্তমান। প্রথমতঃ, রঙিন আলোকচিত্রণ উৎখননের সময় পরিস্ফুট করিয়া পরীক্ষা করা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, গভীর খাদে রঙিন আলোকচিত্র গ্রহণ করা অসম্ভব। তৃতীয়তঃ, রঙিন আলোকচিত্র গ্রহণ করা ব্যয়সাপেক্ষ। চতুর্থতঃ, রঙিন আলোকচিত্রণ প্রত্নবস্তুর ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্ন নিদর্শনের সম্যক পরিচিতি প্রদান করিতে অসমর্থ। সুতরাং উৎখনন কার্যে কৃষ্ণ-শুভ্র আলোকচিত্রই আদর্শস্বরূপ।

সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উৎখননকার্যে লিখিত বর্ণন অপেক্ষা আলোকচিত্রণ অধিকতর সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য। আলোক-

চিত্রই উৎখননকার্যের মূর্ত ও প্রত্যয়জনক সাক্ষ্য। উৎখননে আলোকচিত্রণই বাস্তবতার ও সত্যপরায়ণতার যথার্থ প্রতিবিম্ব।

(৩) উৎখনন-নোট-লিখন : উৎখননকার্যের সহিত নোট-লিখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মৃত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত অনাবৃত বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য বিস্তারিত নোট-লিখন অত্যাবশ্যক। এই প্রসঙ্গে অনুসৃত কতিপয় সাধারণ নীতি উল্লেখনীয়। নোট-লিখন দ্বিবিধ : (ক) খাদতদারককারীদের নোট-লিখন এবং (খ) প্রধান পরিচালকের নোট-লিখন।

উৎখননে বিস্তারিত নোট-লিখনের দায়িত্ব খাদতদারককারীদিগের উপর ন্যস্ত। খাদতদারককারীদিগের নোট-লিখন দুই প্রকার : খাদের দৈনিক উৎখনন-কার্যক্রম-বর্ণন এবং উৎখনন সমাপ্তি-উত্তর সামগ্রিক বিবরণ-লিখন। নোট লিখনের নিমিত্ত সরঞ্জামের মধ্যে ছকাঙ্কিত কাগজ সম্বলিত নোট-বই, পেন্সিল, নির্মোচক রবার, স্কেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নকশা ও ছেদস্তর অঙ্কনের এবং প্রত্নুনিদর্শন-চিত্রণের নিমিত্ত নোট-বই-এর বাম পৃষ্ঠায় ছকাঙ্কিত কাগজ ব্যবহৃত হইবে। দক্ষিণ পার্শ্বের পৃষ্ঠায় উৎখনন সংক্রান্ত আবিষ্কৃত সকল প্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ করা বিধেয়।

কোন প্রত্নবস্তু বা মৃৎস্তর খাদতদারককারীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। স্তরায়ণ সম্পর্কিত সকল তথ্যের লিপিকরণ সর্বাধিক প্রয়োজন। প্রত্যহ খাদের চতুষ্পার্শ্বের ছেদস্তর অঙ্কন করিতে হইবে। খননের গভীরতা ও আবিষ্কৃত প্রত্নুনিদর্শনের এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট স্তরায়ণের সম্পর্কও লিখিতে হইবে। উৎখনন-কালে প্রতি স্তরের সংখ্যামান এবং প্রত্নুনিদর্শনের লেভ্‌ল লিপিবদ্ধ করাও প্রয়োজন। প্রত্যহ খাদের নক্‌শা অঙ্কন করিয়া উৎখনিত অংশ নির্দিষ্ট করাও কর্তব্য।

অনাবৃত প্রত্নুনিদর্শনের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উৎখননে কোন প্রত্নুনিদর্শনই উপেক্ষণীয়

নহে। সকল প্রত্নবস্তুরই সমধিক গুরুত্ব বর্তমান। সুতরাং প্রত্ন-নিদর্শনের অবস্থানের সম্যক পরিচয় প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। আবরণমুক্ত দেওয়ালের ও অন্য বাস্তুনিদর্শনের পরিমাপ গ্রহণ, ইষ্টকের আকার ও প্রকার নির্ণয় এবং গঠন-প্রণালীর বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। বিভিন্ন দেওয়ালের পরস্পর-সম্পর্ক নির্ধারণ করাও প্রয়োজন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অনাবৃত দেওয়াল, মেঝ, কক্ষ প্রভৃতি ক্রমিক সংখ্যায় নির্দিষ্ট করিতে হইবে এবং প্ল্যানেও উক্ত সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা বিধেয়।

প্রত্নবস্তুর লিপিকরণও অতীব সতর্কতার সহিত করিতে হইবে। আবিষ্কৃত পুরাবস্তুর মধ্যে খোলামকুচির প্রাধান্য ও গুরুত্বের জন্য উহাদের লিপিকরণ বিশেষ মনোযোগ সহকারে প্রতিপাদন করা কর্তব্য। প্রতি মৃৎস্তর হইতে উদ্ধৃত খোলামকুচির পরিমাণ, রূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তর হইতে উত্তোলিত খোলামকুচির পার্থক্য ও সমঞ্জসতা অনু-শীলনের তথ্যও লিখিতে হইবে। আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ মৃৎপাত্র-ভগ্নাংশ পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সুরক্ষিত করিতে হয়। প্রত্নবস্তু সম্পর্কিত তথ্য পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রত্নবস্তুর পরিমাপ গ্রহণ করিয়া উহাদের সহিত মৃত্তিকাস্তরের এবং স্তরবিন্যাসের সম্পর্ক নির্ধারণ করিয়া সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। প্রয়োজনমত ছকাঙ্কিত কার্ডে পুরাবস্তুর চিত্র অঙ্কন করিয়া বিস্তৃত তথ্য লিখিতে হয়। কোন বিশেষ প্রত্নবস্তুর নাম অজ্ঞাত থাকিলে আবিষ্কারকের নামে নামকরণ করা যুক্তিসঙ্গত। উৎখনক ড্রুপের মতে এই নীতি অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়। উক্ত প্রত্নবস্তু সনাক্ত না হওয়া পর্যন্ত আবিষ্কারকের নামেই পরিচিত থাকিবে।

দৈনিক নোট-লিখন হইতে খাদের উৎখনন-কার্যের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং খাদোৎখনন সমাপ্তির পর খাদ

সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এই লেখ্যতে খাদের স্তরবিন্যাস, প্রত্নবস্তু এবং সংস্কৃতির পর্যায়ানুক্রম বিবর্তন প্রভৃতির সকল প্রকার উপাদান লিখিত থাকিবে। অর্থাৎ খাদোৎখননের ইতিবৃত্তান্ত লিখন কর্তব্য। উপরি-উক্ত দ্বিবিধ নোট-লিখনের উপরই উৎখননের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ নির্ভরশীল।

এই প্রসঙ্গে খাদতদারককারীর নোট-বই এবং নোট-লিখন সংক্রান্ত কতিপয় মৌলিক নীতি উল্লেখযোগ্য : (ক) নোট-বই সর্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং জলবায়ুর সংস্পর্শ হইতে সুরক্ষিত থাকিবে ; (খ) খাদে খননকালীন সকল প্রকার লিখনকার্য সমাপন করিতে হইবে ; (গ) সর্বদা কালি দ্বারা নোট-লিখন প্রশস্ত ; (ঘ) নোট-বইর পৃষ্ঠা ছেদন করা অনুচিত ; (ঙ) ভ্রমাত্মক লিখন সন্নিবেশিত হইলে চিহ্নিত করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত ; (চ) প্রত্নবস্তুর এবং মৃত্তিকাস্তরের চিত্রাঙ্কন ও তথ্যলিখন অত্যাবশ্যক এবং (ছ) মৃত্তিকাস্তরের বিশদ বর্ণন অতীব সতর্কতার সহিত লিখিতে হইবে। মৃৎস্তরের বিবরণ লিখনে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, যেমন উপর্যুপরি গচ্ছিত মৃত্তিকাস্তরের এবং উহার সহিত পূর্বতন ও পরবর্তী স্তরের সম্পর্ক, প্রতি সংস্তরের বৈশিষ্ট্য, যেমন বর্ণ, গঠন, বিন্যস্ত প্রত্নবস্তু প্রভৃতির সম্যক পরিচয় প্রদান করা কর্তব্য। (জ) সৌধমালার গঠন-প্রণালী ও বৈশিষ্ট্য, যথা : ইষ্টকের পরিমাপ, গাথুনির মশলা, ভিত-খাত, অলঙ্কৃত ইষ্টকের ব্যবহার প্রভৃতির বিস্তারিত তথ্য যথার্থভাবে লিখিতে হইবে। (ঝ) মৃণ্ময়পাত্র এবং প্রত্নবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য যেমন, প্রত্নবস্তুর উদ্ধারণ ও পরিমাপ-গ্রহণ, চিত্রাঙ্কন, আলোকচিত্র-গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট স্তরায়ণ-নির্ণয়, রাসায়নিক দ্রবণ-লেপন, সংরক্ষণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। (ঞ) এতদ্‌ব্যতীত প্রত্নবস্তুর তালিকা প্রণয়ন এবং খোলামকুচি সম্পর্কিত সকল তথ্য, যেমন মৃৎস্তরানুক্রমিক বিভাজন ও বিশ্লেষণ এবং পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয়প্রসঙ্গ নোট-বইতে লিপিবদ্ধ থাকিবে। চিত্রসম্বলিত ও নকশাকৃত গুরুত্বপূর্ণ খোলামকুচির উদ্ধারণ, পৃথকীকরণ,

সংরক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রমেরও যথাযথ লিখন প্রয়োজন।

উপরি-উক্ত সকল প্রকার তথ্য সম্বলিত লেখ্য দৈনিক উৎখনন সমাপ্তির পর প্রধান পরিচালকের নিকট অর্পণ করিতে হইবে। প্রধান পরিচালক লিখিত বিবরণ প্রণিধানপূর্বক নোট-লিখন সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচনা করিয়া খাদতদারককারীকে উপদেশ প্রদান করিবেন। সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উক্ত নোট-লিখনের উপরই উৎখনন-বিবরণের সর্বপ্রকার তথ্য ও উহাদের ব্যাখ্যা এবং উৎখননের সামগ্রিক চিত্র-রূপায়ণকার্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

প্রকৃতপক্ষে উৎখননকার্যের সামগ্রিক নোট-লিখন প্রধান পরিচালকেরই গুরুতর দায়িত্ব। খাদতদারককারিগণ তাঁহাদের নিজস্ব খাদ-উৎখননের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু প্রধান পরিচালক সকল খাদের উৎখনন সংক্রান্ত সর্বপ্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ করিবেন। উৎখনন-বিবরণের জন্যই বিস্তারিত নোট-লিখন অত্যাবশ্যক। প্রধান পরিচালকের নোট-লিখনও দ্বিবিধ: দৈনিক নোট-লিখন ও সমাপ্তক নোট-লিখন। দৈনন্দিন উৎখননকার্যের সহিত জড়িত সকল প্রকার সমস্যা এবং উহাদের সমাধানের সফলতা ও বিফলতা সংক্রান্ত তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতি খাদের উৎখনন সম্পর্কিত সকল প্রকার অভিজ্ঞান, যেমন অনাবৃত সৌধের ধ্বংসাবশেষ, মৃৎস্তরের বৈশিষ্ট্য, স্তরবিন্যাস-নির্ণয়, প্রত্নবস্তু-উদ্ধার, প্রভৃতির উপর সম্যক লক্ষ রাখিয়া বিস্তারিত তথ্যসমূহ লিখিতে হইবে। খাদান্তরের স্তরবিন্যাসের সমন্বয় ও পার্থক্য লিপিবদ্ধ করাও আবশ্যক। বিভিন্ন খাদের স্তরায়ণের সহিত আবিষ্কৃত প্রত্ন-নিদর্শনের সামঞ্জস্য ও বিভিন্নতা সবিস্তারে লিখিতে হইবে। উৎখনন পরিসমাপ্তির পর প্রধান পরিচালক উৎখনন সম্পর্কিত সকল তথ্য একত্রে লিপিবদ্ধ করিবেন। এই লেখ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উক্ত লেখ হইতেই, উৎখনিত প্রত্নস্থলের সর্বাঙ্গীণ চিত্র রূপায়িত হইবে। আবরণমুক্ত খাদসমূহের বাস্তুনিদর্শন ও উদ্ধারিত প্রত্নবস্তু সম্পর্কিত

সর্বপ্রকার তথ্য উৎখননকালেই সম্যকরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং উক্ত সময়েই প্রত্নানিদর্শন সংক্রান্ত সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করা অত্যাবশ্যক।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎখননের ফলে মানব-সংস্কৃতির সাক্ষ্য নিদর্শন বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হয়। উহাদের বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ না করিলে মানব-সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনের সকল প্রকার তথ্য চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, উৎখননের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ-লিখন সময়-সাপেক্ষ। উৎখননান্তে উৎখনন সংক্রান্ত সর্বপ্রকার তথ্য উৎখনকের পক্ষে স্মরণ রাখাও সম্ভব নহে। অধিকন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা স্মরণপূর্বক উৎখননের বিবরণ-লিখন অনুচিত। উক্ত বিবরণে ইতিহাসের রূপায়ণ বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং প্রাত্যহিক ও সমাপ্তক নোট-লিখনের উপরই উৎখননের বিবরণ-লিখন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। নোট-লিখন অযথার্থ বা ভ্রমাত্মক হইলে উৎখননের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে এবং মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণকে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

। ১২ ।

প্রত্ননিদর্শন-সংরক্ষণ

অনাবৃত এবং উদ্ধৃত প্রত্ননিদর্শনের সংরক্ষণও উৎখননকার্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্রত্ননিদর্শন দ্বিবিধঃ স্থাবর এবং অস্থাবর। স্থাবর প্রত্ননিদর্শন উদ্ধার করিয়া সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত করা হয়। কিন্তু অস্থাবর বা স্থিতিশীল প্রত্ননিদর্শন যথাস্থানে সংরক্ষিত থাকা প্রয়োজন। খননকার্য সমাপ্তির পর আবরণমুক্ত স্থিতিশীল প্রত্ননিদর্শনের (যেমন বাস্তুনিদর্শন) ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণ করা উৎখনকের অপর একটি গুরুদায়িত্ব। কারণ, উক্ত নিদর্শন অনাবৃত থাকিলে প্রাকৃতিক ও মানবীয় সংঘাতের ও তৎপরতার ফলে উহারা

ক্রমান্বয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। স্থিতিশীল প্রত্ননিদর্শনসমূহকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দুইটি বৈকল্পিক পন্থা অনুসরণীয়: (ক) প্রত্ননিদর্শনের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং (খ) প্রত্ননিদর্শন-পুনরাবরণ।

প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষণকার্যের অনেক প্রতিবন্ধক বর্তমান। প্রথমতঃ, অনাবৃত বাস্তুনিদর্শনের সংরক্ষণকার্য অধিক অর্থব্যয়সাপেক্ষ। উৎখনন পরিসমাপ্তির পর আবরণমুক্ত দেওয়াল, মেঝ প্রভৃতিকে দৃঢ়ীভূত করিতে হইবে। অধিকাংশ প্রাচীন সৌধনির্মাণে গাঁথুনীর মশলা ব্যবহৃত হইত না। কেবলমাত্র মৃত্তিকা দ্বারাই ইষ্টক-গাঁথুনীর রীতি প্রচলিত ছিল। মৃত্তিকা দ্বারা গ্রন্থিত দেওয়াল বর্ষণ এবং অপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রথমেই দৃঢ় সংযোজক বস্তুদ্বারা অনাবৃত দেওয়াল সংস্পৃষ্ট করিতে হইবে। তাহা হইলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত হইতে উক্ত দেওয়াল রক্ষা পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, খাদে বৃষ্টির জল পুঞ্জীভূত হইলে বাস্তুনিদর্শন ক্রমান্বয়ে ধ্বসিয়া পড়িবে। অতএব খাদ হইতে বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের নিমিত্ত পয়োনালী কর্তন করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ, সংরক্ষিত সৌধমালার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তদারককারীর প্রয়োজনও অত্যধিক। অন্যথায় সংরক্ষিত বাস্তুনিদর্শন মানবীয় এবং পশুদের তৎপরতার ফলে উৎসাদিত হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে ডে লায়েটের (১৯৫৭) উক্তি উল্লেখনীয়। একটি প্রত্নস্থলে উৎখনন সমাপ্তির পরে উক্ত উৎখনক সমাধিস্তূপের সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই মাস অন্তে ঐ স্থান পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ভ্রমণকারীদের এবং অঞ্চলের অধিবাসিগণের তৎপরতার ফলে সকল সংরক্ষিত নিদর্শন উৎসাদিত হইয়াছে। এমন কি প্রত্নবস্তু উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে প্রণোদিত হইয়া উক্ত স্থানেই পুনরায় খনন করিয়াছে। অতএব অনাবৃত সংরক্ষিত প্রত্ননিদর্শনের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংরক্ষক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কিন্তু কেবল-

মাত্র সংরক্ষক নিযুক্ত করিলেই মানবীয় তৎপরতার হাত হইতে প্রত্ন-নিদর্শনের পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নহে। ইহার জন্য দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সর্বাধিক প্রয়োজন। জনসাধারণকে অবহিত করিতে হইবে যে, মানব সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন ধ্বংস করা অতীব গর্হিত কার্য এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। উক্ত কারণবশতঃ প্রায় সর্বদেশেই সরকার আইন পাশ করিয়া মানব সংস্কৃতির নিদর্শন রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু সংরক্ষণের কার্যক্রম অত্যধিক অর্থব্যয়সাপেক্ষ।

এই অর্থব্যয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বর্তমানে অনাবৃত বাস্তুনিদর্শন পুনরায় মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত করিবার নীতি অনুসরণ করা হয়। উৎখননকার্য সমাপ্তি-উত্তর আবরণমুক্ত খাদসমূহ অপসারিত মৃত্তিকাদ্বারা পুনর্বার আচ্ছাদন করিয়া উৎখনিত প্রত্নস্থলাংশকে প্রাক্-উৎখনন অবস্থায় বিন্যস্ত করিতে হইবে (চিত্র নং ২৮ক)। অনাবৃত স্থিতিশীল নিদর্শনসমূহ পুনরায় ভূগর্ভস্থ হইলে উহারা স্বস্থানেই সুরক্ষিত থাকিবে। প্রত্ননিদর্শন ধ্বংস বা বিনষ্ট করিবার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না। অস্থাবর প্রত্নবস্তু অপসারিত হইয়া সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত হয়। কিন্তু স্থিতিশীল প্রত্ননিদর্শনের সংরক্ষণকার্য অতীব দুরূহ। অতএব উক্ত নিদর্শনসমূহকে যথাস্থানে মৃত্তিকাদ্বারা আবৃত করাই বাঞ্ছনীয়।

স্থিতিশীল প্রত্ননিদর্শনের পুনরাবরণের ত্রুটিও বর্তমান। উৎখনন-বিবরণের অবর্তমানে অথবা উৎখনকের অজ্ঞানতাবশতঃ পরবর্তী কোন সময়ে উক্ত পুনরাবৃত প্রত্নস্থলাংশ পুনর্বার উৎখনিত হইবার সম্ভবনাও অধিক। কিন্তু অভিজ্ঞ উৎখনকগণ উক্তস্থানে খননকার্য আরম্ভ করিয়াই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, ঐ ক্ষেত্রাংশ পূর্বেই উৎখনিত হইয়াছিল। পুনরাবৃত উৎখনিতাংশে পুনর্বার উৎখনন পরিচালনার সম্ভাবনার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য উৎখনন-বিবরণী সত্বর প্রকাশ করা আবশ্যক। প্রয়োজনবোধে উৎখনিত ক্ষেত্রাংশ চিহ্ন দ্বারা

নির্দিষ্ট করাও বিধেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পিট-রিভার্স উৎখনিত প্রত্নস্থলসমূহের নিম্নস্তরে একটি স্বীয়নামাঙ্কিত বৃত্তাকার ধাতুফলক বিন্যস্ত করিয়াছেন। উক্ত ফলকে উৎখননের তারিখ লিখিত আছে। সুতরাং পরবর্তী কালে কোন উৎখনক উক্তস্থানে খননকার্য পরিচালনা করিলে অবগত হইবেন যে, ঐ ক্ষেত্রাংশ পূর্বেই অপর উৎখনক দ্বারা উৎখনিত হইয়াছিল।

উপরন্তু উর্ধ্বাধ উৎখনন-খাদের বাস্তু-নিদর্শনের সংরক্ষণকার্য-আয়াস সাধ্য। উর্ধ্বাধ উৎখননে প্রাকৃতিক মৃত্তিকা পর্যন্ত খননকার্য পরিচালিত হয়। অধিকতর নিম্নস্থ লেভ্লের স্থাবর নিদর্শনসমূহের সংরক্ষণ সম্ভব নহে। সুতরাং উর্ধ্বাধ উৎখনিত খাদ সর্বক্ষেত্রেই পুনরাবৃত করা আবশ্যক। কেবলমাত্র অনুভূমিক উৎখনন দ্বারা অনাবৃত এক বা একাধিক পর্যায়ভুক্ত বাস্তুনিদর্শনের সংরক্ষণ সম্ভবপর।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুনিদর্শন আবিষ্কৃত হইলে উহার পুনরাবরণ অনুচিত। অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও অনাবৃত গুরুত্বপূর্ণ সৌধমালা যথাসম্ভব সংরক্ষণ করা কর্তব্য। আবিষ্কৃত সৌধমালা বা অপর স্থিতিশীল নিদর্শনসমূহ শিক্ষণের এবং প্রশিক্ষণের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। বর্তমান যুগে উৎখনিত প্রত্নস্থল- পরিদর্শন শিক্ষার প্রকৃষ্ট মাধ্যম। অধিকন্তু বর্তমান জগতে দেশপর্যটন অতীব আকর্ষণীয়। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় পর্য্যায়ের মানুষের প্রাচীনতার সহিত পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা বা অনুসন্ধিৎসা অতীব প্রবল। অবসর সময়ে এবং সুযোগ ও সুবিধামত অনুসন্ধিৎসু জনসাধারণ স্থিতিশীল প্রত্ননিদর্শনসম্বলিত প্রত্নস্থল পরিদর্শন করিতে দ্বিধাবোধ করে না। প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষিত না হইলে মানুষের এই অনুসন্ধিৎসার ও প্রয়াসের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। কেবলমাত্র প্রাচীন গ্রন্থ বা উৎখনন-বিবরণী অধ্যয়ন করিয়া মানবসভ্যতার বাস্তব নিদর্শনসমূহের সম্যক অনুধাবন সম্ভবপর নহে। প্রত্ননিদর্শনই মানবসভ্যতার ইতিবৃত্ত

অধ্যয়নের প্রকৃষ্ট মূর্ত উপাদান। অস্থাবর প্রত্নবস্তু সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত থাকে এবং উহাদের অধ্যয়ন করা সহজসাধ্য। কিন্তু স্থিতিশীল নিদর্শনসমূহকেও স্বস্থানে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। অধুনা উৎখনিত প্রত্নস্থলের উপকণ্ঠেই সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত করিবার নীতি অনুসৃত হয়। স্থাবর ও অস্থাবর প্রত্ননিদর্শন প্রত্নাঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতেই অনুশীলনীয়। লোকশিক্ষার নিমিত্ত প্রাচীন মানবসভ্যতার যথার্থ পরিচিতির জন্য স্থাবর প্রত্ননিদর্শন সমূহের সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যাবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলেই অনাবৃত সৌধমালা এবং অপর স্থাবর বাস্তব নিদর্শনসমূহের সংরক্ষণের কার্যবিধি বর্তমান। মহেঞ্জোদারো, তক্ষশিলা, রাজগৃহ, নালন্দা, সারনাথ প্রভৃতি প্রত্নস্থলে অনাবৃত স্থিতিশীল বাস্তুনিদর্শন ও অপর অভিজ্ঞানসমূহের সংরক্ষণ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানেও দেশ-দেশান্তর হইতে পর্যটকগণ ও বিদ্যার্থীবৃন্দ ঐ সকল প্রত্নস্থল পরিদর্শন করিয়া প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সহিত ঐকাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াসী। গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুনিদর্শনের সম্যক পরিচিতি লাভ করা সম্ভব নহে। সংরক্ষিত বাস্তুনিদর্শনসমূহই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৌদ্ধ সংঘারামের যথার্থ পরিচয় প্রদান করে। অনুরূপ, মহেঞ্জোদারোর আবরণমুক্ত সুরক্ষিত বাস্তুনিদর্শন ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নগরসভ্যতার মূর্ত পরিচয়।

এই সকল কারণবশতঃই উৎখনন দ্বারা অনাবৃত গুরুত্বপূর্ণ সৌধমালার সংরক্ষণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালনায় রাজবাড়িডাঙা নামক প্রত্নস্থলে উৎখননের ফলে অদ্যাপি বাংলা দেশে অবিদিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ একাধিক বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উক্ত অনাচ্ছাদিত বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত সৌধমালার

সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে। রাজবাড়িডাঙায় উৎখননের ফলে হিউয়েন-সাঙ-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণিত প্রাচীন বাংলার রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণের উপকণ্ঠে অবস্থিত বৌদ্ধ মহাবিহার রক্তমৃত্তিকার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত প্রত্নস্থলে সংরক্ষিত অনাবৃত সৌধমালা অনুশীলনের ফলেই প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যশিল্পের এবং ধর্মীয় সংগঠনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচিতি সম্ভবপর হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রত্নবস্তু

। ১ ।

পরিচিতি ঃ শ্রেণীবিভাজন ও উদ্ধারণ

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্য। পরীক্ষণ ও অনুশীলন করিয়া আবিষ্কৃত জড়পদার্থসমূহের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা নিষ্কর্ষণপূর্বক যথার্থ তথ্য পরিবেশন করাই উৎখনকের প্রধানতম কর্তব্য। আবিষ্কৃত জড়-বস্তুর সম্যক অর্থ বা ব্যাখ্যা নিষ্কর্ষণই মানবসংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণকার্যের সুদৃঢ় ভিত্তি। উক্ত অর্থ বা ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক হইলে ইতিবৃত্তের রূপায়ণও বিকৃত হইবে। সুতরাং প্রত্নবস্তুসমূহের প্রকৃত অর্থ উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত বিবিধ বিজ্ঞান-শাখার সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য। উৎখনকের পক্ষে জড়পদার্থ সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী হওয়াও আবশ্যক।

প্রত্ননিদর্শনের অনাবরণ ও উদ্ধারণ সম্পর্কে উৎখনকের নিবিড় অবগতি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন সর্বাধিক। প্রত্নবস্তু সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য যেমন, সনাক্তকরণ, বিশ্লেষণ, লিপিকরণ, প্রভৃতি বিষয়ে উৎখনকের প্রগাঢ় বুৎপত্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। প্রত্নবস্তু সম্বন্ধে কতিপয় সাধারণ নীতির অনুসরণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, প্রত্নবস্তু মৃত্তিকাবৃত অবস্থায় সুরক্ষিত থাকে। আবরণমুক্ত প্রত্নবস্তু কখনই হস্তদ্বারা ঘর্ষণ করা উচিত নহে। মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, মুদ্রা, সীল, প্রভৃতি অনাবৃত অবস্থায় অতীব নরম থাকে। সুতরাং শুষ্ক হইবার পূর্ব পর্যন্ত

অতীব সাবধানতার সহিত প্রত্নবস্তু স্পর্শ করা বিধেয়, যাহাতে উহা কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরে বিন্যস্ত প্রত্নবস্তুর সংমিশ্রণ স্বেচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হইতে পারে। সাধারণতঃ খননকারীর অসাবধানতার জন্যই বিবিধ মৃৎস্তর হইতে উত্তোলিত প্রত্নবস্তু সংমিশ্রিত হয়। সুতরাং পাত্রে গচ্ছিত প্রত্নবস্তুর পরীক্ষণ সর্বদা আবশ্যক। উক্ত পাত্রে কোন প্রত্নবস্তু শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত থাকিলে খননকারীকে প্রশ্ন করিয়া তাহার প্রকৃত অবস্থানের মৃৎস্তর স্থির করিতে হইবে। উৎখননের সময় সর্বপ্রকার মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশই সিক্ত থাকে। পাত্রে সিক্ত খোলামকুচির মধ্যে একটি শুষ্কাংশ বর্তমান থাকিলে প্রমাণিত হয় যে, উহা পূর্বকর্তিত মৃৎস্তরভুক্ত; অথবা কোন শ্রমিক কর্তৃক উক্ত নিদর্শন ভূপৃষ্ঠ হইতে আনীত হইয়াছে। এই প্রকার কোন সন্দেহের উদ্রেক হইলেই উক্ত প্রত্নবস্তু উপেক্ষণীয়। অথবা উহা স্তরভুক্ত নহে বলিয়া লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য। মৃত্তিকাস্তরানুসারেই সর্বপ্রকার প্রত্নবস্তু উদ্ধার করা ও গচ্ছিত রাখা অত্যাবশ্যক। তৃতীয়তঃ, স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, জৈব পদার্থ সাধারণতঃ মৃত্তিকাগর্ভে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তৈলসিক্ত ও ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় উক্ত নিদর্শনসমূহ সুরক্ষিত থাকে। অনেক সময় দারু ও অস্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও উহাদের ছাপ্ বা প্রতিচিহ্ন মৃত্তিকায় মুদ্রিত থাকে। এই মুদ্রিত ছাপ হইতেও জন্তু বা মানুষের বা বৃক্ষের প্রকৃত রূপের প্রতিকৃতি রূপায়ণ করা সম্ভব। প্রসঙ্গতঃ, পম্পাই মহানগরী ও উড় হইতে আবিষ্কৃত উক্ত প্রকার ছাপের সাহায্যে প্রকৃত নিদর্শনের রূপায়ণ উল্লেখযোগ্য। চতুর্থতঃ, পদার্থানুসারেই প্রত্ননিদর্শনের উদ্ধারণ-কার্যক্রম সম্পাদন করা কর্তব্য। সর্বপ্রকার প্রত্ননিদর্শন উদ্ধার করিয়া প্রত্নবস্তু সংরক্ষকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। মৃত্তিকাস্তরানুক্রমিক মৃৎপাত্র বা খোলামকুচি কৌলাল-সহায়কের নিকট প্রেরণ করা কর্তব্য। পঞ্চমতঃ, ক্ষণভঙ্গুর বা অবক্ষয়প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু উত্তোলন করিয়া

বীক্ষণাগারে প্রেরণ করাই বিধেয়। উপরি-উক্ত বিষয়ের প্রতি উৎখনকের সর্বদা সচেতন থাকা আবশ্যক।

উৎখনন-বিজ্ঞানে প্রত্নবস্তুর শ্রেণী-বিভাজন পদার্থভিত্তিক। পদার্থ অনুসারে প্রত্নবস্তুকে কতিপয় প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) ক্ষণভঙ্গুর পদার্থনির্মিত বস্তু যেমন, চর্ম, বস্ত্র, দারু, শেল ও অস্থি-নিদর্শন; (২) প্রস্তরখণ্ড ও প্রস্তরশিল্প-নিদর্শন; (৩) ধাতুদ্রব্য; (৪) কাঁচনির্মিত জিনিস; (৫) বিবিধ মৃন্ময় শিল্প-নিদর্শন যেমন মৃৎপাত্র, গুটিকা বা পুঁতি, মৃন্ময় মূর্তি, ইষ্টক বা টালি, সীল ইত্যাদি; (৬) পলেস্তারাংশ এবং (৭) ষ্টাকোনির্মিত নিদর্শন।

(১) ক্ষণভঙ্গুর পদার্থনির্মিত বস্তু: ক্ষণভঙ্গুর বস্তু-নিদর্শনের মধ্যে চর্ম, বস্ত্র, দারু, শস্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই সকল পদার্থনির্মিত বস্তু ক্ষণস্থায়ী। সিক্ত মৃত্তিকায় সকল জৈব পদার্থ অল্প সময়ের মধ্যেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু জৈব পদার্থসমূহ স্রোতবিহীন জলে যেমন, গর্ত, খানা, জলকূপ প্রভৃতিতে সাধারণতঃ সুরক্ষিত থাকে এবং উক্ত পদার্থনির্মিত প্রত্নবস্তু সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করাও সম্ভবপর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সকল প্রত্নবস্তু সংগ্রহশালায় বা বীক্ষণাগারে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত জলমগ্ন অবস্থায় সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পরে রাসায়নিক উপকরণ দ্বারা প্রত্নবস্তু সুরক্ষিত করিতে হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীভুক্ত প্রত্নবস্তু অনাবৃত হইলেই উহাদের ভগ্নপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং উদ্ধারকার্য ব্যাহত হয়। সুতরাং সর্বপ্রথমে এই প্রকার প্রত্নবস্তুকে ব্রুশদ্বারা পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। তৎপরে সংরক্ষণের নিমিত্ত রাসায়নিক দ্রবণের প্রয়োগ বিধেয়। সাধারণতঃ পলিভিনাইল অ্যাসেটিক (অর্থাৎ সির্কাম্ল) দ্বারা আবৃত করিতে হয়। এই দ্রবণ অতি অল্পসময়ের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যায় এবং প্রত্নবস্তুকে সুদৃঢ় করে। রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করিবার পর উক্ত প্রত্নবস্তু সুরক্ষিত অবস্থায় উত্তোলন করা সম্ভবপর।

কিন্তু অগ্নিদগ্ধ হইলে দারু, শস্যকণা প্রভৃতি সুরক্ষিত থাকে। অগ্নিদগ্ধ দারু হইতে বৃক্ষের সনাক্তকরণও সম্ভবপর। এমন কি অগ্নিদগ্ধ শস্যের শ্রেণী-বিভাজনও নির্ণয় করা যায়। রাজবাড়িডাঙায় উৎখনন-কালে একটি বৃহৎ অগ্নিদগ্ধ শস্যভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাণ্ডারের শস্য অগ্নিদগ্ধ হইবার জন্যই সুরক্ষিত অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত করা সম্ভব হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত শস্যভাণ্ডারে গম এবং ত্রিশ্রেণীভুক্ত তণ্ডুল গচ্ছিত ছিল। বাংলাদেশে গমের ব্যবহারের প্রাচীনতম নিদর্শন উক্ত স্থানেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এতদ্‌ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ শেল এবং অস্থি-নিদর্শনের আবিষ্কার ও উদ্ধারণ সম্পর্কিত তথ্যের পর্যালোচনা অতীব প্রয়োজন। প্রায় সকল প্রত্নস্থলেই শম্বুকজাতীয় প্রাণীর নিদর্শন পাওয়া যায়। এই প্রকার আবিষ্কার হইতে তৎসময়ের জলবায়ুর অবস্থা এবং প্রত্নবস্তুর আধার সম্পর্কিত অনেক তথ্য অবগত হওয়া সম্ভবপর। উক্ত তথ্য হইতে খানা, স্রোতবিহীন বা স্রোতবতী জলাধারের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতে শঙ্খনির্মিত অলঙ্কারের ভগ্নাংশের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। ভগ্নপ্রবণতার জন্যই অধিকাংশ শঙ্খনির্মিত অলঙ্কার-নিদর্শনের খণ্ডিতাংশই পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে।

অস্থি-নিদর্শনের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ অস্থি-নিদর্শন দুইটি ভাগে বিভক্ত : পশু ও পক্ষীবিশেষের অস্থি এবং মানুষের অস্থি বা নরকঙ্কাল। পশু ও পক্ষী-অস্থির নিদর্শন তথ্য-পূর্ণ। মৃৎস্তরীভূত অস্থি হইতে বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের খাদ্য সংক্রান্ত উপকরণ নির্ণয় করা যায়। পশুর অস্থি-নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া গৃহপালিত জন্তুর বিবর্তন নির্ধারণ করাও সম্ভবপর। কিন্তু এই নির্ধারণকার্য পশু-অস্থির যথার্থ সনাক্তকরণের উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ কুকুর, বিড়াল, গরু, মেষ, শূকর, ভেড়া, ছাগল, হরিণ, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর অস্থি-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়।

মৎস্যাদির কাঁটার আবিষ্কারও গুরুত্বপূর্ণ। জলকূপ বা খানা হইতেও পশু-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ পশু সম্ভবতঃ জলকূপে বা খানায় নিমজ্জিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মন্দির বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানযুক্ত প্রত্নস্থলেও পশুর অস্থি-নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রকার অস্থির পরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ হইতে অনেক মৌলিক তথ্য অনুধাবন করা সম্ভব।

অস্থি-নিদর্শনের সনাক্তকরণই উৎখনকের একমাত্র লক্ষ্য নহে। আবিষ্কৃত অস্থি-নিদর্শন হইতে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করাও গুরুত্বপূর্ণ কার্য। পশুদিগের আঘাত, হত্যা, বয়স, সময় প্রভৃতি নির্ণয় করাও প্রয়োজন। এমন কি পশু ব্যাধিগ্রস্ত ছিল কিনা তাহাও নির্ধারণ করা কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অনুশীলনের জন্য মৃত্তিকাস্তরে বিন্যস্ত পশুর অস্থি-নিদর্শনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। অন্তরীভূত পশুর অস্থিনির্মিত বস্তুর আবিষ্কারও উল্লেখনীয়। প্রাচীনকাল হইতেই গজদন্ত মহামূল্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত। অধিকাংশ প্রত্নস্থল হইতে গজদন্তনির্মিত বিবিধ অলঙ্কার, পাশা বা অনুরূপ ক্রীড়ার জন্য ফুট্‌কি-চিহ্নিত গুটি, চিরুণি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেক গজদন্তনির্মিত বস্তুর উপর মনোরম নক্‌শা ও চিত্রাঙ্কনের নিদর্শনও বিরল নহে। এতদ্‌ব্যতীত পশুর শিঙ্‌ দ্বারা নির্মিত অনেক নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। পশুর অস্থি-নিদর্শন হইতেই খাদ্য, বেশভূষার সামগ্রী, খেলার জিনিস, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

অস্থি-নিদর্শনসমূহের মধ্যে নরকঙ্কাল বা নরকঙ্কালাংশের আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ সমাধিক্ষেত্র হইতেই নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু আবাসস্থলেও নরকঙ্কালের আবিষ্কার বিরল নহে। এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদারোর রাস্তায়, গৃহমধ্যে এবং সিঁড়ির উপর নর-কঙ্কালের আবিষ্কার উল্লেখনীয়। নানা

কারণবশতঃ আবাসস্থলে নরকঙ্কালের অবস্থানের সন্ধান পাওয়া যায়। এমন কি সৌধের ভিত-খাতেও নরমুণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ রাজবাড়িডাঙা প্রত্নস্থলে উৎখননকালে এই প্রকার নরমুণ্ডের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত মুণ্ড কর্তন করিয়া ভিত-খানায় বিশেষভাবে সংস্থাপন করা হইয়াছিল। এই আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সৌধ সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করিবার জন্য নরবলি ও ভিতখাতে মুণ্ড বিন্যস্ত করিবার প্রথার ইহাই একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

নরকঙ্কাল অনাবৃত করিবার কার্যক্রম অধিকতর আয়াসসাধ্য। অতীব সন্তর্পণের সহিত মন্থর গতিতে এবং ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ নরকঙ্কাল বা কঙ্কালাংশ অনাচ্ছাদন করা কর্তব্য। ছুরিকা, ব্রুশ এবং তুলি উক্ত কার্যের প্রকৃত সহায়ক। ছুরিকার সাহায্যেই ক্রমান্বয়ে সমগ্র নর-কঙ্কাল অনাবৃত করা প্রয়োজন। স্তরায়ণ অনুশীলন করিয়া শব-কবরের সীমানা সুনির্দিষ্ট করা সম্ভবপর। স্তরবিন্যাসের সাহায্যে শব-কবরের কাল নিরূপণ করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নরকঙ্কালের উদ্ধারকার্য অতীব কষ্টসাধ্য। সাধারণতঃ বায়ুর সংঘাতে অনাবৃত কঙ্কালের দৃঢ়তা হ্রাস পায় এবং স্পর্শ করিলে কঙ্কালাংশ ধূলায়িত হয়। সুতরাং নরকঙ্কাল ক্রমান্বয়ে অনাচ্ছাদন করিয়া রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা অত্যাবশ্যক কার্যক্রম। স্পিরিট্ (চোলাই-করা তরল দ্রব্য) ও লাক্ষা-সংমিশ্রিত দ্রবণের প্রলেপ প্রয়োগ করা বিধেয়। ভগ্নপ্রবণ নর-কঙ্কাল অপসারণের নিমিত্ত রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপের উপর মোমের আচ্ছাদন প্রদান করাও প্রয়োজন। তাহা হইলেই অক্ষত অবস্থায় নরকঙ্কাল উদ্ধার ও অপসারণ করা সম্ভবপর হয়।

নরকঙ্কাল সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত ও পরিচ্ছন্ন করিয়া নক্শা-অঙ্কন, আলোকচিত্র ও পরিমাপ গ্রহণ, স্তরবিন্যাস নির্ধারণ, বিস্তারিত নোট-লিখন প্রভৃতি কার্যক্রম সমাপন করিতে হয়। তৎপরে বিন্যস্ত

কঙ্কাল অপসারণ করা কর্তব্য। এই উদ্ধারকার্য অতীব সন্তর্পণের সহিত সম্পাদন করিতে হইবে। প্রয়োজনমত নরকঙ্কালাংশ ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত করিয়া অপসারণ করা বিধেয়। সাধারণতঃ তুলা দ্বারা আবৃত করিয়া কঙ্কালাংশ কাষ্ঠনির্মিত পেটিকাতে আবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন।

নরকঙ্কাল অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নাভিজ্ঞান। নরকঙ্কালের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন হইতে নরগোষ্ঠী নির্ধারণ, উহার মৃত্যুকালীন বয়স, শারীরিক ক্ষত ও অস্বাভাবিকতার চিহ্ন, খাদ্য, যুদ্ধ ও ধর্মসংক্রান্ত তথ্য, মরদেহ বিন্যস্ত এবং নিয়ন্ত্রণ করিবার বিবিধ প্রথা ইত্যাদি বিষয়সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটন করা যায়। নরকঙ্কালের নৃতত্ত্বীয় অনুশীলন হইতে সংস্কৃতির প্রকৃত উদ্ভাবক নির্ণয় করাও সম্ভবপর। সুতরাং নরকঙ্কালের অনাচ্ছাদন এবং উদ্ধারণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালী অনুসারে সম্পাদন করা আবশ্যক।

(২) প্রস্তরশিল্প-নিদর্শন : মানবসংস্কৃতির আদিপর্ব হইতেই মানুষ প্রস্তর দ্বারা আয়ুধ তৈয়ার আরম্ভ করে। সাধারণতঃ মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় প্রত্নস্থলে (অর্থাৎ মানুষ যখন স্থায়ী বসতি স্থাপন আরম্ভ করে) বিশিষ্টতাপূর্ণ বিবিধ প্রকার ও আকারের আয়ুধের সংখ্যাধিক্য উল্লেখনীয়। প্রস্তর অনুশীলন করিয়া উহার উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করা যায়। এমন কি উক্ত স্থানের সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্কও স্থির করা সম্ভব। প্রথমতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ার আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজবাড়িডাঙায় এবং অন্য প্রত্নস্থলে উৎখননকালে সৌধ-ভগ্নাবশেষের অভ্যন্তর হইতে একাধিক নবাশ্মীয় শস্ত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। উক্ত হাতিয়ার খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে আরোপণীয়। এই নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ার ঐতিহাসিক যুগেও ব্যবহৃত হইত। সাধারণতঃ উক্ত হাতিয়ার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য

লৌকিক ক্রিয়াকর্মে প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার অদ্যাপি ব্যবহৃত হয়। প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ার ব্যতিরেকে আরও অনেক সামগ্রী প্রস্তর দ্বারা তৈয়ার করা হইত: (ক) আদি-ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতে প্রস্তরনির্মিত বিবিধ গৃহস্থালী সরঞ্জামের আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য। (খ) আদি-ঐতিহাসিক যুগ হইতেই প্রস্তর দ্বারা বিভিন্ন প্রকার মূর্তিনির্মাণ অদ্যাপি প্রচলিত। প্রস্তরনির্মিত মূর্তির গঠনপ্রণালী ও অপর বৈশিষ্ট্য যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। আবিষ্কৃত মূর্তির বৈলক্ষণ্য অনুশীলন করিয়া বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের কাল নির্ধারণ করাও সম্ভবপর। ঐতিহাসিক যুগে লেখসম্বলিত প্রস্তরমূর্তির আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। (গ) এতদ্‌ব্যতীত প্রস্তরনির্মিত অলঙ্কারশিল্প-নিদর্শনও অতীব প্রাচীন। সাধারণতঃ রত্ন এবং উপরত্ন দ্বারা বিবিধ অলঙ্কার তৈয়ার করা হইত। আদি-ঐতিহাসিক যুগ হইতে বিভিন্ন আকার ও প্রকারের রত্ন ও উপরত্ন দ্বারা নির্মিত পুঁতি বা গুটিকার আবিষ্কার উল্লেখনীয়। এই সকল পুঁতির পদার্থ ও গঠন বিশ্লেষণ করিয়া ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব সম্বন্ধীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুধাবন করা যায়। (ঘ) প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সৌধ নির্মাণ করিবার বিবিধ পদ্ধতিও অতীব প্রাচীন। প্রধানতঃ প্রস্তরনির্মিত বাস্তু পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পর্বতদূরবর্তী অঞ্চলেও প্রস্তর দ্বারা তৈয়ারী বিবিধ বাস্তু-উপকরণ যেমন, চৌকাঠ, সিঁড়ির ধাপ, বেদী প্রভৃতির নিদর্শনও পাওয়া যায়। ধর্মীয় বাস্তু নির্মাণের জন্য দূরবর্তী অঞ্চল হইতেও প্রস্তর আনয়ন করা হইত। মর্মর প্রস্তরের শিল্পকলা ও বাস্তু নিদর্শনের প্রমাণও বিরল নহে। প্রস্তর সনাক্তকরণও গুরুত্বপূর্ণ কার্য। এই কার্যের নিমিত্ত প্রস্তরশাস্ত্রবিশারদগণের সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য। সকল প্রকার প্রস্তরনির্মিত নিদর্শন মৃত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত থাকে এবং উহাদের উদ্ধারকার্য সহজসাধ্য। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সহায়তায় প্রস্তরের শ্রেণী-বিভাগের সনাক্তকরণ অত্যাবশ্যক। উক্ত তথ্য হইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

(৩) ধাতুদ্রব্য : আদি-ঐতিহাসিক যুগ হইতে ধাতুর ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। প্রথমে মানুষ তাম্র দ্বারা আয়ুধ ও অন্য বস্তু নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে। তৎপরে তাম্র ও টিন মিশ্রিত পদার্থের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। উক্ত সময়েই স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুর ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষে লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

ধাতুনির্মিত বিবিধ সামগ্রী যেমন, গৃহস্থালী-সরঞ্জাম, আয়ুধ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ আদি-ঐতিহাসিক যুগ হইতে আবিষ্কৃত বিবিধ মনোরম স্বর্ণালঙ্কারের নিদর্শনও উল্লেখযোগ্য। ধাতুনির্মিত বস্তুর মধ্যে মুদ্রার আবিষ্কার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। বহু প্রাচীনকাল হইতেই তাম্র, স্বর্ণ এবং রৌপ্য দ্বারা মুদ্রা তৈয়ার করিবার বিবিধ পদ্ধতি প্রচলিত। মুদ্রা সাধারণতঃ ছাঁচ-মুদ্রিত, ছাপাঙ্কিত (পান্‌শ্‌ মারকৃড) এবং খোদিত থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষে ছাপাঙ্কিত তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রার অধিক প্রচলন ছিল। এই মুদ্রায় বিবিধ প্রতীক-চিহ্ন বর্তমান। কিন্তু অধিকাংশ প্রতীক-চিহ্ন অবোধ্য। ঐতিহাসিক যুগের মুদ্রায় উপাধিভূষিত নৃপতির নাম, সন-তারিখ, দেবদেবীর নাম প্রভৃতি লিখিত থাকে। এতদ্‌ভিন্ন অনেক প্রতীক-চিহ্ন, মনুষ্য বা দেবদেবীর প্রতিকৃতিও মুদ্রায় অঙ্কিত থাকে। প্রত্ন-বিজ্ঞানে মুদ্রার বিশ্লেষণ অর্থপূর্ণ। মুদ্রাতত্ত্ব অনুশীলন করিয়া রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান, মূর্তিতত্ত্ব, ললিতকলার উৎকর্ষ, বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়-সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হইয়াছে।

উৎখনন-বিজ্ঞানে মুদ্রার আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সন-তারিখ সম্বলিত মুদ্রার আবিষ্কারের সাহায্যে স্তরবিন্যাসের কাল নিরূপণ করা সহজসাধ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মুদ্রার যথাবস্থান সম্যকরূপে প্রণিধান করা প্রাথমিক কর্তব্য। উপরন্তু একক মুদ্রার আবিষ্কার হইতে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে। কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য একাধিক মুদ্রার আবিষ্কার প্রয়োজন।

প্রত্নতত্ত্বে মুদ্রার গুরুত্বের জন্য উহার অনাচ্ছাদন এবং উদ্ধারণ সংক্রান্ত কার্য সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদন করা উচিত। এতদ্‌ব্যতীত লেখসম্বলিত তাম্রফলক বা তাম্রপট্টের আবিষ্কারও গুরুত্বপূর্ণ। সর্ব-প্রকার লেখসম্বলিত ধাতুনির্মিত প্রত্নবস্তুর অনাবরণ ও উদ্ধারণ সম্পর্কিত নীতি অতি সাবধানতার সহিত অনুসরণ করা কর্তব্য। উদ্ধারণের পর উক্ত প্রত্নবস্তু বীক্ষণাগারে প্রেরণ করা আবশ্যক।

ধাতুনির্মিত প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার ও উদ্ধারণকার্য অনায়াসসাধ্য নহে। সকল ধাতুদ্রব্যই অবক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ধাতুনির্মিত প্রত্নবস্তু উদ্ধার করিয়াই রাসায়নিক বীক্ষণাগারে প্রেরণ করা বিধেয়। ব্রঞ্জদ্রব্য সাধারণতঃ 'ব্রঞ্জব্যাধিগ্রস্ত' অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়। অর্থাৎ অবক্ষয়ের জন্য ব্রঞ্জদ্রব্যের উপর উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের আবরণ-চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। রাসায়নিক দ্রবণ দ্বারা এই প্রকার প্রত্নবস্তু পরিচ্ছন্ন করা অতীব প্রয়োজন। ঐতিহাসিক প্রত্নস্থলে লৌহদ্রব্যের আবিষ্কার অত্যধিক। লৌহনির্মিত জিনিসের মধ্যে অস্ত্র, বাসন, কীলক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মৃত্তিকাগর্ভে লৌহদ্রব্যও অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ আবিষ্কৃত হইবার পরে ব্রুশ দ্বারা লোহদ্রব্য পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তৎসত্ত্বেও যদি নিদর্শনের আকার ও প্রকারের কোন সুনির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া না যায় তাহা হইলে উহার একস্ রশ্মি-রেডিওগ্রাফী আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া অবক্ষয়-আলেপনের নিম্নে আদি ধাতুর লক্ষণ হইতে দ্রব্যের যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায়। এমন কি ঐ চিত্রণ হইতে লৌহ-দ্রব্যের যথাযথ নক্‌শা অঙ্কন করাও সম্ভবপর। লৌহনির্মিত নিদর্শন উদ্ধার করিয়া উহাদের রাসায়নিক দ্রবণের ক্রিয়ার অধীন করা একান্ত প্রয়োজন।

(৪) কাঁচদ্রব্য : প্রাচীনকাল হইতে বালুকণা, সোডা, রাসায়নিক ক্ষার (পট্যাশ) এবং অন্য উপকরণের সংমিশ্রণে কাঁচ তৈয়ারী করা হয়। উৎখননে কাঁচনির্মিত বস্তুর আবিষ্কার অপ্রচুর নহে। কাঁচনির্মিত বস্তুর মধ্যে অলঙ্কারসামগ্রী ও বিবিধ পাত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাঁচদ্রব্য

ক্ষণভঙ্গুর। অতএব উহাদের অংশবিশেষের আবিষ্কারই সম্ভবপর। কোন সম্পূর্ণ পাত্রের অস্তিত্ব অনাবৃত হইলেও উহা ভগ্ন অবস্থাতেই পুনরুদ্ধার করা যায়। প্রধানতঃ জলে ধৌত করিলেই কাঁচদ্রব্য পরিষ্কৃত হয়। বিবিধ বর্ণের সংযোগে চিত্রিত বা অলঙ্কৃত কাঁচপাত্রের নিদর্শনও বিরল নহে। এই সকল নিদর্শন অভিজ্ঞ তত্ত্ববিশারদদিগের নিকট প্রেরণ করা উচিত। কাঁচপাত্র-নিদর্শন অনুশীলন করিয়া কাল নিরূপণ করাও সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, আরিকামেডু নামক প্রত্নস্থলে উৎখননের সময় কালনির্দিষ্ট রোমক দেশজাত নীলবর্ণের কাঁচপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কার হইতে উক্ত প্রত্নস্থলের স্তরায়ণের কাল নির্ণয় এবং উহার সহিত বহির্বাণিজ্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাও সম্ভব হইয়াছে।

(৫) মৃন্ময় শিল্প-নিদর্শন : সকল প্রত্নস্থলেই মৃন্ময় শিল্প-নিদর্শনের আধিক্য বিদ্যমান। মৃন্ময় শিল্প-নিদর্শনের মধ্যে (ক) গৃহস্থালীর সরঞ্জাম বা মৃৎপাত্র, (খ) অলঙ্কার, (গ) খেলার সামগ্রী, (ঘ) মূর্তিকা, (ঙ) ইষ্টক ও টালি, (চ) সীল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(ক) মৃৎপাত্র : মৃৎপাত্র-তৈয়ার মানব সংস্কৃতির বিকাশের সহিত ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত। খাদ্য-সংগ্রাহক-সমাজ হইতে খাদ্য-উৎপাদক-সমাজে বিবর্তনের যাত্রাপথেই মৃত্তিকা দ্বারা পাত্র নির্মাণ আরম্ভ হয়। খাদ্য-সংগ্রাহক-সমাজে গুল্ম, ব্রততী, পত্র প্রভৃতি দ্বারা ঝুড়ি নির্মাণ এবং উহার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কালক্রমে উক্ত ঝুড়ি কর্দমাক্ত করিয়া সুদৃঢ় করিবার রীতি আরম্ভ হয়; কর্দমাক্ত ঝুড়িই মৃৎপাত্র তৈয়ার করিবার প্রাথমিক উৎস। প্রারম্ভে মৃৎপাত্র রৌদ্রতাপেই শুষ্ক করা হইত। পরে আকস্মিক অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ শিক্ষা লাভ করিল যে, মৃত্তিকাপাত্র অগ্নিদগ্ধ হইলে দৃঢ়বদ্ধ হইবে। এমন কি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ মৃৎপাত্রে খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করিবার প্রণালীও ক্রমে উদ্ভাবিত হয়।

মৃৎপাত্র তৈয়ার অতীব শ্রমসাধ্য কারুশিল্প। সর্বপ্রথম মানুষ

হস্ত দ্বারাই মৃৎপাত্র তৈয়ার করিত। হস্ত দ্বারা পিষিয়া বা ছাঁচের সাহায্যে পাত্র নির্মিত হইত। ক্ষুদ্রাকৃতি পাত্র ছাঁচে তৈয়ার করা সম্ভবপর। কিন্তু বৃহদাকার পাত্র হস্তদ্বারা পিষিয়া বা পিটাইয়া তৈয়ার করিতে হয়। পাত্রের তলদেশের কাঠামো তৈয়ার করা সর্বপ্রথম কার্য। উহার উপর ক্রমপর্যায়ে মৃত্তিকাবলয় বিন্যস্ত করিতে হয়। তৎপরে পিটাইয়া পাত্রাকারে পরিণত করা যায়। এই নির্মাণ-কার্যক্রম 'বৃত্তাকার পদ্ধতি' নামে পরিচিত। কিন্তু এই পদ্ধতির অনুসরণ সময়সাপেক্ষ। তলদেশের উপর বিন্যস্ত প্রথম মৃত্তিকাবলয় দৃঢ়বদ্ধ হইবার পরই পুনরায় মৃৎবলয় সংস্থাপন করা সম্ভবপর। ক্রমে পদ ও হস্ত দ্বারা চালিত চক্র আবিষ্কৃত হয়। এই চক্রেই কৌলাল-চক্র নামে পরিচিত। কৌলাল-চক্রের উদ্ভাবন ও প্রবর্তন মানবসভ্যতার বিকাশের অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রারম্ভিক পদক্ষেপ। কৌলাল-চক্র প্রবর্তনের ফলে মৃৎপাত্র নির্মাণ করিবার পদ্ধতি রূপান্তরিত হয়। আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এসিরিয়া, সীয়ালক, সিন্ধু উপত্যকা, প্রভৃতি স্থানে প্রাচীনতম কৌলাল-চক্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কৌলাল-চক্রের সাহায্যে বিবিধ প্রকার মৃৎপাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী তৈয়ার করা সহজতর। কিন্তু কোন যুগেই হস্তনির্মিত পাত্রের প্রচলন বন্ধ হয় নাই। একই সময়ে উভয় প্রকার মৃৎশিল্প প্রচলিত ছিল। হস্তনির্মিত ও চক্রনির্মিত মৃন্ময় পাত্রের পার্থক্য নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। প্রথমতঃ, চক্রনির্মিত মৃৎপাত্রের কয়েকটি বৈলক্ষণ্য হইতে এই পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। চক্রনির্মিত মৃৎপাত্রের অভ্যন্তরে বিলেখর (ষ্ট্রাইঅ্যাসন্) চিহ্ন বর্তমান। উক্ত চিহ্ন অঙ্গুলি দ্বারাও অনুভব করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, পাত্রের তলদেশেও উক্ত নিদর্শনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তৃতীয়তঃ, হস্তনির্মিত ও চক্রনির্মিত পাত্রের গাত্রে অঙ্কিত বা খোদিত রেখা হইতেও পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব। চক্রনির্মিত পাত্রের খোদিত রেখা হস্তনির্মিত পাত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতদ্‌ব্যতীত অপর কতিপয় বৈলক্ষণ্য অনুশীলন করিয়া হস্তনির্মিত ও চক্রনির্মিত পাত্রের

পার্থক্য প্রণিধান করা সম্ভবপর হইয়াছে। মৃৎপাত্র দৃঢ়বদ্ধ করিবার প্রণালী দ্বিবিধ : সূর্যতাপদগ্ধ এবং অগ্নিদগ্ধ। অগ্নিদগ্ধ করিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিবার পূর্ব পর্যন্ত সূর্যতাপদগ্ধ পাত্রই ব্যবহৃত হইত। অনেক প্রত্নস্থল হইতে কৌলাল-পোয়ান (কিল্‌ন্) আবিষ্কৃত হইয়াছে। পোয়ানের আকার ও প্রকার অনুশীলন করিয়া উৎখনকগণ মৃৎপাত্র অগ্নিদগ্ধ করিবার পদ্ধতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মৃন্ময় পাত্র তৈয়ার করিবার বিবিধ প্রণালী প্রচলিত। প্রধানতঃ মৃন্ময় পাত্র তৈয়ার করিবার প্রাণালী ঐতিহ্যিক। চিরাচরিত প্রথা বা নিয়মানুসারেই মৃৎপাত্র অদ্যাপি নির্মিত হয়। মৃৎপাত্রের গঠন, আকার ও প্রকার সাধারণতঃ আঞ্চলিক। মৃৎশিল্পের এই ঐতিহ্যিক এবং আঞ্চলিক বিশিষ্টতা বিবিধ কারণে সংগঠিত হয়। দেশান্তরে বসবাসকারী এবং আক্রমণমূলক সংস্কৃতি কর্তৃক নূতন মৃৎপাত্র-শিল্পের প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দৃঢ়বদ্ধ এবং অবিকৃত সমাজে মৃন্ময় পাত্র তৈয়ার করিবার পদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকাই স্বাভাবিক। কুম্ভকারের অজ্ঞাতসারেই কোন কোন ক্ষেত্রে মৃন্ময় পাত্রের ব্যতিক্রম বা রূপান্তর লক্ষ করা যায়। একই শ্রেণীভুক্ত মৃৎপাত্রের মধ্যে পার্থক্যের বিদ্যমানতাও উল্লেখ্য। সাধারণতঃ মৃৎ-পাত্রের আকার, প্রকার, চিত্রণ প্রভৃতিতে এই পার্থক্য প্রকটিত। ক্রমান্বয়ে মৃৎপাত্রের শ্রেণী-বৈশিষ্ট্যও বিলুপ্ত হয়। ক্রমাগত পুনঃকরণের ফলে মৃৎপাত্রের প্রকার, শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির অপকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও স্বাভাবিক। এই প্রবাহ সাধারণতঃ প্রাচীনতম যুগের মৃৎপাত্রশিল্পে লক্ষ করা যায়। উক্ত যুগে সমাজ স্থিতিশীল ছিল না। সুতরাং বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত ও সংযোগের ফলে মৃন্ময় পাত্র-শিল্পের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। নবাশ্মীয় ও তাম্রযুগ সম্বন্ধীয় প্রত্ন-শিল্পতাত্ত্বিকগণ মৃৎপাত্রের আকার, প্রকার এবং চিত্রণ প্রভৃতিতে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবের অভিজ্ঞান বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এমন কি তাঁহারা

মৃৎপাত্র হস্তান্তরিত ও সংক্রামিত হইবার লক্ষণ নির্ণয় করিতেও কৃতকার্য হইয়াছেন।

তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্ব হইতেই মৃৎপাত্রের বিবিধ নির্মাণ-কৌশলের বিস্তার ও প্রভাব লক্ষ করা যায়। উক্ত যুগেই মৃৎশিল্প বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। হস্তনির্মিত মৃৎপাত্রশিল্পে মহিলারাই প্রথমে কুশলী ছিলেন। তাঁহারাই ঐতিহ্যিক আকার ও প্রকার অনুসারে মৃৎপাত্র নির্মাণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে নূতন কৌশল অবলম্বনের জন্য মৃৎপাত্র-শিল্পের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। কৌলাল-চক্র প্রবর্তনের, ফলে মৃৎপাত্র-শিল্প পুরুষদিগের এক্তিয়ারভুক্ত হয়। ক্রমে এই শিল্প স্বতন্ত্র শক্তি ও বিশিষ্টতা অর্জন করে। বিশেষজ্ঞ কুম্ভকার ভ্রাম্যমাণ কারিগরবৃত্তি আরম্ভ করে। ফলে চাহিদা অনুযায়ী মৃৎপাত্র সরবরাহ করা সম্ভব হয়। ক্রমে কুম্ভকার ঐতিহ্যের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া সমাজের চাহিদা অনুসারে মৃৎপাত্রের আকার ও প্রকার পরিবর্তন করিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই। অতএব মৃৎপাত্র-শিল্পের অগ্রগতির পথে সর্বপ্রকার বাধা তিরোহিত হয়। বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাবের জন্য অনুকরণ করিবার স্পৃহাও জাগরিত হয়। এই সকল কারণবশতঃই মৃৎপাত্র-শিল্পের জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

উৎখনন-বিজ্ঞানে সর্বজন-উপেক্ষিত মৃৎপাত্র ও খোলামকুচি মানবসমাজের ইতিবৃত্ত রূপায়ণের প্রকৃত বর্ণমালা। সকল প্রত্ন-স্থলেই খোলামকুচির প্রাধান্য বর্তমান। এমন কি প্রত্নস্থলের ভূপৃষ্ঠেও নানাবিধ খোলামকুচি বিস্তৃত থাকে। অতীতে উৎখনকগণ খোলামকুচির উপর কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করিত না। অধুনা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খোলামকুচির নিদর্শনই মানবসংস্কৃতির সর্বোৎকৃষ্ট পরিচায়ক। সুতরাং উৎখনন-বিজ্ঞানে মৃৎপাত্র ও উহার ভগ্নাংশের আবিষ্কার, উদ্ধারণ এবং লিপিকরণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। সাধারণতঃ, দর্শক এবং খননকার্যে

নিযুক্ত শ্রমিকগণ উৎখনকের খোলামকুচি-সম্পর্কিত অনুশীলনের নিয়ম-নিষ্ঠায় স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হয়। অনেক সময় শ্রমিকগণ খোলামকুচি সম্পর্কে বিবিধ ব্যাখ্যাও প্রদান করে। তাঁহারা মনে করে যে, উৎখনক যাদুমন্ত্রের সাহায্যে খোলামকুচিকে স্বর্ণখণ্ডে পরিণত করিতে সমর্থ। প্রকৃতপক্ষে উৎখনন-বিজ্ঞানে খোলামকুচি উৎখনকের নিকট সুবর্ণ অপেক্ষাও মূল্যবান বাস্তব নিদর্শন।

মৃৎপাত্র ও খোলামকুচি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু। মৃৎপাত্রের আকার ও প্রকার প্রত্যেক সংস্কৃতিরই স্বতন্ত্র সম্পদ। কুম্ভকারের সংরক্ষণশীলতার জন্য মৃৎপাত্রের গঠন সাধারণতঃ অপরিবর্তনশীল। যুগ-যুগান্তর হইতে মৃৎপাত্র সুনিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যসূচক প্রকারেই পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং মৃৎপাত্র সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচায়ক। পেট্রী সর্বপ্রথম খোলামকুচি আবিষ্কারের এবং অনুশীলনের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তিনিই প্রথম প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, খোলামকুচি বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর। মৃৎপাত্র ক্ষণভঙ্গুর। অতি সহজেই মৃৎপাত্র ভগ্নপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীনকালে ভগ্ন মৃৎপাত্রাংশ সাধারণতঃ খানায় বা গর্তে নিক্ষিপ্ত হইত। খানায় উৎখনন করিয়া উক্ত খোলামকুচিসমূহ উদ্ধার করা সম্ভব এবং উৎখনক ভগ্নাংশসমূহ সংযোজন করিয়া পাত্রের আদি রূপের পুনর্গঠন করিতে সমর্থ।

বিভিন্ন কারণে মৃৎপাত্রের বা খোলামকুচির গুরুত্ব প্রতীয়মান হয় : (ক) মৃৎপাত্র এবং খোলামকুচি সর্বযুগে সর্বাত্মক প্রয়োজনীয় কারুশিল্পের নিদর্শন এবং (খ) সংখ্যার প্রাচুর্যের জন্য খোলামকুচির পরিসাংখ্যিক অনুশীলন সম্ভব ; (গ) মৃৎপাত্রের আকার ও প্রকারের পার্থক্য বিভিন্ন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ; (ঘ) মৃন্ময় পাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ; (ঙ) মৃৎপাত্র আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিশিষ্টতার নির্ণায়ক ; (চ) খোলামকুচি বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাবসূচক এবং অনুক্রমিক সংস্কৃতি-পর্বের নির্দেশক ; (ছ) মৃৎপাত্র বিভিন্ন

যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের এবং কারুশিল্প ও ললিতকলার অনুশীলনের প্রধান উৎস।

মৃৎপাত্র ও খোলামকুচি অধ্যয়ন করিয়া বিভিন্ন সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ণয় করা যায়। এই অধ্যয়ন হইতে সভ্যতার বিস্তার ও ব্যবসাসম্পর্কিত অনেক মৌলিক তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতে পণ্ডিচেরীর নিকটবর্তী আরিক্কামেডু নামক প্রত্নস্থল হইতে রোমকদেশজাত অ্যারিটাইন্ (ইতালির অ্যারিটুম নামক অঞ্চলজাত কৌলাল) মৃৎপাত্র, অ্যাম্পোরা (সুরাভাণ্ড) প্রভৃতির আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। এই সকল নিদর্শনই প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত রোমকদেশের বাণিজ্যের কাঠামোর সুদৃঢ় ভিত্তি। অধিকন্তু কালনির্দিষ্ট অ্যারিটাইন পাত্রের সাহায্যে আরিক্কামেডুর স্তরবিন্যাসের কালনিরূপণ সুনির্দ্দিষ্ট করাও সম্ভব হইয়াছে (খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দী)। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে রোমকদেশীয় রুলেটেড্ (কুণ্ডলীকৃত নক্‌শা) মৃৎপাত্রের আবিষ্কারও উল্লেখনীয়। এই রোমক মৃৎপাত্রের অনুকরণে ভারতবর্ষেও অনুরূপ পাত্র নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত প্রকার নিদর্শন ভারতবর্ষের মৃৎশিল্পে রোমক সংস্কৃতির প্রভাব সূচনা করে।

উপরন্তু মৃন্ময় পাত্র বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের নির্দেশক। মৃৎপাত্র অনুশীলন করিয়া ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-পর্বের বিবিধ ধারা ও উপধারা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। হরপ্পা সংস্কৃতির মৃৎপাত্রের স্বতন্ত্র বৈলক্ষণ্য বর্তমান। এই সকল মৃৎপাত্র তাম্রাশ্মীয় (ক্যালকোলিথিক) সংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন। অপর প্রত্নস্থল হইতে অনুরূপ মৃৎপাত্রের নিদর্শন তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রভাব জ্ঞাপন করে। হস্তিনাপুর প্রত্নস্থলে তাম্রাশ্মীয় যুগ হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত পর্বানুক্রমিক বিবিধ প্রকার মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রাশ্মীয় সংস্তর হইতে গিরিমাটিতে রঞ্জিত কৌলালের (ঔক্যার ওয়্যার) উদ্ধার বৈশিষ্ট্যসূচক। উহার উপরিস্থ স্তরায়ণে চিত্রিত ধূসর কৌলালের নিদর্শন

গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরিস্থ সংস্তর হইতে উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ-চিক্কণ-উজ্জ্বল কৌলালের (নর্দান ব্ল্যাক্ পলিশড্ পট্যারি) আবিষ্কারও অর্থসূচক। উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ-চিক্কণ-উজ্জ্বল কৌলালের কাল সুনির্দিষ্ট। এই সকল মৃৎপাত্র-অভিজ্ঞান দ্বারা ত্রয়ী সংস্কৃতি-পর্বের পর্যায়ানুক্রমিক বিদ্যমানতা স্বীকৃত। এমন কি উক্ত ত্রিবিধ সংস্কৃতিভুক্ত কৌলালের কাল নির্ধারণ করাও সম্ভব হইয়াছে। উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ-চিক্কণ-উজ্জ্বল কৌলালের নির্দিষ্টকাল এবং স্তরবিন্যাসের অনুশীলন দ্বারা নিম্নস্থ অপর কৌলালদ্বয়-বিন্যস্ত স্তরায়ণের কালও নির্ণীত হইয়াছে।

সাধারণ কৌলাল ব্যতীত প্রাচীনকালে বিবিধ আকার ও প্রকার মৃৎপাত্রের গাত্রে চিত্র ও নকশা অঙ্কন করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। নক্শাঙ্কন-পদ্ধতি দ্বিবিধ : ছাঁচমুদ্রিত অথবা ছাপাঙ্কিত এবং খোদিত। মৃৎপাত্রগাত্রে চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতিও বিবিধ। প্রথমতঃ, পঙ্ক-প্রলেপিত বা শ্লিপ-আলেপিত (বিশুদ্ধ মৃত্তিকা ও জলমিশ্রিত তরল পদার্থ বিশেষ বা পঙ্ক-প্রলেপ) মসৃণ গাত্র রঞ্জিত করিয়া পটভূমি তৈয়ার করিবার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। উহার উপর তুলির সাহায্যে একক বা একাধিক রঙ দ্বারা পরিকল্পনা অনুসারে বিবিধ চিত্র অঙ্কিত হইত। এই চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি এবং চিত্র-পরিকল্পনা বিভিন্ন সংস্কৃতি-ভুক্ত। প্রসঙ্গতঃ হরপ্পা-সংস্কৃতির সমাধির জন্য ব্যবহৃত চিত্রাঙ্কিত কুম্ভ এবং অপর চিত্রিত মৃৎপাত্রের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। হরপ্পা সংস্কৃতির মৃৎপাত্রাঙ্কিত চিত্র এবং পরবর্তীযুগের চিত্রিত ধূসর-কৌলালের বিদ্যমানতা এবং বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত। চিত্রিত ধূসর-কৌলাল অপর সংস্কৃতিভুক্ত। পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগের চিত্রিত মৃন্ময়-পাত্রও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই প্রকার তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, চিত্রাঙ্কিত কৌলাল বিভিন্ন যুগভুক্ত সংস্কৃতির প্রকৃত নির্দেশক। এতদ্ব্যতীত মৃৎপাত্রের গাত্রে কুম্ভকারের নাম খোদিত বা মুদ্রিত থাকিত। এই প্রকার লেখ হইতে কাল নির্ধারণ করা সহজতর।

উপরন্তু কৌলালপাত্রে অবোধ্য লেখ এবং বিবিধ রেখাঙ্কিত (গ্রাফিটি) নিদর্শনও পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে রেখাঙ্কিত বা খোদিত মৃৎপাত্রভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সকল রেখা বোধগম্য নহে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, মৃৎপাত্র বা খোলামকুচি মানব সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের প্রকৃত আধার। প্রাচীনতম কাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানবসংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা খোলামকুচির অনুশীলন হইতে নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। উক্ত কারণবশতঃই সংস্কৃতির ইতিহাস লিখনে মৃৎপাত্র বা খোলামকুচি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু বলিয়া স্বীকৃত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, বহু ক্ষেত্রে প্রাচীনতম আকার ও প্রকারের মৃৎপাত্র অদ্যাপি নির্মিত হয়। মহেঞ্জোদারোর বিবিধ প্রকার মৃন্ময় পাত্র অদ্যাপি সিন্ধুদেশের কুম্ভকারগণ তৈয়ারী করে। সুতরাং কৌলালের ঐতিহ্যিক গঠন-প্রণালীর ধারা অব্যাহত থাকা অস্বাভাবিক নহে। এই সকল ক্ষেত্রে কৌলালের গঠন-প্রণালী ও অপর বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করিয়া কালনিরূপণ এবং সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা নির্ধারণ করা সর্বক্ষেত্রে যুক্তিসিদ্ধ নহে।

মৃৎপাত্র বা খোলামকুচি মৃত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু আর্দ্র মৃত্তিকায় অপরিমিত অগ্নিদগ্ধ প্রাচীনতম খোলামকুচির ভগ্নপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং উত্তোলনের সময় উহা বিচূর্ণিত হইবার সম্ভাবনাও অধিক। প্রধানতঃ অম্লযুক্ত মৃত্তিকা খোলামকুচি-সংরক্ষণের পরিপন্থী। সর্বপ্রকার খোলামকুচি জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিলে সুরক্ষিত হয়। প্রয়োজনমত রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করাও বিধেয়। চিত্রিত বা নক্শাকৃত মৃৎপাত্র অতীব সতর্কতার সহিত আবরণমুক্ত এবং উত্তোলন করা আবশ্যক। পাত্রে অঙ্কিত চিত্রের সুরক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করা কর্তব্য। বিশুদ্ধ জলে ধৌত করিয়া রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা বিধেয়। লেখসম্বলিত বা রেখাঙ্কিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পৃথকভাবে

উদ্ধার করা প্রয়োজন। সর্বদাই লক্ষ রাখিতে হইবে যাহাতে পাত্রের গাত্রাঙ্কিত লেখ সুরক্ষিত থাকে।

উৎখননকালে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্র ও খোলামকুচি সংক্রান্ত অপর তথ্য এবং উহাদের লিপিকরণ ও উদ্ধারণ সম্পর্কিত কার্যক্রম পরবর্তী অনুচ্ছেদে প্রত্নবস্তু-লিপিকরণ প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

(খ) অলঙ্কার-সামগ্রী: মৃৎপাত্র ব্যতীত প্রায় সকল প্রত্নস্থল হইতেই মৃন্ময় শিল্পকলা-নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। এই নিদর্শনসমূহের মধ্যে মৃন্ময় অলঙ্কার-সামগ্রীর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন আকার ও প্রকার পোড়ামাটির পুঁতির আধিক্য উল্লেখযোগ্য। এই সকল পুঁতি গ্রন্থন করিয়া কণ্ঠহার তৈয়ার করা হইত। এতদ্‌ভিন্ন পোড়ামাটির কর্ণফুল, নথ, বালা, কঙ্কন, মল প্রভৃতি নিদর্শনের আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ দরিদ্র জনসাধারণই মৃত্তিকানির্মিত অলঙ্কার-সামগ্রী ব্যবহার করিত। বিত্তশালিগণ স্বর্ণ, রৌপ্যাদি, রত্ন প্রভৃতি পদার্থ-নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিত। মৃত্তিকানির্মিত অলঙ্কার-সামগ্রী ক্ষণভঙ্গুর। কেবলমাত্র পরিমিত অগ্নিদগ্ধ মৃন্ময় অলঙ্কার-সামগ্রীই সুরক্ষিত থাকে। অপরিমিত অগ্নিদগ্ধ বা কাঁচা মৃন্ময় অলঙ্কার-নিদর্শন সাধারণতঃ বিনষ্ট হয়। অক্ষত থাকিলেও উহাদের উদ্ধারকার্য কষ্টসাধ্য। পোড়ামাটির অলঙ্কার-নিদর্শন হইতে অনেক মৌলিক তথ্য অনুধাবন করা যায়।

(গ) খেলার সামগ্রী: প্রাচীনকালে খেলার নিমিত্ত বিবিধ সামগ্রী মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত হইত। এই সকল সামগ্রীর মধ্যে বিভিন্ন আকার ও প্রকার পোড়ামাটির দাবার গুটি, গোলক, চাক্তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ প্রত্নস্থল হইতে অসংখ্য পোড়ামাটির গুলতি বা গোলক ও চাকতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। নানাবিধ পোড়ামাটির খেলার সামগ্রীর আবিষ্কার ও উদ্ধার করা সহজসাধ্য।

(ঘ) মৃত্তিকা : এতদ্ব্যতীত মৃন্ময় মূর্তি-শিল্প-নিদর্শনের আবিষ্কার অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মৃত্তিকা দ্বারা মূর্তি-নির্মাণকার্য প্রচলিত। বিবিধ মৃন্ময় মূর্তির মধ্যে জীবজন্তু, মানুষ ও দেব-দেবীর প্রতিকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃন্ময় মূর্তির গঠন-পদ্ধতি দ্বিবিধ : হস্তনির্মিত এবং ছাঁচমুদ্রিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ছাঁচমুদ্রিত মুণ্ড হস্তনির্মিত মূর্তিতে সংলগ্ন করা হইত। অধিকন্তু এই সকল মূর্তিকে রৌদ্রে শুষ্ক ও অগ্নিদগ্ধ করিবার প্রথা সর্বযুগেই প্রচলিত ছিল। প্রধানতঃ পোড়ামাটি-মূর্তির নিদর্শনই সুরক্ষিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়।

বিভিন্ন যুগের পোড়ামাটি-মূর্তির গঠন-প্রণালীর ও অপর বৈলক্ষণ্যের অনুশীলন প্রত্নবিজ্ঞানের মৌলিক নিবন্ধ। বিভিন্ন সংস্কৃতির পর্বের বা যুগের পোড়ামাটি-মূর্তির বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সুতরাং পোড়ামাটি-মূর্তি সংস্কৃতি-পর্বের কালনির্ণয়কার্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পোড়ামাটি-মূর্তির আকৃতি ও লক্ষণ প্রধানতঃ কালবর্জিত অভিজ্ঞান। অধিকন্তু মৃন্ময় মূর্তির নির্মাণ-পদ্ধতি ঐতিহ্যিক। সুতরাং প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত অনুরূপ মূর্তি-নির্মাণ প্রচলিত। মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত পোড়ামাটি-মূর্তির অনুরূপ প্রতিকৃতি অদ্যাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত হয়। অতএব মৃন্ময় মূর্তির বৈলক্ষণ্য অনুশীলন করিয়া কালনির্ধারণকার্য সন্দেহাতীত নহে। কেবলমাত্র স্তরবিন্যাসের সাহায্যেই মৃন্ময় মূর্তির কাল সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব। তৎসত্ত্বেও মৃন্ময় মূর্তি অনুশীলন করিয়া সামাজিক, ধর্মীয়, ললিতকলার উৎকর্ষ প্রভৃতি বিষয়-সম্পর্কিত অনেক তথ্য অনুধাবন করা যায়।

এতদ্ব্যতীত পোড়ামাটি-চিত্র-ফলকের (টের‍্যাকট্যা প্ল্যাক্) আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। বৃক্ষ, ফল, পুষ্প, পশু, পক্ষী, মানুষ প্রভৃতির আকৃতি ছাঁচমুদ্রিত। মৃন্ময় ফলককে প্রথমে রৌদ্রতাপে শুষ্ক এবং পরে অগ্নিদগ্ধ করিতে হয়। পোড়ামাটি-প্ল্যাক্ মন্দিরগাত্রে এবং কুলুঙ্গীর

অভ্যন্তরে নিবিষ্ট থাকিত। অনেক ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতে উক্ত প্রকার বিবিধ ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। অহিচ্ছত্রা, কৌশাম্বী, পাহাড়পুর প্রভৃতি প্রত্নস্থল হইতে বিবিধ পোড়ামাটির চিত্র-ফলকের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের পরবর্তী যুগের মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ পোড়ামাটি-চিত্র-ফলক অতীব মনোরম ও আকর্ষণীয় শিল্প-নিদর্শন। পোড়ামাটির চিত্র-ফলক সাধারণতঃ মৃত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত থাকে। সুতরাং উহাদের পুনরুদ্ধারকার্য অধিকতর সহজ-সাধ্য।

(ঙ) সীল-নিদর্শন : অপর মৃত্তিকানির্মিত প্রত্ননিদর্শনের মধ্যে সীল বা সীলমোহরের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বহু প্রাচীন-কাল হইতেই মৃত্তিকানির্মিত বিবিধ সীলের ব্যবহার প্রচলিত। মৃন্ময় সীল দ্বিবিধ: চিত্রসম্বলিত এবং লেখসম্বলিত। অনেক সীলে চিত্র ও লেখ উভয়েরই নিদর্শন পাওয়া যায়। চিত্রসম্বলিত সীলে বৃক্ষ, পুষ্প, ফল, জীবজন্তু, মানুষের ও দেব-দেবীর প্রতিকৃতি বর্তমান থাকে। সীলে ছাঁচমুদ্রিত প্রতিকৃতির সহিত লেখর বিদ্যমান-তাও উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদারো হইতে আবিষ্কৃত প্রতীকচিহ্ন ও লেখ সম্বলিত সীলের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত সীলের লেখর পাঠোদ্ধার অদ্যাপি সম্ভবপর হয় নাই।

উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে নানা আকার এবং প্রকার মৃন্ময় সীল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল প্রত্নস্থলের মধ্যে বৈশালী, নালন্দা, সারনাথ, রাজঘাট, রত্নগিরি, পাহাড়পুর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি রাজবাড়িডাঙা নামক প্রত্নস্থল হইতে বিবিধ আকারের অসংখ্য মৃন্ময় সীলের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মৃত্তিকানির্মিত সীল প্রধানতঃ বৌদ্ধ-বিহার ও স্তূপ সম্বলিত প্রত্নস্থল হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল সীলের লেখর অনুশীলন করিয়া কালনিরূপণ করাও সম্ভবপর।

অনেক প্রত্নস্থলের কালনির্দিষ্টবিহীন স্তরবিন্যাসের কালনির্ণয় লেখসম্বলিত সীল হইতেই নির্দিষ্ট হইয়াছে।

মৃত্তিকানির্মিত সীল রৌদ্রতাপে শুষ্ক বা অগ্নিদগ্ধ করিতে হয়। সূর্যের তাপে শুষ্ককৃত মৃৎসীলের ভগ্নপ্রবণতা অত্যধিক। আর্দ্র মৃত্তিকায় বিন্যস্ত এই প্রকার সীল বিনাশপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক এবং উহাদের পুনরুদ্ধার করাও অসম্ভব। কেবলমাত্র অগ্নিদগ্ধ মৃন্ময় সীল সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ মৃৎসীলের অগ্নিদগ্ধতাও অত্যল্প। সুতরাং আর্দ্র মৃত্তিকায় বিন্যস্ত উক্ত প্রকার সীলও বিনষ্ট হয়। উপরন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি সীলের আধিক্য উল্লেখযোগ্য। অপসারিত মৃত্তিকার সহিত ক্ষুদ্রাকৃতি সীল স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা অধিক। সুতরাং খননকালে সীল-বিন্যস্ত স্তরের মৃত্তিকা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া অপসারণ করা কর্তব্য। অনাচ্ছাদিত সীলসমূহের বিস্তারিত লিপিকরণান্তে উত্তোলন করিয়া শুষ্ক করা অত্যাবশ্যক। তৎপরে বীক্ষণাগারে জল ও তুলি দ্বারা অতি সন্তর্পণের সহিত প্রতিচিহ্নিত বা খোদিত লেখ প্রতিভাত করা বিধেয়। সাধারণতঃ খোদিত লেখ মৃত্তিকার সংঘাতে অস্পষ্টাকারে পরিণত হয়। সুতরাং মৃন্ময় সীলের লেখর পরিষ্করণের উপরই উহার পাঠোদ্ধার এবং কালনির্দিষ্টকরণ সর্বতোভাবে নির্ভরশীল (চিত্র নং ৩০)।

(ঙ) ইষ্টক ও টালি-নিদর্শন: মৃন্ময় বস্তু-নিদর্শনের মধ্যে ইষ্টক ও টালির তৈয়ার প্রণালী এবং উহাদের অনুশীলনকার্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আদি-ঐতিহাসিক যুগ হইতেই সূর্যতাপদগ্ধ ইষ্টক বা মৃৎতাল দ্বারা গৃহনির্মাণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত। ইষ্টক তৈয়ার করিবার প্রণালী দ্বিবিধ: হস্তনির্মিত এবং ছাঁচমুদ্রিত। হস্তনির্মিত ইষ্টক সাধারণতঃ বৃহদাকার এবং অসদৃশ। অর্থাৎ হস্তনির্মিত ইষ্টকের আকার ও প্রকার অনুরূপ নহে। কিন্তু ছাঁচমুদ্রিত ইষ্টক সদৃশ হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে ইষ্টকে শিল্পকারের নামও খোদিত থাকে। ইষ্টক নির্মাণের জন্য উপযুক্ত মৃত্তিকার প্রয়োজন অধিক। ছাঁচ

বা হস্ত দ্বারা ইষ্টকখণ্ড তৈয়ার করিয়া সূর্যতাপে উত্তমরূপে শুষ্ক করিতে হয়। তৎপরে অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করা প্রয়োজন। প্রাচীন কালে কাষ্ঠাগ্নিতেই ইষ্টক দগ্ধ করা হইত। সূর্যের তাপে বিন্যস্তকালীন নম্র ইষ্টকখণ্ডের উপর বিবিধ জন্তুর পদচিহ্নের বিদ্যমানতা উল্লেখনীয়। উক্ত নিদর্শন হইতে তৎসময়ের বিবিধ প্রাণিকুলের অস্তিত্ব নির্ণয় করা সম্ভবপর।

মৃত্তিকাগর্ভে ইষ্টক সুরক্ষিত থাকে। অতএব উহাদের অনাচ্ছাদন-কার্য অধিক সহজ। কিন্তু বহুদিন জলমগ্ন বা জলসিক্ত থাকিলে ইষ্টকের দৃঢ়তা হ্রাস পায় এবং ভগ্নপ্রবণতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রাচীনকালে ইষ্টক-গাঁথুনীর নিমিত্ত কোন মশলা ব্যবহৃত হইত না। কেবলমাত্র দৃঢ়তা-সংযোজক কর্দম ব্যবহার করা হইত। পরবর্তী যুগে সুরকী ও চুন-মিশ্রিত মশলার ব্যবহার প্রচলিত হয়। টালির অনুরূপ বৃহদাকার ইষ্টক প্রধানতঃ প্রাঙ্গণ ও ছাদ নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হইত।

ইষ্টকের আকার ও প্রকার বিভিন্ন সংস্কৃতির পরিচায়ক। বিভিন্ন যুগে ইষ্টকের আকার ও প্রকার পরিবর্তিত হইয়াছে। আদি-ঐতিহাসিক, প্রাচীন ঐতিহাসিক, মধ্য যুগের এবং বর্তমান কালের ইষ্টকের আকার ও প্রকার সম্পর্কিত বিভিন্নতা সুনির্দিষ্ট। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উত্তর ভারতে গুপ্তযুগের ইষ্টকের আকার বৃহত্তর। কিন্তু পরবর্তী যুগে ইষ্টক ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইয়াছে। মধ্যযুগের ইষ্টক সর্বক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রাকৃতি। অতএব ইষ্টকের আকার ও প্রকার যুগ-নির্দেশক। অনাচ্ছাদিত ইষ্টকের পরিমাপ গ্রহণ করিয়া উহাদের তুলনামূলক অনুশীলনও অতীব প্রয়োজনীয়। এই অনুশীলনজাত তথ্য হইতে পূর্বতন যুগের ইষ্টক পরবর্তী সৌধনির্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা তাহাও নির্ণয় করা যায়।

প্রসঙ্গতঃ, অলঙ্কৃত ইষ্টক তৈয়ার এবং উহাদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন যুগের ইষ্টক বিবিধ প্রকারে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে। ইষ্টক অলঙ্কৃত করিবার পদ্ধতিও দ্বিবিধ: ছাঁচালঙ্কৃত এবং

হস্তালঙ্কৃত। সূর্যতাপ-দগ্ধ এবং অগ্নিদগ্ধ উভয় প্রকার ইষ্টক অলঙ্কৃত বা নক্শাঙ্কিত করিবার জন্য বিবিধ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। প্রধানতঃ ছাঁচে মৃত্তিকা পীড়ন করিয়া প্রতিকৃতি মুদ্রিত করিতে হয়। সাধারণতঃ অঙ্কিত ইষ্টকে ফল, ফুল, গুল্ম, জ্যামিতিক নক্শা প্রভৃতির আধিক্য বর্তমান। দেওয়ালের কার্নিস্ (ক্যরনিস্), কুলুঙ্গী (নিশ্) প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত বা নকশাকৃত ইষ্টকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই প্রকার ব্যবহৃত ইষ্টক হইতে চারুকলা, স্থাপত্যের উৎকর্ষ, ধর্মীয় ও সামাজিক ধ্যান-ধারণা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অনেক প্রত্নস্থলে পূর্বতন সৌধের অলঙ্কৃত ইষ্টক পরবর্তী দেওয়ালের ভিতে বিন্যস্ত অবস্থাতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রকার নিদর্শন হইতে অনুধাবন করা যায় যে, পূর্বতন দেওয়াল হইতে ইষ্টক অপহরণ করিয়া পরবর্তী দেওয়াল নির্মিত হইয়াছিল। ইষ্টকের পরিমাপ, গঠন-প্রণালী, নক্শা প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন এবং বর্ণন করা সম্ভব। কোন প্রকার ইষ্টকের বা টালির নিদর্শনই উপেক্ষণীয় নহে। সর্বক্ষেত্রেই ইষ্টকসম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। উৎখননকালে সকল পর্যায়ের ইষ্টকের পরিমাপ গ্রহণ ও পরিসাংখ্যিক অনুশীলনও অত্যাবশ্যক কার্যক্রম।

(৬) চুনের পলেস্তারা (লাইম প্ল্যাস্টার): অধিকাংশ ঐতিহাসিক প্রত্নস্থলে অনাবৃত দেওয়ালের গাত্রে চুনের আস্তরের প্রলেপ-সম্পর্কিত নিদর্শন পাওয়া যায়। এমন কি পলেস্তারার উপর রংয়ের আলেপনের প্রমাণও বিরল নহে। এই প্রসঙ্গে রাজবাড়িডাঙা-প্রত্নস্থলে মেঝের ও দেওয়ালের পলেস্তারার উপর রক্তাভ প্রলেপ-নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখনীয়। রক্তাভ মৃত্তিকা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত রঙ তৈয়ার করা হইত। সিক্ত পলেস্তারা অক্ষত অবস্থায় অনাবরণ বা উদ্ধার করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে। অতীব সন্তর্পণের সহিত বুরুশ দ্বারা পরিষ্কার করিয়া পলেস্তারা শুষ্ক করিতে হয়। শুষ্ক হইবার পর রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা

শ্রয়। বহু ক্ষেত্রে দেওয়ালের ইষ্টক পতিত হইবার ফলে মেঝের রঞ্জিত পলেস্তারা খণ্ডিত বা বিনষ্ট হয়। খণ্ডিত বা পলেস্তারাংশ সংরক্ষণ করিয়া পুনর্বিন্যাস করাও অসম্ভব নহে। উৎখনকগণ ইংলণ্ডে ও অন্যত্র রোমক সৌধের খণ্ডিত পলেস্তারা পুনর্বিন্যাস করিতেও সমর্থ হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত অলঙ্কৃত বা নক্‌শাকৃত পলেস্তারাংশও অনেক প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজবাড়িডাঙা- প্রত্নস্থল হইতে পত্র, গুল্ম, পুষ্প ও জ্যামিতিক চিহ্নসম্বলিত অনেক চুনের পলেস্তারাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শন হইতে তৎকালীন চারুকলার বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য অনুশীলন করা সম্ভবপর।

(৭) ষ্টাকো-নিদর্শন (এক প্রকার চুন, সুরকি বা প্রস্তরকণা এবং মৃত্তিকা মিশ্রিত উপকরণ): ঐতিহাসিক প্রত্নস্থলে ষ্টাকোনির্মিত বিভিন্ন নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। গুল্ম, পুষ্প, ফল প্রভৃতি ব্যতিরেকে ষ্টাকো-উপকরণ দ্বারা মূর্তিগঠনও প্রচলিত ছিল। ষ্টাকোর উপকরণ সকল অঞ্চলে অনুরূপ নহে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে ষ্টাকো প্রস্তর-চূর্ণ ও চুন মিশ্রিত উপাদানমূলক পদার্থ। কিন্তু অন্যত্র, বিশেষতঃ পূর্বভারতে, ষ্টাকো ইষ্টকচূর্ণ, চুন- ও মৃত্তিকা মিশ্রিত বস্তু। ষ্টাকো নমনীয় ও পরিবর্তনসাধ্য উপকরণ। সুতরাং মূর্তি-গঠনে ষ্টাকো অতীব উপযোগী উপকরণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সহিত ষ্টাকোনির্মিত ভাস্কর্য-শিল্প বিজড়িত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে ষ্টাকোর অধিক প্রচলন আরম্ভ হয়। তক্ষশিলা এবং নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে অসংখ্য ষ্টাকোনির্মিত ভাস্কর্যশিল্পের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ষ্টাকো-মুণ্ডের আবিষ্কারই সর্বাধিক। আবিষ্কৃত ষ্টাকো-নির্মিত ভাস্কর্যশিল্পের মধ্যে বুদ্ধমূর্তি এবং সাধারণ মুণ্ডের প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের কারুশিল্পের ও ললিতকলার বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন হইতে গ্রীক ও রোমক কারুশিল্পের প্রভাব

প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্ত সময়েই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রখ্যাত গন্ধার-শিল্প বিকশিত হইয়াছিল। এই অঞ্চলের ষ্টাকো-মূর্তিশিল্প গন্ধার-শিল্প-শ্রেণীভুক্ত। ষ্টাকো-শিল্প উক্ত অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তৎপরে গন্ধার-শিল্প বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু পরবর্তীকালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতেও ষ্টাকোনির্মিত মূর্তির ভগ্নাংশ ও সম্পূর্ণ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৌধ সুসজ্জিত করিবার জন্য ক্ষুদ্রাকৃতি ষ্টাকোমুণ্ড কুলুঙ্গীতে বিন্যস্ত করা হইত। এই ষ্টাকো-নিদর্শন তৎকালীন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সহিত বিজড়িত। যে সকল প্রত্নস্থল হইতে ষ্টাকো-মূর্তির শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাদের মধ্যে রাজগৃহ এবং নালন্দা উল্লেখযোগ্য। বাঙলা দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলাংশ হইতে ষ্টাকো মুণ্ডের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড়পুরে উৎখনন-কালে বুদ্ধের একাধিক ষ্টাকো মুণ্ড উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্প্রতি রাজ-বাড়িডাঙা-প্রত্নস্থল হইতে অতীব মনোরম কতিপয় ষ্টাকো মুণ্ডের আবিষ্কার উল্লেখনীয়। এই প্রত্নস্থলের নির্ধারিত স্তরবিন্যাস অনুসারে ষ্টাকো-মুণ্ডসমূহ ত্রিপর্বভুক্ত—প্রাক্-গুপ্ত, গুপ্ত এবং গুপ্ত-উত্তর। বাঙলা দেশে এই প্রকার যুগভিত্তিক মনোরম ষ্টাকো-মুণ্ড রাজবাড়িডাঙাতেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ষ্টাকোনির্মিত সম্পূর্ণ মূর্তির বা মুণ্ডের পুনরুদ্ধারকার্য অতীব কষ্ট-সাধ্য। সিক্ত মৃত্তিকায় বিন্যস্ত ষ্টাকো-নিদর্শন নম্রতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উৎখননের সময় ক্ষত বা বিনষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। শুষ্ক ও শিথিল মৃত্তিকায় এবং ভস্মাকীর্ণ স্তরে ষ্টাকো-নিদর্শন সুরক্ষিত থাকে। ষ্টাকো-নিদর্শনের অনাচ্ছাদন ও উদ্ধারকার্য অতীব সাবধানতার সহিত সমাপন করা কর্তব্য। অধিক সন্তর্পণের সহিত ছুরিকা এবং বুরুশ দ্বারা উক্ত নিদর্শন অনাবৃত করিতে হয়। তৎপরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে লিপিকরণ সমাপ্ত করিয়া সযত্নে উত্তোলনপূর্বক বীক্ষণাগারে প্রেরণ করা উচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, ষ্টাকোনির্মিত মুণ্ডের উপরক্ষ

রঙের প্রলেপ প্রদানের প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। বীক্ষণাগারে ষ্টাকো-নিদর্শন পরিচ্ছন্ন করিয়া রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা বিধেয়।

ষ্টাকোনির্মিত শিল্পনিদর্শন হইতে কারুশিল্পের এবং ললিতকলার উৎকর্ষ নির্ণয় করা যায়। সমাজগত ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, আচার ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তথ্য উক্ত নিদর্শন হইতে অনুধাবন করা সম্ভব। অধিকন্তু ষ্টাকোনির্মিত মূর্তির গঠন-প্রণালী বিবিধ যুগ-ভিত্তিক। বিভিন্ন যুগের ষ্টাকো-মূর্তিশিল্প অনুরূপ নহে। প্রতি যুগের ষ্টাকো-মূর্তির বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করিয়া কালনিরূপণ করাও সম্ভবপর। সুতরাং ষ্টাকো-মূর্তির যুগবৈশিষ্ট্যের সাহায্যে প্রত্নস্থলের স্তরবিন্যাসের কাল নির্ধারণ করাও সম্ভব। এই সকল কারণবশতঃ সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণকার্যে ষ্টাকো-নিদর্শনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সাধারণভাবে প্রত্নবস্তুর শ্রেণীবিভাজন এবং উদ্ধারণ-সম্পর্কিত সকল তথ্য সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হইয়াছে। সর্বপ্রকার প্রত্নবস্তুর সবিশেষ পরিচয় প্রদান ও উদ্ধারণ-প্রণালীর অনুসরণের বিস্তারিত বর্ণনা এখানে পরিবেশন করা সম্ভব নহে। ভঙ্গুর এবং ক্ষয়িত প্রত্নবস্তুর পুনরুদ্ধারণ সংক্রান্ত পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাও প্রয়োজন। এই প্রকার প্রত্নবস্তু উদ্ধারণের নিমিত্ত উৎখনকের সম্যক জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অত্যধিক দরকার। উত্তোলনের পূর্বে ও পরে ক্ষণভঙ্গুর প্রত্নবস্তুসমূহকে রাসায়নিক ক্রিয়ার অধীন করা অত্যাবশ্যক কার্য।

প্রত্নবস্তুকে রাসায়নিক ক্রিয়ার অধীন করিবার কার্যক্রম দ্বিবিধ: উত্তোলনের নিমিত্ত দৃঢ়বদ্ধকরণ এবং অবক্ষয়ের ও বিকৃতির হাত হইতে সংরক্ষণ। দৃঢ়বদ্ধকারক এবং সংযোজক উপকরণ প্রত্নবস্তুর অনাবরণের পরেই ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় বায়ুর সংঘাতে প্রত্ন-বস্তুর বিনাশপ্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান। কিন্তু দৃঢ়বদ্ধকারক দ্রবণ এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্নবস্তুর স্বাভাবিক বর্ণ

অবিকৃত থাকে। অর্থাৎ উক্ত দ্রবণের ব্যবহারের ফলে যেন বীক্ষণাগারে প্রত্নবস্তুর পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের কোন ব্যাঘাত না জন্মায়। সাধারণতঃ লাক্ষা ও স্পিরিট্ মিশ্রিত তরল দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা বিধেয়। এতদ্‌ব্যতীত দৃঢ়বদ্ধকারক প্যারাফিন্- ওঅ্যাক্‌স্‌ও (খনিজ মোম) ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই উপকরণের ব্যবহার বীক্ষণাগারে প্রত্নবস্তুর পরীক্ষণকার্যের পরিপন্থী। দারুনির্মিত প্রত্নবস্তু মোমদ্বারা আবৃত করা যায়। ক্যারবো ওঅ্যাক্‌স্ (পলিয়েথিলেন্ গ্লিস্কোলি) ব্যবহার করা বিধেয়। কিন্তু ধাতুদ্রব্য এবং চিত্রিত পলেস্তারার উপর মোঁমের আবরণ প্রদান করা সঙ্গত নহে। সাধারণতঃ ভিনামুল জলে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা কর্তব্য।

কোন অস্থিখণ্ড উত্তোলনের নিমিত্ত উপরি-উক্ত মিশ্রিত দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা যায়। কিন্তু মৃত্তিকাসহ অস্থিনিদর্শন (যেমন, নরকঙ্কাল) উত্তোলনের প্রয়োজন হইলে অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। প্রত্নবস্তুর যথাবস্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ মৃত্তিকা কর্তন করিয়া পরিকল্পিত নিদর্শন পৃথক করা সর্বপ্রথম কার্য। তৎপরে রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করিতে হইবে। দৃঢ়বদ্ধ হইবার পর মৃত্তিকাসহ উক্ত নিদর্শন অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব। এই সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসারে নরকঙ্কালের বিভিন্নাংশও উদ্ধার করা উচিত। কিন্তু মৃত্তিকাপূর্ণ গর্তসম্বলিত অস্থি-নিদর্শনের (যেমন, 'নরকরোটি) দৃঢ়ীকরণ এবং উত্তোলনের কার্যক্রম সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপরি-উক্ত রাসায়নিক দ্রবণ গর্তে প্রদত্ত হইলে করোটির অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকা দৃঢ়ীভূত হইবে। সুতরাং পরিবহণকালে ঐ নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। অতএব তুলির সাহায্যে নিদর্শনের উপর উক্ত দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা কর্তব্য।

অনাচ্ছাদনের পরে ধাতব দ্রব্য (তাম্র, লৌহ প্রভৃতি) অতি সত্বর শুষ্ক করা প্রয়োজন। অন্যথায় প্রত্নবস্তু অবক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জলে নিমজ্জিত প্রত্ননিদর্শন (যেমন, দারু, চর্ম ইত্যাদি) সজল অবস্থাতে

সংরক্ষণ করা উচিত। সজল পলিথিন-থলিতে প্রত্নবস্তু বিন্যস্ত করিয়া দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিতে হইবে। সর্বদা লক্ষ রাখিতে হইবে যে, কোন প্রকারে যেন উক্ত নিদর্শন শুষ্কপ্রাপ্ত না হয়। অন্যথায় প্রত্ননিদর্শন বিকৃত হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান। বীক্ষণাগারেই উক্ত নিদর্শনসমূহের সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু জৈব ও ধাতব পদার্থ-সংযুক্ত প্রত্ননিদর্শনের (যেমন, দারুনির্মিত হাতলসম্বলিত ধাতব অসি) সংরক্ষণকার্য অতীব কষ্টসাধ্য। এই প্রকার প্রত্ননিদর্শনকে অনাচ্ছাদন-অন্তর রাসায়নিক দ্রবণের ক্রিয়ার অধীন করা অত্যাবশ্যক।

প্রত্নবস্তুর আকার, প্রকার, ভগ্নপ্রবণতা প্রভৃতি বিচার করিয়া রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার করা বিধেয়। উৎখনন-বিজ্ঞানে প্রত্নবস্তুর পরিচয় এবং উহাদের শ্রেণী-বিভাজনের এবং উদ্ধারণের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হইয়াছে। প্রত্নবস্তুর অনাচ্ছাদন এবং উদ্ধারণ-কার্য অতীব সন্তর্পণের সহিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদন করা কর্তব্য। এই কার্যের শিথিলতা বা অবহেলার জন্য মানব-সংস্কৃতির অনেক অমূল্য বাস্তব নিদর্শন ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হইয়াছে। সর্বপ্রকার প্রত্ননিদর্শনের অক্ষত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করাই উৎখনকের প্রধানতম দায়িত্ব। সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যথাবস্থায় প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার এবং উদ্ধারণই ইতিবৃত্ত রূপায়ণের সুদৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু বাস্তব নিদর্শনের যথাবস্থানের অনাচ্ছাদন ও উদ্ধারণ করিলেই উৎখনকের দায়িত্ব সমাপ্ত হয় না। উত্তোলনের পূর্বে প্রত্ননিদর্শন-সম্পর্কিত সর্বপ্রকার তথ্যের লিপিকরণ উৎখনকের অধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

। ২ ।

প্রত্নবস্তু : লিপিকরণ

উৎখনন মৃত্তিকাগর্ভে রক্ষিত প্রত্নিদর্শনকে আলোড়িত করে এবং বহুক্ষেত্রে ধ্বংস করে। যে কোন প্রকারে খনন করিয়া প্রত্নবস্তুর উদ্ধারকার্য ধ্বংসাত্মক। এই প্রকার খননকার্যের ফলে মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শনের গুরুত্ব লোপ পায় এবং ইতিহাস-লিখনও বিকৃত হয়। মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের নিমিত্ত সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসৃত উৎখনন এবং প্রত্ননিদর্শনের যথাযথ লিপিকরণ অত্যাবশ্যক কার্যক্রম। আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের যথার্থ পুনর্বিন্যাস এবং প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির ইতিহাস-লিখনই উৎখননের মৌলিক নিবন্ধ। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে প্রত্নবস্তুর লিপিকরণের উপরই উৎখননের এই মৌলিক নিবন্ধের রূপায়ণকার্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের লিপিকরণ-প্রণালী উৎখনন-লেখর অন্তর্গত। পূর্বেই উৎখনন-লেখ্য সম্পর্কিত আলোচনায় নক্শাঙ্কন, ছেদস্তর-চিত্রণ, আলোক চিত্র-গ্রহণ, নোট-লিখন প্রভৃতি কার্যক্রমের সকল মৌলিক তথ্য সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে (পৃঃ১১৭-১৩৭)। প্রত্নবস্তুর লিপিকরণের প্রণালীও উক্ত তথ্যসমূহের সহিত বিজড়িত। তথাপি প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ সংক্রান্ত সকল পদ্ধতির পৃথক আলোচনা প্রয়োজন।

সর্বপ্রথমেই উল্লেখনীয় যে, আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর যথার্থ লিপিকরণের উপরই ইতিবৃত্তের রূপায়ণকার্য সর্বতোভাবে নির্ভর করে। প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ ভ্রমাত্মক হইলে ইতিহাস-লিখনও বিকৃত হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারেই প্রত্নবস্তুর উদ্ধার ও লিপিবদ্ধ করিবার কার্যক্রম সম্পাদন করা কর্তব্য। ভ্রান্তিপূর্ণ লিপিকরণের ফলে অধিকাংশ প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর

ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ এই প্রকার লিপিকৃত প্রত্নবস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্তের বা অভিমতের ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। অনিশ্চায়ক বা সন্দিগ্ধ প্রত্নবস্তুর আধিক্যের জন্য অতীতের অবৈজ্ঞানিক খননকার্যই সর্বতোভাবে দায়ী। অতীতে স্তরবিন্যাসতত্ত্ব অবিদিত ছিল। অতএব প্রত্নবস্তুর যথাবস্থানের লিপিকরণও সম্ভবপর হয় নাই। এখন কি প্রত্নবস্তুর লিপিকরণের কোন সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিরও প্রচলন ছিল না। সুতরাং অতীতের অধিকাংশ প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রত্নবস্তুর ভ্রমাত্মক লিপিকরণের জন্য প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত-রূপায়ণও ত্রুটিপূর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। অতীতের অনেক খননকার্যের বিবরণীও প্রকাশিত হয় নাই। যে সকল বিবরণ-লিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও অপর্যাপ্ত এবং ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং ইতিহাসতত্ত্বের অনুশীলনের নিমিত্ত এই সকল প্রকাশিত উৎখনন-বিবরণীর উপর নির্ভর করা অনুচিত। অধিকন্তু বহুক্ষেত্রে প্রত্নবস্তুর যথাবস্থানের নির্দেশ-জ্ঞাপক লেখও অবর্তমান। সংগ্রহশালায় ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণের জন্যও অনেক উৎখনিত প্রত্নবস্তুর প্রামাণিকতা অনস্বীকার্য।

উৎখনিত প্রত্নবস্তুর যথার্থ লিপিকরণের উপরই ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিবার কর্মপদ্ধতি নির্ভর করে। সাধারণতঃ ত্রিবিধ আবিষ্কৃত নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিতে হয়—বাস্তু-নিদর্শন, স্তরবিন্যাস এবং প্রত্নবস্তু। প্রথম দুইটি জরিপকারীর বা নক্‌শাকারীর এখ্‌তিয়ারভুক্ত। প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ উৎখনকেরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে প্রতিটি নিদর্শনের যথাবস্থান সম্যকরূপে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়। প্রত্নবস্তুর যথাযথ লিপিকরণের উপরই সংস্কৃতির পৌর্বাপর্য-নির্ধারণ এবং উৎখননের যথার্থ বিবরণী-লিখন সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। উক্ত লিপিকরণ স্তরবিন্যাসের সহিত সংযুক্ত।

লিপিকরণের নিমিত্ত আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনসমূহকে দুইটি প্রধান-ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ স্থাবর এবং অস্থাবর। স্থাবর প্রত্ননিদর্শন যেমন, সৌধশ্রেণী এবং অপর বাস্তু বা গৃহাদির বিবিধ অংশের লিপি-করণের কার্যক্রম পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। অতএব অস্থাবর প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ-সম্পর্কিত সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালীর অনুসরণ প্রসঙ্গই আলোচনীয়। অস্থাবর প্রত্নবস্তু দ্বিবিধঃ সাধারণ বা বিশিষ্টতা-বিহীন প্রত্নবস্তু এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নবস্তু। কিন্তু উৎখননতত্ত্বে সর্বপ্রকার প্রত্নবস্তুর সমধিক গুরুত্ব বর্তমান। তথাপি আলোচনার সুবিধার্থে উক্ত দ্বিবিধ বিভাজন সাধারণভাবে স্বীকৃত। বিশিষ্টতাবিহীন বা সাধারণ প্রত্নবস্তুর মধ্যে পোড়ামাটির গোলক, চাক্তি, অতীব সাধারণ মৃন্ময় পাত্র ও খোলামকুচি, গৃহস্থালীর সরঞ্জাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। উৎখননতত্ত্বে খোলামকুচির গুরুত্ব সর্বাধিক। প্রায় সকল ঐতিহাসিক প্রত্নস্থলেই খোলামকুচির প্রাধান্য বিদ্যমান। লেখসম্বলিত নিদর্শন যথা, লেখমালা, সীলমোহর, মুদ্রা, বিবিধ পদার্থনির্মিত অলঙ্কার এবং অপর বিশিষ্টতাপূর্ণ প্রত্নবস্তু অসাধারণ বা গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ধার্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্রাকৃতির এবং বৃহদাকৃতির প্রত্নবস্তুর আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য। উৎখননতত্ত্বে পরিবর্তনশীল ক্ষুদ্র প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব অধিক।

অতীতে বিবিধ প্রত্নবস্তুর লিপিকরণের জন্য কোন দৃঢ়বদ্ধ প্রণালী অনুসৃত হইত না। উৎখনক যে সকল প্রত্নবস্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা গুরুত্ব-পূর্ণ বলিয়া অনুমান করিতেন তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইত। অর্থাৎ কেবলমাত্র মনোরম শিল্পকলার নিদর্শনই লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু অধুনা উৎখননতত্ত্বে সর্বপ্রকার প্রত্ননিদর্শনের সমধিক গুরুত্ব বর্তমান। কোন প্রত্নবস্তুই উপেক্ষণীয় নহে। সকল প্রকার আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শন অনুশীলন করিয়াই প্রত্নস্থলের ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা সম্ভব। এই অনুশীলনকার্যের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া প্রত্নবস্তুর যথাযথ লিপিকরণ অত্যাবশ্যক।

অতীতে প্রত্নবস্তু লিপিবদ্ধ করিবার পদ্ধতির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও ছিল না। ভারতবর্ষেও ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভ্রমাত্মক প্রণালী অনুসরণ করিয়াই প্রত্নবস্তুর লিপিকরণের কার্যক্রম সাধিত হইয়াছে। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলেও পুরাবস্তুর লিপিকরণে ভ্রমাত্মক প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে। মেসোপটামিয়া এবং মিশর দেশেও উৎখনন-কালে প্রত্নবস্তু লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হইয়াছিল। এই প্রণালী উৎখনক পেট্রির উৎখনন-ক্রিয়াপদ্ধতি-জাত। পেট্রি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, মিশরের প্রত্নস্থলের সকল প্রত্ন-নিদর্শনেরই সুনির্দিষ্ট কালানুক্রমের সহিত সমীকরণ সাধন করা সম্ভব-পর। প্রত্নস্থলে নির্দিষ্ট 'বেঞ্চ-লেভ্‌ল' (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতার নির্ধারিত বিন্দু) হইতে পরিমাপ গ্রহণ করিয়া বাস্তু-নিদর্শন এবং প্রত্নবস্তু লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী অনুসরণ করা হইত। এই পদ্ধতি অনুসরণ-সম্পর্কিত তথ্য পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ৯৬-১১৭)। মহেঞ্জো-দারোর প্রত্নস্থলেও দুইটি ক্ষেত্রে লেভ্‌ল্-বিন্দু নির্দ্দিষ্ট করা হইত (সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৭৪'৭ ফুট এবং ১৮০'৯ ফুট উচ্চ)। এই ভিত্তিক বিন্দু হইতেই অনাচ্ছাদিত সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর পরিমাপ গ্রহণ করিবার প্রণালী অনুসৃত হইত। অনুমান করা হইয়াছে যে, একই লেভ্‌লে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু ও বাস্তু-নিদর্শন সমকালভুক্ত। উৎখনক ম্যাকাই বলিয়াছেন যে, সুচারুরূপে উৎখননকার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন-স্থানে লেভ্‌ল নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এই নির্দিষ্ট লেভ্‌ল-বিন্দু হইতেই বাস্তু-নিদর্শনের বিভিন্নাংশের লেভ্‌ল স্থির করা সম্ভবপর। উপরন্তু প্রত্নবস্তু ও সৌধ-নিদর্শন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এমন কি কারু-শিল্পের বা শিল্পকলার বিবর্তন-ধারা নির্ণয়ের জন্যও সর্বপ্রকার প্রত্নবস্তুর লেভ্‌ল লিপিবদ্ধ করা উচিত। এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া অগণিত প্রত্নবস্তুর লেভ্‌ল স্থিরীকরণ অনায়াসসাধ্য। প্রত্যুষে 'লেভ্‌ল-সাবিত্র' একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংস্থাপন করিয়া উৎখননের সময় উক্ত

ভিত্তিক বিন্দু হইতে পরিমাপ গ্রহণ পূর্বক প্রত্নবস্তুর লেভ্‌ল লিপিবদ্ধ করা সহজসাধ্য। কিন্তু এই প্রণালী অনুসরণ করিলে প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ ত্রুটিপূর্ণ হইবে। উৎখনক ম্যাকাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, প্রাঙ্গণের উপর বা সন্নিকটে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর পর্ব বা পর্যায় নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সৌধের ভিতে বা উহার নিকটবর্তী স্থানে আবিষ্কৃত সকল প্রত্নবস্তু সৌধ-সমকালভুক্ত বলিয়া ধার্য করিতে হইবে। এমন কি, উক্ত প্রণালী অনুসারে খোলামকুচি এবং অপর ক্ষুদ্র প্রত্নবস্তুও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

কিন্তু বেঞ্চ-লেভ্‌ল-পদ্ধতির অনুসরণ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বর্তমান উৎখনন-বিজ্ঞানে এই পদ্ধতি-অনুসরণের মৌলিক ভিত্তি অবিদ্যমান। এই পদ্ধতি দ্বারা লিপিকৃত প্রত্নবস্তুর অনুশীলন করিলে বিকৃত ইতিবৃত্ত রূপায়িত হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকন্তু প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ স্তরবিন্যাসভিত্তিক (স্তরবিন্যাসের সহিত প্রত্নবস্তুর সম্পর্ক পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে)। উৎখননের সময় যথাস্থানে আবিষ্কৃত সর্ব-প্রকার নিদর্শনের ও মৃত্তিকান্তরের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত কার্য-ক্রমের পরিবর্তে সুদূরবর্তী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নির্দিষ্ট লেভ্‌ল দ্বারা স্তরবিন্যাস নির্ধারণ ও প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক। বর্তমান উৎখনন-বিজ্ঞানে এই পদ্ধতির অনুসরণ অবৈধ।

প্রত্নস্থলে প্রাকৃতিক মৃত্তিকাস্তর ব্যতীত কোন মৃৎস্তরই অনু-ভূমিক বা সমতলভাবে বিন্যস্ত হয় নাই। কোন নগর বা আবাসস্থল একই সময়ে অনুরূপভাবে বিধ্বস্তও হয় নাই। অনুভূমিকভাবে কোন নগরের পুনর্নির্মাণ স্বাভাবিক নহে। স্বত্বাধিকারের ইচ্ছা অনুযায়ীই ধ্বংসপ্রাপ্ত গৃহ পুনর্নির্মিত হইত। বিভিন্ন আকার ও প্রকার নগর উৎসাদিত ও পুনর্নির্মিত হইবার ফলে কোন একটি গৃহস্থল সন্নিকটবর্তী অপর গৃহস্থলের উপরি লেভ্‌লে বিন্যস্ত হওয়াও স্বাভাবিক। ক্রমাগত ধ্বংসস্তূপের উপর গৃহনির্মাণের ফলে নগর-

স্থূল পর্বতাকারে পরিণত হয়। এই সকল ক্ষেত্রেও উপরি-ভাগের এবং ঢালু অংশের গৃহ সমকালভুক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নহে নগরক্ষেত্রের বিভিন্নাংশে এবং বিবিধ লেভ্‌লে সমকালভুক্ত প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়াও স্বাভাবিক। বিভিন্ন লেভ্‌লে সদৃশ প্রত্নবস্তুর আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু বিবিধ যুগভুক্ত নিদর্শনও একই লেভ্‌লে পাওয়া যায়। কিন্তু বেঞ্চ-লেভ্‌ল-পদ্ধতির নিয়ম অনুসারে সমকালভুক্ত প্রত্ননিদর্শন একটি নির্দিষ্ট লেভ্‌লেই বিন্যস্ত থাকিবে। পূর্বেই এই পদ্ধতির অসারতা আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ৯৬-১১৭)। বেঞ্চ-লেভ্‌ল-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রত্নবস্তুর লিপিবদ্ধীকরণ ভ্রমাত্মক।

বর্তমানে আমেরিকাতে অপর একটি ভ্রান্ত পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পেনগেল্লি স্তরবিন্যাস ও প্রত্নবস্তু লিপিকরণের নিমিত্ত 'ফুট্-লেভ্‌ল' নামক (পদক্ষেপ-লেভ্‌ল ; পদক্ষেপ অনুসারে লেভ্‌ল ধার্য করিবার রীতি) পদ্ধতির প্রচলন করিয়াছিলেন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পদক্ষেপের লেভ্‌ল অনুযায়ী প্রত্নবস্তু-লিপিকরণের এবং স্তরবিন্যাস-নির্ধারণের কার্যক্রম সাধিত হইত। পেন-গেল্লি কর্তৃক প্রচলিত প্রণালী সংশোধন করিয়া আমেরিকাতে 'ইউনিট্-লেভ্‌ল' (একক লেভ্‌ল) প্রবর্তিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে বেলচার ফলকের (৬-১২ ইঞ্চি) পরিমাপ অনুসারে মৃৎস্তরের বিন্যাস ও প্রত্ন-বস্তুর আবির্ভাবস্থল নির্দিষ্ট করা হয়। বেলচার ফলকের পরিমাপই একটি লেভ্‌ল বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসরণকারি-গণের মতে প্রত্নবস্তু ও স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত তথ্য উৎখননের পরেই নির্ধারণ করা বিধেয়। কারণ, উৎখননের সময় স্তরবিন্যাস-সংক্রান্ত নিদর্শনের অনুশীলন বিভ্রান্তিকর। তাঁহারা মনে করেন যে, উৎখননের সময়ে স্তরবিন্যাসের ব্যাখ্যা প্রদানের প্রচেষ্টা বিফল হওয়া স্বাভাবিক। তাঁহাদের মতে স্তরবিন্যাসতত্ত্ব অবাস্তব। উপরন্তু এই প্রণালী অনুসারে খোলামকুচির অনুক্রমিক পর্যায়ের নির্ণয়কার্য অধিক

সহজ। মন্তব্য করা হইয়াছে যে, বর্তমান কালে প্রবর্তিত অনেক জটিলতাপূর্ণ প্রণালী অপেক্ষা ইউনিট্ লেভ্লের কার্যক্রম অধিকতর সহজসাধ্য। বেলচার ফলকের পরিমাপ অনুসারে যন্ত্রবৎ প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ নিঃসন্দেহে অনায়াসসাধ্য। কিন্তু এই পদ্ধতির সারবত্তা স্বীকার্য নহে।

ইউনিট্-লেভ্ল-পদ্ধতিতে প্রত্নবস্তুর নিরীক্ষণের বা পর্যবেক্ষণের ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন অবর্তমান। এই পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মতও নহে। ইউনিট্-লেভ্ল-প্রণালী অনুসরণ করিলে উৎখননের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করা সম্ভব নহে। উক্ত পদ্ধতির অনুশীলন দ্বারা উৎখননের মৌলিক নিদর্শন যেমন, মৃৎস্তর, স্তরবিন্যাস, সংস্কৃতি-পর্ব বা বাস্তু-পর্যায় প্রভৃতির নির্ণয়কার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করাও অসম্ভব। সুতরাং উৎখনক হুইলার দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রত্নবস্তুর লিপিকরণের জন্য এই প্রকার অবৈজ্ঞানিক বা অবৈধ প্রণালীর অনুসরণ অতীব মর্মান্তিক।

এতদ্ব্যতীত অতীতে কেবল প্রত্নস্থলের ভূপৃষ্ঠ হইতে গভীরতার পরিমাপ গ্রহণ করিয়াই প্রত্ননিদর্শন লিপিকৃত হইত। অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া স্তরবিন্যাসও নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু এই পদ্ধতির অনুসরণও ভ্রমাত্মক। প্রত্নস্থলের ভূপৃষ্ঠের কোন ক্ষেত্রাংশই সমতল নহে। একই পর্যায় বা সংস্কৃতিভুক্ত প্রত্ননিদর্শন বিভিন্ন স্তরে ও লেভ্লে আবিষ্কৃত হওয়াই স্বাভাবিক। সমতলে বিন্যস্ত সকল প্রত্নবস্তু সমকালভুক্ত বা সমসংস্কৃতি-পর্বভুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে স্তরবিন্যাস ও সংস্কৃতি-পর্বের কালনিরূপণকার্য বিকৃত হইবে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ-সম্পর্কিত উপরি-উক্ত কোন প্রণালীই বিজ্ঞানসম্মত নহে। বর্তমান প্রত্নবিজ্ঞানের বিচারে উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের অনুসরণ প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণকার্যের পরিপন্থী।

উৎখননের উদ্দেশ্য এবং প্রত্নবস্তুর যথাযথ লিপিকরণের অভিসন্ধি

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মৃত্তিকাগর্ভস্থ প্রত্ননিদর্শনের যথাযথ প্রতিকৃতি রূপায়ণ করিয়া ইতিবৃত্ত-লিখনই উৎখননের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রত্নবস্তুর যথার্থ লিপিকরণের উপরই এই কার্য সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। অতএব প্রত্নবস্তুর লিপিকরণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত প্রামাণিক পদ্ধতির অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। হুইলার এই প্রামাণিক পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ-সম্পর্কিত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছেন।

প্রত্নবস্তু-লিপিকরণের প্রামাণিক পদ্ধতির সহিত মৃত্তিকাস্তরানুক্রমিক উৎখনন, স্তরবিন্যাস-নির্ধারণ, সংস্কৃতি-পর্ব-নির্ণয় প্রভৃতি কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই সকল তথ্য পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। মৃত্তিকাস্তরানুসারেই প্রত্যেক প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ কর্তব্য। অধিকন্তু প্রত্নবস্তুর যথাবস্থানের এবং লেভ্ল-এর নির্দিষ্টকরণও অত্যাবশ্যক। প্রত্নবস্তুর লিপিকরণের জন্য সাধিত্র-এর ব্যবহারও প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে প্রত্নবস্তুর লিপিকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মধ্যে বিভিন্ন আকার ও প্রকারের লেপাফা, ছকাঙ্কিত কার্ড, তুলা, রাসায়নিক দ্রবণ, পরিমাপ গ্রহণ-সংক্রান্ত যন্ত্র ও অন্য সামগ্রী যেমন, মাপাঙ্কিত ফিতা (টেইপ্), ওলন্ (প্লাম্ব্ বল্) বুদ্‌বুদ্ লেভ্ল, (বাব্ল্ লেভ্ল) বা সমতল-দর্শক, বুদ্‌বুদ্-নিবদ্ধ ত্রিভুজাকার সাধিত্র, ক্রমাঙ্কিত পরিমাপ-দণ্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্রাকৃতি প্রত্নবস্তুর লিপিকরণের এবং সংরক্ষণের জন্য লেপাফার প্রয়োজন অধিক। বিবিধ আকার ও প্রকারের লেপাফা ব্যবহৃত হয়। সকল প্রকার লেপাফার উপর কতিপয় পরিচয়-জ্ঞাপক পঙ্‌ক্তি মুদ্রিত থাকিবে: (১) উৎখনন-সংস্থার নাম; (২) প্রত্নস্থলের নাম; (৩) উৎখনন-ক্ষেত্রাংশের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা; (৪) খাদ-সংখ্যা; (৫) মৃৎস্তর-সংখ্যা; (৬) স্তরবিন্যাস ও সংস্কৃতি-পর্বের সংজ্ঞা; (৭) দৈর্ঘ-প্রস্থ-বেধ-পরিমাপ; (৮) প্রত্নবস্তুর নাম; (৯) সংশ্লিষ্ট গুরুত্ব-

পূর্ণ প্রত্ননিদর্শন; (১০) উদ্ধারণ-তারিখ এবং (১১) খাদ-তদারককারীর স্বাক্ষর [উদাহরণস্বরূপ: (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ; (২) রাজবাড়িডাঙা; (৩) রা ড১; (৪) ক৪; (৫) মৃৎস্তর-৪; (৬) পর্ব-খ; (৭) ক৪ ৬×১০-৫ ফুট; (৮) লেখ সম্বলিত পোড়ামাটির সীল; (৯) মেঝ, খোলামকুচি, লৌহনির্মিত বস্তু ইত্যাদি; (১০) ১০.৬.৬৯ এবং (১১) এ.দাশ]। খাদতদারককারী পরিমাপ গ্রহণ করিয়া প্রত্নবস্তু-সম্পর্কিত উক্ত তথ্যসমূহ লেপাফার উপর লিপিবদ্ধ করিবে। প্রয়োজনমত উদ্ধৃত প্রত্নবস্তুকে তুলা দ্বারা আবৃত করিয়া যত্নসহকারে লেপাফার অভ্যন্তরে ন্যস্ত করা প্রয়োজন। তৎপরে নোট-লিখন সমাপ্ত করিয়া প্রত্নবস্তু-লিপিকারকের নিকট প্রেরণ করা বিধেয়। এতদ্ব্যতীত ছকাঙ্কিত কার্ডে সকল বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ প্রত্নবস্তুর উপরি-উক্ত তথ্যসমূহ লিখিতে হইবে। কার্ডের ছকাঙ্কিত অংশে প্রত্নবস্তুর রেখা-চিত্রণও আবশ্যক। প্রত্নবস্তু দৈবাৎ বিনষ্ট বা নিখোঁজ হইলে উক্ত লেখ বা চিত্রণ প্রামাণিক সাক্ষ্য রূপে গ্রহণযোগ্য। বৃহদাকার প্রত্নবস্তুও অনুরূপভাবে লিখিয়া থলিতে ন্যস্ত করিতে হয়। থলির অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে 'লেবেল' বা নির্দেশজ্ঞাপক অঙ্ক-পট্টি ন্যস্ত ও নিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রসঙ্গতঃ, প্রত্নবস্তুর পরিমাপ গ্রহণের জন্য সাধিত্র-সম্পর্কিত আলোচনা আবশ্যক। উৎখননতত্ত্বে প্রত্নবস্তুর পরিমাপ গ্রহণ এবং উহার সহিত স্তরবিন্যাসের সম্বন্ধ নির্ণয় করা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্নবস্তু এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন যাহাতে উহার যথাবস্থান বা আবির্ভাবস্থল সুনির্দিষ্ট করা যায়। এই কার্যের নিমিত্ত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ- পরিমাপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। একটি সাধিত্র-এর সাহায্যেই এই পরিমাপ গ্রহণ করা সহজসাধ্য। উক্ত সাধিত্র একটি কাষ্ঠনির্মিত সমকোণী ত্রিভুজ। এই সমতল-দর্শক-বুদ্‌বুদ্‌-নিবদ্ধ সাধিত্র-এর বাহুদ্বয় ন্যূন পক্ষে তিন ফুট হইবে। বাহুদ্বয়ের উপর ক্রমিক পরিমাপ-সংখ্যাও

অঙ্কিত থাকিবে। চিত্র নং ২৮খ-তে তিন ফুট পরিমাপের এই সাধিত্র-এর প্রতিকৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত চিত্রে সাধিত্র-সম্পর্কিত সকল তথ্য নির্দেশ করাও হইয়াছে। দৈর্ঘ-প্রস্থ-বেধ-পরিমাপ গ্রহণের নিমিত্ত এই সাধিত্রই প্রকৃত সহায়ক।

প্রত্নবস্তুর যথাবস্থান সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-(থ্রি-ডিমেন্‌শন্‌ল্) পরিমাপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই লিপিকরণ-প্রণালী ত্রিবিধ পরিমাপসম্বলিত : অনুদৈর্ঘ্য (লন্‌জি-টিউডিনাল্) পরিমাপ (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বরাবর পরিমাপ), বহির্মুখ-(আউট্ ওঅ্যারড্) পরিমাপ (অর্থাৎ বস্তুর অবস্থানের বর্হিদিকের পরিমাপ) এবং নিম্নাভিমুখ-(ডাউন ওঅ্যারড্) পরিমাপ (অর্থাৎ প্রত্নবস্তুর স্বস্থানের গভীরতার পরিমাপ)। প্রথমে প্রত্নবস্তুর যথাবস্থান নির্দিষ্ট করিতে হইবে। খাদের কোণে প্রোথিত কীলকের বরাবর প্রত্নবস্তুর যথাবস্থান নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

ভিত্তিক রজ্জুর (ডেট্যাম্ স্ট্রিং) বহির্মুখ-বরাবর প্রত্নবস্তুর যথাব-স্থানের বিন্দু স্থির করিতে হইবে। কীলক-বিন্দু হইতে ভিত্তিক রজ্জুর উল্লিখিত বিন্দু পর্য্যন্ত পরিমাপ-ফিতা দ্বারা দৈর্ঘের পরিমাপ গ্রহণ করিতে হয়। তৎপরে উক্ত বিন্দু হইতে প্রত্নবস্তুর যথাবস্থানেব বহির্মুখ-দূরত্বের পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বশেষে বহির্মুখ-পরিমাপের বিন্দু হইতে প্রত্নবস্তুর যথাবস্থানের গভীরতার পরিমাপ গ্রহণীয়। এই প্রকার ত্রিবিধ পরিমাপ-গ্রহণই দৈর্ঘ-প্রস্থ-বেধ-পরিমাপ নামে পরিচিত।

দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ- পরিমাপ গ্রহণের জন্য উপরি-বর্ণিত সাধিত্র ব্যবহার করা আবশ্যক। সর্বপ্রথম খাদসমপৃষ্ঠের কীলকবিন্দু এবং ভিত্তিক রজ্জুর দৈর্ঘ্য বরাবর উল্লিখিত সাধিত্র ভূপৃষ্ঠে সংস্থাপন করিতে হইবে। সাধিত্র-তে নিবদ্ধ বুদ্‌বুদ্ পরীক্ষা করিয়া লেভ্‌লের সমতলতা নির্ণয় করিতে হয়। অর্থাৎ, সাধিত্র-এর সংস্থাপন ভিত্তিক রজ্জুর বরাবর সমতলবর্তী হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় পরিমাপ-গ্রহণ ভ্রমাত্মক

হইবে। অস্তিত্বব্যঞ্জক দীর্ঘখাদে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর যথাবস্থান খাদ-প্রান্ত হইতে তিন ফুটের অধিক দূরবর্তী হইলে পরিমাপ-ফিতা বা পরিমাপদণ্ড দ্বারা সাধিত্র-এর বহির্ভুজ প্রলম্বিত করা প্রয়োজন। জালাকার খাদে প্রোথিত কীলকের বরাবর সাধিত্র-এর ভূজদ্বয় উক্ত উপায়ে প্রলম্বিত করা যায়। সাধিত্র সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিয়া কীলক-বিন্দু হইতে দৈর্ঘ্য-পরিমাপ গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপরে সাধিত্র-এর বহির্মুখ-বরাবর প্রত্নবস্তুর যথাবস্থানের দূরত্বের পরিমাপ গ্রহণ করিতে হয়। সর্বশেষে উক্ত বহির্মুখ-স্থিরীকৃত বিন্দু হইতে প্রত্নবস্তুর যথাব-স্থানের উপর ওলন্‌ নিক্ষেপ করিয়া পরিমাপ-ফিতা দ্বারা গভীরতার পরিমাপ নির্ধারণ করিতে হইবে (চিত্র নং ৩০)। এই প্রকার পরিমাপ গ্রহণান্তে নোট-বইতে এবং লেপাফার উপর খাদ-সংখ্যা অনুযায়ী ত্রিপরিমাপের সংখ্যামান লিপিবদ্ধ করিতে হয় যেমন, ক১ ৩ × ৬ — ৭ ফুট। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই সর্বপ্রকার প্রত্নবস্তুর পরিমাপ গ্রহণ করা আবশ্যক। উক্ত প্রকার ত্রিবিধ পরিমাপ হইতেই প্রত্নবস্তুর যথাবস্থান সুনির্দিষ্ট করা সম্ভবপর। এই পরিমাপ-গ্রহণের সাহায্যে নক্‌শাতেও প্রত্নবস্তুর যথাবস্থান অঙ্কন করা যায়।

উপরি-উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রত্নবস্তুর লিপিকরণের কার্যক্রম সমাপন করা কর্তব্য। গুরুত্বপূর্ণ পুরাবস্তু প্ল্যানে এবং ছেদস্তর-চিত্রণেও সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে। পূর্ণাঙ্গ মৃৎপাত্রের লিপিকরণ ভিন্ন। উক্ত পাত্র কোন মৃৎস্তরে বিন্যস্ত এবং কোন মৃৎস্তর দ্বারা আবৃত তাহাও লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। প্রয়োজনমত ভিন্ন ছেদস্তর অঙ্কন করিয়া মৃৎপাত্রের যথাস্থান সুনির্দিষ্ট করা উচিত। প্রত্নবস্তু-সম্পর্কিত প্ল্যান-অঙ্কন ও ছেদস্তর-চিত্রণ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ১১৯-১২৬)। সুতরাং উহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, উৎখননের সময়েই সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রত্নবস্তুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ- পরিমাপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক কার্য।

কিন্তু মৃন্ময় পাত্রের বা খোলামকুচির লিপিকরণ-প্রণালী সম্পূর্ণ

ভিন্ন। পূর্বেই খোলামকুচির উদ্ধারণ ও লিপিকরণ সম্পর্কিত তথ্য আংশিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। খোলামকুচির লিপিকরণ উৎখনন-খাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। মৃত্তিকাস্তরানুসারে খোলামকুচি উদ্ধার পূর্বক লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, খননকার্য সর্বদা মৃৎস্তরানুক্রম পরিচালনা করা আবশ্যক। একটি মৃৎস্তরের খননকার্য সম্পূর্ণভাবে সমাপন করিয়া অপর স্তরে উৎখনন আরম্ভ করা উচিত। সাধারণতঃ প্রত্যেক মৃৎস্তরেই খোলামকুচির আধিক্য বিদ্যমান। সর্বদা লক্ষ রাখিতে হইবে যাহাতে এক স্তরের খোলামকুচি অন্য স্তরের সহিত সংমিশ্রিত না হয়। উৎখননকালে খোলামকুচি গচ্ছিত রাখিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট বারকোষ বা ঝুড়ি সন্নিকটে রাখা প্রয়োজন। কর্তিত মৃত্তিকাস্তর হইতে উদ্ধৃত খোলামকুচি উক্ত ঝুড়িতে বা পাত্রে গচ্ছিত রাখা আবশ্যক। পরিপূর্ণ ঝুড়ি মৃৎ-পাত্র-প্রাঙ্গণে প্রেরণ করিতে হয়। একটি চিরকুটে খাদ-সংখ্যা, মৃৎস্তর-সংখ্যা, মৃৎস্তরের গভীরতার পরিমাপ, তারিখ, খাদতদারককারীর স্বাক্ষর প্রভৃতি লিখিয়া উক্ত পরিপূর্ণ ঝুড়ির সহিত মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণে প্রেরণ করা কর্তব্য। মৃৎপাত্র-সহকারী চিরকুটে লিখিত তথ্যানুযায়ী প্রাঙ্গণের যথাস্থানে খোলামকুচি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণে প্রেরণের পূর্বে মৃত্তিকাস্তর ও খোলামকুচি-সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্য নোট-বইতে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। আবিষ্কৃত বৈশিষ্ট্যসূচক খোলামকুচিসমূহের (চিত্রিত, লিখিত, অলঙ্কৃত ইত্যাদি) পৃথক লিপিকরণ আবশ্যক। উক্ত প্রকার খোলামকুচির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ- পরিমাপ গ্রহণ করিয়া লেপাফায় অথবা পৃথক পাত্রে গচ্ছিত রাখা বিধেয়। উত্তোলন করিবার সময় খোলামকুচির আকার এবং অপর বৈশিষ্ট্যসূচক নিদর্শন অনুশীলনপূর্বক সর্বপ্রকার তথ্য নোট-বইতে লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য। পূর্বতন ও পরবর্তী মৃৎস্তর হইতে উদ্ধৃত খোলামকুচির অনুরূপতা ও বিভিন্নতা সম্পর্কিত তথ্যও লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

প্রসঙ্গতঃ, মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণ-সংক্রান্ত তথ্যের আলোচনা করা উচিত। মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের বিন্যাস খাদবিন্যাসের অনুরূপ। ন্যূনপক্ষে ৩ × ৩ ফুট পরিধিবিশিষ্ট চতুর্ভুজাকার কক্ষে প্রাঙ্গণ বিন্যস্ত করিতে হয়। স্বল্প-পরিসর নালি কর্তন করিয়া প্রতিটি কক্ষের পরিধি চিহ্নিত করা উচিত। প্রয়োজনমত নালি সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য শুভ্র চুনের রেণু আরোপ করাও কর্তব্য। কক্ষবিশিষ্ট প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে উৎখনিত খাদসংখ্যার নির্দেশজ্ঞাপক এবং অপর পার্শ্বে মৃৎস্তরের সংখ্যাজ্ঞাপক কাষ্ঠনির্মিত স্বল্পপরিসরের কীলক বা ফলা দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রোথিত করিতে হইবে। কীলকের উপর উক্ত তথ্য স্পষ্টাক্ষরে লিখিত থাকিবে। চিত্র নং ২৯-তে মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উক্ত চিত্রে খাদসংখ্যা অনুযায়ী মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণ পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত (ক১—ক৫, খ১—খ৫ ইত্যাদি)। প্রত্যেক শ্রেণীতে খাদ-সংখ্যা-লিখিত কাষ্ঠনির্মিত ফলা প্রোথিত আছে। অপর পার্শ্বে মৃৎস্তরের সংখ্যা-(১ হইতে ১০ পর্যন্ত) লিখিত ফলা প্রোথিত রহিয়াছে। সুতরাং প্রতি খাদের মৃৎস্তরানুক্রমিক কক্ষ সুনির্দিষ্ট। খাদতদারককারী কর্তৃক প্রেরিত চিরকুটে লিখিত তথ্যানুসারে মৃৎপাত্র-সহকারী মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের নির্দিষ্ট কক্ষে খোলামকুচি গচ্ছিত রাখিবে।

মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের সন্নিকটে খোলামকুচি ধৌত করিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করাও একান্ত প্রয়োজন। খোলামকুচি ধৌত করিবার নিমিত্ত বিবিধ প্রকার টব, বুরুশ, তুলি, প্রভৃতির দরকার। সাধারণতঃ একজন ধৌতকারীর নিকট তিনটি জলপূর্ণ টব রক্ষিত থাকিবে। মৃৎপাত্র-সহায়ক মৃত্তিকাস্তরানুসারে খোলামকুচি পরীক্ষা করিয়া ধৌতকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন। কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থাৎ অলঙ্কৃত, চিত্রিত বা রঞ্জিত খোলামকুচি বীক্ষণাগারে প্রেরণ করা শ্রেয়। উল্লিখিত প্রথম জলপূর্ণ টবে খোলামকুচি নিমজ্জিত রাখিতে হয়। কিন্তু খোলামকুচিকে অধিক সময় নিমগ্ন রাখা সঙ্গত নহে। তৎপরে প্রত্যেক খোলামকুচিকে বুরুশ দ্বারা অতীব সতর্কতার

সহিত পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে। সর্বশেষে পরিষ্কৃত জলে ধৌত করিয়া মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের নির্দিষ্ট কক্ষে পুনঃসংস্থাপন করিতে হয়। ধৌতকারী খোলামকুচির পরিচয়-জ্ঞাপক চিরকুট সযত্নে রক্ষা করিবে। অন্যথায় খোলামকুচি মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা অধিক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, ধৌতকারীর পক্ষে কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খোলামকুচি সাধারণভাবে ধৌত করা অনুচিত। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খোলামকুচি মৃৎপাত্র-সহায়কের নিকট অর্পন করিতে হইবে। কারণ, অলঙ্কৃত বা চিত্রিত মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ পরিচ্ছন্ন করিবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিক্ষণাগারে পরিস্রুত জল (ডিষ্টিল্ ওয়াটার্) দ্বারা এই সকল খোলামকুচি পরিষ্কার করিতে হয়। প্রয়োজনমত রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করাও উচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, অনেক প্রত্ন-স্থলে লবণের আধিক্যের ফলে আবরণমুক্ত খোলামকুচি বায়ুর সংঘাতে বিনষ্ট হয়। সুতরাং অতি সত্বর পরিস্রুত জল দ্বারা ধৌত করিয়া খোলামকুচির উপর রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা অত্যাবশ্যক।

বিধৌত খোলামকুচির অনুশীলন মৃৎপাত্র-সহায়কের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। সর্বপ্রথমে পরিষ্কৃত খোলামকুচি শুষ্ক করিতে হইবে। পরে অনুশীলন করিয়া খোলামকুচি-লিপিকরণের কার্যক্রম সমাপন করিতে হয়। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন খোলামকুচিই উপেক্ষণীয় নহে। প্রথমতঃ, প্রতি খাদের মৃৎস্তরানুসারে খোলামকুচির পরিসাংখ্যিক অনুশীলন করাও কর্তব্য। তৎপরে সকল খাদের প্রতিস্তর হইতে উদ্ধৃত খোলামকুচির পরিসংখ্যা নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই পরিসাংখ্যিক অনুশীলন দ্বারা প্রতি মৃৎস্তর হইতে কত সংখ্যক খোলাম-কুচি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি স্তর হইতে উদ্ধৃত বিবিধ কৌলাল-শ্রেণীভুক্ত খোলামকুচি নির্বাচন করিয়া উহাদের বিভিন্ন বারকোষে সংরক্ষণ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, খোলামকুচি পরীক্ষা করিয়া পুরাতন ও নূতন ভগ্নাংশ পৃথক করা

প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, নূতন ভগ্নাংশসমূহ সংযোগ করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। তৎপরে পুরাতন ভগ্নাংশের সহিত তাহাদের সংযোগসাধন করিবার প্রচেষ্টা বিধেয়। পঞ্চমতঃ, সংযোগসাধক খোলামকুচি একত্রে মেরামতকারীর (মেন্‌ডার্) নিকট প্রেরণ করিতে হয়। মেরামত-কারী উক্ত খোলামকুচিসমূহ একত্র করিয়া দৃঢ়-সংযোজক দ্রবণ দ্বারা বিভিন্নাংশ দৃঢ়ীবদ্ধ করিবে। এই প্রকার খোলামকুচিসমূহ সংযোজন করিয়া পুনরায় মৃৎপাত্রকে পূর্বাকারে বিন্যাস করা সম্ভবপর। মৃন্ময় পাত্রের জীর্ণ সংস্কার করিবার প্রণালী অতীব সতর্কতার সহিত অনুসরণ করা কর্তব্য। প্রথমে দুইটি অংশকে সংযোজক দ্রবণ দ্বারা সংযোগ করিয়া বালুকণায় বিন্যস্ত করিতে হয়। দৃঢ়ীবদ্ধ হইবার পর অপর একটি অংশ উহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া ক্রমান্বয়ে মৃৎপাত্রের বিভিন্নাংশ সংযোজন করা উচিত। ষষ্ঠতঃ, অবশিষ্ট খোলামকুচিরও নির্বাচন প্রয়োজন। এই নির্বাচনকার্য উৎখনকের এবং মৃৎপাত্র-সহায়কের অভিজ্ঞতার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সম্ভবমত পরিসাংখ্যিক এবং অন্যান্য অনুশীলন করিবার পর অধিকাংশ খোলামকুচি উপেক্ষা করা যায়। সুতরাং প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় খোলামকুচি নির্বাচন করা উৎখনকের অপর একটি অত্যাবশ্যক কার্য। সকল প্রকার অপ্র-য়োজনীয় খোলামকুচি সযত্নে বহন করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

খোলামকুচির নির্বাচনকার্য মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণেই সম্পাদন করা কর্তব্য। এই নির্বাচনকার্য দ্বিবিধ: সংযোজক নির্দেশক খোলাম-কুচি এবং কৌলালের আকার ও প্রকার সম্পর্কিত পরিচয়জ্ঞাপক খোলামকুচি। সাধারণতঃ তলদেশবর্জিত এবং বেড়বিহীন খোলামকুচি অপ্রয়োজনীয় এবং উপেক্ষণীয়। প্রধানতঃ প্রয়োজনীয় বা অপরি-ত্যাজ্য খোলামকুচির মধ্যে বেড়, তলদেশ, হাতল, নল এবং কারুশিল্প-বৈশিষ্ট্যসূচক (মসৃণ, চাকচিক্যপূর্ণ, রঞ্জিত প্রভৃতি) নিদর্শন উল্লেখ-যোগ্য। এতদ্ব্যতীত নকশাকৃত বা অলঙ্কৃত এবং চিত্রিত ও লেখ-

সম্বলিত সর্ববিধ খোলামকুচির সংরক্ষণ ও লিপিকরণ অত্যাবশ্যক। সম্ভবমত সকল প্রকার ও আকারের তলদেশ, বেড় এবং কালনির্দেশ-জ্ঞাপক খোলামকুচির সংরক্ষণ কর্তব্য।

নির্বাচনকার্য সম্পাদন করিয়া প্রত্যেক খোলামকুচির গাত্রে কালি দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য লিখিতে হইবে। উক্ত লেখর জন্য 'চাইনিজ' বা 'ইণ্ডিয়ান ইংক্' নামক কালি ব্যবহার করা উচিত। খোলামকুচির অদৃশ্য অংশেই কালি দ্বারা লেখা শ্রেয়। প্রত্যেক খোলামকুচির গাত্রে ক্রমিক সংখ্যা, উৎখনন-ক্ষেত্রাংশের সংক্ষিপ্ত নাম, খাদ-সংখ্যা, মৃৎস্তর-সংখ্যা (যেমন, ১০, রা, ঙ১, খাদ-সংখ্যা ক৪, মৃৎস্তর-সংখ্যা—৫) ইত্যাদি লিখিতে হইবে। অধিকন্তু মৃৎপাত্র-সহায়কের নিবন্ধে ক্রমিক-সংস্থানুসারে খোলামকুচি-সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। উপরি-উক্ত তথ্য ব্যতিরেকে খোলামকুচি উত্তোলনের তারিখ, উত্তোলনকারীর নাম, মৃত্তিকাস্তর-সম্পর্কিত তথ্য, সংশ্লিষ্ট প্রত্নবিদর্শন, প্রত্নবস্তুর আকার ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, আনুমানিক কাল, সংস্কৃতি-পর্ব এবং অপর বৈলক্ষণ্য ও গুরুত্ব নিবন্ধে লিখিতে হইবে। মৃৎপাত্র-নিবন্ধক খোলামকুচির বিস্তারিত তথ্য লিখিয়া রাখিবে। এতদ্‌ব্যতীত নকৃশাকারী ছকাঙ্কিত কার্ডে গুরুত্বপূর্ণ খোলামকুচির প্রতিকৃতি অঙ্কন করিবে। সুতরাং একটি লেখ নিরুদ্দেশ হইলে অপরটি বর্তমান থাকিবে। উপরি-উক্ত লেখ-সম্বলিত খোলাম মিশ্রিত হইলেও প্রয়োজনমত উহাদের পৃথক করা সহজসাধ্য হইবে।

সকল প্রকার তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া কাপড়ের বা প্ল্যাষ্টিকের থলিতে খোলামকুচি সংরক্ষণ করা উচিত। দুইটি চিরকুটে জ্ঞাপক-সূচক তথ্য যেমন, প্রত্নস্থলের নাম, খাদসংখ্যা, মৃৎস্তর-সংখ্যা, উদ্ধারণের তারিখ, স্তরবিন্যাস প্রভৃতি লিখিয়া একটি থলির অভ্যন্তরে ন্যস্ত করা বিধেয়। থলির বহিরাংশে অপর চিরকুটটি দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখা প্রয়োজন। এই পরিচয়জ্ঞাপক চিরকূটদ্বয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবহণ ও হস্তান্তরিত হইবার সময় বহিরাংশের চিরকুট নিরুদ্দেশ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু থলির অভ্যন্তরস্থ চিরকুট বর্তমান থাকিবে। কার্যশেষে খোলামকুচিপূর্ণ সকল থলি কাষ্ঠনির্মিত পেটিকাতে পরিবহণের নিমিত্ত সযত্নে বিন্যস্ত করা কর্তব্য।

অখণ্ড বা সম্পূর্ণ এবং সংসৃষ্ট মৃৎপাত্র-গাত্রের লিখন-প্রণালীও অনুরূপ। প্রধানতঃ দৈর্ঘ-প্রস্থ-বেধ-পরিমাপ গ্রহণ করিয়া উক্ত মৃন্ময় পাত্রসমূহের যথাবস্থান সুনির্দিষ্ট করা কর্তব্য। প্ল্যান্ ও উল্লম্ব-ছেদের চিত্রণে উহাদিগের আবির্ভাবক্ষেত্রও অঙ্কিত করা প্রয়োজন। যথারীতি পাত্রের গাত্রে ক্রমিকসংখ্যা এবং অপর তথ্যের বিস্তারিত বর্ণন নিবন্ধে লিপিবদ্ধ করা উচিত। প্রয়োজনমত সর্বপ্রকার অখণ্ড পাত্রের পরিলেখ অঙ্কন করা বিধেয়। তৎপরে পরিবহণের জন্য কৌলাল-সংরক্ষণ-সংক্রান্ত উপকরণ (তুলা, শুষ্ক খড়কুটা প্রভৃতি) দ্বারা সকল মৃন্ময়পাত্র আবৃত করিয়া কাষ্ঠনির্মিত পেটিকাতে সযত্নে ন্যস্ত রাখা প্রয়োজন।

উপরি-বর্ণিত এবং পূর্বোক্ত স্তরবিন্যাসের পর্য্যালোচনা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ-পদ্ধতি মৃত্তিকাস্তর, স্তরবিন্যাস এবং সংস্কৃতি-পর্বের সহিত বিজড়িত। সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ উল্লিখিত তথ্যসম্বলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় প্রত্নবস্তুর ব্যাখ্যা-প্রদান এবং উৎখনন-বিবরণী-লিখন সম্ভব নহে। কিন্তু কেবলমাত্র প্রত্নবস্তুর যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলেই উৎখনকের দায়িত্ব সম্পাদিত হয় না। উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর কাল নিরূপণ করা উৎখনকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

। ৩ ।

প্রত্নবস্তুঃ কালনিরূপণ

সুনির্দিষ্ট কালবর্জিত মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ এবং প্রকৃত-পক্ষে অর্থশূন্য। কালবর্জিত ইতিবৃত্তের রূপায়ণ সময়সূচিবিহীন রেলগাড়ির নির্দেশক পুস্তিকার অনুরূপ। আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের অনুক্রমিক কালনির্ধারণের উপরই উৎখনন- বিজ্ঞানের মৌলিক নিবন্ধ প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্ননিদর্শনের কালনিরূপণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং আয়াসসাধ্য কার্যক্রম। উৎখননকার্যে নিযুক্ত কর্মিবৃন্দের এবং দর্শকগণের মধ্যে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর প্রাচীনত্বের সুনির্দিষ্ট তারিখ জানিবার ঔৎসুক্য অতীব প্রবল। সাধারণ মানুষও পুরাবস্তুর যথার্থ তারিখ অবগতির জন্য আগ্রহান্বিত। কোন একটি প্রত্নবস্তু তাম্রাশ্মীয়-যুগভুক্ত বলিলেই প্রশ্নোত্তর যথার্থ হয় না। সাধারণ মানুষ প্রত্নবস্তুর নির্দিষ্ট তারিখের সহিত সাক্ষাৎ পরিচিতির অভিলাষী। ইহার জন্য সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর যথাযথ কাল নির্ণয় করা প্রয়োজন। প্রত্নবস্তুর সুনির্দিষ্ট কাল নির্ধারণের উপরই ইতিহাস-লিখন সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। সুতরাং সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালী অনুসারে প্রত্নবস্তুর কাল নির্ধারণ করা উৎখনকের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম।

ঐতিহাসিক যুগের কালনিরূপণকার্যের নিমিত্ত লেখসম্বলিত প্রত্ন-নিদর্শনই সুদৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালনির্ধারণ বাস্তব নিদর্শনের পদার্থভিত্তিক। উক্ত যুগের কালনিরূপণে শতাব্দী বা সহস্রক বৎসরের ব্যবধান উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ, কালনির্দেশ শতাব্দী বা সহস্রক অঙ্কে নির্ণীত হয়—যেমন, খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দী বা অষ্টম সহস্রক। এই সকল ক্ষেত্রে প্রত্নবস্তুর নির্দিষ্ট তারিখ অজ্ঞাত। উপরন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে সাধারণ কৌলাল-নিদর্শন ব্যতিরেকে অপর কোন কাল-নির্দেশক বাস্তব নিদর্শন অবর্তমান। কৌলাল-

নিদর্শন অনুশীলন করিয়া অনুক্রমিক সংস্কৃতি-পর্ব নির্ণয় করা সম্ভবপর। কিন্তু নিশ্চিত বা সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবেশ (অর্থাৎ প্রাণিকুল, উদ্ভিদ্‌কুল, জলবায়ু প্রভৃতি) বিশ্লেষণ করিয়া কাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর। ঐতিহাসিক যুগে কালনির্দিষ্ট প্রত্নবস্তুর সাহায্যে নিশ্চিত তারিখ নির্ধারণ করা হয়। সুনির্দিষ্ট তারিখসম্বলিত প্রত্নবস্তুর অবর্তমানেও বিভিন্ন পদ্ধতি এবং উপকরণের অনুকূলতায় ঐতিহাসিক যুগের বিবিধ সংস্কৃতি-পর্বের আনুমানিক কাল নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে।

প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণকার্য দ্বিবিধ : (১) অপ্রত্যক্ষ (পরোক্ষ বা সাপেক্ষ বা সম্বন্ধযুক্ত) কালনিরূপণ এবং (২) প্রত্যক্ষ (বা নিরপেক্ষ) ও নিশ্চিত কালনিরূপণ। অপ্রত্যক্ষ কালনিরূপণকার্য সাপেক্ষ বা সম্বন্ধযুক্ত উপকরণভিত্তিক। কিন্তু প্রত্যক্ষ কালনিরূপণ স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ উপাদানমূলক। প্রত্যক্ষ উপাদান হইতেই নিশ্চিত কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর। উৎখনন-বিজ্ঞানে প্রত্নবস্তুর নিশ্চিত কাল নিরূপণ করাই প্রধানতম উদ্দেশ্য।

(১) অপ্রত্যক্ষ কালনিরূপণ : প্রত্নতত্ত্বে প্রত্ননিদর্শনের সাপেক্ষ কালনিরূপণভিত্তিক তথ্যসমূহের বিশ্লেষণের মধ্যে (ক) শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য, (খ) সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তু, (গ) স্তরবিন্যাস, (ঘ) প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলবায়ু, (ঙ) প্রত্নবস্তুর বিস্তার, (চ) পারস্পরিক সম্পর্ক ও যুগপত্তা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল তথ্য অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রত্নবিজ্ঞানে বিবিধ বিজ্ঞানশাখার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই পুরাবস্তুর কাল নিরূপণ করা কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উপরি-উক্ত বিবিধ তথ্যের সামগ্রিক অনুশীলন দ্বারাই প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণকার্য সমাপন করা উচিত। তথাপি সকল প্রকার তথ্যের ও প্রণালীর অনুশীলনের অসারতা ও সারতা সংক্রান্ত নিবন্ধের পৃথক আলোচনা প্রয়োজন।

(ক) শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য : প্রত্নবস্তুর শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকার্য

পরিবর্তনমূলক শিল্প-নিদর্শনভিত্তিক। বিবিধ কারণে শিল্প-নিদর্শন পরিবর্তিত হয়। এক শ্রেণীভুক্ত নিদর্শনের গঠন ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিয়া শিল্প-পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা নির্ণয় করা সম্ভবপর। এই বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, নিকৃষ্টতম এবং উন্নততম শিল্প-নিদর্শন যথাক্রমে প্রাচীনতম এবং পরবর্তী কালভুক্ত হইবে। যেমন, প্রস্তর হাতিয়ারের কারুশিল্প অনুশীলন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগকে বিবিধ অনুক্রমিক সংস্কৃতি-পর্বে বিভক্ত করা হইয়াছে—প্রত্নাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয়। অধিকন্তু কারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিটি পর্বকে বিভিন্ন উপপর্বেও বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ এই প্রকার শ্রমশিল্পের বিবর্তনমূলক বিভাজন ভ্রমাত্মক। বহুক্ষেত্রে এই অনুশীলনের ফলে সংস্কৃতির বিবর্তনের রূপায়ণ বিকৃত হইয়াছে। একটি হাতিয়ারের উন্নতি বা উৎকর্ষ দ্বিবিধঃ নির্মাণকৌশলজনিত এবং ক্রিয়াধিকারজনিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, নবাশ্মীয় হাতিয়ারের অনুকরণেই প্রথম চ্যাপ্টাকার ব্রঞ্জের কুঠার নির্মিত হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে কিনারাযুক্ত, পক্ষযুক্ত এবং সর্বশেষে কোটরযুক্ত কুঠারের নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। কারুশিল্প-বিবর্তনের ধারা অনুসারে চ্যাপ্টাকার কুঠার প্রাচীনতম এবং কোটরযুক্ত কুঠার পরবর্তী যুগভুক্ত হইবে। কিন্তু এই প্রকার কারু-শিল্প-বিবর্তনের ধারা সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃত নহে। কারণ, পক্ষযুক্ত এবং কোটরযুক্ত কুঠার একই সময়ে নির্মিত ও ব্যবহৃত হইত। উপরন্তু পক্ষযুক্ত কুঠার হইতে কোটরযুক্ত কুঠারের বিবর্তন প্রতিপাদন করিবার সম্ভাবনা ন্যূন। এমন কি কারুশিল্পের বিবর্তন সর্বক্ষেত্রে উদ্দেশ্যসূচকও নহে।

উৎখনন-বিজ্ঞানে প্রত্নবস্তুর শ্রেণীগত বিশ্লেষণের গুরুত্ব অত্যল্প। কারণ একই শিল্প-নির্দেশক শ্রেণীভুক্ত নিদর্শন বিভিন্ন যুগে প্রচলিত ছিল। এমন কি অনুরূপ শিল্প নিদর্শন একাধিক সংস্কৃতি-পর্বভুক্ত হওয়াও স্বাভাবিক। সাধারণতঃ কৌলাল-শিল্প কালনির্দিষ্ট সংস্কৃতির

ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে কৌলাল-শিল্প সংস্কৃতির কাল-নির্দেশক নহে। বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বে সদৃশ মৃৎপাত্র-শিল্পের নিদর্শনও বর্তমান। কেবলমাত্র অনুরূপ মৃন্ময় পাত্র হইতে কাল বা সংস্কৃতি-পর্ব নির্ধারণ করা অনুচিত। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে স্তরবিন্যাসযুক্ত কালনির্দিষ্ট প্রত্নবস্তুর সহিত শ্রেণী-বৈশিষ্টসম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্নস্থলে অনাবৃত মৃৎস্তরের কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর। তথাপি উক্ত প্রকার প্রত্নবস্তুর উপমানগত সাদৃশ্য বা আনুরূপ্য অধ্যয়ন করিয়া কালনিরূপণ করা অনুচিত। কারণ, সমতাবাচক সকল-প্রকার প্রত্ননিদর্শন কালনির্দেশক নহে। বর্তমান প্রত্নবিজ্ঞানে উপমানগত সদৃশ প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব অস্বীকার্য।

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তু : কালনিরূপণকার্যে সমতাবাচক প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট প্রত্ননিদর্শনের অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, একই নির্ধারিত সংস্তরে বিন্যস্ত প্রত্নবস্তু সমকালভুক্ত হওয়াও স্বাভাবিক। এক শ্রেণীভুক্ত বিবিধ আকার ও নানাপ্রকার সংশ্লিষ্ট প্রত্ননিদর্শনও সমকালীন বলিয়া স্বীকৃত। দ্বিতীয়তঃ, সংশ্লিষ্ট প্রত্ন-বস্তুর সামগ্রিক অনুশীলন করিয়াই সংস্কৃতি-পর্বের সম্যক চিত্র রূপায়ণ করা সম্ভবপর। তৃতীয়তঃ, স্বাভাবিক অবস্থায় বিন্যস্ত তারিখ-সম্বলিত একাধিক প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার হইতেই উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট অপর কালবর্জিত প্রত্নবস্তুর তারিখ নির্ধারণ করা যায়। উৎখনন-তত্ত্বে একক প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব অবর্তমান। প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপর বাস্তব নিদর্শনের উপরই নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট প্রত্ননিদর্শনের সামগ্রিক অনুশীলন দ্বারাই সংস্কৃতির প্রকৃতি এবং প্রত্নবস্তুর কাল নির্ণয় করা কর্তব্য। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট প্রত্ননিদর্শনের সামগ্রিক অধ্যয়ন করিয়াই সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ণয় এবং প্রত্নবস্তুর কাল নির্ধারণ করা বিধেয়।

(গ) স্তরবিন্যাস : স্তরবিন্যাসের সাহায্যে প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণ-প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ১০৯-১১৭)। উৎখনন-বিজ্ঞানে

স্তরবিন্যাসের গুরুত্ব সর্বাধিক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, স্তরবিন্যাস অনুশীলন করিয়াই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সংস্কৃতির পর্ব-নির্ধারণ এবং প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণকার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করা প্রয়োজন। উৎখননতত্ত্বে স্তরবিন্যাসবর্জিত প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব অস্বীকার্য। ভূতত্ত্বীয় স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালানুক্রমিক সংস্কৃতির বিকাশ নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু উক্ত যুগভুক্ত প্রত্নবস্তুর যথার্থ কাল নিরূপণের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুশীলন করা কর্তব্য। ঐতিহাসিক যুগের স্তরবিন্যাসের কাল নির্ধারণের নিমিত্ত তারিখ বা লেখসম্বলিত প্রত্নবস্তুই প্রধানতম উপকরণ। অধিকন্তু অপর প্রত্নস্থলের কালনির্দিষ্ট স্তরবিন্যাসের সমতাবাচক অনুশীলন করাও প্রয়োজন। এই আপেক্ষিক অনুশীলন হইতেই স্তরবিন্যস্ত পুরাবস্তুর কালনিরূপণের কাঠামো সুদৃঢ় করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র একটি প্রত্নস্থলের কালনির্দিষ্ট স্তরবিন্যাসের সমতুল্যতার অধ্যয়নের উপর নির্ভর করিয়া কোন মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে।

(ঘ) জলবায়ুঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগভুক্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের জলবায়ু বা পরিবেশ বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্ননিদর্শনের আনুমানিক কাল নির্ণয় করা যায়। এই কার্যের জন্য ভূতত্ত্ববিদ্, পুরা-ভূগোলশাস্ত্রবিশারদ, জীবাশ্মশাস্ত্রবিশারদ, প্রত্নোদ্ভিদবিশারদ প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবেশ অনুরূপ নহে। উদ্ভিদ-কুল ও প্রাণিকুল সম্পর্কিত নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলবায়ু নির্ণয় করা সম্ভবপর। প্রত্যেক প্রাগৈতিহাসিক পর্বের বৈশিষ্ট্যসূচক জলবায়ু কালনির্দেশক। প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণে বিজ্ঞান-পদ্ধতির পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে পরিবেশ ও জলবায়ু-সংক্রান্ত তথ্য আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণকার্যে উক্ত তথ্য উদ্দেশ্যসিদ্ধ নহে।

(ঙ) বিস্তার : বিভিন্ন প্রত্নস্থলে অনুরূপ প্রত্নবস্তুর বিস্তার নির্ধারণ করিয়া সংস্কৃতি-পর্বের এবং পুরাবস্তুর কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর। এই প্রণালী অনুসরণ করিয়া শিল্পনিদর্শনের উৎপত্তি-স্থলও নির্ণয় করা যায়। মানচিত্রে প্রত্যেক পুরাবস্তুর আবির্ভাবস্থান নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এই নির্দিষ্টীকরণের ফলে প্রত্নবস্তুর উৎপত্তি-স্থল এবং উহার বিস্তার সম্পর্কিত অনেক তথ্য প্রতিভাত হইবে। সুতরাং এই পদ্ধতি অনুসারে কোন একটি বিশেষ সংস্কৃতির উদ্ভব ও উহার প্রসার সংক্রান্ত অনেক তথ্য নির্ণয় করা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে সদৃশ প্রত্নবস্তুর ভৌগোলিক বিস্তার অনুশীলন করিয়া প্রত্নস্থলের তারিখ-বর্জিত প্রত্নবস্তুর কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর হয়।

(চ) পারস্পরিক সম্পর্ক ও যুগপত্তা বিশ্লেষণ : প্রত্নস্থলের সংস্কৃতি-পর্বের অনুক্রমিক কালনিরূপণকার্য সমাপ্ত করিয়া অপর প্রত্ন-স্থল হইতে আবিষ্কৃত সমকালভুক্ত সংস্কৃতি-নিদর্শনের সহিত তুলনাত্মক বিশ্লেষণ করাও প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে অনুরূপ প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। অতএব তুলনাযোগ্য প্রত্নবস্তুর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা উচিত। এই প্রকার বিশ্লেষণ হইতে প্রত্নবস্তুর অনির্দিষ্ট কাল নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর।

উক্ত প্রকার কালনিরূপণের জন্য প্রত্নবস্তুকে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায় : দেশজাত এবং পরদেশজাত। আবিষ্কৃত কাল-নির্দিষ্ট পরদেশজাত প্রত্নবস্তুর সাহায্যে দেশজাত সদৃশ কাল-অনির্দিষ্ট প্রত্নবস্তুর কাল নিরূপণ করা সম্ভব। উপরন্তু কালনির্দিষ্ট পরদেশজাত অনুরূপ প্রত্নবস্তু দেশজ প্রত্নবস্তুর নির্ধারিত কাল সুদৃঢ় করে। মোন্‌-টেলিয়াস্‌ সর্বপ্রথম এই প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। অদ্যাপি এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অনেক প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর এবং স্তরবিন্যাসের কাল নির্ধারণ করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ মহেঞ্জোদারো হইতে আবিষ্কৃত বিবিধ প্রত্নবস্তুর এবং পর্যায়ের কালনিরূপণ-প্রসঙ্গ আলোচনা করা প্রয়োজন। মহেঞ্জো-

দারোতে কোন কালনির্দিষ্ট প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং মহেঞ্জোদারোর বিভিন্ন পর্যায়ের কাল অবিদিত। কিন্তু মার্শাল মেসোপটামিয়ার কালনির্ধারিত প্রত্নবস্তুর ও স্তরবিন্যাসের সহিত তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া মহেঞ্জোদারোর একাধিক পর্যায়ের এবং প্রত্নবস্তুর কাল নিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উপরন্তু মহেঞ্জো-দারোর বৈশিষ্ট্যসূচক প্রত্নবস্তু মেসোপটামিয়ার কালনির্ধারিত স্তরায়ণ হইতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রকার তুলনামূলক এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়াই মহেঞ্জোদারোর প্রত্ননিদর্শনের কাল নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই ঐতিহাসিক যুগভুক্ত অনেক প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর এবং স্তরায়ণের কালও নির্ধারিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, আরিকামেডু হইতে 'অ্যারিটাইন্' ও 'রোলেটেড্' কৌলাল-শ্রেণীদ্বয়ের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। অ্যারিটাইন্ ও রোলেটেড্ কৌলাল ইতালী-দেশজাত কালনির্ধারিত নিদর্শন। সুতরাং উক্ত কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্কার হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইতালী দেশজাত প্রত্নবস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার প্রত্ননিদর্শন সমকালভুক্ত। এই প্রকার উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া আরিকামেডুর এবং দক্ষিণ ভারতের অপর প্রত্নস্থলের সংস্কৃতি-পর্বের কাল সুনির্দিষ্ট করা সম্ভবপর হইয়াছে।

প্রত্নবিজ্ঞানে কালনির্দিষ্ট সদৃশ প্রত্নবস্তুর সাহায্যে কাল-অনির্দিষ্ট প্রত্নবস্তুর কাল নিরূপণ করিবার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই প্রণালীর অনুসরণ বিজ্ঞানসিদ্ধ নহে। কোন এক প্রত্নস্থলে অধিক বৎসর পর্যন্ত অনুরূপ প্রত্নবস্তু প্রচলিত থাকাও অসম্ভব নহে। অপর প্রত্নস্থলে উক্ত সদৃশ প্রত্নবস্তু অচিরে বিলুপ্ত হওয়াও সম্ভব। এমন কি সদৃশ প্রত্নবস্তু বিভিন্ন সংস্কৃতিভুক্ত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং অনুরূপ প্রত্নবস্তুর তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা কাল নিরূপণ করা ভ্রমাত্মক হওয়াও স্বাভাবিক। তৎসত্ত্বেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের কাল-

নিরূপণের জন্য সাপেক্ষ প্রমাণের প্রযুক্তি অত্যধিক। কিন্তু বিবিধ সাপেক্ষ কালনিরূপণ-পদ্ধতির অনুশীলনের যথার্থতা সন্দেহভাজক। অনেক ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক নির্দেশও প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ, সাপেক্ষ কালনিরূপণের পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। সুতরাং উৎখনন- বিজ্ঞানে উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণ-প্রসঙ্গে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনুচিত।

(২) প্রত্যক্ষ কালনিরূপণ : পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্নবস্তুর নিশ্চিত কাল নিরূপণ করাই উৎখনন- বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্ননিদর্শনের নিশ্চিত কালনিরূপণ-কার্য তারিখ বা অপর লেখসম্বলিত প্রত্নবস্তুর আবিষ্কারের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই প্রকার প্রত্নবস্তু সর্বক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক যুগভুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সন-তারিখ বা লেখসম্বলিত প্রত্ন-বস্তুর উদ্ধার সম্ভব নহে। সুতরাং বর্তমানে উদ্ভাবিত বিবিধ বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলন করিয়াই প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি-পর্বের নিশ্চিত কাল নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে।

সর্বপ্রথমে, ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর নিশ্চিত কালনিরূপণ-সংক্রান্ত পদ্ধতির আলোচনা প্রয়োজন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি-পর্ব লিখিত নিদর্শনভিত্তিক। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্ব অলিখিত উপাদান-প্রসূত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পাঠোদ্ধৃত লিখিত উপাদানই কাল- নির্দেশক। প্রসঙ্গতঃ, মহেঞ্জোদারো হইতে আবিষ্কৃত অসংখ্য লেখ- সম্বলিত সীলের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। মহেঞ্জোদারোর সীলের লেখর পাঠোদ্ধার অদ্যাপি সম্ভব হয় নাই। সুতরাং ইতিবৃত্তের রূপায়ণ-কার্যে এবং প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণে উক্ত লিখিত উপাদান অর্থ-জ্ঞাপক নহে। মহেঞ্জোদারোর লিপির পাঠোদ্ধার হইলেই সিন্ধু-সভ্যতার যথার্থ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা সম্ভবপর হইবে। এমন কি এই লিপির পাঠোদ্ধার হইতে সিন্ধু-সভ্যতার সহিত জড়িত অনেক সমস্যার

সমাধানের পথও সুগম হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ মিশরের হাই-অ্যারোগ্লিফ্ (হাইঅ্যারস্=পবিত্র ; গ্লিফাইন্=খোদিত বা লিখিত ; মিশরদেশের প্রাচীনতম চিত্র-লিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালা) এবং মেসো-পটামিয়ার কিউনীইফ্যরম্ (কিউন্যাস্=কীলকাকার ; ইরাক ও পারস্য দেশের প্রাচীন কীলকাকার বর্ণমালা) লেখদ্বয়ের পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত পাঠোদ্ধৃত লেখতত্ত্ব হইতে সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তুর এবং সংস্কৃতি-পর্বের কালনিরূপণকার্য অধিক সহজসাধ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম লিপিদ্বয় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী নামে পরিচিত। বহু অধ্যবসায়ের ফলে উক্ত লিপিদ্বয়ের পাঠোদ্ধার সম্ভব হইয়াছে। এই লিপিদ্বয়ে লিখিত অনেক লেখমালার আবিষ্কারও উল্লেখনীয়। অধিকন্তু এই লিপিদ্বয়ের প্রারম্ভিক ও সর্বশেষ কালও সুনিশ্চিত। উক্ত লিখিত উপাদানের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তুর কাল নির্ধারণ করা অনায়াসসাধ্য। প্রকৃতপক্ষে পাঠোদ্ধৃত লেখমালাই প্রাচীন ভারতবর্ষের কালানুক্রমিক ইতিহাস-রূপায়ণের সুদৃঢ় ভিত্তি।

ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নবস্তুর নিশ্চিত কালনিরূপণ-সংক্রান্ত উপা-দানের মধ্যে গ্রন্থ, লেখমালা, মুদ্রা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে প্রত্নবস্তুর বা প্রত্নস্থলের কালনির্ণয়-কার্যে এই সকল লিখিত উপাদান নির্ভরযোগ্য নহে। বেদ, মহাকাব্য, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ ভারতবর্ষের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এই গ্রন্থসমূহের সুনির্দিষ্ট কাল অবিদিত। উপরন্তু কোন গ্রন্থই প্রত্নতত্ত্বীয় বা বাস্তব নিদর্শনভিত্তিক নহে। সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থের তথ্য সংস্কৃতি-পর্বের বা প্রত্নবস্তুর কাল-নিরূপণকার্যে মূল্যহীন। এমন কি প্রাচীন লেখমালা হইতেও সুনির্দিষ্ট কালনির্ঘণ্ট নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মেসোপটামিয়ার বিবিধ লেখতে নৃপতিবর্গের বংশানুক্রম-তালিকা ও পরিচয় লিখিত আছে। কিন্তু উক্ত লেখ সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নহে। নৃপতিবর্গের বংশতালিকায় অনেক অসামঞ্জস্যতাও বিদ্যমান। লেখতে অনেক নৃপতিবর্গ বংশপরম্পরাগত বলিয়া লিখিত আছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা সমকালভুক্ত। এই সকল ক্ষেত্রে নৃপতি-গণের কালনিরূপণ সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নহে। ফলে অধিকাংশ নৃপতিবর্গের নির্ধারিত তারিখ বিতর্কমূলক। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, প্রখ্যাত নৃপতি হামুরাবীর তারিখ একাধিক বার পরিবর্তিত হইয়াছে। পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের তারিখ খ্রীষ্টের জন্মের নবম শতাব্দীর পূর্বে সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নহে। কিন্তু মিশর দেশের তারিখ-নির্ধারণের ভিত্তি অধিক দৃঢ়ীভূত। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রক পর্যন্ত মিশর দেশের কালনিরূপণ সুনির্দিষ্ট। লেখমালা, মুদ্রা প্রভৃতি হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন নৃপতি-বংশসমূহের কালনির্ঘণ্ট নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত নির্ধারণও বিতর্কমূলক। সুতরাং কেবল-মাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসৃত উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনই কালনির্ঘণ্ট সুনির্দিষ্ট করিতে সমর্থ।

আদি-ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের সহিত গ্রন্থাদিতে বা লেখমালায় বর্ণিত রাজত্বকালের বা কোন ঘটনার সময়ের সঙ্গতি নির্ধারিত হইলেই নিশ্চিত তারিখ নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর। কিন্তু এই কার্য সাধন করা আয়াসসাধ্য। প্রধানতঃ প্রাচীন নগর-প্রত্নস্থলেই উৎখনন পরিচালিত হইয়াছে। নগরেই রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরের আধিক্য বিদ্যমান। মিশরের স্মৃতিসৌধসমূহ হাইঅ্যারোগ্লিফিক্- লেখমালাবৃত। কিন্তু মেসোপটামিয়ায় উক্ত প্রকার লেখমালাবৃত সৌধ অবর্তমান। অথচ মেসোপটামিয়াতে লেখসম্বলিত বিবিধ মৃন্ময় ফলকের প্রাচুর্য বিদ্যমান। স্তরবিন্যাস এবং লিখিত উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া মন্দির, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির কাল নির্ধারণ করা যায়। এমন কি, উক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা একই সংস্তরে অবস্থিত অপর সৌধ-নিদর্শনের এবং বিন্যস্ত প্রত্নবস্তুর কাল নির্ধারণ করাও হইয়াছে। এই সকল কালনির্ধারিত প্রত্নবস্তুর সহিত তুলনামূলক অধ্যয়ন করিয়া অপর প্রত্নস্থল হইতে উদ্ধৃত কাল-অনির্দিষ্ট প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণ করাও সম্ভবপর। উক্ত তুলনাত্মক প্রত্নবস্তুর মধ্যে

কৌলাল-নিদর্শন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সদৃশ কৌলাল সমকালীন সংস্কৃতিভুক্ত। অপর প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত অনুরূপ কৌলাল-নিদর্শন সমসংস্কৃতিভুক্ত রূপে ধার্য করা অসঙ্গত নহে। সুতরাং একটি প্রত্নস্থলের কৌলালের নির্ধারিত তারিখের সাহায্যে অপর প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত সদৃশ কৌলালের অনির্দিষ্ট কাল নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পুরাবস্তুর কাল নিরূপণ করা সঙ্গত নহে।

প্রসঙ্গতঃ, প্রত্ননিদর্শনের কাল নিরূপণকার্যে আবিষ্কৃত মুদ্রার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। গ্রীস, রোম, ইতালী, প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন প্রত্নস্থলে বিস্তারিত উৎখনন পরিচালিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রত্নস্থল হইতে লেখসম্বলিত মুদ্রার আবিষ্কার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। বিবিধ মৃৎস্তর হইতে আবিষ্কৃত মুদ্রার সহায়তায় প্রত্নস্থলের অনুক্রমিক কালনিরূপণকার্য উত্তমরূপে সাধিত হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, একক মুদ্রার আবিষ্কার হইতে কালনিরূপণ-সম্পর্কিত কোন মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় আবিষ্কৃত হইলে, একক মুদ্রাও নিশ্চিত তারিখ-নির্দেশক। কোন স্তরে ১০২ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত স্তরের তারিখের পূর্বে উহা বিন্যস্ত হওয়া সম্ভব নহে। এই সকল ক্ষেত্রেও মুদ্রার অবস্থা এবং প্রচলনের কালনির্দেশ-জ্ঞাপক তথ্যের অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই কার্য সম্পাদন করা অধিক শ্রমসাধ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেনের সম্রাট অ্যান্টোনিওর মুদ্রা ৩২-৩১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত মুদ্রা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। অধিক বৎসরব্যাপী কোন মুদ্রার প্রচলন অস্বাভাবিক। সাধারণতঃ ৫-৫০ বৎসর যাবৎ মুদ্রার প্রচলন স্বীকৃত। অধিকন্তু সর্বক্ষেত্রে মুদ্রার সাহায্যে উহার স্তরের কালনির্ধারণকার্য সমাপন করা সম্ভব নহে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থায় বিন্যস্ত মুদ্রায়

লিখিত তারিখ-এর পূর্বে মৃৎস্তর গঠিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত মুদ্রা হইতে স্তরবিন্যাসের ও অপর সংশ্লিষ্ট প্রত্ননিদর্শনের নিশ্চিত কালনির্ধারণ সন্দেহাতীত নহে।

উপরন্তু একক মুদ্রা-প্রাপ্তির উপর কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করা অবৈধ। মুদ্রা চলমান। এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে মুদ্রার সঞ্চারণ অতিশয় স্বাভাবিক। নানা কারণে মুদ্রা স্বাভাবিক অবস্থায় বিন্যস্ত হওয়াও অসম্ভব নহে। প্রাকৃতিক অবস্থায় বিন্যস্ত একক মুদ্রার আবিষ্কার হইতেও কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনুচিত। মৃৎস্তরে বিন্যস্ত একাধিক মুদ্রার আবিষ্কারই কালনিরূপণ-কার্যের প্রকৃত সহায়ক। এতদব্যতীত সমমৃৎস্তরে বিভিন্ন তারিখ-সম্বলিত কতিপয় মুদ্রার আবিষ্কারও সম্ভবপর। এই সকল ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম তারিখসম্বলিত মুদ্রার নির্দেশ অনুযায়ী মৃত্তিকা-স্তরের কালনিরূপণ করিতে হইবে। মুদ্রার অনুরূপ অন্যান্য লেখ-সম্বলিত প্রত্নবস্তুর যথার্থ অবস্থান নির্ণয় করিয়া মৃৎস্তরের কাল নির্ধারণ করা বিধেয়।

লেখবর্জিত প্রত্নবস্তুও নিশ্চিত কালনিরূপণকার্যে প্রভূত সাহায্য করে। এই প্রকার প্রত্নবস্তুর মধ্যে কৌলাল-নিদর্শন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইতালীর বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত বিবিধ কৌলালের গঠন, আকার ও প্রকার বিশ্লেষণ করিয়া কৌলাল-শিল্পের বিবর্তনের ধারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। উক্ত বিশ্লেষণ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, টেরাসিগিল্লাতা- কৌলালশ্রেণীভুক্ত (ছাপাঙ্কিত কৌলাল) অ্যারিটাইন্-মৃৎপাত্র (অ্যারিটিয়াম নামক অঞ্চলে নির্মিত) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্মিত ও প্রচলিত হইয়াছিল।

এই প্রকার কালনির্দিষ্ট কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্কারের সাহায্যে অপর প্রত্নস্থলের কাল-অনির্দিষ্ট মৃৎস্তরের এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তুর তারিখ উক্ত নিদর্শনের সমকালে আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত। প্রসঙ্গতঃ, দক্ষিণ ভারতের আরিকামেডু নামক প্রত্নস্থল

হইতে একাধিক ইতালীয় অ্যারিটাইন্- কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। অ্যারিটাইন্ মৃৎপাত্রের নির্মাণকার্য খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। কিন্তু উন্নত ধরনের অ্যারিটাইন্ মৃৎপাত্র সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে উক্ত মৃৎপাত্র ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চল হইতে অন্তর্হিত হয়। সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, আরিক্কামেডুতে প্রাপ্ত অ্যারিটাইন্- মৃৎপাত্র খ্রীষ্টের জন্মের ৪৫-৫০ বৎসর পরবর্তী হইবে। উৎখনক হুইলার নির্ধারণ করিয়াছেন যে, উক্ত মৃৎপাত্রকে ২০-৫০ খ্রীষ্টাব্দতে আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত। এই সময়েই ইতালী হইতে অ্যারিটাইন্- মৃৎপাত্র আরিক্কামেডুতে আমদানিকৃত হইয়াছিল।

আরিক্কামেডু-প্রত্নস্থলে এই প্রকার নিশ্চিত কালনির্ণীত কৌলালের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অ্যারিটাইন্- মৃৎপাত্রের আবিষ্কারের সাহায্যেই আরিক্কামেডুর স্তরায়ণের অবিদিত কাল নির্ধারিত হইয়াছে। অ্যারিটাইন্- মৃৎপাত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর কাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর হইয়াছে। উক্ত কালনির্দিষ্ট অ্যারিটাইন্- মৃৎপাত্রই দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির কালনির্ঘণ্টের একমাত্র দৃঢ়বদ্ধ ভিত্তিরেখা।

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রত্নস্থলের বিবিধ সংস্কৃতি-পর্বের নিশ্চিত কালনিরূপণের ভিত্তি আলোচনা করা প্রয়োজন। দক্ষিণ ভারতে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ব্রহ্মগিরি নামক প্রত্নস্থলের উৎখনন উল্লেখনীয়। উক্ত প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত স্তরায়ণের এবং প্রত্ননিদর্শনের গুরুত্ব পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ১০৬-১০৭)। ব্রহ্মগিরিতে সর্বোপরি স্তরায়ণের কাল দক্ষিণ ভারতীয় সাতবাহন (আন্ধ্র) এবং রোমক নৃপতিবর্গের মুদ্রা দ্বারা নির্ধারিত (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধ) হইয়াছে। কিন্তু নিম্নস্থ মহাশ্মীয়, অশ্মীয় বা তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বের কাল অবিদিত। মুদ্রা দ্বারা নির্ধারিত তারিখের সহিত স্তরবিন্যাসের ব্যবধান বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নস্থ সংস্কৃতি-

পর্বদ্বয়ের কাল নির্দিষ্ট করা হইয়াছে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রারম্ভ পর্যন্ত)।

অনেক প্রত্নস্থলে কৌলাল-নিদর্শন এবং মুদ্রা উভয়ের সাহায্যে স্তরায়ণের ও প্রত্নবস্তুর কাল নির্ধারিত হইয়াছে। সর্বপ্রথমে তক্ষশিলা হইতে গ্রীক মুদ্রার আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। ঐ মুদ্রার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তু মুদ্রায় লিখিত তারিখসম হইবে। উপরন্তু তক্ষশিলা হইতে আবিষ্কৃত উত্তর-ভারতীয়-কৃষ্ণ-চিক্কণ ও উজ্জ্বল কৌলাল-নিদর্শনের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরোপ করা হইয়াছে। অপর প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত এই কৌলালের নির্ণীত কাল হইতে স্তরায়ণে বিন্যস্ত অন্য প্রত্নবস্তুর কাল নির্ধারণ করা যায়। হস্তিনাপুর-উৎখননে বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রত্নস্থলের স্তরবিন্যাস সম্পূর্ণভাবে কৌলাল-বিশ্লেষণভিত্তিক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হস্তিনাপুর প্রত্নস্থলের নিম্নস্তরে গিরি-মৃত্তিকা দ্বারা রঞ্জিত কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি-স্তর হইতে চিত্রিত-ধূসর-কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্কার অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। উহার পরবর্তী স্তর হইতে উত্তর-ভারতীয়-কৃষ্ণ-চিক্কণ ও উজ্জ্বল কৌলালের আবিষ্কার কাল-নির্দেশক। এই কালনির্দিষ্ট কৌলালের সাহায্যে বিভিন্ন স্তরায়ণের কাল সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হইয়াছে। নিম্নস্থ দ্বিবিধ কৌলাল-নিদর্শনের কাল অবিদিত। কিন্তু স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত কৌলাল-শ্রেণীদ্বয়ের কাল নির্দেশ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত লেখসম্বলিত প্রস্তর বা ধাতব বা মৃন্ময় সীলের ও অপর নিদর্শনের সাহায্যেও কাল নিরূপণ করা যায়। উক্ত লেখসম্বলিত নিদর্শনের সহায়তায় উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রত্নবস্তুর এবং স্তরায়ণের কালও নির্ধারণ করা হইয়াছে। রাজবাড়িডাঙা নামক প্রত্নস্থলে উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের বিশ্লেষণজাত ত্রয়ী

সংস্কৃতি-পর্বের নির্ণয়কার্য উল্লেখযোগ্য। প্রথম ও তৃতীয় পর্বভুক্ত প্রত্ন বস্তুর কাল অবিদিত। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরায়ণের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তুর কাল লেখসম্বলিত পোড়ামাটির সীলের সাহায্যে নির্ণীত হইয়াছে। এই নির্ধারিত কালের সাহায্যে অপর পর্বদ্বয়ের কাল নির্দিষ্ট করা সম্ভব হইয়াছে (পৃঃ ১০৭-০৯)। কোন একটি স্তরায়ণ হইতে লেখ বা তারিখ সম্বলিত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলেই স্তরবিন্যাসের এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য সকল প্রত্নবস্তুর কাল নির্ধারণ করা সম্ভবপর।

উপরি-উক্ত কালনিরূপণ-সংক্রান্ত উদাহরণমূলক তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, তারিখ ও অপর লেখসম্বলিত প্রত্নবস্তুর আনুকূল্যেই সকল প্রকার কালবর্জিত প্রত্ননিদর্শনের এবং স্তরায়ণের নিশ্চিত কাল সুনির্দিষ্ট করা সম্ভবপর। কোন স্তরায়ণে কালনির্দেশক প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইলে, উহার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং উহার উপরিস্থ এবং নিম্নস্থ মৃৎস্তরসমূহে বিন্যস্ত প্রত্নবস্তুর কাল নির্ণয় করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই ঐতিহাসিক প্রত্নস্থলের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের ও পর্যায়ের কাল নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই প্রকার কালনিরূপণ ত্রুটিবর্জিত বা সন্দেহাতীত নহে। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে প্রত্ননিদর্শনের এবং স্তরায়ণের নিশ্চিত কাল নিরূপণের নিমিত্ত বিবিধ বিজ্ঞান-প্রণালীর প্রবর্তন-সংক্রান্ত আলোচনা প্রয়োজন।

। ৪ ।

প্রত্নবস্তু : কালনিরূপণে বিজ্ঞান-পদ্ধতি

অধুনা প্রত্নবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক নিয়মানুবর্তিতার অধীন। উৎখনন-বিজ্ঞানের বিবিধ কার্যক্রম সর্বতোভাবে বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নিষ্ঠা দ্বারা পরিচালিত। বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখা অনেক পদ্ধতি আবিষ্কার

ও প্রবর্তন করিয়া উৎখননের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে। বর্তমান যুগে বিবিধ বিজ্ঞান-শাখার মৌলিক আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনকার্যের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। বিবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে অনেক নূতন পদ্ধতিও প্রবর্তিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণের কার্যক্রমজাত তথ্যই বর্তমান উৎখননতত্ত্বের দৃঢ় ভিত্তি।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে উৎখননতত্ত্বের অনেক সমস্যার সমাধানের পথও সুগম হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বে প্রত্নবস্তুর নিশ্চিত কাল নিরূপণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্ননিদর্শনের নিশ্চিত কালনিরূপণ সর্বক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। এমন কি ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নবস্তুর কাল-নির্ধারণও সন্দেহাতীত নহে। কিন্তু বর্তমানে এই সমস্যার সমাধান বহুলাংশে সাধিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারই প্রত্নতত্ত্বীয় সমস্যার সমাধানকার্যের প্রধান উৎস। সুতরাং প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণকার্যের নিমিত্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। প্রত্নবস্তুর কাল নিরূপণের জন্য যে সকল পদ্ধতি অধিক অনুসৃত হয় তাহাদের মধ্যে তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক-বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নবস্তুর কাল নিরূপণের জন্য আরও অনেক বিজ্ঞান-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্ননিদর্শনের কালনির্ণয়কার্যে বিজ্ঞান-পদ্ধতির প্রয়োগ-সম্পর্কিত যথাযথ পর্যালোচনাও আবশ্যক।

(ক) তেজস্ক্রিয়-অঙ্গারক-বিশ্লেষণ (রেডিও-কার্বন অ্যান্যালিসিস্): নিউক্লিয় পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা (পরমাণু কেন্দ্রীয়নের গঠন-সংক্রান্ত বিজ্ঞান) ও তেজস্ক্রিয়-গবেষণা (রেডিও অ্যাকটিভিটি রিসার্চ) কেবল-মাত্র পৃথিবীর ধ্বংস-সাধনকার্যে ব্রতী নহে। মানবসমাজের শান্তিপ্রবণ-কার্যেও ইহার দান ন্যূন নহে। বর্তমান প্রত্নতত্ত্বে 'তেজস্ক্রিয়'- (রেডিও অ্যাকটিভিটি) বিশ্লেষণই কালনিরূপণকার্যের সুদৃঢ় ভিত্তি।

যে সকল বিজ্ঞান-অনুসৃত পদ্ধতি উৎখনন-কার্যক্রমকে সক্রিয়-

ভাবে সাহায্য করে তাহাদের মধ্যে অঙ্গারক-এর (কার্‌বন) তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। উৎখনন-বিজ্ঞানে রেডিও-কার্‌বন-বিশ্লেষণ যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। রেডিও-কার্‌বন-বিশ্লেযণের ফলে উৎখনন্ দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের কালনিরূপণের কাঠামোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বহুলাংশে সুদৃঢ় হইয়াছে। অঙ্গারক-এর তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণ প্রত্নতত্ত্বে 'কার্‌বন ডেটিং' (অথবা সী-১৪ ডেটিং) নামে পরিচিত।

বহু বৎসর যাবৎ প্রত্নতত্ত্বে প্রকৃত ঘটনার ও বিভিন্ন নিদর্শনের সুনির্দিষ্ট কাল নির্ধারণের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান-পদ্ধতির অভাব সম্যকভাবে উপলব্ধি করা হইয়াছে। সম্প্রতি একাধিক বিদগ্ধ বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে উক্ত অভাব বহুলাংশে মোচন করা সম্ভব হইয়াছে। অঙ্গারক-এর তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণপূর্বক প্রত্নবস্তুর কাল নিরূপণ করিবার পদ্ধতির প্রবর্তন প্রত্নতত্ত্বীয় কালনির্ঘণ্ট-রূপায়ণে ও নিশ্চিত তারিখ নির্ধারণকার্যে আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। অধুনা প্রত্নতত্ত্বীয় কালনিরূপণকার্যে অঙ্গারক-এর তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণপ্রসূত তথ্যই সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পন্থা। সুতরাং তেজস্ক্রিয়-অঙ্গারক-বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা প্রয়োজন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গাইস্‌লের-এর 'টরিসেলীয়' নলের (ভ্যাকুয়াম্ টিউব) সাহায্যে রন্‌টগেন (১৮৯৫) একস্ রশ্মি' (রঞ্জনরশ্মি) আবিষ্কার করেন। তৎপরে বেকারেল (১৮৫২-১৯০৮) উদ্ভাবন করিলেন যে, 'ইউরেনিয়্যাম' (তেজস্ক্রিয় ধাতুবিশেষ) হইতেও অনুরূপ রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি-বিচ্ছুরণ (রেডিএস্‌ন্) কুরী-দম্পতিও বিশ্লেষণ্ করিয়াছেন। উক্ত বিশ্লেষণের ফলে 'রেডিঅ্যাম' (তেজস্ক্রিয় ধাতব) এবং রেডিও-অ্যাক্‌টিভিটিতত্ত্ব (তেজস্ক্রিয়তা) উদ্ভাবিত হয়। রাদার-ফোর্ড (১৮৭১-১৯৩৭) প্রমাণ করিয়াছেন যে, তেজস্ক্রিয় ধাতুর পরমাণু (অ্যাটম্) বিভিন্নাংশে বিভক্ত হইয়া আল্‌ফা ও বিটা কণায় বিচ্ছুরিত হয়। আল্‌ফা-কণাই 'হীলিয়াম্-পরমাণুর' (মৌলিক

গ্যাস) ভিত্তি। বিটা-কণা 'ইলেকট্রন্-পরমাণুর' (বিদ্যুৎ-পরমাণু) উৎস। তেজস্ক্রিয়-এর অবক্ষয় আদি-পরমাণুকে নব-পরমাণুতে রূপায়িত করে। রাদারফোর্ড (১৯০৪) তেজস্ক্রিয়-এর অবক্ষয়ের আনুপাতিক হার নির্ধারণ করিয়া 'অর্ধ-জীবন'- (হাফ্-লাইফ্) সংজ্ঞার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। অর্ধ-জীবন পরমাণু-বিচ্ছুরণের অর্ধাংশ। তেজস্ক্রিয়-এর অবক্ষয়ের গতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সোড্ডি (১৯১৩) রাসায়নিক উপাদানের পরমাণুকে 'অ্যাইসোটোপ্' বা 'তেজস্ক্রিয় অ্যাইসোটোপ্' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তেজস্ক্রিয় অ্যাইসোটোপ্ প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত হইতে পারে। অপ্রাকৃত উপায়েও অ্যাইসোটোপের উৎপাদন অসম্ভব নহে। অঙ্গারক-এর প্রাকৃত অ্যাইসোটোপ্ই যথার্থ কালনির্দেশক।

প্রায় সকল অঙ্গারক-পরমাণু দৃঢ়বদ্ধ। সাধারণ অঙ্গারক প্রোটন্-৬ (বিদ্যুতের পরমাত্রা) এবং নিউট্রন্-৬ (বিদ্যুতের অক্রিয় বা প্রশমিত কণা) সম্বলিত এবং উহার পরমাণু-ওজন (অ্যাটমিক্ ওয়েট্) ১২ (সী ১২)। মহাজাগতিক রশ্মি দ্বারা বায়ুমণ্ডল ক্রমাগত বিমর্দিত হইবার ফলে অঙ্গারক-পরমাণুসমূহের ক্ষুদ্রানুপাত তেজস্ক্রিয় আকারে (রেডিও অ্যাক্টিভ) পরিবর্তিত হয়। ইহাই অঙ্গারক-১৪ (কার্‌বন-১৪) নামে অভিহিত। কারণ, ইহার পরমাণু-ওজন ১৪। এই ১৪ পরমাণু-ওজনসম্পন্ন অঙ্গারক-এর তেজস্ক্রিয়-অ্যাইসোটোপ্ই কালনিরূপণকার্যের নিমিত্ত অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে লিব্বী বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তত্ত্বের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক বায়ুমণ্ডলেও বিদ্যমান। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিব্বী প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মহাজাগতিক রশ্মিজাত তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক কালনিরূপণকার্যের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সিদ্ধান্তের প্রামাণিকতা বিজ্ঞানী-মহলে স্বীকৃতি লাভ করে এবং তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন।

তেজস্ক্রিয়-অঙ্গারক (সী-১৪) ৯০০০-১৬০০০ মিটার ঊর্ধ্বে বায়ু-

মণ্ডলে (অ্যাট্‌মস্‌ফিঅ্যার্‌) মহাজাগতিক রশ্মির (কস্মিক্‌-রে) প্রভাবে পরমাণুর উপস্থিতির (ট্র্যান্সমিউটেশন্‌) ফলে নাইট্রোজেন্‌ (মৌলিক গ্যাসবিশেষ) উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক-১৪-এর মোট পরিমাণ (আনুমানিক ৮১ মেট্রিক টন্‌) অপরিবর্তনশীল। তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক-এর মোট পরিমাণের ৯৩% সাগরে, ৪% জৈবদেহে এবং ৩% বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান। বিচ্ছুরণের ফলে তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক-১৪ পুনরায় নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। অধিকন্তু কার্‌বন-১৪ বায়ুমণ্ডলের 'কার্‌বন-ডাইঅক্‌সআইড্‌' গ্যাস-(দ্ব্যণুক অক্‌সাইড্‌বিশেষ) উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। ফোটো সংশ্লেষকালীন (ফোটা-সিন্‌থেসিস্‌) উদ্ভিদ্‌কুল 'কার্‌বন-ডাইঅক্‌সাইড্‌' (সী O_2) শোষণ (অ্যাব্‌স্যর্‌ব্‌) করে। পরে উহা উদ্ভিদ্‌কুলের দেহে সংমিশ্রিত হয়। প্রাণিকুল উদ্ভিদ্‌রাজি ভক্ষণ করিয়া কার্‌বন-১৪ শোষণ করে। এমন কি সামুদ্রিক প্রাণিকুলও কার্‌বন-১৪ শোষণ করিয়া থাকে। বিনাশপ্রাপ্ত হইবার পর প্রাণিকুল নূতন কার্‌বন-পরমাণু গ্রহণ করিতে অপারগ। সুতরাং কার্‌বন-১৪ ক্রমান্বয়ে ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। সী-১৪-এর 'অর্ধ-জীবন' ৫৫৬৮ $\pm$ ৩০ (অথবা ৫৭৩০ $\pm$ ৪০ বা ৫৭২০ $\pm$ ৪৭) বৎসর স্বীকৃত। পরমাণু-ওজনের ত্রিবিধ গড় নির্ণয় করিয়া উক্ত অর্ধ-জীবন নির্ধারিত হইয়াছে। ৫৫৬৮ বৎসর-অন্তে জীবাশ্ম-এর জীবিত কালের কার্‌বন-১৪-এর অর্ধেক পরিমাণ অবক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। সুতরাং প্রাচীন জৈব পদার্থের কার্‌বন-১৪-এর পরিমাণ বিশ্লেষণ করিয়া উহার কার্‌বন-স্থিতি নির্ধারণ করা সম্ভবপর। কিন্তু ২০,০০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন জৈব পদার্থের অন্তর্নিহিত কার্‌বন-১৪ অত্যল্প এবং উহার পরিমাণ নির্ণয় করা আয়াসসাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়-অবক্ষয়ের বিশ্লেষণই একমাত্র সহায়ক। তেজস্ক্রিয়-ধাতুর (ইউরেনিয়্যাম্‌ ও থ্যরিঅ্যাম্‌) অর্ধ-জীবন (৭'৬ বিলিঅ্যান্‌; এক বিলিঅ্যান্‌ লক্ষ কোটি বৎসর) প্রাগৈতিহাসিক যুগভুক্ত উপকরণের পক্ষে যথোপযুক্ত।

তেজস্ক্রিয়-কার্‌বন-বিশ্লেষণ দ্বারা কাল নিরূপণ করিবার জন্য সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার সরঞ্জামসম্বলিত বীক্ষণাগারের প্রয়োজন অত্যধিক। প্রথমে উপকরণের নমুনাকে (যথা দারু, অস্থি বা অপর জৈব পদার্থ) ক্ষুদ্রতম খণ্ডে কর্তন করিতে হইবে। তৎপরে উক্ত খণ্ডিত উপকরণ উত্তাপক নলে ন্যস্ত করিয়া উহাকে কার্‌বন এবং পরে 'কার্‌বন-ডাইঅক্‌সাইড'-গ্যাস-এ পরিণত করিতে হয়। বিশেষ ধরণের বিভিন্ন কাঁচপাত্রে রক্ষিত নানাবিধ রাসায়নিক দ্রবণের সাহায্যে উক্ত গ্যাস শোধন করা প্রয়োজন। সর্বশেষে গ্যাস ঘনীভূত করিয়া বোতলে সঞ্চিত রাখিতে হয়। 'গাইগার- কাউন্‌ট্যার' নামক যন্ত্রের সাহায্যে রশ্মি-বিচ্ছুরণ নির্ণয়পূর্বক উহার মান লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তেজস্ক্রিয় অঙ্গারকের পরিমাণ এবং ঘনীভূত কার্‌বন-ডাইঅক্‌সাইড-এর নমুনা হইতে নির্গত মৌলিক কণিকার অনুপাতও নির্ণয় করা প্রয়োজন। উক্ত প্রণালী অনুসারে তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক-এর কণিকার যথাযথ গণনা করিয়া পরীক্ষিত নমুনার কাল নির্ধারণ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অঙ্গারে পরিণত জৈব পদার্থসমূহই কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণকার্যের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত নিদর্শন।

এতদ্‌ভিন্ন কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থের পরিমাণ নিদর্শনের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ ১০ গ্রাম ওজনের অঙ্গার প্রয়োজন। উদ্ভিদ্‌কুল (ঝুরি, তৃণ, খাগড়া, মাদুর প্রভৃতি) এবং প্রাণিকুল (অস্থি, শিঙ, নখ ইত্যাদি) সংক্রান্ত নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের জন্য যথাক্রমে ২০০ ও ৩০০ গ্রাম পদার্থ দরকার। অধিকন্তু গজদন্ত এবং অঙ্গারীভূত অস্থি এবং সেলের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের নিমিত্ত ২০০ ও ৭০০ গ্রাম ওজনের পদার্থ অপরিহার্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অঙ্গার ব্যতীত অস্থি নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ তারিখ-নির্ধারণকার্য সর্বক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয় না। মোভি-য়াস্‌ বলিয়াছেন যে, নূতন অবস্থায় অঙ্গারীভূত হইলেই অস্থির কার্‌বন-১৪ তারিখ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য

সম্পূর্ণরূপে অগ্নিদগ্ধ বা ভস্মীভূত সর্বপ্রকার অস্থির গুরুত্ব অবর্তমান। কারণ, অস্থির অঙ্গারক দূরীভূত হয়। অতএব প্রাগৈতিহাসিক যুগের সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত অস্থি-নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ বিশেষ ফলবতী হয় না। দহন (ক্যাম্‌বাস্‌ন্) কর্তৃক ভস্মীভূত অস্থিতে অঙ্গারকের স্থিতি অনিশ্চায়ক এবং উহার রন্ধ্রীয় (প্যরাস্) সত্ত্বের উপর মৃত্তিকার প্রতিক্রিয়ার ফলে জৈব পদার্থের অবশেষ-এর স্বল্পতার জন্য উহা কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের অনুপযোগী। সুতরাং কেবলমাত্র অল্প মাত্রায় অঙ্গারীভূত অস্থিই কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের নিমিত্ত যথার্থ উপযোগী নিদর্শন।

সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, সকল প্রাণিকুলের মধ্যেই অঙ্গারক বর্তমান। সর্বপ্রকার জৈব পদার্থই কার্‌বন-ডাইঅক্‌সাইড্ রূপে আদান-প্রদান করে। বিবিধ জৈব পদার্থে কার্‌বন-১৪-এর বিদ্য-মানতা গত ৫০,০০০ বৎসর যাবত ধ্রুবক (কন্‌স্‌ট্যাণ্ট)। বিনাশ-প্রাপ্তির পরে এই প্রকার আদান-প্রদান বন্ধ হয় এবং 'কার্‌বন-যৌগিক' অবক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। এই অবক্ষয়ের মাত্রাও বিধিবদ্ধ। ব্যাক্-টেরিয়ার্ সাহায্যে কার্‌বন-যৌগিক পুনরায় কার্‌বন-ডাইঅক্‌সাইড-এ পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া জৈব পদার্থের কার্‌বন-১৪-এর অবক্ষয়ের মান নির্ধারণ পূর্বক পরীক্ষিত নিদর্শনের তারিখ নির্ণয় করা সম্ভবপর। সুতরাং উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বিনাশ-প্রাপ্ত জৈব পদার্থের অন্তর্নিহিত অঙ্গারক-এর মান বিশ্লেষণ করিয়া উহার কাল নির্ধারণ করা যায়। এক সহস্র হইতে দ্বাদশ সহস্রের অন্তর্ভুক্ত পরীক্ষিত নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ তারিখ-নির্ধারণ অধিক ফলপ্রদ। কিন্তু কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের ফলে কেবলমাত্র নৈকট্য তারিখ নিরূপণ করা সম্ভবপর। সর্বক্ষেত্রেই কার্‌বন-১৪ তারিখ কতিপয় বৎসর যোগ ও বিয়োগ সম্বলিত হইবে। সুতরাং যোগ ও বিয়োগ-চিহ্ন সংযোগে নির্দিষ্ট বৎসর লিখিতে হয় যেমন, ১৮৪৮ খ্রীঃপূঃ ± ২৭৫ ;

অর্থাৎ ১৮৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২৭৫ বৎসর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী (২১২৩ খ্রী: পূ: এবং ১৫৭৩ খ্রী: পূ:) হইবে।

কালনিরূপণকার্যে তেজস্ক্রিয়-অঙ্গারক-বিশ্লেষণের কতিপয় বিতর্ক-মূলক তথ্য উল্লেখনীয়: (ক) জীবন্ত জৈব পদার্থের আপেক্ষিক সক্রিয়তা বহুদিন দৃঢ়বদ্ধ থাকে; (খ) বিশ্লেষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জৈব পদার্থসমূহের আদি-সংযুক্তি (কম্পোজিশন্) রক্ষিত থাকে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত কারবন-আধারের সহিত উহার বিনিময় বন্ধ থাকে এবং (গ) তেজস্ক্রিয় অঙ্গারকের অর্ধ-জীবন যথাযথ নির্ধারিত হয় নাই। এই সকল তথ্য অদ্যাপি অনুশীলন-সাপেক্ষ। কিন্তু ক্রম-বর্ধমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে উক্ত তথ্যসমূহ সম্পর্কিত সংশয় বহুলাংশে দূরীভূত হইবার পথ সুগম হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত রেডিও-কারবন-কালনিরূপণের পদ্ধতিও ভ্রমমুক্ত নহে। রেডিও-কারবন বিশ্লেষণের কতিপয় বিভ্রান্তিকর এবং স্বাভাবিক সাধারণ তথ্যের মধ্যে (ক) সূর্যের নভোরশ্মি (কজমিক্ রে) উৎপাদের পরিবর্তন-শীলতা, (খ) প্রত্নস্থলে বিবিধ সময়ে কারবন-১৪-এর প্রাপ্তি-সাধনের বিভিন্নতা, (গ) উদ্ভিদ্‌কুলের বিভিন্ন পরিমাণে কারবন-১৪ দেহভুক্ত করিবার প্রবণতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দক্ষতাপূর্ণ বিশ্লেষণ দ্বারা কারবন-১৪ তারিখ নিরূপণ করিলে স্বাভাবিক ভ্রম সংশোধন করা অসম্ভব নহে। উপরন্তু কারবন-১৪ বিশ্লেষণের গণন-পদ্ধতিও আয়াসসাধ্য। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে উক্ত পদ্ধতির বিশ্লেষণ-কার্যক্রমও বহুলাংশে সহজতর এবং দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। এমন কি গণনা করিবার পদ্ধতিরও অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। অধুনা ১০%-এর অধিক ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক। কারবন-১৪ বিশ্লেষণকৃত তারিখের ভ্রমের মাত্রা হ্রাস করিবার জন্য নির্দিষ্ট তারিখসম্বলিত নিদর্শনের বিশ্লেষণ সর্বপ্রথম কর্তব্য। উক্ত তারিখের পরিপ্রেক্ষিতেই কাল-অনির্দিষ্ট নিদর্শনের কারবন-১৪ তারিখ নির্ধারণ করা সঙ্গত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, লিব্বী এই নীতি অনুসরণ করিয়া মিশরের

বিভিন্ন যুগের নিদর্শন পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি যথাক্রমে মিশরের প্রথম রাজবংশীয় সমাধির নিদর্শন, পরবর্তী যুগের নিদর্শন এবং ঐতিহাসিক যুগের টলেমির শবাধারের বস্তুর বিশ্লেষণ করিয়া কার্‌বন-১৪ তারিখের ভ্রমের মাত্রা বহুলাংশে হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কার্‌বন-১৪ কাল নিরূপণের কার্যক্রমও আয়াসসাধ্য। কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ দ্বারা তারিখ-নির্ধারণও ত্রুটিবর্জিত নহে। (ক) কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ অতীব ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। (খ) কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণকার্যে প্রত্নবস্তুর ক্ষতি হওয়াও স্বাভাবিক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্লেষণের জন্য অধিক পরিমাণ নিদর্শন প্রয়োজন। সুতরাং কেবল-মাত্র যে উপাদান অনাবশ্যক অথবা অল্পপরিমাণে বিনষ্ট হইলেও উহার কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা অবর্তমান, উক্ত নিদর্শনেরই কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ করা যায়। (গ) কার্‌বন-১৪ কালনিরূপণকার্য প্রাচীনতম নিদর্শনের বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দুই বা তিন সহস্র বৎসরের প্রাচীন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ বিশেষ ফলপ্রদ নহে। কারণ, কার্‌বন-১৪ কালনিরূপণে ১০০ বৎসর যোগ-বিয়োগের ন্যূন তারিখের সম্ভাব্যতার সীমা হ্রাস করা অসম্ভব। ঐতিহাসিক যুগে উক্ত সীমা-রেখার গুরুত্ব অধিক। কারণ, ইতিহাস-প্রসূত অপর সুদৃঢ় উপাদান দ্বারা প্রত্ননিদর্শনের তারিখ সুনির্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং ঐতিহাসিক যুগের কার্‌বন-১৪ কালনিরূপণ স্বতন্ত্র নহে। অধিকন্তু উক্ত কালনিরূপণ প্রত্নতত্ত্বীয় কালনির্ধারণের সহিত সংযুক্ত। ঐতিহাসিক যুগের কার্‌বন-১৪ কালনিরূপণ প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানজাত কালের সমর্থক। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বীয় এবং কার্‌বন-১৪ কালনিরূপণের অসঙ্গতিও বিদ্যমান। উক্ত ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বীয় কালনিরূপণের উপরই অধিক নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত। (ঘ) একই লেভ্‌ল্ বা মৃৎস্তর হইতে উত্তোলিত নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ তারিখের বিভিন্নতাও বিরল নহে। এমন কি একাধিক

বীক্ষণাগারে একই প্রত্ননিদর্শনের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের ফলে পার্থক্য-মূলক তারিখ-নির্ধারণও পরিবেশিত হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে বিবিধ তারিখের গড় অনুযায়ী তারিখ নির্দিষ্ট করিতে হয়। অতএব সর্বক্ষেত্রে কার্‌বন-১৪ নিরূপিত তারিখ নিশ্চিত নহে। (ঙ) পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কার্‌বন-১৪ কালনির্ণয়ের পদ্ধতি প্রাগৈতিহাসিক ও ভূতত্ত্বীয় নিদর্শনের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ কালনিরূপণের স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, উহার সহিত ভূতত্ত্বীয় স্তরবিন্যাসপ্রসূত কাল-নির্ধারণের সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ভূতত্ত্বীয় স্তরবিন্যাসের কালগত ব্যবধান অত্যধিক। উপরন্তু তুলনামূলক বিচারে ভূতত্ত্বীয় কালনিরূপণ অপেক্ষা কার্‌বন-১৪ তারিখ-নির্ণয় অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক। (চ) কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের জন্য অসংক্রামিত নিদর্শনের প্রয়োজন অত্যধিক। সংক্রামিত নিদর্শনের বিশ্লেষণকৃত তারিখ বিভ্রান্তিকর হওয়াই স্বাভাবিক। অতএব উৎখননকালে কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের উপযোগী নিদর্শন অতীব সতর্কতার সহিত উত্তোলন করা একান্ত প্রয়োজন। (ছ) কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের উপযোগী নিদর্শনের যথাযথ লিপিকরণও অত্যাবশ্যক। অন্যথায় কালনির্দেশ ভ্রমাত্মক হওয়া স্বাভাবিক। (জ) কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনসাধক উপাদানের প্রাপ্তিও সহজসাধ্য নহে। সর্বপ্রকার জৈব নিদর্শনেরই কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ ফলপ্রদ হয় না। কেবলমাত্র মহাজাগতিক বিচ্ছুরণকৃত তেজস্ক্রিয়সম্পন্ন জৈব পদার্থের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ ফলপ্রসূ হয়। অতএব কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ-কার্যের পরিধি অধিক সীমিত।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে, কারবন-১৪ তারিখ পরীক্ষিত নিদর্শনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, বিন্যস্ত অঙ্গার-নিদর্শন মৃৎস্তরের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী হওয়া স্বাভাবিক। পরবর্তী হইলে নিদর্শনের যথাবস্থান অস্বাভাবিক হইবে। উক্ত নিদর্শন মৃৎ-স্তরের পূর্ববর্তী হইবার সম্ভাবনাও অধিক। যে বৃক্ষ হইতে পরীক্ষিত

নিদর্শন উদ্গত এবং পরে অঙ্গারীভূত হইয়াছে তাহা সম্ভবতঃ বহু পূর্বে কর্তিত বা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণ বশতঃ পরীক্ষিত নিদর্শনের তারিখ মৃৎস্তর-বিন্যাসের পূর্ববর্তী হইবে। উক্ত প্রকার ক্রটি বৃক্ষকাণ্ডে বিন্যস্ত বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণের (ট্রী-রিং-অ্যান্যাল্যাসিস্) ক্রটির অনুরূপ। বেড়-বিশ্লেষণ পদ্ধতির পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে এই প্রকার ক্রটি আলোচিত হইয়াছে।

উল্লিখিত নানাবিধ ক্রটির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষ কালনির্দেশবর্জিত স্তরবিন্যাসের ও প্রত্নবস্তুর কাল নিরূপণ-কার্যে কারবন-১৪ তারিখ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রামাণিক সাক্ষ্য। প্রাচীনতা বিষয়ে সন্ধানলাভের জন্য কারবন-১৪ বিশ্লেষণজাত প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণ-প্রণালীর উদ্ভাবন প্রত্নতত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কার্‌বন-১৪ তারিখ-নির্ধারণ প্রত্নবিজ্ঞানকে বিবিধ প্রকারে প্রভাবিত করিয়াছে। প্রথমতঃ, কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ মানব-সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব খ্রীষ্টের জন্মের ৩০০০ বৎসরের পূর্বেও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। এমন কি, প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির কাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর হইয়াছে। অতীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাল ১০০০০ বৎসর ব্যবধানেও নির্ধারিত হইত। বর্তমানে কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের আনুকূল্যে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তুর নির্দিষ্ট তারিখ নির্ণয় করা সম্ভবপর। কেবল মাত্র ১০০-২০০ বৎসরের পূর্ব-পশ্চাৎ পার্থক্য বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্য-সংগ্রাহক-সংস্কৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া খাদ্য-উৎপাদক-সংস্কৃতি পর্যন্ত বিবিধ পর্ব ও উপ-পর্বের বা পর্যায়ের তারিখ কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ দ্বারা সুনির্দিষ্ট হইয়াছে। এমন কি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আবিষ্কৃত 'নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের সাহায্যে কালনিরূপণ-সংক্রান্ত পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করাও সম্ভবপর। তৃতীয়তঃ, পূর্বে ইতিহাসের সন্দেহজনক তারিখ এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত বিবিধ কালের অনুক্রমিক সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোন সুনিয়ন্ত্রিত কৌশল বা প্রণালীর

অবিদ্যমানতাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ নিশ্চিত তারিখ নির্ণয় করিয়া ইতিহাসের কালনির্ঘণ্ট-এর ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অতীতে প্রত্নবস্তু বা সংস্কৃতি-পর্বের কাল আনুমাণিকভাবেই লিখিত হইত। চাইল্ড বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপের প্রাগৈতিহাসিক পর্বের তারিখ খ্রীষ্টের জন্মের ১৪০০ বৎসরের অধিক পূর্বে আরোপ করা সম্ভব নহে। কার্‌বন-১৪ তারিখ দ্বারা এই প্রকার কল্পনাপ্রসূত অভিমতের ভ্রম সংশোধন করা হইয়াছে। ড্যানিয়াল্ (১৯৬৭) যথার্থই বলিয়াছেন যে, যদি মানবকুলের প্রাচীনত্বের এবং মনুষ্যনির্মিত কারুশিল্প-কৌশলভিত্তিক ত্রয়ী যুগের উদ্ভাবনই প্রত্নবিজ্ঞানের প্রকৃত স্রষ্টা বলিয়া ধার্য করা হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, লিব্বী কর্তৃক বৈপ্লবিক পরিবর্তনমূলক কার্‌বন-১৪ তারিখ নির্ধারণের পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রত্নতত্ত্বকে ইতিহাস-বিজ্ঞানের পর্যায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের ফলে অধুনা নিশ্চিত তারিখের উপর ভিত্তি করিয়া মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা সম্ভব হইয়াছে। উপরন্তু বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের কালনির্ঘণ্টের কাঠামোও কার্‌বন-১৪ তারিখ দ্বারা বহুলাংশে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। বর্তমানে উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত অধিকাংশ নিদর্শন ও স্তরায়ণ কার্‌বন-১৪ তারিখসম্বলিত। সুতরাং অধুনা কার্‌বন-১৪ কালনিরূপণ উৎখনন-তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তিরূপে সর্বতোভাবে স্বীকৃত।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্নাংশে কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের জন্য পঞ্চাশৎ-এর অধিক বীক্ষণাগার বিদ্যমান। উহাদের মধ্যে পেনসিল্‌ভ্যানিয়ার এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বীক্ষণাগার প্রখ্যাত। ভারতবর্ষে বোম্বাই মহানগরীতে টাটা ইনষ্টিটিউট অভ্‌ ফাণ্ডামেণ্ট্যাল্ রিসার্চ-এ ভারত সরকারের সহায়তায় ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের জন্য একটি আধুনিক বীক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্‌বন-১৪ তারিখ নির্ণয়ের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে

আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূহ বর্তমানে উক্ত বীক্ষণাগারেই প্রেরিত হয়। এই বীক্ষণাগার সংস্থাপনের পূর্ব-পর্যন্ত ভারতবর্ষের নিদর্শন বিশ্লেষণের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বীক্ষণাগারে প্রেরিত হইত।

পৃথিবীর বিভিন্ন বীক্ষণাগারে কার্বন-১৪ বিশ্লেষণের ফলে মানবকুলের আবির্ভাবের ও সংস্কৃতির যথার্থ তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্রই কার্বন-১৪ বিশ্লেষণকৃত তারিখ ব্যবহৃত হয়। আমেরিকাতেই সর্বপ্রথম কার্বন-১৪ বিশ্লেষণের যথার্থতা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ফলে আমেরিকাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রত্ননিদর্শন পরীক্ষিত হইয়াছে। ফলজমের সভ্যতার তারিখ বহু দিন যাবৎ বিতর্কমূলক ছিল। কিন্তু কার্বন-১৪ তারিখ উক্ত বিতর্কের অবসান ঘটাইয়াছে। টেক্সাস্ হইতে আবিষ্কৃত অগ্নিদগ্ধ বাইসনের অস্থির (বন্য ষাঁড় বা মহিষ) কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত সভ্যতার কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০-৭০০০-তে ধার্য করা হইয়াছে। অরিগণ হইতে আবিষ্কৃত রজ্জুনির্মিত চপ্পলের বিশ্লেষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত নিদর্শন ৯০০০ বৎসর পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

আফ্রিকা মহাদেশের প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের কার্বন-১৪ পরীক্ষা করিয়া বিবিধ তারিখ নির্ধারিত হইয়াছে। কার্বন-১৪ বিশ্লেষণের ফলে লাস্কাউক্সের গুহাচিত্রের তারিখ খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৬০০০-তে ধার্য করা হইয়াছে। রোডেসিয়াতে প্রাপ্ত অঙ্গারের বিশ্লেষণের দ্বারা প্রাগৈতিহাসিক নাচিকুকান্-এর শিল্প-নিদর্শন ৬০০০ বৎসর পূর্ববর্তী বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। অধিকন্তু কার্বন-১৪ বিশ্লেষণ করিয়া নেদারল্যাণ্ড হইতে আবিষ্কৃত এক দারুখণ্ডের তারিখ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮০০০-তে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সময়ে পৃথিবীতে মানবকুলের সত্তা সন্দেহজনক। উত্তর-আমেরিকা, ইরাক প্রভৃতি স্থান হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের কার্বন-১৪ তারিখ অনুসারে মানবকুলের বিদ্যমানতা খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০০-তে ও ৩২০০০-তে আরোপ করা যায়।

ইরাকের জার্‌মোতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ তারিখ অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদনের প্রাচীনতম তারিখ খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০০-তে ধার্য করা হইয়াছে। কিন্তু প্যালেষ্টাইনের নিদর্শন অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ হইতে ব্রেইড্‌উ্যড্‌ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হামুরাবীর রাজত্বকালের সৌধ-নিদর্শন ৩০৪৫ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল।

প্রখ্যাত ডেড্‌-সি-স্ক্রোল-এরও কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। উক্ত বিশ্লেষণ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ডেড্‌-সি-স্ক্রোল্‌ যীশু খ্রীষ্টের সমকালভুক্ত। জাপানের প্রাগৈতিহাসিক ও আদি-ঐতিহাসিক সংস্কৃতির কালনিরূপণে কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণজাত তারিখের বহুল ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ করিয়া ট্যাস্‌মেনিয়ার সংস্কৃতির কালও নির্ণীত হইয়াছে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, ট্যাস্‌মেনিয়ার অধিবাসিগণ খ্রীষ্টপূর্ব ৬৫০০-তে ইন্দোনেশিয়া হইতে আগমন করিয়াছিল।

পৃথিবীর অন্যদেশের অনুরূপ ভারতবর্ষেরও প্রাগৈতিহাসিক আদি-ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক প্রত্ননিদর্শনের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের ফলে অনেক প্রত্নবস্তুর ও সংস্কৃতি-পর্বের অবিদিত কাল নির্ধারিত হইয়াছে। কার্‌বন-১৪ তারিখ নিরূপণের সাহায্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের কালনির্ধারণও বহুলাংশে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট প্রারম্ভিক তারিখ খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬-তে নির্ধারিত। কিন্তু উৎখনন দ্বারা সিন্ধুসভ্যতার আবিষ্কারের জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রারম্ভিক কাল খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ সহস্রকে ধার্য করা হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বীয় বিশ্লেষণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহেঞ্জোদারো সভ্যতার স্থিতিকাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রক হইতে দ্বিতীয় সহস্রকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু মহেঞ্জোদারো সভ্যতার উক্ত কালনির্ণয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। উপরন্তু দ্বিতীয় সহস্রকের মধ্যভাগ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ পর্যন্ত

কোন সুনির্ধারিত কালনির্ঘণ্ট রূপায়ণ করাও অদ্যাপি সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি বিভিন্ন প্রত্নস্থলে খননকার্যের ফলে এই নিরূপিত তারিখদ্বয়ের অন্তর্বর্তী কালভুক্ত সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সংস্কৃতি বিভিন্ন কৌলাল-শ্রেণী-নির্দেশক যেমন, চিত্রিত-ধূসর-কৌলাল-সংস্কৃতি, উত্তর-ভারতীয়-চিক্কণ-কৃষ্ণ-কৌলাল-সংস্কৃতি, কৃষ্ণ- এবং -লোহিত-কৌলাল-সংস্কৃতি প্রভৃতি। এই সকল সংস্কৃতির পৌর্বাপর্য কাঠামোর কালনির্ণয় দৃঢ়বদ্ধ নহে। কিন্তু বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত উপাদানের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণ করিয়া হরপ্পা-সংস্কৃতির এবং পরবর্তী সংস্কৃতির কালনিরূপণের প্রচেষ্টা বহুলাংশে ফলপ্রদ হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ও পাকিস্তানের একাধিক প্রত্নস্থল হইতে প্রাক্-হরপ্পা-সংস্কৃতির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে—গুল মুহম্মদ, কোট ডিজি, অ্যামরী, কালিবন্‌গন্ প্রভৃতি। এই সকল প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণও করা হইয়াছে। গুল মুহম্মদের গ্রামীণ সংস্কৃতির কার্‌বন-১৪ তারিখ: ৩৬৯০ ± ৮৫ খ্রীঃ পূঃ এবং ৩৫১০ ± ৫১৫ খ্রীঃ পূঃ। এই প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির তৃতীয় পর্বে তাম্র-নিদর্শন এবং চিত্রিত কৌলালের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কোন অঙ্গার-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। তৎসত্ত্বেও পৌর্বাপর্য বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত পর্বের তারিখ সাধারণভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০-তে নির্ধারণ করা হইয়াছে। কোট ডিজির প্রাচীনতম এবং সর্বশেষ লেভ্‌লের কার্‌বন-১৪ তারিখ যথাক্রমে: ২৬০৫ ± ১৪৫ খ্রীঃ পূঃ এবং ২০৯০ ± ১৪০ খ্রীঃপূঃ। কোট ডিজির প্রাক্-হরপ্পা-সংস্কৃতিকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৭০০-তে আরোপ করা-হইয়াছে। কালিবন্‌গন-এর হরপ্পা-সংস্কৃতির কারবন-১৪ তারিখ: ২০৯৫ ± ১১৫ এবং ২০৪৫ ± ৭৫। কালিবন্‌গন্-এর বসতির শেষ পর্যায় খ্রীষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বে আরোপিত হইয়াছে। লোথাল-প্রত্নস্থলে খ্রীষ্টপূর্ব ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে হরপ্পা-সংস্কৃতির পরিবর্তন উল্লেখনীয় (পর্যায় থ্রি-বি: ২৫০০ ± ১১৫; পর্যায় ফাইভ্-এ: ১৮১০ ± ১৪০ খ্রীঃ পূঃ)।

মহেঞ্জোদারো হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের কারবন-১৪ তারিখ : ১৭৬০±১১৫ খ্রীঃ পূঃ। সম্প্রতি মহেঞ্জোদারোতে উৎখননের ফলে অনেক অঙ্গারের নিদর্শন উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শনের কারবন-১৪ বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করাও হইয়াছে। সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মহেঞ্জোদারোতে খ্রীষ্টের জন্মের ২৪০০ বৎসর পূর্বে বসতি সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ (১৭৫০ খ্রীঃ পূঃ) পর্যন্ত উহা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সাধারণ-ভাবে বলা যায় যে, মহেঞ্জোদারো-সংস্কৃতি খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এই কারবন-১৪ কাল-নিরূপণ প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদান দ্বারাও বহুলাংশে স্বীকৃত।

ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক যুগভুক্ত কতিপয় নিদর্শনের কারবন-১৪ বিশ্লেষণ করিয়াও তারিখ নিরূপিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে উৎনুর (আন্ধ্র প্রদেশ) হইতে আবিষ্কৃত অঙ্গার বিশ্লেষণ পূর্বক সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, উক্ত স্থানে নবাশ্মীয় সংস্কৃতির তারিখ খ্রীষ্টপূর্ব ২২৯৫±১৫৫-তে ধার্য করা যায়। কিন্তু বুরজাহাইম (কাশ্মীর) হইতে প্রাপ্ত অঙ্গার-এর বিশ্লেষণের ফলে নবাশ্মীয় সংস্কৃতিব কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৯০০-তে নির্ধারিত হইয়াছে। অধিকন্তু মধ্যভারতের নাবদাতলী এবং এরাণ্ নামক প্রত্নস্থলদ্বয়ের তাম্রাশ্মীয় (ক্যালকোলিথিক) সংস্কৃতির তারিখ কারবন-১৪ বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে—এরাণ : খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থাংশ ; নাবদাতলী : খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভকাল হইতে দুইশত বৎসর বর্তমান ছিল। আহারের বানস্ সংস্কৃতির (আহার—গুজরাট ও রাজস্থান) পরিসমাপ্তি খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ অঞ্চলের (নাসিক, নেভাসা প্রভৃতি) তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির কাল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে আরোপ করা হইয়াছে।

উপরি-বর্ণিত কার্বন্-১৪ তারিখ হইতে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির কাল সাধারণভাবে নির্ণীত হইয়াছে। এই নির্ধারণকার্যের ফলে হরপ্পা-উত্তর

সংস্কৃতির কালনির্ণয় করাও সম্ভব হইয়াছে। উক্ত কালনিরূপণ দ্বারা উল্লিখিত অন্তর্বর্তী কালের সংস্কৃতির অজ্ঞাত তারিখ নির্ধারণ করা বর্তমান ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ কার্য। কিন্তু তাম্রাশ্মীয় যুগ-উত্তর সংস্কৃতির কার্‌বন-১৪ তারিখ ও প্রত্নতত্ত্বীয় তারিখের মধ্যে ঈষৎ অসঙ্গতি বিদ্যমান। বর্তমানে তাম্রাশ্মীয় যুগের পরবর্তী সংস্কৃতির কারবন-১৪ তারিখ-নিরূপণ সুনির্দিষ্ট নহে। প্রসঙ্গতঃ হস্তিনাপুর হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের কারবন-১৪ বিশ্লেষণকৃত তারিখের সহিত প্রত্নতত্ত্বীয় তারিখের অসঙ্গতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ভারতবর্ষে তাম্রাশ্মীয় যুগের পরবর্তী সংস্কৃতির কার্‌বন-১৪ তারিখ যথাযথ নির্ণয় করা আবশ্যক। এই নির্ণীত তারিখের সাহায্যেই আদি-ঐতিহাসিক যুগ হইতে ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির কালনির্ঘণ্টের কাঠামো দৃঢ়ভাবে সংস্থাপন করা সম্ভব হইবে।

ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের কালনিরূপণ-কার্য তারিখসম্বলিত উপাদানভিত্তিক। কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনেরও কারবন-১৪ তারিখ নির্ণয় করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ রাজবাড়িডাঙা প্রত্নস্থলের অঙ্গার-নিদর্শনের কার্‌বন-১৪ তারিখ-নির্ধারণ উল্লেখযোগ্য। রাজবাড়িডাঙায় একটি বৃহৎ অগ্নিদগ্ধ শস্যভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত ভাণ্ডারের অগ্নিদগ্ধ শস্যের কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণকৃত তারিখ ১২০০ ± ৮০-তে নির্ধারিত হইয়াছে। টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্ট্যাল্ রিসার্চের বীক্ষণাগারে উক্ত প্রত্নস্থলের বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তর হইতে উদ্ধৃত অঙ্গার-নিদর্শন বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ত্রিস্তরের কার্‌বন-১৪ নির্ধারিত তারিখ যথাক্রমে : ১৭১০ ± ৯৫, ১৫৬৫ ± ৯৫ এবং ১৫৪০ ± ৯৫-তে (অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ ২৪০, ৩৮৫ এবং ৪১০) নির্ণীত হইয়াছে। উক্ত কার্‌বন-১৪ তারিখ প্রত্নতত্ত্বীয় লেখসম্বলিত উপাদান দ্বারা স্বীকৃত। সুতরাং কার্‌বন-১৪ তারিখ দ্বারা রাজবাড়িডাঙার সংস্কৃতি-পর্বের কালনির্ঘণ্ট নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে।

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে কার্‌বন-১৪ তারিখও নির্ভরযোগ্য নহে। অধুনা কার্‌বন-১৪ তারিখ নিরূপণের প্রামাণিকতার উপরও সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। কার্‌বন-১৪ বিশ্লেষণের উপরই প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনের কালনিরূপণ সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। কারণ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালনিরূপণের নিমিত্ত অন্য পদ্ধতি অপেক্ষা অঙ্গারকের তেজস্ক্রিয়-এর বিশ্লেষণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কিন্তু আদি-ঐতিহাসিক বা ঐতিহাসিক যুগের কার্‌বন-১৪ তারিখের সহিত প্রত্নতত্ত্বীয় তারিখের সঙ্গতির বিদ্যমানতা একান্ত প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক প্রত্নস্থলে কাল-অনির্দিষ্ট প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানের অবর্তমানে কার্‌বন-১৪ তারিখের নির্ভরযোগ্যতা ও প্রামাণিকতা অনস্বীকার্য।

রেডিও-কার্‌বন-বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ধারিত তারিখ ব্যতীত অন্যবিধ বিজ্ঞান-পদ্ধতির উদ্ভাবনও উল্লেখনীয়। এই সকল বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণও প্রত্ননিদর্শনের কাল-নিরূপণকার্যের সহায়ক। অতএব প্রত্নবস্তুর কাল নিরূপণের জন্য অন্যান্য বিজ্ঞান-পদ্ধতির পর্যালোচনাও প্রয়োজন।

(খ) তাপ-প্রতিপ্রভতা (তাপদ্যুতি)-বিশ্লেষণ (থ্যার্মো লুমিনেসেন্‌স্): তেজস্ক্রিয়-বিশ্লেষণই তাপদ্যুতি-অনুশীলন-পদ্ধতির ভিত্তি। এই পদ্ধতির অনুশীলন দ্বারা অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকার তেজস্ক্রিয় কণার অবক্ষয়ের পরিমাপ নির্ণয় করা সম্ভবপর। যথাযোগ্য উত্তপ্ত করিলে সকল পদার্থ হইতেই আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ হয়।

প্রত্নতত্ত্বে কৌলাল-নিদর্শন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৌলালের কালনিরূপণ করা অধিক প্রয়োজন। সর্বপ্রকার কৌলালে ইউরিয়াম্ ও থোরিয়াম্ (মৌলিক ধাতু) পদার্থ বিদ্যমান। এই পদার্থ হইতে নির্ধারিত হারে 'এ' কণিকা নিঃসৃত হয়। উক্ত 'এ' কণিকা স্থূলাণুতে (আইঅনাইজ) পরিণত হয় এবং ফলে বিদ্যুত-পরমাণুর (ইলেক্‌ট্রন্) উদ্ভব হয়। তাপকৃত কৌলাল হইতে ইলেক্‌ট্রন্ নির্গত হয়। এই প্রকার কণিকা নিঃসরণের

এবং বিদ্যুৎ-পরমাণুর উদ্ভবের এবং নির্গমনের বিশ্লেষণ করিয়া কৌলালের কাল নির্ণয় করা যায়। উক্ত পদ্ধতি দ্বারা কৌলালের কাল নিরূপণের জন্য প্রয়োজন: (ক) তাপকৃত কৌলাল হইতে নিঃসৃত আলোক-কণার পরিমাণ নিরূপণ, (খ) কৌলালের 'এ' ক্রিয়ার তীব্রতার পরিমাপ নির্ণয় এবং (গ) কৃত্রিম কিরণ-বর্ষণের পরিমাণ গ্রহণ পূর্বক 'এ' রশ্মিদ্বারা বিপর্যস্ত কৌলালের ধারণ-ক্ষমতা নির্ধারণ।

উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ এবং কালনির্দিষ্ট মৃৎপাত্রের অনুশীলনজাত তথ্য হইতে পরীক্ষিত কৌলালের কাল নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতি দ্বারা কৌলালের সুনিশ্চিত তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। সাধারণতঃ উক্ত তারিখ নির্ণয়ে ±১০০ বৎসরের পূর্ব-পশ্চাৎ ব্যবধান বর্তমান।

তাপদ্যুতি-বিশ্লেষণ দ্বারা ১০০০০০ বৎসর পূর্বের নিদর্শনের তারিখও নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। অ্যারিজোনার 'লাভা-রক্' (আগ্নেয়গিরি হইতে নিঃসৃত গলিত ধাতবপদার্থবিশেষ) বিশ্লেষণ করিয়া ১৫০০০ বৎসরের প্রাচীনতা নির্ধারিত হইয়াছে। খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর গ্রীসদেশজাত কৌলালের বিশ্লেষণ হইতেও যথাযথ কাল নিরূপিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রাগৈতিহাসিক যুগের অঙ্গার-বর্জিত সংস্কৃতির কালনিরূপণের যথার্থ সহায়ক। এই পদ্ধতি দ্বারা বিভিন্ন আকার ও প্রকার কৌলালের অনুক্রমিক কাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর। প্রত্নবিজ্ঞানে সাধারণতঃ কারুশিল্পের তুলনামূলক অধ্যয়ন করিয়াই কাল নির্ধারণ করা হয়। তাপদ্যুতি-বিশ্লেষণ দ্বারা উক্ত প্রত্নতত্ত্বীয় কাল নির্ধারণের সারতা ও অসারতা প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতবর্ষে তাপদ্যুতি-বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলনের প্রয়োজন অধিক। কারণ, ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রত্নস্থল হইতেই অগণিত কৌলাল-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বহুক্ষেত্রে এই সকল নিদর্শনের কাল অজ্ঞাত। তাপদ্যুতি-বিশ্লেষণ দ্বারা

ঐ সকল নিদর্শনের অবিদিত তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রত্নস্থলের নিদর্শনের তাপদ্যুতি-বিশ্লেষণ বিশেষ ফলপ্রদ নহে। কারণ, এই বিজ্ঞান-পদ্ধতিজাত কালনির্ণয়ে ১০০ বৎসরের পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। কেবল প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৌলাল-নিদর্শনের কাল-নিরূপণেই তাপদ্যুতি-বিশ্লেষণ বিশেষ ফলদায়ক।

(গ) চুম্বক-মেরু ও চুম্বকত্ব বিশ্লেষণ: সম্প্রতি অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকার কাল নিরূপণের জন্য একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের (কার্‌বন-১৪) প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের বিশ্লেষণই এই পদ্ধতির ভিত্তি। জৈব পদার্থ কার্‌বন-১২ ধারণ করে। কিন্তু কার্‌বন-১৪-এর স্থিতি অত্যল্প। আইসো-টোপের অবক্ষয়ের হার বিদিত। সুতরাং অবশিষ্ট আইসোটোপের পরিমাণ নির্ণয় পূর্বক জৈব বস্তুর কাল নির্ধারণ করা সম্ভব। সম্প্রতি ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডুবয় একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছেন। ডুবয় কর্তৃক প্রবর্তিত পদ্ধতির বিশ্লেষণকার্যের জন্য অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকানির্মিত নিদর্শন যেমন, চুল্লী, ইষ্টক-দেওয়াল, কৌলাল ইত্যাদি প্রধানতম উপকরণরূপে পরিগণিত।

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র (স্থিতিশীল চুম্বকের চতুষ্পার্শ্বস্থ চৌম্বকশক্তির ক্ষেত্র) নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবর্তিত ও পুনরাবৃত্ত হয়। অধ্যাপক ডুবয়-এর মতে চুম্বক-মেরু (ম্যাগনেটিক্ পোল্) গত ৮০০ বৎসরে স্বস্থান হইতে ২৫° ডিগ্রি পরিবর্তিত হইয়াছে। মৃন্ময় বস্তু চুম্বকত্ব ধারণ করে। মৃত্তিকানির্মিত বস্তু অগ্নিদগ্ধ হইবার সময়ে সুমেরুর (নর্থ পোল) অবস্থান এবং উহার বর্তমান স্থিতি অনুশীলন করিয়া ১০-২০ বৎসরের ব্যবধানে উক্ত বস্তুর কাল নির্ধারণ করা সম্ভবপর। এই পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের ফলে প্রত্নতত্ত্বীয় স্তরবিন্যাসের ও সংস্কৃতি-পর্বের কাল-নির্ধারণ সুদৃঢ় হইবে।

(ঘ) অব্‌সিডিয়ান্ (আগ্নেয়গিরি-উৎপন্ন কাঁচসদৃশ প্রস্তরবিশেষ) তারিখ-অনুশীলন: আগ্নেয়গিরি হইতে উৎপন্ন কাঁচসদৃশ প্রস্তর

প্রাগৈতিহাসিক যুগে হাতিয়ার নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইত। প্রস্তরের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া অব্‌সিডিয়ান্‌-নির্মিত শিল্প-নিদর্শনের তারিখ নির্ধারণ করা যায়। অব্‌সিডিয়ান্‌ দ্বারা নির্মিত হাতিয়ারের পৃষ্ঠে জলশোষণের ফলে পরিমাণ-গ্রহণযোগ্য জলযোজিত স্তর সাধারণ দৃষ্টিতে অদৃশ্য। প্রস্তরের পৃষ্ঠ ছেদিত বা খণ্ডিত হইবার পর জলযোজন আরম্ভ হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত উক্ত জলশোষণের গতি ও মান নির্ধারিত হইয়াছে। নির্মাণকাল হইতেই প্রাচীন হাতিয়ারে জলযোজন অব্যাহত থাকে। এই জলযোজনের গভীরতার পরিমাণ নির্ণয় করিয়া কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর।

উক্ত কালনিরূপণের জন্য প্রয়োজন: (ক) জলযোজিত স্তরের গভীরতার পরিমাপ-গ্রহণের নিমিত্ত পদ্ধতি নির্ণয়, (খ) জলযোজিত স্তরের গভীরতার গতি ও ধারা নির্ধারণ, (গ) জলযোজনের ধারার উপর বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবের বিশ্লেষণ, (ঘ) ব্যবহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হাতিয়ারের বৈষম্যের অনুশীলন এবং (ঙ) হাতিয়ারের সহিত স্তরবিন্যাসের নির্ধারিত কালসম্বন্ধযুক্ত প্রত্ননিদর্শনের বিশ্লেষণ। এই সকল উপাদানের যথার্থতা নির্ধারণের উপরই অব্‌সিডিয়ান্‌-কালনিরূপণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

প্রত্নতত্ত্বে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োগ সাম্প্রতিক। কিন্তু অব্‌সিডিয়ানের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পদ্ধতি অদ্যাপি সুনির্দিষ্ট হয় নাই। উপরন্তু এই পদ্ধতি দ্বারা অব্‌সিডিয়ান্‌ ব্যতিরেকে অপর প্রস্তরনির্মিত বস্তুর কাল নিরূপণ করা সম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কালনিরূপণের জন্য অব্‌সিডিয়ান্‌ প্রস্তরের উপর জলযোজিত স্তরের গভীরতার পরিমাপ-গ্রহণ উক্ত বস্তুর নির্মাণকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু এই তারিখের সহিত বস্তুর ভূগর্ভে বিন্যাসকালের সঙ্গতি অবর্তমান। স্মিথ্‌ এই পদ্ধতি অনুশীলন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, অব্‌সিডিয়ান্‌ কালনিরূপণের সহিত প্রত্নতত্ত্বীয় কালনিরূপণের সামঞ্জস্য অবিদ্যমান। এই অসঙ্গতির

কারণও নির্ণীত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও অব্‌সিডিয়ান্‌-তারিখ নির্ণয়ের প্রণালীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অদ্যাপি সুদৃঢ় হয় নাই।

(ঙ) প্রত্নচুম্বক-বিশ্লেষণ (আরকাইও ম্যাগ্‌নিটিজিম্‌): প্রত্ন-নিদর্শনের অন্তঃস্থ চুম্বকত্ব বিশ্লেষণই এই বিজ্ঞান-পদ্ধতির প্রধান উৎস। থেল্লিয়ার (১৯২৮) আরকাইও ম্যাগনেটিজিম্‌ বিশ্লেষণের পদ্ধতি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। প্রস্তর ও মৃত্তিকায় লৌহ-অক্সাইড বর্তমান। প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাচীন পোয়ান, চুল্লী, দগ্ধ মৃত্তিকা প্রভৃতি চুম্বকায়ন্‌ (ম্যাগ্‌নিটিজাইসন্‌) সংরক্ষণ করে। চুম্বকায়নের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া পৃথিবীর দিক্‌-দর্শনের সহিত তুলনামূলক অধ্যয়ন করা যায়। চিত্র-লেখতে (গ্রাফ) উক্ত তথ্য নির্দেশ করিয়া এক শতাব্দীর চতুরাংশের ব্যবধানে প্রত্ননিদর্শনের কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর।

ভূতত্ত্বীয় প্যালিওম্যাগ্‌নিটিজম্‌ হইতে প্রত্নচুম্বকত্ব ভিন্ন। কিন্তু পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের অনুরূপ দিক্‌-প্রবাহের ও তীব্রতার পরিবর্তন অনুরূপভাবেই সাধিত হয়। এই পরিবর্তনের নিদর্শনও পাওয়া যায়। উক্ত নিদর্শন ভূগঠনের ফলে পালল-শিলাতে (সেডি-মেনটারী রক্‌) বিন্যস্ত হয়। প্রত্নচুম্বকত্ব বিশ্লেষণ দ্বারা উত্তাপ-উৎপাদক নিস্তেজ চুম্বকত্বের অনুশীলন করা যায়। এই পদ্ধতি 'উত্তপ্ত নিস্তেজ চুম্বকত্ব-বিশ্লেষণ' নামে অভিহিত।

অনেক শিলাতে লৌহ-অক্সাইড বিদ্যমান। নির্দিষ্ট উত্তাপের (কুরি-বিন্দু) উর্ধ্বে অক্সাইড-কণা চুম্বকত্ব ধারণ করিতে অপারগ। কিন্তু 'কুরি-বিন্দু' এবং প্রতিরোধ-তাপের কতিপয় মাত্রা উর্ধ্বে অক্সাইড-কণা পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্র হইতে চুম্বক গ্রহণ করিতে সমর্থ। উক্ত কণা দিক্‌-প্রবহমানতা এবং তীব্রতা অর্জন করে। প্রতিরোধ-তাপের নিম্নে এই অর্জিত চুম্বক রক্ষিত হয়। নিস্তেজ চুম্বক উহাকে প্রভাবান্বিত করিতে অসমর্থ।

আরকাইও ম্যাগ্‌নিটিজিম্‌ অনুশীলনের জন্য দগ্ধমৃত্তিকা-নিদর্শন

প্রশস্ত। কারণ, উক্ত সামগ্রীর চুম্বকত্ব স্থায়ী থাকে এবং উহা চুম্বকিত হইবার সময় হইতে পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্র (ম্যাগনেটিক্ ফিল্‌ড্) নির্ধারণ করা যায়। চৌম্বক ক্ষেত্রের বিভিন্নতাও নির্ণয়সাধ্য। প্রাচীন ইষ্টকনির্মিত বাস্তু বা অপর নিদর্শনের অন্তঃস্থ চুম্বকত্ব (ম্যাগ-নেটিজিম্) নির্ণয় করিয়া উহাদের কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর। দিকচক্র অপেক্ষা নিস্তেজ চুম্বকত্বের তীব্রতা অল্প। বর্তমান এবং প্রাচীন অগ্নিদগ্ধ মৃন্ময় বস্তুর চুম্বকত্বের তীব্রতা নির্ণয় করিয়া উহার কৃত্রিমতাও নির্ধারণ করা যায়। এমন কি, এই পদ্ধতির অনুশীলন দ্বারা মৃন্ময় বস্তুর শিল্পকেন্দ্রের এবং পোয়ানের কাল নিরূপণ করাও সম্ভব হইয়াছে।

কিন্তু উক্ত বৈজ্ঞানিক অনুশীলনকার্যের অনেক প্রতিবন্ধক বর্তমান। আরকাইও-ম্যাগনেটিজিম্ বিশ্লেষণের জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশের অভাব অত্যধিক। চুম্বকত্ব বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত তত্ত্ব অদ্যাপি যথার্থতা অর্জন করিতে পারে নাই। তথাপি বর্তমান প্রত্নতত্ত্বীয় কালনিরূপণে এই চুম্বকত্ব-বিশ্লেষণ সহায়করূপে পরিগণিত।

(চ) পট্যাসিয়্যাম্ আরগন্-বিশ্লেষণ (রাসায়নিক ক্ষারজশ্বেতবর্ণ ধাতুবিশেষ ; গ্যাসবিশেষ) : পট্যাসিয়্যাম্ পদার্থ সাধারণতঃ খনিজে (মিন্যারেল্) ন্যস্ত থাকে। এক প্রকার পট্যাসিয়্যাম্ অ্যাটম্ (পরমাণু) [অর্থাৎ পট্যাসিয়্যাম্-৪০] তেজস্ক্রিয়সম্পন্ন এবং অতি মন্থর গতিতে অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আরগন্-গ্যাস খনিজের কণার অভ্যন্তরে বদ্ধ থাকে। পট্যাসিয়্যাম্-৪০ আরগনে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের মাত্রা নির্ণয় করিয়া খনিজের কাল নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। উক্ত কালনিরূপণকার্যের জন্য পট্যাসিয়্যাম্ ও আরগনের পরিমাণ-মাত্রার গড় নির্ধারণ করিতে হয়।

তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের পর রুদারফোরড্ প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণের দ্বারা ভূতত্ত্বীয় কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর। তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, সৃষ্টিকাল হইতে ক্ষেরণ্ড-

জ নাইট্ কেলাস-এর (ক্রিস্ট ল) ন্যূনপক্ষে ৫০০ নিযুত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। উক্ত কেলাসে ৭% ইউরেনিঅ্যাম্ (তেজস্ক্রিয় ধাতুবিশেষ) এবং ১৮ সী সী হীলিয়াম্ (সূর্যমণ্ডলস্থ গ্যাসবিশেষ) বর্তমান। খনিজের (মিন্যারেল্) ইউরেনিঅ্যাম্ ও সীসকের (লেড্) এবং ইউরেনিঅ্যাম্ ও হীলিয়ামের অনুপাতের পরিমাণ গ্রহণ করিয়া ভূতত্ত্বীয় কালনির্ঘণ্টের ভিত্তি সুদৃঢ় করা হইয়াছে। এই অনুশীলনের জন্য যথোপযুক্ত উপকরণের প্রয়োজন অধিক। এমন কি এই বিজ্ঞান-পদ্ধতি দ্বারা জীবাশ্ম-নিদর্শনের কাল নির্ণয় করাও সম্ভবপর হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ এই পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া জিন্‌জান্‌থ্রোপাস্-এর (আফ্রিকা মহাদেশ হইতে আবিষ্কৃত মানুষের তুল্য করোটি-জীবাশ্ম) কালনির্ধারণ উল্লেখযোগ্য। উহার পট্যাসিয়্যাম্ আরগন্-বিশ্লেষণকৃত কাল ১.২৩ এবং ১.৭৫ নিযুত বৎসর পূর্বে নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু এই বিজ্ঞান-পদ্ধতির পরিসংখ্যান্-সংক্রান্ত ত্রুটির বিদ্যমানতা স্বাভাবিক।

(ছ) আগ্নেয় প্রস্তর-(ব্যাসাল্ট) বিশ্লেষণ : পট্যাসিয়্যাম্ আরগন্-কালনিরূপণের পদ্ধতি প্রধানতঃ ভূতত্ত্বীয় কালনির্ঘণ্ট নির্ণয়-কার্যের সহায়ক। পালল শিলার (সেডিমেন্টারি রক্) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও করা হইয়াছে। এই বিজ্ঞান-পদ্ধতি আগ্নেয় প্রস্তর-বিশ্লেষণকার্যে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু আগ্নেয় প্রস্তর-বিশ্লেষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উপাদান অত্যল্প। পলল-এর (সেডিমেণ্ট) কালনিরূপণে ব্যবহৃত খনিজ পদার্থ বিরল। এক গ্রাম ওজনের পদার্থের জন্য অধিক পরিমাণ পললকে বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়ার অধীন করিতে হয়। কিন্তু ব্যাসাল্ট-এর প্রাক্-বিস্ফোরণকালীন আরগন্ (গ্যাস) ধারণ করিবার ক্ষমতা অল্প। এই বিশ্লেষণ দ্বারা আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণের (ভল্‌ক্যানিক্ ইরাপ্‌সন্) সময়ের সহিত প্রত্ন-তত্ত্বীয় নিদর্শনের সামঞ্জস্য নির্ণয় করা যায়। লাভার (আগ্নেয়গিরি হইতে নিঃসৃত গলিত ধাতব পদার্থ) পট্যাসিয়্যাম্ আরগন্-বিশ্লেষণ

দ্বারা প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শনের তারিখও সুনির্দিষ্ট করা সম্ভবপর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্নতত্ত্বে রেডিও-কারবন্ কালনিরূপণের নিম্নমানতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পট্যাসিয়্যাম্ আরগন্-বিশ্লেষণ বহুলাংশে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে। রেডিও-কারবন্ এবং পট্যাসিয়্যাম্ আরগন্-এর সম্মিলিত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শনের কালনিরূপণ নিশ্চিতভাবে স্থির করা সম্ভব হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ তেজস্ক্রিয় পদার্থসম্বলিত শিলার পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর বয়স-নির্ধারণকার্য উল্লেখযোগ্য। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা শিলার তেজস্ক্রিয় বিশ্লেষণপূর্বক পৃথিবীর বয়স পঞ্চশত কোটি বৎসরে ধার্য করিয়াছেন।

(জ) পরিবেশ-বিশ্লেষণ: কালনিরূপণে উপরি-উক্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যতীত পারিপার্শ্বিক অবস্থার বা পরিবেশ-এর (ইন্‌ভাইঅ্যারন্‌মেণ্ট) অনুশীলনও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু, মৃত্তিকা, প্রাণিকুল, উদ্ভিদ্‌কুল, ভূসংস্থান (টপোগ্রাফি) প্রভৃতি পরিবেশ-নির্দেশক। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের কার্যক্রমকে পরিবেশ সর্বতোভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনকার্যে পরিবেশ-এর বিশ্লেষণ সর্বাধিক প্রয়োজন। ভূতত্ত্বীয়, প্রাণিকুল ও উদ্ভিদ্‌কুল-সংক্রান্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবেশ নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনে উক্ত উপকরণসমূহের প্রয়োজন দ্বিবিধ: (ক) জলবায়ুর, উদ্ভিদকুলের এবং প্রাণিকুলের বিবর্তনের ধারা নির্ণয় করিয়া পৌর্বাপর্য স্থিরীকরণ এবং (খ) প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবস্তুর সহিত উক্ত তথ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ। এই দ্বিবিধ অনুশীলন করিয়া প্রত্ননিদর্শনের নির্ভরযোগ্য কাল নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে।

কারুশিল্প-সংক্রান্ত উপাদান ব্যতিরেকে মৃত্তিকার, প্রাণিকুলের ও উদ্ভিদ্‌কুলের নিদর্শনও মানুষের কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। এই সকল নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবেশের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করা হইয়াছে। প্রাচীনতম যুগের

জন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভূতত্ত্বীয় অনুশীলন-প্রসূত তথ্যের উপর নির্ভর করেন। এই ভূতত্ত্বীয় অনুশীলন হিমযুগের ঘটনা-প্রবাহের সহিত জড়িত।

প্ল্যাইস্টোসিন্ যুগের অবক্ষেপণ (ডিপোজিশ্ন্) বিশ্লেষণ করিয়া জলবায়ু নির্ধারণ করা যায়। প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীনডনে অশ্যু-লীয় (অশ্যুল নামক স্থানের প্রস্তর-হাতিয়ার নির্দেশক সংস্কৃতি-পর্ব) মানুষ আন্তঃহিমযুগের বেলাভূমিতে আবাসস্থল তৈয়ার করিয়াছিল। এমন কি কঙ্করের আকার ও প্রকার বিশ্লেষণ করিয়া জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ণয় করাও সম্ভব হইয়াছে। হিমযুগের অবক্ষেপের ধাপ নির্ণয় এবং জলবায়ু ও প্রাণিকুলের নিদর্শনের অনুশীলন পূর্বক কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর।

অধুনা প্রত্নতত্ত্বে গুহায় বিন্যস্ত পলল-এর (সেডিমেণ্ট) অনুশীলন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পলল-এর অবক্ষেপ বিশ্লেষণ করিয়া জলবায়ুর প্রকৃতিও নির্ণীত হইয়াছে। এই পলল-বিশ্লেষণের সহিত পরাগরেণু-বিশ্লেষণ (পোলেন্ অ্যানালিসিস্) জড়িত। পরাগরেণু বিশ্লেষণ করিয়া গুহায় বিন্যস্ত অবক্ষেপের সহিত উদ্ভিদকুলের সম্পর্ক নির্ণয় করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বালুকণা এবং গুল্মাচ্ছাদিত অবক্ষেপের অনুশীলন দ্বারা জলবায়ুর গতির অনুক্রম ধারা নির্ণয় করা যায়। মৃৎতত্ত্ববিদগণ স্তম্ভ-গর্তের মৃত্তিকার বিকৃত বর্ণ-পরিচয়, নদীতট প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়াও অনেক মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

কারুশিল্প-নিদর্শনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাণিকুলের অস্থি-বিশ্লেষণ হইতেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলবায়ু এবং কাল নিরূপণ করাও সম্ভব হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লারটেট্ প্রত্নাশ্মীয় হাতিয়ারের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাণিকুলের নিদর্শনের গুরুত্ব সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন। প্রাণিকুল, উদ্ভিদকুল এবং পলল-অবক্ষেপের সামগ্রিক বিশ্লেষণের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবেশের যথার্থ

পরিচয় লাভ করা সম্ভব হইয়াছে। প্রাণিকুলের নিদর্শন পর্যালোচনা করিয়া কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর।

পরিবেশ-সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির আলোচনাও প্রয়োজন। এই সকল বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলনের ফলে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি-পর্বের কালনিরূপণ কার্যের ভিত্তি বহুলাংশে সুদৃঢ় হইয়াছে।

(ঝ) সাগরান্তর-(ডীপ সী-কোর) বিশ্লেষণ : সাগরান্তর-বিশ্লেষণ সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের উষ্ণতার বিভিন্নতা ও পরিবর্তনশীলতা নির্ণয় করিয়া প্ল্যাইষ্টোসিন্ যুগের জলবায়ু-সম্পর্কিত নির্দেশ প্রদান করিতে সমর্থ। এই বিশ্লেষণ হইতে আদি-প্ল্যাইষ্টোসিন্ যুগের কাল নির্ণয় করাও সম্ভব হইয়াছে। এমন কি জীবাশ্ম-নিদর্শনের তারিখ-নির্ধারণকার্যও এই পদ্ধতি-অনুশীলনের সহায়করূপে পরিগণিত। কিন্তু উক্ত অনুশীলনকার্যের সফলতা সমুদ্রজলের উষ্ণতার সহিত মহাদেশীয় পর্বের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।

(ঞ) মৃত্তিকাস্তরবিন্যাস ও পরিবেশ (সয়ল্ স্ট্র্যাটিফিকেসন্ অ্যানড্ ইনভাইঅ্যারনমেণ্ট)-বিশ্লেষণ : মৃত্তিকার গঠন,| প্রকৃতি ও বিন্যাস এবং পরিবেশ বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন মৃৎস্তরের কালাতিক্রম নির্ণয় করা সম্ভবপর। স্তরবিন্যাস-অনুশীলন উৎখননতত্ত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। প্রধানতঃ উৎখনক প্রত্ননিদর্শনের সাহায্যেই স্তর-বিন্যাস-সংক্রান্ত তথ্য প্রণিধান করেন। কিন্তু মৃত্তিকার যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করা মৃৎতত্ত্ব-বিশারদগণের কার্য। মৃৎতত্ত্ব-বিশারদগণই কৃষ্ণবর্ণ বা ভস্মাকীর্ণ মৃত্তিকাস্তর বিন্যস্ত হইবার কারণ এবং খানার বা গর্তের আবরণ-সম্পর্কিত যথার্থ পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পরিবেশজাত খনিজই প্রস্তর, ধাতবপদার্থ ও অপর বাস্তব নিদর্শনের প্রকৃত উৎস। প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির পরিচয় কেবল-মাত্র প্রস্তর বা অস্থিনির্মিত নিদর্শনভিত্তিক নহে। পশু, শেল্, উদ্ভিদকুল ইত্যাদির নিদর্শন হইতেও উক্ত যুগের পরিবেশ-সংক্রান্ত

অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর। হিমপ্রবাহ, প্রবাহিকা, হ্রদ, মরুভূমির অবক্ষেপণ, গুহার পলল, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণজাত ভস্ম, বালুকণাস্তূপ, জীবাশ্মক্ষেত্র প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের সামগ্রিক চিত্র রূপায়ণ করা যায়। কালনিরূপণের জন্য মৃত্তিকার বৈজ্ঞানিক অনুশীলনও আবশ্যক। প্রাকৃতিক মৃত্তিকাস্তর বিন্যস্ত হইতে শত বা সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। অতএব মৃত্তিকাস্তর-বিন্যাসের কালনির্ণয়ের পদ্ধতি সমসাময়িক পরিবেশের অনুশীলনের সহিত জড়িত। মৃত্তিকাস্তর-বিন্যাসের ক্রমবর্ধমানতা বিশ্লেষণ করিয়াও কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর। ভূতত্ত্বীয় অনুশীলন-প্রসূত কালনির্ঘণ্ট প্রত্নতত্ত্বীয় কালনিরূপণকার্যের প্রকৃত সহায়ক।

(ট) পরাগরেণু-বিশ্লেষণ (পোলেন্ অ্যানালিসিস্): মৃত্তিকা-স্তরে বিন্যস্ত পরাগরেণুর বিশ্লেষণ বর্তমান প্রত্নতত্ত্বের অতীব গুরুত্ব-পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। পরাগরেণুর বিশ্লেষণ প্রত্নবিজ্ঞানের অনু-শীলনকে ত্রিবিধ উপায়ে সাহায্য করে: (ক) কালনিরূপণে, (খ) পরিবেশ-নির্ণয়ে এবং (গ) মানুষের কার্যকলাপ-নির্ধারণে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের বৈজ্ঞানিক লেন্নার্ট পরাগরেণু বিশ্লেষণ করিবার পদ্ধতি প্রথম উদ্ভাবন করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই পদ্ধতির অনুশীলনের মান অধিক উন্নত হইয়াছে। বর্তমানে পরাগরেণুতত্ত্ব প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যার একটি স্বতন্ত্র শাখায় পরিণত হইয়াছে।

স্বয়ং পরাগযোগের (পলিনেস্ন্) সহায়তায় সপুষ্পক (ফ্লাওয়া-রিন্‌গ্ প্ল্যান্ট্) পুনরুৎপাদনকার্যে ব্রতী। পুং-পুনরুৎপাদী-কোষ-(সেল্) সম্বলিত ক্ষুদ্রতম পরাগরেণু স্ত্রী-পুনরুৎপাদী-কোষ-সম্বলিত ডিম্বকের (ওভিউল্) সহিত যুক্ত হইবার ফলে গর্ভ সঞ্চারিত হয়। পক্ষী ও পতঙ্গের কর্মতৎপরতায় পরাগযোগ সাধিত হইয়া থাকে। তাহারা পরাগরেণুকে এক পাদপ (প্ল্যান্ট) হইতে অপর পাদপে বহন করে। বায়ুও পরাগরেণুকে বহন করিয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত

করে। পরাগিত বায়ু (প'লিনেটেড উইনড্) পুষ্পে অধিক সংখ্যক পরাগরেণু উৎপাদন করে। কিন্তু উক্ত পরাগরেণুর অধিকাংশই ভূপতিত হয়। পরাগরেণুর ভূপতন পরাগরেণু-বর্ষণ (পোলেন রেন্স্) নামে অভিহিত। সাধারণতঃ পরাগরেণু ধ্বংসাতীত। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে পরাগরেণু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অক্সিজেন্ (গ্যাস্বিশেষ) অভাবগ্রস্ত ক্ষেত্রে (যেমন, কর্দম, জলাভূমি, বালুকাকীর্ণ ভূমি প্রভৃতি) পতিত হইলে পরাগরেণু সংরক্ষিত থাকে। অধিক সময় অতিবাহিত হইবার পর উক্ত পরাগরেণু অশ্মীভূত (ফসিলাইজ্ড্) হয়। প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যা-বিশারদগণ অনুবীক্ষণ (মাইক্রোস্কোপ্) যন্ত্রের সাহায্যে অশ্মীভূত পরাগরেণুর আকার ও প্রকার পরীক্ষা করিয়া বৃক্ষ সনাক্ত করিতে পারেন। বিবিধ বৃক্ষের পরাগরেণু ভিন্ন। সুতরাং পরাগ-রেণু পরীক্ষা করিয়া বৃক্ষ সনাক্ত করা অসম্ভব নহে। এই বৈজ্ঞানিক অনুশীলন 'প্যালিনলজি' নামে পরিচিত।

পরাগরেণু বিশ্লেষণ করিয়া প্রাচীনকালের জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ণয় করাও সম্ভব হইয়াছে। বায়ু-পরাগিত জলাভূমি হইতে আনীত পাইন-বৃক্ষের (দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ) বা ভূর্জ (ব্যার্চ্)-বৃক্ষের পরাগরেণুর বিদ্যমানতা হইতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত সময়ে জলবায়ু শীতল ছিল। ঔক্-বৃক্ষের বা এল্ম্-বৃক্ষের (দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ-বিশেষ) পরাগরেণুর বিদ্যমানতা উষ্ণ জলবায়ুর নির্দেশক। পরাগরেণু অনুশীলন করিয়া তৃণরাজির বিদ্যমানতাও প্রমাণ করা যায়। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা উদ্ভিদকুলের বিবর্তনের প্রকৃত রূপও নির্ণীত হইয়াছে। ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে পরাগরেণু বিশ্লেষণ পূর্বক শতাব্দী-পরম্পর উদ্ভিদকুলের বিবর্তন ধারাবাহিক রূপে নির্ধারিত হইয়াছে। ভ্যার্ব-বিশ্লেষণজাত হিমবাহের পশ্চাদপসরণ-সংক্রান্ত কাল-নির্ণয়ের প্রামাণিকতা পরাগরেণু-বিশ্লেষণ দৃঢ় করিয়াছে। প্রাগৈতি-হাসিক প্রত্নস্থলের সন্নিকটে বৃক্ষের পরাগরেণুর বিদ্যমানতা ভ্যার্ব-বিশ্লেষণ দ্বারা নিরূপিত কালের সহিত সংযুক্ত করিতেও সাহায্য করে।

ব্রঞ্জযুগের সমাধি-ভগ্নস্তূপের অভ্যন্তরে কোন সমাধি-নিদর্শন অবিদ্যমান থাকিলে, যে ক্ষেত্রের উপর স্তূপ নির্মিত হইয়াছে উহাতে বিন্যস্ত পরাগরেণুর বিশ্লেষণ করিয়া গাছপালার বিবর্তনের কোন পর্বে উক্ত স্তূপ নির্মিত হইয়াছিল তাহাও নির্ণয় করা যায়। পূর্বে কেবল জলাভূমিতে বিন্যস্ত পরাগরেণুর বিশ্লেষণ করা হইত। শুষ্ক মৃত্তিকায় অবস্থিত প্রত্নিদর্শনের অনুশীলনকার্যে পরাগরেণুর বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া হল্যাণ্ডের ওয়াটারবক্ এবং ইংল্যাণ্ডের ডিমব্লেবী সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। এই বিষয়ে স্মরণীয় যে, উক্ত ক্ষেত্র অম্লযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

পরাগরেণুর বিশ্লেষণ করিয়া কালনিরূপণ করাও সম্ভবপর। কিন্তু এই কালনিরূপণ অপর প্রত্যক্ষ কালনির্দিষ্ট উপাদানের বিশ্লেষণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কারবন্-১৪ তারিখ পরাগরেণুর বিশ্লেষণ-সম্পর্কিত কালনিরূপণকার্যের প্রকৃত সহায়ক। পরাগরেণু-বিশ্লেষণ পরিবেশ-সংক্রান্ত অনেক তথ্য সরবরাহ করে। কিন্তু কালনিরূপণে পরাগরেণু-বিশ্লেষণের গুরুত্ব সমধিক নহে।

কার্‌বন্-১৪ তারিখ নির্ধারণের অনুরূপ পরাগরেণুর বিশ্লেষণও ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। পরাগরেণুর বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত কার্যক্রমের গতি কার্‌বন্-১৪ তারিখ-বিশ্লেষণ অপেক্ষা অধিক মন্থর। কারণ, পরাগরেণুর বিশ্লেষণকার্যে অধিক সংখ্যক শ্লাইড (কাঁচখণ্ড) পরীক্ষা করিয়া পরাগরেণুর সংখ্যামান নির্ণয় করিতে হয়। অধিকন্তু পরাগ-রেণুর বিশ্লেষণকৃত তথ্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। গাছপালার বিবর্তনের ইতিবৃত্ত-সম্বলিত অঞ্চলেই পরাগরেণু বিশ্লেষণের প্রামাণিকতা প্রতিপাদন করা সম্ভবপর। উপরন্তু অধি-কাংশক্ষেত্রে পরাগরেণুর বিশ্লেষণ দ্বারা ভ্রমাত্মক কালও নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং পরাগরেণুর বিশ্লেষণকৃত কালনিরূপণ অপর নির্দিষ্ট তারিখসম্বলিত উপাদান দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।

(ঠ) গিরিগুহার পলল-বিশ্লেষণ (কেইভ্ সেডিমেণ্ট অ্যানা-

লিথ্যাসিস্): গিরিগুহায় বিন্যস্ত পলল অনুশীলন করিয়া পরিবেশ ও কালপরিমাণ নির্ণয় করা যায়। গিরিগুহায় উৎখননকার্যে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সাহায্য গ্রহণ করা কর্তব্য। গুহায় বিভিন্ন আকারে ও প্রকারে বিন্যস্ত পলল ভূতত্ত্বীয় ঘটনা-প্রবাহের সহিত জড়িত। এই পলল-বিশ্লেষণ করিয়া ভূতত্ত্বীয় ঘটনা-প্রবাহের এবং জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কিত কাল নির্ধারণ করা সম্ভবপর। প্রাচীনতম কাল হইতে মানুষ গিরিগুহায় বসবাস আরম্ভ করে। সমাধি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্ররূপেও গিরিগুহা ব্যবহৃত হইত। ভূতত্ত্বীয় পলল-এর বিন্যাস ব্যতিরেকে গিরিগুহায় উৎখনন প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি-সংক্রান্ত অনেক তথ্যও পরিবেশন করে। গিরিগুহায় খনন করিয়া বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্যায়ের কালনিরূপণ, পলল-স্তরসমূহের কাল-পার্থক্য নির্ণয় এবং সমসাময়িক পরিবেশ-সংক্রান্ত অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। গিরিগুহায় আবিষ্কৃত নিদর্শনের মধ্যে মানুষের ও পশুর কঙ্কাল, অন্য অস্থি-নিদর্শন এবং উহাদের বসতির ও কার্যক্রম-সংক্রান্ত অভিজ্ঞান যেমন, প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ার, অপর প্রত্নবস্তু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গিরিগুহা মানুষ ও পশু উভয়েরই আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। গৃহপালিত এবং বন্য পশু প্রকৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। সুতরাং গিরিগুহাতে মানুষের এবং পশুর কার্য-কলাপের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে একই পলল-স্তরে বিন্যস্ত পশুঅস্থির ও মানবসংস্কৃতির নিদর্শনের সমকালবর্তিতা প্রমাণিত হয় না। কারণ, পরিত্যক্ত হইবার অনেক পরেও গুহা পশুগণের আশ্রয়কেন্দ্র হইতে পারে। অধিকন্তু পরিত্যক্ত হইবার অনতিকাল পরেও পশুগণের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। গুহার পলল বিশ্লেষণ করিয়া এই প্রকার সীমিত ব্যবধান নির্ধারণ করা আয়াসসাধ্য। সর্বপ্রথমেই প্রাকৃতিক ও মানবীয় তৎপরতা-প্রসূত পলল-অবক্ষেপের অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

গিরিগুহায় পললের অবক্ষেপণ বিভিন্ন কারণে বিন্যস্ত হয়। পললের বিন্যাস গুহার আকার ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ গিরিগুহা দ্বিবিধ: এন্‌ডোজিন্ (গমনাগমন-পথ ও কক্ষসম্বলিত গুহা) এবং একস্‌অজিন্ (অগভীর গর্ত, আশ্রয় ক্ষেত্র এবং কুলঙ্গী সম্বলিত গুহা)। বিবিধ প্রাকৃতিক কারণবশতঃ বিভিন্ন প্রকার গিরিগুহার উদ্ভব হইয়াছে। গিরিগুহার অবস্থানও ভূসংস্থানভিত্তিক। বিন্যস্ত পলল অনুশীলনের জন্য গুহার প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা প্রধান কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গুহার অগ্রভাগের পলল-অবক্ষেপণ বহির্জগতের জলবায়ু দ্বার প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু গুহার অভ্যন্তরাংশের পলল বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে গঠিত হয়। গুহার পললে বিন্যস্ত বাস্তব নিদর্শন যেমন, হাতিয়ার, প্রস্তরখণ্ড, অস্থি, ধাতব বস্তু, পোড়ামাটির নিদর্শন প্রভৃতি মানুষের কার্যক্রমের অভিজ্ঞান। অঙ্গার ও উদ্ভিদ্‌কুলের নিদর্শনের বিদ্যমানতাও বিরল নহে। চুল্লী ও অগ্নির প্রামাণিক চিহ্নও গুহায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। উল্লিখিত তথ্যপূর্ণ নিদর্শন প্রাচীন মানুষের নানাবিধ কার্যক্রমের প্রকৃত পরিচায়ক। এমন কি, শব সমাধিস্থ করিবার জন্য গুহার মধ্যে কবর-খনন-সংক্রান্ত চিহ্নও আবরণ-মুক্ত করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে মানবীয় কর্মতৎপরতার জন্যও গুহায় বিন্যস্ত পলল আলোড়িত হয়।

গিরিগুহায় পললের চতুর্বিধ স্তরের বিন্যাস বিদ্যমান: (ক) ভূ-তত্ত্বীয় স্তর, (খ) জীবাশ্মীয় স্তর, (গ) প্রত্নতত্ত্বীয় স্তর এবং (ঘ) সং-স্কৃতির নিদর্শনসম্বলিত স্তর।

উৎখননের সময়ই উপরি-উক্ত বিবিধ স্তরের বিশ্লেষণ করা উচিত। বীক্ষণাগারে অনুশীলনের জন্য গুহার বিভিন্নাংশ হইতে যথোপযুক্ত নিদর্শন সংগ্রহ করা কর্তব্য। হিমযুগের পলল-অবক্ষেপণের এবং পরবর্তী যুগের পলল-বিন্যাসের পার্থক্য বিদ্যমান। গিরিগুহার পললে বিন্যস্ত নিদর্শনের কালনিরূপণের জন্য পরিবেশ, প্রাগৈতিহাসিক

মানুষের কর্মতৎপরতা এবং পললের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অত্যধিক প্রয়োজন।

(ড) বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণকৃত কালনির্ঘণ্ট (ডেন্-ড্রোক্রোনলজি অথবা ট্রি-রিং অ্যান্যালিসিস্): বৃক্ষকাণ্ডে বিন্যস্ত বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণ প্রত্নবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক উপায়। বৃক্ষাংশে বিন্যস্ত বলয়াকার বেড় (রিং) অনুশীলন পূর্বক উহার কালনির্ঘণ্ট-নির্ণয়তত্ত্ব ডেন্ড্রোক্রোনলজি নামে পরিচিত। এই বিজ্ঞান-পদ্ধতি দ্বারা বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়সমূহ বিশ্লেষণ করিয়া যথার্থ কালনির্ঘণ্ট নির্ণয় করা সম্ভবপর হইয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে থিওফ্রাস্টাসের লেখতে বৃক্ষকাণ্ডের বেড়-অনুশীলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত সময় হইতেই উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিশারদগণের এবং অপর বিজ্ঞান-বেত্তার গবেষণার ফলে বৃক্ষ-কাণ্ডে বিন্যস্ত বলয়াকার বেড়-সম্পর্কিত বিশ্লেষণের তাৎপর্য প্রতি-পাদন করা আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বীয় কাল নিরূপণের জন্য জ্যোতি-র্বেত্তা ডাঔগলাস্ই সর্বপ্রথম প্রত্নবিজ্ঞানে ডেনড্রোক্রোনলজি-পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন। ১৯০: খ্রীষ্টাব্দে ডাঔগলাস্ বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-অনুশীলন আরম্ভ করেন। তিনি প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া সুনির্দিষ্ট কালনিরূপণে ডেন্ড্রোক্রোনলজির প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। ডাঔগলাস্ কর্তৃক নির্ধারিত প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্লোক্ তাঁহার গ্রন্থে ডেন্ড্রোক্রোনলজি-অনুশীলনের বৈজ্ঞানিক কাঠামো সুদৃঢ় করিয়াছেন।

ডেন্ড্রোক্রোনলজি একটি সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুশীলন করিয়া বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়সমূহের গঠন-কালীন জলবায়ুর প্রকৃতিও নির্ণয় করা যায়। বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণের ফলে জলবায়ুনির্ণয় এবং উহার কালনিরূপণকার্য ফলপ্রদ হইয়াছে। বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড় বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত

হয়। এই সকল বলয়াকার বেড় পরিবেশের প্রতিক্রিয়াজাত। বলয়াকার বেড়সমূহ প্রতি বৎসর উৎপন্ন হয় এবং জলবায়ুর প্রভাবে উহাদের বেধ পৃথকাকারে বিন্যস্ত হয়। বলয়াকার বেড়সমূহের বিভিন্নতাও সুস্পষ্ট। অধিকন্তু গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুর পরিবেশের বৃক্ষকুলও ভিন্ন। এমন কি, সৌর বিকীরণের তীব্রতার সহিতও বেড়-বেধ-এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নির্ধারিত হইয়াছে।

ডেন্‌ড্রোক্রোনলজির অনুশীলন-প্রযুক্ত প্রত্নাঞ্চলে দ্বিবিধ বৃক্ষ-কাণ্ডের বলয়াকার বেড় উল্লেখনীয়: (ক) অনুরূপ বেধবিশিষ্ট এবং (খ) ভিন্নরূপ বেধবিশিষ্ট। প্রথমোক্ত বেধ পরিতৃপ্ত (ক্যাম্‌-প্লেইস্‌ন্‌ট্‌) এবং শেষোক্ত অনুভবশীল (সেন্‌জিটিভ্‌) নামে অভিহিত। শেষোক্ত বৃক্ষকাণ্ডের বেড়-অনুশীলনই কালনিরূপণকার্যের জন্য প্রশস্ত।

বিশেষ পরিবেশে বৃক্ষকাণ্ডের বেড়-এর সহিত সমকালভুক্ত অনুভবশীল বলয়াকার বেড়সমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করিয়া অনুরূপতা প্রতিপন্ন করা সম্ভব। একই পরিবেশে একটি বৃক্ষকাণ্ডে প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত উভয় প্রকার বলয়াকার বেড় অপর বৃক্ষকাণ্ডের বেড়ের অনুরূপ হইবে। এই প্রকার বিভিন্ন বৃক্ষকাণ্ডের বেড় বিশ্লেষণ করিয়া বেড়-বিন্যাস নির্ণয় করা সম্ভবপর হইয়াছে। অনুরূপ বেড়-সমূহ সমকালভুক্ত। এই পদ্ধতি দ্বারা বৃক্ষকাণ্ডের বেড়সমূহের কাল-নির্ধারণকার্য প্রতিতুলনামূলক তারিখ নির্ণয়ের প্রণালীভিত্তিক। প্রতিতুলনামূলক কাল নির্ণয়ের জন্য বর্তমান কাল-নির্দিষ্ট বৃক্ষকাণ্ড-বেড়-এর অনুশীলন করা প্রয়োজন। বৃক্ষকাণ্ড বেড়-এর কাল নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষিত নিদর্শনের আবিষ্কৃত অঞ্চলে প্রচলিত কালগণনার পদ্ধতি প্রয়োগ করিতে হইবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া নিশ্চিত কাল নির্ধারণ করা যায়। বর্তমানকালভুক্ত বৃক্ষকাণ্ডের বেড়-এর অবর্তমানেও সাপেক্ষ কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর। প্রতি বৎসর পরিবর্তনীয় বৃক্ষকাণ্ডের বেড়সমূহ আঞ্চলিক পরিবেশের যথার্থ

পরিচায়ক। সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সমপরিবেশে অনুরূপ বেড় বিন্যস্ত হয়। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত স্বীকার্য নহে।

প্রত্নতত্ত্বীয় কালনিরূপণকার্যে উল্লিখিত বৃক্ষকাণ্ডের বেড় বিশ্লেষণ করিবার প্রণালী অনুসরণের পূর্বে কতিপয় নির্দেশের বিদ্যমানতা উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, প্রত্নতত্ত্বীয় পরিবেশের সহিত সংশ্লিষ্ট বৃক্ষকাণ্ডের বা অঙ্গারের আবিষ্কার আবশ্যক। বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-এর বিশ্লেষণকার্যের নিমিত্ত অঙ্গার-নিদর্শনই সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান। প্রাগৈতিহাসিক যুগভুক্ত মানুষের কর্মতৎপরতার সহিত অঙ্গার-নিদর্শনের আবিষ্কার ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়সমূহ বিন্যস্ত হইবার কাল নির্ধারণের জন্য সম্বন্ধযুক্ত নির্দিষ্ট তারিখসম্বলিত উপাদানের প্রয়োজন অত্যধিক। তৃতীয়তঃ, এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত তরঙ্গায়িত বেধযুক্ত সুনির্দিষ্ট কাণ্ডে বিন্যস্ত বেড়-চিহ্ন সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

বলয়াকার বেড়সম্বলিত নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া সাপেক্ষ কাল নির্ণয় করা সহজসাধ্য। কিন্তু নিশ্চিত কাল নির্ধারণ করিবার পদ্ধতি জটিলতাপূর্ণ। নিশ্চিত কাল নিরূপণের জন্য বলয়াকার বেড়সমূহের কালনির্ঘণ্ট নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বর্তমান কালনির্দিষ্ট বেড় হইতে আরম্ভ করিয়া বেড়-এর বৎসরান্তর অনুক্রমিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা কর্তব্য। এই পদ্ধতির অনুশীলনও সময়সাপেক্ষ। সর্বপ্রথম নিশ্চিতরূপে কালনির্ঘণ্ট নির্ণয় করিতে হইবে। বলয়াকার বেড়-এর প্রকৃতি বিশ্লেষণপূর্বক কালনির্ঘণ্টের সহিত সংশ্লিষ্ট তারিখ-নির্দিষ্ট উপাদানের তুলনামূলক পর্যালোচনা করিয়া যথার্থ কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর।

বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণের জন্য উপাদান সংগ্রহ ও অনুশীলন-সংক্রান্ত তথ্য আলোচনা করাও প্রয়োজন। যথার্থ বলয়াকার বেড়সম্বলিত এবং আড়াআড়িভাবে ছেদ-কর্তনযোগ্য নিদর্শন সংগ্রহ করা একান্ত দরকার। উৎখননের সময় যাহাতে বৃক্ষকাণ্ডের বহিরাংশে বিন্যস্ত বেড় কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়,

সেই দিকেও সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অঙ্গার-নিদর্শনের উপর সংরক্ষণকারক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। সকল প্রকার দারু-নিদর্শনের সহিত অপর সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তুর সম্বন্ধ এবং উহাদের প্রকৃতি সংক্রান্ত বিবিধ তথ্যের লিপিকরণও আবশ্যক।

বিশ্লেষণের পূর্বে তীক্ষ্ণ ক্ষুর দ্বারা পরীক্ষিত নিদর্শনের পৃষ্ঠ সমতল করিতে হয়। বিবিধ শিরিস্ কাগজের সাহায্যেও উক্ত কার্য সম্পাদন করা যায়। বর্তমানে নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষিত নিদর্শনের পৃষ্ঠ সমতল করা হয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য প্রথমে বিভিন্ন নিদর্শনের কাল নির্ণয় করিতে হইবে। নিশ্চিত তারিখ নির্ধারণের নিমিত্ত নির্দিষ্ট কালনির্ঘণ্টের সহিত প্রতিতুলনাত্মক অনুশীলন করাও প্রয়োজন। অনেকক্ষেত্রে নিদর্শন-পৃষ্ঠে কৃত্রিম বলয়াকার বেড়-এর (ফল্‌স্ রিং) চিহ্নও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই কৃত্রিম বলয়াকার বেড় কেবলমাত্র কাণ্ডের পরিধির অংশবিশেষে বিদ্যমান থাকে। বিশ্লেষণের জন্য ডৌলাস্ কর্তৃক প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করাই শ্রেয়। এই পদ্ধতির কার্যক্রম দ্বিবিধ : (ক) সাধারণ ও অসাধারণ বলয়াকার বেড়সমূহের পৃথক্ করণ এবং (খ) অভ্যন্তরস্থ বেড়সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ। কিন্তু এক বেড়ের সহিত অপর বেড়ের তুলনামূলক অনুশীলনের পদ্ধতি ত্রিবিধ : (ক) স্মরণসাধ্য পদ্ধতি (মেমোরী মেথড্), (খ) রেখাঙ্কন পদ্ধতি এবং (গ) বেড়-প্রস্থের পরিমাপ-গ্রহণ-পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি দ্বারা সকল প্রকার বেড়-এর প্রকৃতি মানসপটে নির্ণয় করিতে হয়। এই পদ্ধতির বিশ্লেষণ সহজ-সাধ্য। কিন্তু ইহার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অত্যধিক। দ্বিতীয় পদ্ধতির অনুশীলনকার্যে বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত নিদর্শনের বেড় বিশ্লেষণ পূর্বক রেখাঙ্কন করিতে হইবে। এই রেখাঙ্কন অধ্যয়ন করিয়া কাল নিরূপণ করা সম্ভব। তৃতীয় পদ্ধতির অনুশীলনকার্যে বিবিধ উপায়ে বেড়-প্রস্থের পরিমাপ গ্রহণপূর্বক তুলনামূলক এবং পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ করিয়া কাল নির্ধারণ করা হয়। এই পরিমাপ

গ্রহণের জন্য ক্রেইগহেড্ ডৌলাস্ নামক সাধিত্র ব্যবহার করা শ্রেয়। বৃক্ষকাণ্ডের কালনির্দিষ্ট ও কাল-অনির্দিষ্ট বেড়সমূহ বিশ্লেষণ করিয়াই বৃক্ষের তারিখ নির্ণয় করা সম্ভবপর।

উপরি-উক্ত পদ্ধতি ব্যতিরেকে গ্যাড্উইন্ আমেরিকাতে অপর একটি প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই প্রণালী বেড়-পরিমাপনের পরিসাংখ্যিক অনুশীলনভিত্তিক। কিন্তু সকল প্রকার পদ্ধতি-প্রসূত পরিমাপনের প্রামাণিকতা প্রতিতুলনাত্মক কালনিরূপণের যথার্থতার উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। অধিকন্তু সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বৃক্ষকাণ্ডের বেড়-এর তারিখ পরীক্ষিত নিদর্শনের উপরই আরোপনীয়। এই নিদর্শনের সহিত অপর সংশ্লিষ্ট প্রত্নবস্তুর কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের অবিদ্যমানতাও অসম্ভব নহে। সুতরাং পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের সহিত সম্বন্ধযুক্ত প্রত্ননিদর্শনের যথার্থ সম্পর্ক-নির্ণয়কার্য সমস্যাপূর্ণ।

প্রত্নতত্ত্বে ডেন্‌ড্রোক্রোনলজীর অনুশীলনকার্য জটিলতাপূর্ণ এবং ভ্রমযুক্ত। প্রসঙ্গতঃ, কতিপয় স্বাভাবিক ভ্রমোৎপাদক তথ্য উল্লেখ-যোগ্য: (ক) কালনির্দিষ্ট বৃক্ষকাণ্ডের এবং অপর প্রত্ননিদর্শনের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অপর সংশ্লিষ্ট প্রত্ননিদর্শনের পূর্ববর্তীকালে বৃক্ষ (যাহার অংশ পরীক্ষিত হইয়াছে) বিনাশপ্রাপ্ত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। উপরন্তু ব্যবহার করিবার সময় বৃক্ষ কর্তিত হইবার সম্ভাবনাও অধিক। সুতরাং সর্বক্ষেত্রেই সমসংস্থাযুক্ত পরীক্ষিত নিদর্শন এবং অপর প্রত্নবস্তু সমকালভুক্ত নহে। (খ) পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ড এবং অপর প্রত্ননিদর্শনের সম্বন্ধ অপ্রত্যক্ষ হওয়াও স্বাভাবিক। উক্ত পরীক্ষিত নিদর্শনের প্রাক্-কালনির্দিষ্ট তারিখে উহার ব্যবহারও অস্বাভাবিক নহে। (গ) প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ড ও অপর প্রত্নবস্তুর বিদ্যমানতার সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত বৃক্ষ পরবর্তীকালে সমসংস্থাভুক্ত হইয়াছে। (ঘ) অধিকন্তু অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত প্রত্ননিদর্শন ও বৃক্ষকাণ্ড বর্তমান থাকিলে সিদ্ধান্ত

করা যায় যে, পরীক্ষিত নিদর্শন পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সাধারণতঃ ছপ্পর-নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত পরীক্ষিত প্রত্ননিদর্শনের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ। কিন্তু ছপ্পরযুক্ত কক্ষে বিন্যস্ত বস্তুর উপর উক্ত তারিখ প্রয়োগ করা হইলে সম্বন্ধ অপ্রত্যক্ষ হইবে। এতদ্‌ব্যতীত অসম্বন্ধযুক্ত প্রত্নতত্ত্বীয় পরিবেশে বৃক্ষকাণ্ডের নিদর্শন স্বয়মাগত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে।

উপরি-উক্ত জটিলতাপূর্ণ তথ্যের জন্য ডেন্‌ড্রোক্রোনলজী দ্বারা কালনির্ধারণ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হওয়াও স্বাভাবিক। অতএব বৃক্ষকাণ্ডের আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত পদ্ধতি-অনুসৃত কাল-নিরূপণ বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের তারিখ পূর্বকালভুক্ত হইলে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, উক্ত নিদর্শন পুনরায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। আমেরিকার বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে এই প্রকার পুনর্ব্যবহৃত অনেক দারুনির্মিত বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব সর্বক্ষেত্রে দারুর তারিখ অনুসারে বাস্তুনির্মাণের কাল নির্ণয় করা ভ্রমাত্মক। এই সকল ক্ষেত্রে বাস্তুর নির্মাণকাল পূর্ববর্তী হইবে। এতদ্‌ভিন্ন আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে প্রাকৃতিক কারণে অরণ্যে ভূপতিত ও বিনাশপ্রাপ্ত বৃক্ষের ব্যবহার অধিক প্রচলিত। গৃহনির্মাণের বহু পূর্বেই উক্ত বৃক্ষ ভূপতিত হইয়াছিল। সুতরাং গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত বৃক্ষাংশ সমকালভুক্ত নহে। এমন কি বৃক্ষকে অধিক সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবার প্রথাও প্রচলিত। অতএব উক্ত বৃক্ষাংশের ব্যবহার ও গৃহনির্মাণ সমসাময়িক নহে। বৃক্ষ-দুর্লভ অঞ্চলে কাষ্ঠের পুনর্ব্যবহার অধিক প্রচলিত। সুতরাং বৃক্ষ এবং উহার অংশের ব্যবহার সমকালীন হওয়া অস্বাভাবিক। অধিকন্তু অনুরূপ কাষ্ঠনির্মিত হাতিয়ার বা অপর বস্তু এবং উহাদের নির্মাণ ও ব্যবহার সমকালভুক্ত হওয়া সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়তঃ, অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের তারিখ পূর্বকালভুক্ত হইলে, ডেন্‌ড্রোক্রোনলজী দ্বারা নিরূপিত কাল ভ্রমাত্মক

হইবে। কক্ষ-নির্মাণে ব্যবহৃত কাষ্ঠের তারিখ দ্বারা উহার অভ্যন্তরস্থ দারুনির্মিত হাতিয়ারের তারিখ নির্ণয় করাও ভ্রমপূর্ণ। পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের তারিখ অনুসারে দীর্ঘকালব্যাপী বসতি-সম্বলিত প্রত্নস্থলের কক্ষের নির্মাণকাল নির্ণয় করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। উপরন্তু উক্ত কাল-নিরূপণের সাহায্যে কক্ষের অভ্যন্তরস্থ নিদর্শনের কালনির্ধারণও ভ্রমাত্মক।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের তারিখ পরবর্তী হইলেও কালনিরূপণ-সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হয়। দীর্ঘ বৎসর পরে গৃহের ধ্বংসপ্রাপ্ত দারুস্তম্ভ অপর স্তম্ভদ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। উক্ত প্রতিস্থাপিত দারুর পরীক্ষিত তারিখ গৃহনির্মাণের সমসাময়িক নহে। কিন্তু গৃহের একাধিক দারু-নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া দীর্ঘকালব্যাপী অধিবসতির স্থিতি নির্ণয় করা যায়। অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধযুক্ত পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের তারিখ পরবর্তী হইলেও কালনিরূপণের সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। বাস্তুনির্মাণে অব্যবহৃত কাষ্ঠের তারিখ অনুসারে উহার কাল নিরূপণ করাও ভ্রমাত্মক। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, কক্ষের অভ্যন্তর বা অগ্নিকুণ্ড হইতে আবিষ্কৃত অঙ্গারের পরীক্ষিত তারিখ এবং কক্ষ-নির্মাণের কাল সমসাময়িক নহে। কিন্তু একই প্রত্নস্থলে বাস্তু-নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত উভয় প্রকার দারুনিদর্শন পরীক্ষা করিয়া অধিবাসের পূর্ণাঙ্গ কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর।

বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড় বিশ্লেষণ করিয়া উপরি-বর্ণিত বিবিধ জটিলতাপূর্ণ তথ্যের ও ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তের পরিবেশন স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই উক্ত জটিলতাপূর্ণ নিদর্শনের আবিষ্কার অস্বাভাবিক। উল্লিখিত বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি এক বা একাধিক কারণে সংঘটিত হয়। এই বিজ্ঞান-পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারিত প্রত্যেক তারিখই সমস্যাযুক্ত। উৎখনন-কার্যের পরিপ্রেক্ষিতেই উল্লিখিত সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর।

পূর্বোক্ত জটিলতাপূর্ণ সমস্যার জন্য বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণ-প্রসূত তথ্যের ব্যাখ্যা এবং যথার্থতাও সন্দেহভাজক। এই সন্দেহের উদ্রেক পরীক্ষিত নিদর্শনের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। বাস্তুর একক তারিখ নির্ধারিত হইলে, উক্ত বিভ্রান্তিকর সমস্যার সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অধিক সংখ্যক নিদর্শনের বিশ্লেষণ করিলে নির্ধারিত তারিখের ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যার পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণকৃত তারিখের ভ্রম সংশোধন করাও সম্ভব হইয়াছে। একটি বাস্তুর একাধিক দারু-নিদর্শনের তারিখ নির্ণয় করিয়া উহার নির্মাণকাল, নিদর্শনের পুনর্ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করাও সম্ভবপর। সুতরাং অধিক সংখ্যক বৃক্ষকাণ্ডের বেড়সমূহের নির্ধারিত তারিখমালা অনুশীলন করিয়া সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব নহে। এতদ্‌ভিন্ন বিবিধ কারণবশতঃ পরীক্ষিত বৃক্ষকাণ্ডের পৃষ্ঠের বহির্ভাগস্থ বলয়াকার বেড় নিশ্চিহ্ন বা অস্পষ্ট ও ক্ষীণ হইলেও নানাপ্রকার জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে উক্ত সমস্যার সমাধানের পথ বহুলাংশে উন্মুক্ত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্বীয় কালনিরূপণকার্যে বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণকৃত তারিখমালার প্রয়োগ ত্রিশ্রেণীভুক্ত: (ক) বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণ দ্বারা কালনির্ণয়- কার্য নির্দিষ্ট কালনির্ঘণ্ট-ভিত্তিক; (খ) বলয়াকার বেড়-বিন্যাস নির্ধারিত পরিবেশের ইতিবৃত্ত-ভিত্তিক এবং বিবিধ ব্যাখ্যানতত্ত্বে উক্ত কালনির্ণয়ের প্রয়োগ; (গ) কাল-নির্ঘণ্টবিহীন তথ্য-পর্যালোচনায় উক্ত কালনির্ণয়-প্রণালী- প্রসূত তারিখের ব্যবহার। কিন্তু প্রধানতঃ প্রত্নতত্ত্বীয় কালনির্ঘণ্ট-নির্ধারণ-কার্যেই ডেন্‌ড্রোক্রোনলজির অনুশীলন করা হয়। আমেরিকাতে এই পদ্ধতির অনুশীলন অধিক সফলতা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু অন্যত্র এই পদ্ধতি-বিশ্লেষণের সফলতা সন্দেহজনক। যে অঞ্চলে কাষ্ঠের ব্যবহার অধিক প্রচলিত, সেই স্থানে ডেন্‌ড্রোক্রোনলজির

অনুশীলনজাত তত্ত্ব দ্বি অথবা ত্রি সহস্রকের অধিক প্রাচীনতম কালের নির্দেশজ্ঞাপক নহে। বর্তমানে ডেনড্রোক্রোনলজি অনুশীলনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক বীক্ষণাগারও সংস্থাপিত হইয়াছে।

ডেনড্রোক্রোনলজি অনুশীলন করিয়া প্রাচীন যুগের জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ধারণ করা অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। কিন্তু ডেন্-ড্রোক্রোনলজির অনুশীলনকৃত তথ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নহে। ইহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অনুসরণও অধিক জটিলতাপূর্ণ। অতএব জলবায়ু-নির্ধারণকার্যেও ডেনড্রোক্রোনলজি- প্রসূত তথ্য অতীব সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনে ডেনড্রোক্রোনলজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ডেনড্রোক্রোনলজি বিশ্লেষণের কাঠামো বহুলাংশে সুদৃঢ় হইয়াছে এবং প্রত্নতত্ত্বীয় কালনিরূপণকার্যে উহার অনুশীলনের গুরুত্ব অচিরেই অধিক স্বীকৃতিলাভ করিবে।

(ঢ) মৃৎভ্যার্ব-বিশ্লেষণ (ক্লে ভ্যার্ব অ্যান্যালিস্যিসিস্): বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-বিশ্লেষণকৃত তারিখ ব্যতিরেকে মৃত্তিকার ভ্যার্ব অনুশীলন করিয়াও কাল নিরূপণ করা যায়। সর্বশেষ হিমক্রিয়া- (গ্লাসিয়েসন্) অন্তে তুষারের পশ্চাদপসরণের ফলে ব্যাল্‌টিক উপকূলে মৃত্তিকাবৎ অবক্ষেপ বিন্যস্ত হইয়াছিল। শীত-ঋতুতে তুষারের পশ্চাদপসরণ-অন্তর গলিত জলদ্বারা সাধারণ বালুকণার অবক্ষেপণ সংস্থাপিত হয়। বাৎসরিক অবক্ষেপণের, এক সেন্টিমিটার বেধই ভ্যার্ব নামে অভিহিত। মৃত্তিকার ও বালুকণার পর্যায়ানুবৃত্তিক বিন্যাসের জন্য ভ্যার্ব-সমূহের বিভিন্নতাও সুস্পষ্ট। বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার বেড়-অনুশীলনের অনুরূপ ভ্যার্বসমূহের বেধও জলবায়ুভিত্তিক। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে ভ্যার্বসমূহের পৌর্বাপর্য নির্ধারণ করা সম্ভবপর।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেন-দেশীয় বৈজ্ঞানিক গীর্ সিদ্ধান্ত করিয়া-ছিলেন যে, মৃত্তিকার ভ্যার্ব বিশ্লেষণ করিয়া উহার অবক্ষেপণের নিশ্চিত কাল নির্ণয় করা যায়। আমেরিকার ও ফিনদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ গীর্

এর অনুশীলন-পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া ভ্যার্ব-বিশ্লেষণের বাস্তবতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এমন কি, এই বিশ্লেষণের ফলে হলোসিন্-পর্বের নিশ্চিত কালও নির্ধারিত হইয়াছে। মোরেণ-নিদর্শনের অনুশীলন দ্বারা এই কালনির্ধারণকার্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভ্যার্ব-বিশ্লেষণ গত ১২ সহস্র বৎসর- পরিধিব্যাপ্ত। বর্তমানে উক্ত বিশ্লেষণ প্রত্নবিজ্ঞানের কাল-নিরূপণকার্যের সহায়করূপে পরিগণিত।

(ণ) জ্যোতির্বিদ্যা-অনুশীলন-পদ্ধতি (অ্যাস্ট্রন্যমিক্যাল্ মেথড্): ভূতত্ত্বীয় হিমযুগের ও আন্তঃহিমযুগের জলবায়ুর বিভিন্নতাও উল্লেখযোগ্য। জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা উক্ত বিভিন্নতার কারণ নির্ধারিত হইয়াছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ব্ল্যান্চার্ড সূর্যের ও চন্দ্রের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর আবর্তন দ্বারা মেরুর স্থানচ্যুতি-সম্পর্কিত তত্ত্ব পরিবেশন করেন। এই স্থানচ্যুতির জন্যই হিমযুগ ও আন্তঃহিমযুগ একান্তর সংগঠিত হইয়াছিল। মেরুর স্থানচ্যুতির পর্যায়বৃত্তি গণনাপূর্বক হিমযুগের কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর হইয়াছে।

কিন্তু কেবল তরঙ্গায়িত জলবায়ুর জন্যই মেরুর স্থানচ্যুতি সাধিত হয় না। উপরন্তু ক্রান্তিকোণ (অবলিকিউটি অভ্ দি এক্লিপটিক্) ও কক্ষের অস্বাভাবিকতা (এক্সেন্ট্রিসিটি অভ্ দি ইকিউনক্স্) উক্ত পরিবর্তনশীল জলবায়ুর জন্য দায়ী। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠের নির্দিষ্ট বিন্দুতে সৌর বিকিরণের তীব্রতা তরঙ্গায়িত হয়। পণ্ডিতগণ সৌর বিকিরণের বিভিন্নতা গণনাপূর্বক তারিখ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিকিরণের বক্ররেখার অনুশীলন করিয়া মিলান্-কোভিট্জ্ ভূতত্ত্বীয় হিমযুগের সহিত আন্তঃহিমযুগের সম্পর্ক নির্ণয় করিবার পদ্ধতিও প্রবর্তন করিয়াছেন। সৌর বিকিরণের সহিত হিম-অবতরণ ও হিম-পশ্চাদ্ধাবন সংযুক্ত। মিলান্কোভিট্জ্ সৌর বিকিরণের বক্ররেখাসমূহের নিশ্চিত কাল নির্ধারণ করিতেও কৃতকার্য হইয়াছেন।

এই নির্ধারিত তারিখের সাহায্যে বিভিন্ন ভূতত্ত্বীয় এবং প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি-পর্বের কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। মানুষের প্রাচীনতম নিদর্শনের এবং প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বের কারুশিল্প-নিদর্শনের তারিখ যথাক্রমে ৫৯০০০০ এবং ২৫০০০ বৎসর পূর্বে ধার্য করা হইয়াছে। মিলান্‌কোভিট্‌জ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত ভূতত্ত্বীয় কাল-নির্ঘণ্ট অপর বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলন দ্বারাও বহুলাংশে সমর্থিত। কিন্তু কারবন্-১৪ তারিখ কর্তৃক এই পদ্ধতি-নির্ধারিত তারিখ সমর্থিত হয় না। বর্তমানে জ্যোতির্বিদ্যা-বিশারদগণ মিলান্‌কোভিট্‌জ্‌ কর্তৃক নির্দেশিত তারিখ-সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। এই পদ্ধতির গণন-প্রণালীও ত্রুটিযুক্ত। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সমগ্র প্লাইস্টোসিন্ যুগের কালনির্ঘণ্টের দৃঢ় ভিত বিন্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

(ত) ফ্লুঅ্যরাইন্ (গ্যাসীয় পদার্থবিশেষ) পদার্থ-বিশ্লেষণ (ফ্লুঅ্যরাইন্ অ্যান্যাল্যাসিস্) ঃ ফ্লুঅ্যরাইন্ গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ ফ্লুঅ্যরাইড্ রূপে বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্যাপকভাবে বর্তমান। জলাভূমিতে উহার অংশবিশেষ ন্যস্ত থাকে। আর্দ্র মৃত্তিকা হইতেই বিন্যস্ত অস্থি মন্থর গতিতে ফ্লুঅ্যরাইন্- পদার্থ শোষণ করে। ফ্লুঅ্যরাইন্- পদার্থের ক্রমবর্ধমানতা কালভিত্তিক। বস্তুর কাল-প্রাপ্তির সঙ্গে উক্ত পদার্থ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নিম্ন স্তরে বিন্যস্ত বস্তুতে ফ্লুঅ্যরাইনের পরিমাণ উপরি-স্তরস্থ বস্তুর ফ্লুঅ্যরাইন্ অপেক্ষা অধিকতর হইবে। ফ্লুঅ্যরাইন- পদার্থের শোষণের মাত্রাও নির্ধারিত হইয়াছে। অতএব মৃত্তিকাস্তরে অস্থির স্থিতিকালের নির্ণয়কার্য সহজসাধ্য। পর্যায়ানুক্রমিক লেভ্‌ল বা স্তর হইতে আবিষ্কৃত বস্তুর ফ্লুঅ্যরাইন-পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া স্তরবিন্যাসের যথার্থতাও নির্ণয় করা যায়। স্তরবিন্যস্ত নিদর্শনের ফ্লুঅ্যরাইন- পদার্থের মানজনিত বৈষম্য প্রমাণিত হইলে, অধিক মাত্রায় ফ্লুঅ্যরাইন্ পদার্থসম্বলিত নিদর্শন প্রাচীনতম হইবে। অন্যত্র হইতে পৃথক্ বা অনুরূপ যুগভুক্ত

জীবাশ্ম-এর ফ্লু্অ্যরাইন্-পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত কাল নির্ধারণ করাও সম্ভবপর। এই বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণের জন্য সকলপ্রকার অস্থি-নিদর্শন, শিঙ্ এবং গজদন্ত সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্লু্অ্যরাইন্- পদার্থ-বিশ্লেষণের সাহায্যে ফরাসী ও ইংরাজ বিজ্ঞান-বিশারদগণ কর্তৃক জীবাশ্ম-এর কাল-নিরূপণের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কারনট্ সর্বপ্রথম ফ্লু্অ্যরাইন্ বিশ্লেষণ-পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পরে ওঅ্যক্লে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছেন।

এই বিজ্ঞানপদ্ধতির অনুশীলনকার্য সীমাবদ্ধ। কারণ, বিবিধ অঞ্চলের ফ্লু্অ্যরাইন-এর মাত্রা বিভিন্ন। ওঅ্যক্লে স্বীকার করিয়াছেন যে, ফ্লু্অ্যরাইন্- নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে নবাশ্মীয় যুগভুক্ত অস্থি হইতে রোমক যুগের অস্থির ভিন্নতা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। ফ্লু্অ্যরাইন্-পদার্থ-বিশ্লেষণের সফলতা আবিষ্কৃত নিদর্শনের সংরক্ষণের অনুরূপতার উপর নির্ভরশীল। উপরন্তু বিবিধ স্থান হইতে সংগৃহীত নিদর্শনের উপর এই পদ্ধতির প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয় না। এমন কি অনেকক্ষেত্রে ভূতত্ত্বীয় তত্ত্বের অবর্তমানে নবাশ্মীয় এবং মধ্যযুগের অস্থি-নিদর্শনের বিভিন্নতাও নির্ণয় করা সম্ভব নহে। অধিকন্তু ফ্লু্অ্যরাইন্-পদার্থের বিশ্লেষণ নিশ্চিত কাল নিরূপণে অপারগ।

তৎসত্ত্বেও ফ্লু্অ্যরাইন্-বিশ্লেষণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করিয়াছে। প্রথমতঃ বলা যায় যে, এই বিশ্লেষণের ফলেই সোয়ান্‌স্‌কম্বে-করোটির (স্কাল্) এবং প্লাইষ্টোসিন্ ও অশ্যুলীয় (অশ্যুলীয়ান্) প্রস্তর হাতিয়ারের সমকালতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ফ্লু্অ্যরাইন্- পদার্থ-বিশ্লেষণ দ্বারা রোডেশিয়ান করোটির প্রাচীনত্বও প্রমাণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান জগতের প্রত্ন-বিজ্ঞানের অতীব বিস্ময়কর প্রতারণার মূল সূত্র এই পদ্ধতির বিশ্লেষণ দ্বারাই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লু্অ্যরাইন্- পদার্থের

বিশ্লেষণের ফলে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ডাওসন্ কর্তৃক আবিষ্কৃত 'পিল্টডাউন-চোয়াল' (ম্যান্‌ডিবল্) প্রাচীন ঈঅ্যানথ্রোপাস্ (আদি-মানব-প্রজাতি) প্রজাতির (স্পীশীজ-এর) অঙ্গীভূত নহে। উপরন্তু উক্ত নিদর্শন বর্তমান মানব-প্রজাতির অংশস্বরূপ। এমন কি, পিল্টডাউন-চোয়ালের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ার ও অপর নিদর্শন-সমূহও প্রতারণামূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সুতরাং ফ্লুঅ্যরাইন্- পদার্থের বিশ্লেষণই প্রমাণ করিয়াছে যে, প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত চোয়াল এবং অপর নিদর্শন পিল্ট-ডাউনের ভূতত্ত্বীয় স্তরে বিন্যস্ত করা হইয়াছিল।

(থ) অন্যবিধ বিজ্ঞান-পদ্ধতি : এতদ্‌ব্যতীত অপর অনেক বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলনও উল্লেখযোগ্য। এই সকল অনুশীলনের ফলে বিবিধ প্রত্নবস্তুর তারিখ- নির্ণয়কার্য অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। এমন কি, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বোদ্‌ঘাটন সম্ভবপর হইয়াছে। (১) রোন্‌জেন-রশ্মি (রোন্‌জেনগ্রাফি) পরীক্ষণ অপচ্ছায়া (স্পেক্‌ট্রল্)-বীক্ষণ, তাপক্রিয়া- (থারমল্) বিশ্লেষণ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ (কেমিক্যাল অ্যান্যালাসিস্) প্রভৃতির অনু-শীলনের ফলে অনেক তথ্যের গুরুত্ব প্রণিধান করা সম্ভব হইয়াছে। ধাতু-লিখন (মেটালোগ্রাফি) বিশ্লেষণ করিয়া অনেক তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। রাশিয়াতে লৌহ এবং ইস্পাতের (ষ্টীল) প্রচলন সপ্তদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে আরোপ করা যায় না। কিন্তু উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত লৌহ দ্রব্যের মেটালোগ্রাফি অনুশীলন প্রমাণ করিয়াছে যে, রাশিয়াতে দশম শতাব্দীতেও লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। রাশিয়ার নবম শতাব্দীর ইস্পাত-নির্মিত তরোয়াল নর্‌মান্‌জাত বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে উহার অপচ্ছায়া অনুশীলন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, উক্ত নিদর্শনে ন্যস্ত নিকেল (ধাতুবিশেষ) স্থানীয় লৌহ-খনিজেও বর্তমান। রোন্‌জেন্-রশ্মির সাহায্যে জীবাশ্ম-এর অঙ্গবিন্যাস (টেক্‌স্‌চ্যার),

বিভিন্ন পদার্থের সংযুতি এবং ধাতববস্তুর অনেক অদৃশ্য তথ্য অনুধাবন করা সম্ভবপর হইয়াছে। তাপক্রিয়া বিশ্লেষণের সহায়তায় কৌলাল সম্পর্কিত অনেক তথ্যের উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে। (২) শিলাবীক্ষণ (পেট্রোগ্রাফি), শস্যকণা- (গ্র্যানিউল) বিশ্লেষণ প্রভৃতি অনুধাবন করিয়া বিবিধ ভূতত্ত্বীয় পর্বের বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব হইয়াছে। (৩) মণিকবিদ্যার (মিন্যার‍্যাল্যাজি) অনুশীলন হইতে মণিক ও মণিকবৎ অনেক পদার্থের মূলতত্ত্ব প্রাণধান করা যায়। (৪) এমন কি, প্রস্তরনির্মিত শিল্প-নিদর্শনের ব্যবহারজাত ক্ষয় ও ক্ষতির মান নির্ধারণ করাও সম্ভব হইয়াছে। এই অনুশীলনের জন্য আলোকবিদ্যা-সংক্রান্ত বিবিধ যন্ত্র যেমন, বাইনকুলার লেন্স, বাইনকুলার মাইক্রোসকোপ (অনুবীক্ষণ), প্রভৃতির প্রয়োজন অধিক। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য যে, নবাশ্মীয় যুগেই প্রস্তরনির্মিত হাতলযুক্ত হাতিয়ারের প্রচলন নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু। অধুনা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাচীনতম প্রস্তরহাতিয়ারও হাতলসম্বলিত ছিল।

উপরি-বর্ণিত বিজ্ঞান-পদ্ধতিসমূহ প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বীয় কালনির্ধারণকার্যের জন্য বিশেষ উপযোগী। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্ননিদর্শনের কালনিরূপণের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ তারিখ-সম্বলিত প্রত্নবস্তু অবিদ্যমান। অতএব সাধারণ ভূতত্ত্বীয় অনুশীলন ব্যতিরেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কালনির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণই একমাত্র সহায়ক। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ননিদর্শনের নির্ধারণের জন্য একাধিক বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণ-প্রসূত নির্ধারিত তারিখই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে একাধিক বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলনযোগ্য প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার সম্ভব নহে। যে প্রত্নস্থল হইতে একাধিক বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলন-উপযোগী নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদেরই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্ভবপর।

ঐতিহাসিক যুগের প্রত্ননিদর্শনের কালনিরূপণকার্যের জন্যও বিভিন্ন বিজ্ঞান-পদ্ধতির প্রয়োগ ফলপ্রদ হইয়াছে। কালনির্দিষ্ট প্রত্নবস্তু-বর্জিত প্রত্নস্থলের কালনির্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুশীলনই একমাত্র পন্থা। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণ-প্রসূত তারিখের অসঙ্গতিও প্রমাণিত হইয়াছে। বিবিধ কারণবশতঃ এই প্রকার অসামঞ্জস্য সংঘটিত হয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-প্রসূত ও প্রত্নতত্ত্বীয় তারিখের সঙ্গতিও বর্তমান। প্রসঙ্গতঃ, রাজবাড়িডাঙ্গা হইতে আবিষ্কৃত অগ্নিদগ্ধ গম ও তণ্ডুলের কার্বন্-১৪ তারিখের সহিত লেখসম্বলিত প্রত্নবস্তু-বিন্যস্ত স্তরবিন্যাসের নির্ধারিত তারিখের সঙ্গতি উল্লেখযোগ্য। সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ঐতিহাসিক প্রত্নস্থলে উক্ত প্রকার সঙ্গতির বিদ্যমানতা অত্যাবশ্যক। বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণ-প্রসূত তারিখ দ্বারা প্রত্নতত্ত্বীয় কালনিরূপণের ভিত্তি দৃঢ়বদ্ধ হয়। ফলে, অনেক প্রত্ননিদর্শনের তারিখ-সম্পর্কিত বিতর্কের অবকাশ তিরোহিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণ-প্রসূত এবং প্রত্নতত্ত্বীয় তারিখদ্বয়ের সঙ্গতির অবর্তমানে কালনিরূপণকার্য দুরূহ ও বিতর্ক-মূলক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একাধিক বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণ-কৃত তারিখ সর্ব ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য।

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বিবিধ প্রত্ননিদর্শনের কাল নিরূপণের নিমিত্ত অনুসৃত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে আলোচিত হইয়াছে। অধিকাংশ বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণ জটিলতা-পূর্ণ এবং সময়সাপেক্ষ। এমন কি, বিবিধ বিজ্ঞান-পদ্ধতির বিশ্লেষণ-জাত কালনিরূপণ পরস্পরবিরোধী, অস্বীকৃতিমূলক এবং ভ্রমাত্মক হয়। কারণ, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বর্তমান যুগেও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অনেক ত্রুটি ও ভ্রম অদ্যাপি বিদ্যমান।

তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে উল্লিখিত বিজ্ঞান-পদ্ধতি অচিরেই পরিপূর্ণতা অর্জন

করিবে। তাহা হইলেই, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ননিদর্শনের কালনিরূপণের এবং কালনির্ঘণ্টের রূপায়ণকার্য ঐতিহাসিক যুগের নিদর্শনের কাল-নিরূপণের অনুরূপ সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইবে। প্রাগৈতি-হাসিক যুগের কালনির্ঘণ্ট স্থিরীকৃত হইলেই ঐতিহাসিকগণ মানবসংস্কৃ-তির প্রাচীনতম ইতিবৃত্তের পূর্ণাঙ্গ রূপপ্রদান করিতে কৃতকার্য হইবেন। প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেই প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগদ্বয়ের আঙ্গিক পার্থক্য দূরীভূত হইবে এবং মানবসংস্কৃতির প্রারম্ভিক কাল হইতেই তারিখ-নির্দিষ্ট ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত গ্রন্থন করা সম্ভব হইবে।

। ৫ ।

বীক্ষণাগার ও প্রত্নবস্তু

উৎখনন- বিজ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণ বীক্ষণাগারের প্রয়োজন সর্বাধিক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উৎখননের সময় ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগার সংস্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান প্রত্নতত্ত্বে প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণ ও অনুশীলনের জন্য বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য। প্রত্নতত্ত্বীয় বীক্ষণাগার দ্বিবিধ: ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগার এবং স্থায়ী বীক্ষণাগার। বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য উভয় প্রকার বীক্ষণাগারই সর্বপ্রকার সরঞ্জাম-সম্বলিত হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার বিশারদগণ উক্ত বীক্ষণাগারে স্বীয় বিশ্লেষণকার্যে নিযুক্ত থাকিবেন। উৎখননকালে যে সকল প্রত্নবস্তুর ত্বরিত সংরক্ষণ এবং অপর তথ্য উদ্‌ঘাটন করা অধিক প্রয়োজন তাহাদেরই ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগারে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশ প্রত্নবস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সময়সাপেক্ষ। সুতরাং ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগারে প্রাথমিক সংরক্ষণের ও বিশ্লেষণের কার্যক্রম পরিসমাপ্তির পর স্থায়ী বীক্ষণাগারে সর্বপ্রকার প্রত্নবস্তুর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই প্রত্নবস্তুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রকৃত সহায়ক।

উৎখননে রাসায়নিকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগারেই রাসায়নিক তাঁহার বিশ্লেষণকার্য পরিচালনা করিবেন। বীক্ষণাগারের সরঞ্জামের মধ্যে হুইলার কর্তৃক পরিবেশিত অধিক প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ উল্লেখযোগ্য : পাতিত বা পরিস্ফুট জল, নাইট্রিক অ্যাসিড্ (শোরাঘটিত অম্ল), অ্যাসিটোন্ (বর্ণহীন রাসায়নিক তরল পদার্থ), অ্যামিল-অ্যাসিটিক্ (সির্কাম্ল), সিল্‌ভ্যার-নাইট্র্যাট্ (নাইট্রিক অ্যাসিড্ হইতে প্রাপ্ত ক্ষার), সিট্রিক-অ্যাসিড্ (জম্বীরাম্ল), সালফিউরিক্ অ্যাসিড্ (গন্ধকাম্ল), অ্যাসেটিক্ অ্যাসিড্ (সির্কাম্ল), অ্যামোনিয়া, কস্টিক্ সোডা, সেলুলয়েড, লাক্ষা বা গালা (সেলাক্), সোডিয়াম, পলিভিনাইল অ্যাসিটিক্ (সির্কাম্ল), মেথিলযুক্ত স্পিরিট্ (চোলাই করা তরল দ্রব্য), প্যারি-প্লাষ্টার, কণিকাকার দস্তা (গ্রানিউল্যাটেড্ জিংক), কৃষ্ণ-সীস-ধাতু (গ্র্যাফাইট্), কপ্যার ওয়্যার্ (তাম্রতার), তাম্র এবং পিতলের দণ্ড, বিদ্যুৎ উৎপাদনার্থ ধারক-কোষ (ব্যাটারি) এবং ট্র্যান্‌স্‌ফ্যরমার (বিদ্যুৎ উৎপাদক-যন্ত্র হইতে বৈদ্যুতিক প্রবাহগ্রাহী যন্ত্র) কাঁচনির্মিত এবং মৃন্ময় আধার (গ্ল্যাস এবং পট্যারি ট্যাঙ্ক্), হাতল-সম্বলিত পাত্র, কাঁচনির্মিত থালা, পরিমাপন-গেলাস, পরীক্ষণের নিমিত্ত কাঁচের নল, কাঁচের বোতল, চামচ, ক্ষুদ্র ছুরিকা, বিবিধ ব্রুশ, সাবান, মোম, শিরিস-কাগজ, স্টোভ্ প্রভৃতি।

ক্ষেত্রীয় রাসায়নিকের প্রধানতম কার্যক্রমের মধ্যে (ক) মৃৎস্তরে বিন্যস্ত সকল অবক্ষয়প্রাপ্ত ও ক্ষণভঙ্গুর প্রত্নবস্তুর উদ্ধারণ ও পরিবহন, (খ) বায়ুর সংস্পর্শে বা সংঘাতে ক্ষয়প্রাপ্তির বা বিকৃতির হাত হইতে প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণ, (গ) ধাতুনির্মিত মুদ্রার পরিষ্করণ ও সংরক্ষণ, (ঘ) গুরুত্বপূর্ণ কৌলাল-নিদর্শন-পরিষ্করণ ও অপর মৃন্ময় বস্তুর সংরক্ষণ, (ঙ) অস্থি- ও দারু- নিদর্শনের পরিষ্করণ ও সংরক্ষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গতঃ ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগারে যে সকল প্রত্নবস্তুর পরিষ্করণ ও সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক তাহাদেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। (ক) ধাতু-নির্মিত নিদর্শন: ধাতুনির্মিত বস্তুর মধ্যে লৌহনির্মিত দ্রব্যের ত্বরিত সংরক্ষণ করা উচিত। প্রথমে প্রত্নবস্তুকে রাসায়নিক ক্রিয়ার অধীন করিতে হইবে। পরে মোম দ্বারা লৌহ দ্রব্যকে আবৃত করিয়া সংরক্ষণ করা দরকার। (খ) মুদ্রা: প্রথমে ব্রুশ দ্বারা মুদ্রাকে পরিষ্কার করিতে হয়। মুদ্রায় লিখিত তথ্য অস্পষ্ট থাকিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মুদ্রাটিকে পরিষ্কার করিতে হইবে। (গ) দারুনির্মিত বস্তু: দারুনির্মিত নিদর্শন ক্ষণভঙ্গুর। উহাদের উত্তোলন করাও আয়াসসাধ্য। উত্তোলনের পূর্বেই রাসায়নিক দ্রবণের প্রয়োগ করা বিধেয়। উত্তোলনের পরে বীক্ষণাগারে দারুনির্মিত বস্তুকে পুনরায় রাসায়নিক ক্রিয়ার অধীন করিতে হয়। লবণাক্ত ক্ষেত্রস্থ দারু-বস্তুকে লবণমুক্ত করিয়া পুনরায় রাসায়নিক দ্রবণের প্রক্রিয়ার অধীন করিতে হইবে। সাধারণতঃ অনাবৃত প্রত্নবস্তুর উপরে গালা ও স্পিরিট-সংমিশ্রিত দ্রবণ বা পলিভিনাইল অ্যাসিটেটের প্রলেপ প্রদান করা কর্তব্য। (ঘ) সেল ও চর্মনির্মিত নিদর্শনসমূহকেও উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে সংরক্ষণ করিতে হয়। (ঙ) অস্থি-নিদর্শন: উত্তোলনের পূর্বেই অস্থি-নিদর্শনের উপর রাসায়নিক দ্রবণের প্রলেপ প্রদান করা উচিত। পরে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অধীন করিতে হইবে। (চ) লেখ বা চিত্র-সম্বলিত মৃন্ময় সীল: মৃন্ময় সীলের উদ্ধারণ ও সংরক্ষণকার্য অতীব শ্রমসাধ্য। আর্দ্র মৃত্তিকায় বিন্যস্ত থাকিলে মৃন্ময় সীলের ভগ্ন-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সিক্ত সীলকে প্রথমে শুষ্ক করিতে হইবে। সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত কোন সীলকে জল দ্বারা ধৌত করা অনুচিত। শুষ্ক সীলকে তুলি ও ব্রুশ দ্বারা অতীব সাবধানতার সহিত পরিষ্কার করিতে হয়। প্রয়োজনমত বিশুদ্ধ জলের সাহায্যে ব্রুশ দ্বারা পরিষ্কার করা উচিত। এই কার্য অতীব সতর্কতার সহিত

সম্পাদন করা কর্তব্য। অন্যথায় সীলের লেখ বা চিত্র বিনষ্ট হইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, রসায়নজ্ঞ তাঁহার নিবন্ধ-গ্রন্থে সর্বপ্রকার সংরক্ষিত প্রত্নবস্তুর বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিবেন। ধ্বংসপ্রাপ্তির হাত হইতে প্রত্নবস্তুকে সংরক্ষণের নিমিত্ত অনাবৃত স্থলেই রাসায়নিক দ্রবণের ব্যবহার অধিক প্রয়োজন। উত্তোলন করিয়াই প্রত্নবস্তুসমূহকে বীক্ষণাগারে প্রেরণ করা উচিত। বীক্ষণাগারে পরিষ্করণপূর্বক পুনরায় রাসায়নিক দ্রবণের ক্রিয়ার অধীন করিয়া প্রত্নবস্তুকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়।

বীক্ষণাগারে প্রত্নবস্তুর বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের বিস্তারিত লিখন যেমন, আকার ও প্রকার, ব্যবহার, নির্মাণ-কৌশল ও পদার্থ-নির্ণয়, নির্মাণস্থল-নির্ধারণ, তারিখ-নির্ণয়, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রত্নবস্তুর তারিখ নির্ধারণ করা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। সাধারণতঃ প্রত্নবস্তুতে নির্মাণকাল লিখিত থাকে না। উৎখননের সময়ই প্রত্নবস্তু-সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য উৎখন্তা অনুশীলন করেন। তারিখ-নির্দিষ্ট প্রত্নবস্তুর সাহায্যে স্তরবিন্যাসের কাল নির্ধারিত হয় এবং উহার সহিত স্বাভাবিক অবস্থায় আবিষ্কৃত সকল সংশ্লিষ্ট প্রত্ননিদর্শনই উক্ত তারিখভুক্ত হইবে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে মৃৎস্তরে বিন্যস্ত প্রত্নবস্তুর সমকালতা প্রমাণ করা সম্ভব নহে। এই সকল ক্ষেত্রে উৎখনকের অনুরূপ প্রত্নবস্তুর অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। আকার ও গঠন অনুসারে প্রত্নবস্তুর শ্রেণীবিন্যাস রূপায়ণ করাও উৎখনকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। পরে অন্য প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত সমতাবাচক প্রত্নবস্তুর সহিত তুলনামূলক অনুশীলন করিয়া তারিখ নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত নহে।

বর্তমান প্রত্নবিদগণের মতে প্রত্নবস্তুর কেবলমাত্র আঙ্গিক বিশ্লেষণ করিয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অবৈজ্ঞানিক। অধুনা সর্বপ্রকার প্রত্নবস্তুর বিস্তারিত অনুশীলন প্রয়োজন। এই

কার্যের জন্য বিবিধ বিজ্ঞান-শাখা যেমন, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পরিসংখ্যান- বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়-সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। উক্ত অনুশীলনের কার্যক্রমের জন্যও বীক্ষণাগার অপরিহার্য। সর্বপ্রথমেই প্রত্নবস্তুর তারিখ নির্ধারণ করা আবশ্যক। পূর্বেই 'কালনিরূপণ' অনুচ্ছেদে প্রত্নবস্তুর তারিখনির্ণয়ের নিমিত্ত বিবিধ বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলন আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ২০৩-২৫০)। উল্লিখিত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বীক্ষণাগারেই সম্পন্ন করিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত প্রত্নবস্তু সম্পর্কিত অপর কার্যক্রমও বীক্ষণাগারে পরিচালনা করিতে হয়। এই কার্যক্রমের মধ্যে প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণ ও পুনর্গঠন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ করা প্রয়োজন। এই সকল পদ্ধতিও বিজ্ঞান-গবেষণালব্ধ তত্ত্বভিত্তিক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আবরণমুক্ত সকল পদার্থের অবক্ষয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। প্রথমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনাবৃত ক্ষেত্রেই প্রত্নবস্তুকে রাসায়নিক ক্রিয়ার অধীন করা একান্ত প্রয়োজন। পরে উত্তোলন করিয়া প্রত্নবস্তুকে বীক্ষণাগারে প্রেরণ করিতে হইবে। বীক্ষণাগারে পরিষ্করণ এবং পুনরায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অধীন করিয়া প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণকার্যক্রম সমাপন করিতে হয়।

সংরক্ষণ ব্যতিরেকে প্রত্ননিদর্শনের পুনর্গঠন বা 'পুনর্বিন্যাস অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। প্রত্নবস্তুর আংশিক নিদর্শন হইতে উহার পূর্বতন আকার ও রূপের পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস' করা সম্ভবপর। এমন কি, অশ্মীভূত মানবদেহের অংশবিশেষ হইতেও উহার প্রকৃত রূপ ও আকার পুনর্গঠিত হইয়াছে। সৌধের আংশিক নিদর্শন হইতেও উহার পূর্ণাঙ্গ আকার রূপায়ণ করা সম্ভব। অধিকাংশ প্রত্নস্থলের গুরুত্বপূর্ণ সৌধ-নিদর্শন পুনঃরূপায়িত হইয়াছে।

এতদ্‌ভিন্ন বীক্ষণাগারে প্রত্নবস্তু সম্পর্কিত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক

কার্যক্রমও উল্লেখনীয়। বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলেই প্রত্ন-বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ এবং তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হইয়াছে। প্রত্ন-বস্তুর স্বরূপ ও তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিবিধ যন্ত্র বা সাধিত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যেই প্রত্নবস্তু সংক্রান্ত অনেক অজ্ঞাত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক নিদর্শনের নির্মাণ-কৌশলজনিত এবং নির্মাণকাল ও উৎপত্তি সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য উন্মিষিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বীক্ষণাগারে কতিপয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকার্য উল্লেখনীয়।

(ক) নিবিড়তা-নির্ধারণ (ডেনসিটি ডিট্যারমিনেসন্): প্রধানতঃ, স্বর্ণনির্মিত বস্তুর সূক্ষ্মতা এবং চিত্তোৎকর্ষতা ও বিশুদ্ধতা নির্ধারণের জন্য উহার নিবিড়তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। বায়ুতে এবং জলে পরীক্ষিত নিদর্শনের ওজন নির্ণয় করিতে হইবে। বায়ুতে নিদর্শনের ওজনকে জলের এবং বায়ুর ওজনের পার্থক্যজাত সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া নিবিড়তা নির্ণয় করিতে হয়। স্বর্ণের নিবিড়তা ১৯.৩। অতএব এই বিশ্লেষণ দ্বারা স্বর্ণের সহিত অপর খাদের সংমিশ্রণ-সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারণ করা যায়। এই বিজ্ঞান-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ক্যালে (১৯৪৭) অনেক প্রাচীন রোমক স্বর্ণমুদ্রা বিশ্লেষণ-পূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অধিকাংশ মুদ্রায় ৯৫% স্বর্ণধাতু বিদ্যমান।

(খ) বর্ণালি-লিখন (স্পেক্‌ট্রোগ্রাফি): দ্বি ধাতুর তড়িৎ-দ্বারে (ইলেক্‌ট্রোড্) বৈদ্যুতিক (ইলেক্‌ট্রিক) স্ফুলিঙ্গ (স্পার্ক্) চালিত হইলে আলোক নির্গত হয়। এই আলোক-নিক্ষেপণ বর্ণালি-মাপক (স্পেক্‌ট্রোমিটার) যন্ত্র দ্বারা অনুশীলন করিয়া পরীক্ষিত নিদর্শনের সংমিশ্রিত পদার্থসমূহ নির্ণয় করা যায়। উক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য ধাতুনির্মিত বস্তু, মুদ্রা, কৌলাল, কাঁচনির্মিত দ্রব্য প্রভৃতি বিশেষ উপযোগী।

(গ) এক্‌স্-রশ্মি-প্রতিপ্রভ বর্ণালি-মাপন (এক্‌স্-রে ফ্লুওরে-

সেণ্ট স্পেক্‌ট্রোমেট্রি) : প্রত্নবস্তুর পৃষ্ঠের একস্‌-রশ্মিজাত আলোক-চিত্র পরীক্ষা করিয়া প্রতিপ্রভ নির্ণয় করা যায়। এই পরীক্ষণকার্যে প্রত্নবস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কৌলাল-নিদর্শন এই বিশ্লেষণের নিমিত্ত সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

(ঘ) একস্‌-রশ্মি- বিচ্ছুরণ-বিশ্লেষণ (একস্‌-রে ডিফ্রাক্‌সন্‌ অ্যানালিসিস্‌) : এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা কৌলাল-নিদর্শনের খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়। এমন কি, মৃৎপাত্র নির্মাণে ব্যবহৃত আদি মৃত্তিকার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাও সম্ভবপর। পোয়ানে কৌলাল দগ্ধ হইবার সময়ে অগ্নির তাপমাত্রাও নির্ধারণ করা যায়। এতদ্‌ভিন্ন রশ্মির বিচ্ছুরণ বিশ্লেষণ করিয়া ব্রোঞ্জ-ধাতুর উপর কৃত্রিম মরিচার প্রকৃতিও নির্ণয় করা হইয়াছে।

(ঙ) নিউট্রন্‌- (বিদ্যুতের অক্রিয় কণা বা পরমাণুর কেন্দ্রীয়) সক্রিয়তা- (অ্যাক্‌টিভ্যাস্‌ন্‌) বিশ্লেষণ : বিদ্যুতের অক্রিয় কণা এবং গামা-রশ্মি পদার্থে শোষিত হয়। এই বিদ্যুতের অক্রিয় কণার সক্রিয়তা নির্ণয় করিয়া অনেক মৌলিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে। প্রধানতঃ মুদ্রা ও কৌলাল-নিদর্শন উক্ত বিশ্লেষণের যথোপযোগী প্রত্নবস্তু। ষোড়শ শতাব্দীতে পারদমিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া সুইডেনের রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। নিউট্রোন্‌-অ্যাক্‌টি-ভ্যাস্‌ন্‌ বিশ্লেষণপূর্বক পাত্রে পারদের স্থিতি নির্ণয় করিয়া উক্ত ঘটনার প্রামাণিকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(চ) বিটা-রশ্মি-বিশ্লেষণ (বিটা-রে ; পদার্থের পরমাণু বিভাজনের স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় উদ্‌গত বিটা পার্টিক্‌ল্‌) : প্রত্ননিদর্শনে বিটা-রশ্মি বর্তমান থাকে। কতিপয় বিটা-কণা শোষিত হয় এবং অপর কণা নির্গত হয়। বিপরীত বিক্ষেপক- মিটারের সাহায্যে উক্ত কণা নির্ণয় করা যায়। এই বিশ্লেষণ দ্বারা কাঁচনির্মিত বস্তুতে এবং উজ্জ্বল প্রলেপে সীসকের অস্তিত্ব নির্ণয় করাও সম্ভবপর।

উপরি-উক্ত বিবিধ বিশ্লেষণ ব্যতীত প্রত্ননিদর্শনের অপর বৈজ্ঞানিক অনুশীলন পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে। উল্লিখিত সকল-প্রকার বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম বীক্ষণাগারেই সম্পন্ন করিতে হয়। কিন্তু বীক্ষণাগারে প্রত্নবস্তুর বিশ্লেষণই উৎখনকের একমাত্র কার্য নহে। বীক্ষণাগারের বিশ্লেষণলব্ধ তথ্যের সহিত অপর বীক্ষণাগার-জাত অভিজ্ঞানের তুলনামূলক অধ্যয়ন করিতে হইবে। এই তুলনামূলক অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন বীক্ষণাগারে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত প্রত্নবস্তু-সম্পর্কিত সকল প্রকার তথ্যের অনুধাবন করাও প্রয়োজন। উক্ত অনুশীলনের সাহায্যেই প্রত্নবস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর।

। ৬ ।

প্রত্নবস্তু ঃ অপসারণ

উৎখনন- উত্তর প্রত্নস্থল হইতে সংরক্ষিত অস্থাবর প্রত্নবস্তু-অপসারণের কার্যক্রম উল্লেখনীয়। সাধারণতঃ স্থাবর বা নিশ্চল প্রত্ননিদর্শন যথাস্থানেই সংরক্ষণ করা কর্তব্য। স্বস্থানে বিন্যস্ত অবস্থায়ই স্থাবর প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃত পরিচয় বা স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। অনাবৃত মন্দিরের গাত্র হইতে কোন মূর্তি বা অপর নিদর্শন অপসারিত করিলে মন্দিরের তথা ধর্মীয় ইতিহাসের রূপায়ণ-কার্য ব্যাহত হইবে। অতএব উৎখনন- উত্তর যথাসম্ভব প্রত্ননিদর্শন-সমূহকে স্বস্থানেই যথাবৎ সংরক্ষণ করা কর্তব্য।

প্রত্নস্থলের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত সংগ্রহশালায় আবিষ্কৃত অস্থাবর এবং ক্ষুদ্রাকার প্রত্নবস্তু সংরক্ষিত হওয়া উচিত। কারণ, উৎখননদ্বারা অনাবৃত প্রত্নস্থলের পরিপ্রেক্ষিতেই স্বস্থানে বিন্যস্ত প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। এই কারণবশতঃ অধুনা অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলের সন্নিকটে সংগ্রহশালা সংস্থাপন করা

হয়। এই প্রকার সংগ্রহশালা ক্ষেত্রীয় সংগ্রহশালা বা 'সাইট্ মিউজিয়াম্' নামে অভিহিত। ভারতবর্ষের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থলের সন্নিকটে ক্ষেত্রীয় সংগ্রহশালা সংস্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রীয় সংগ্রহশালার মধ্যে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা তক্ষশিলা, নালন্দা প্রভৃতি প্রত্নস্থলের সংগ্রহশালার নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল সংগ্রহশালায় পরিদর্শকবৃন্দ ও প্রত্নবিদ্‌গণ উৎখনিত প্রত্ন-স্থলের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্নবস্তুর যথার্থ অনুশীলন করিতে পারেন। সাধারণ দর্শকগণের পক্ষেও আবরণমুক্ত প্রত্নস্থলের সন্নিকটস্থ সংগ্রহশালায় রক্ষিত প্রত্নবস্তুর সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা অধিক সহজসাধ্য।

উৎখনন- সমাপ্তিপর্বের কার্যক্রমও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উৎখনন-কার্যে ব্যবহৃত বিবিধ সরঞ্জামের যথাযথ পরিবহণের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উৎখনন- উত্তর অধিকাংশ প্রত্নস্থল হইতে প্রত্নবস্তু অপসারণ করিতে হয়। অতএব প্রত্নবস্তুর অপসারণ ও পরিবহণ-সংক্রান্ত কার্যক্রম অধিক সতর্কতার সহিত সম্পাদন করা কর্তব্য। সাধারণতঃ প্রত্নবস্তু ক্ষণভঙ্গুর। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগারে সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর প্রাথমিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া কাষ্ঠনির্মিত পেটিকাতে তাহাদের ন্যস্ত করিতে হয়। তৎপরে যথাসময়ে পোতাশ্রয়ে বা রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রেরণ করিয়া পরিবহণের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর বীক্ষণাগারে পরীক্ষণের এবং সংগ্রহশালায় সুরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। তৎপরে উৎখননের প্রতিবেদন লিখিবার জন্য প্রত্নবস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন করিতে হইবে।

। ৭ ।

প্রত্নবস্তু ও সংগ্রহশালা

উৎখননকার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে এবং সমাপ্তির পর সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত প্রত্নবস্তুর অধ্যয়নও অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্য। উৎখনন- উত্তর সকল প্রকার প্রত্নবস্তুকেই সংগ্রহশালায় সুবিন্যস্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা কর্তব্য। বিবিধ প্রত্নবস্তু এমনভাবে সংগ্রহশালায় বিন্যস্ত করিতে হইবে যাহাতে উৎখনক তুলনামূলক অনুশীলন করিয়া মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত-এর ধারাবাহিক রূপ সম্যকভাবে রূপায়িত করিতে সমর্থ হন। ব্যক্তীকরণের জন্যই প্রত্নবস্তুর সুবিন্যাস একান্ত প্রয়োজন। এই প্রকার অনুশীলন দ্বারা উৎখননের সহিত জড়িত অনেক সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত করাও সম্ভবপর।

সংগ্রহশালায় দ্বিবিধ প্রত্নবস্তু সংরক্ষিত থাকে : (ক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসৃত উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু এবং (খ) অবৈধ উপায়ে আবিষ্কৃত বা সাধারণভাবে আহৃত প্রত্নবস্তু। প্রথমোক্ত প্রত্নবস্তু সম্পর্কে কোন প্রকার কৃত্রিমতার প্রশ্ন অমূলক। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রত্নবস্তু বিভিন্ন উপায়ে সংগৃহীত হয়; যেমন, সাধারণ বা অবৈধ খননকার্য দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু, ভূপৃষ্ঠ হইতে সংগৃহীত প্রত্নবস্তু, পুষ্করিণী বা নালা-খননজাত প্রত্নবস্তু, মানবীয় ও পশুদিগের তৎপরতায় আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু, ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে ক্রীত প্রত্নবস্তু ইত্যাদি। এই সকল প্রত্নবস্তুর অনুশীলন-প্রসূত তথ্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবিদ্যমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত প্রত্ননিদর্শনের অনুশীলন-জাত ইতিবৃত্ত বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক।

অবৈধ খননকার্য দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু ব্যবসায়িগণের এখ্‌তিয়ারভুক্ত হয়। এই সকল প্রত্নবস্তুই পরে সংগ্রহশালায় স্থান পায়। কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্নবিজ্ঞানে প্রত্নবস্তুর যথার্থ অনুশীলন উহার সহিত সংশ্লিষ্ট নিদর্শনের উপরই সম্পূর্ণভাবে

নির্ভরশীল। ঐতিহাসিক তথ্যবিজড়িত প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব বা মূল্য বর্ধিত করিবার জন্য ব্যবসায়িগণ নানাবিধ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে প্রত্নবস্তু দেশদেশান্তরে প্রেরিত হয় এবং উহাদের যথাবস্থান ও অপর প্রয়োজনসাধক তথ্য চিরতরে বিলুপ্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ ইউরোপের ও আমেরিকার একাধিক সংগ্রহশালায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত প্রত্নবস্তুর বিরাজমানতা উল্লেখযোগ্য। প্রত্নবিজ্ঞানের বিচারে সংগ্রহশালায় রক্ষিত এই সকল প্রত্নবস্তুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার্য নহে। শিল্পকলা বা ললিতকলার দৃষ্টিতে মনোরম প্রত্নবস্তুর মূল্য অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিবৃত্ত রূপায়ণকার্যে উক্ত প্রত্নবস্তুর উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা অনুচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এই শ্রেণীভুক্ত প্রত্নবস্তুর আধিক্য বর্তমান। সংগ্রহশালায় সর্বপ্রকার মনোরম প্রত্নবস্তুকে কাষ্ঠাধারে সুবিন্যাস করিয়া সাধারণ দর্শকবৃন্দকে বিমুগ্ধ করা সম্ভবপর। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকট উক্ত প্রত্নবস্তুর মৌলিক ভিত্তি অবিদ্যমান। ললিতকলার বা কারুশিল্পের নিদর্শনসমূহ ক্রয়-পূর্বক সংগ্রহশালায় সুসজ্জিত করিয়া প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন করা যায় না। কারণ, মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণকার্যে এই সকল প্রত্নবস্তুর মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নহে। সুতরাং কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসৃত উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর অনুশীলনই ইতিহাস রূপায়ণের যথার্থ নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক নিদর্শন।

এতদ্‌ভিন্ন অধিকাংশ সংগ্রহশালায় কৃত্রিম প্রত্নবস্তুর সংখ্যাও ন্যূন নহে। প্রকৃত প্রত্নবস্তুর অনুকরণে কৃত্রিম প্রত্নবস্তু তৈয়ার করা সম্ভবপর। সাধারণতঃ পুরাবস্তু-ব্যবসায়িগণ উক্ত প্রকার কৃত্রিম প্রত্ননিদর্শন সংগ্রহশালায় বিক্রয় করে। সুতরাং কৃত্রিম পুরাবস্তুর সনাক্তকরণ প্রত্নতত্ত্ববিদের অপর একটি দায়িত্বপূর্ণ কার্য।

সাধারণতঃ যে সকল পুরাবস্তুর উপর প্রাচীনত্বের চিহ্ন (প্যাটি-

নেসন্) বর্তমান থাকে তাহাদের অনুকরণ সহজসাধ্য নহে। প্রস্তর, ব্রোঞ্জ, রৌপ্য প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা নির্মিত বস্তুর কৃত্রিম প্রতিরূপ রূপায়ণ করাও সম্ভবপর নহে। কারণ, কালপ্রবাহের, ফলে উক্ত পদার্থনির্মিত বস্তুর উপর প্যাটিনা-চিহ্ন উৎপাদিত হয়। এই চিহ্ন অনুকরণ করা অসম্ভব। প্রাচীনত্বের চিহ্ন উৎপাদনের নিমিত্ত প্রত্নবস্তুর ন্যূনপক্ষে ১৫০০ বৎসরের অধিক পুরাতন হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং ইউরোপের নবজাগরণজাত ভাস্কর্য ও অপর শিল্পনিদর্শনের অনুকরণ সহজসাধ্য। কাঁচনির্মিত বস্তুর অনুকরণও সম্ভব নহে। অন্য পক্ষে স্বর্ণনির্মিত বস্তুর উপর প্রাচীনত্বের চিহ্ন উৎপাদিত হয় না। সুতরাং স্বর্ণনির্মিত বস্তুর অনুকরণ করা সহজসাধ্য। তাহা ছাড়া চাহিদার জন্যও স্বর্ণনির্মিত বস্তুর অধিক অনুকরণ করা হয়। এই কারণবশতঃই এট্রাস্কান্ স্বর্ণালঙ্কারের অনুকরণে নির্মিত কৃত্রিম অলঙ্কার ইউরোপে বহুল প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু রৌপ্যনির্মিত বস্তুর অনুকরণ সম্ভব নহে। কারণ, উহার কৃত্রিমতা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়। গজদন্ত ও প্রস্তরনির্মিত বস্তুর অনুকরণ করাও সম্ভবপর। চূনাপাথর, স্তূপীকৃত শিলা প্রভৃতির উপরও প্রাচীনত্বের চিহ্ন উৎপাদিত হয় না। সুতরাং উক্ত পদার্থ-নির্মিত বস্তুর অনুকরণ করা সহজ। প্রসঙ্গতঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত মুদ্রার কৃত্রিম প্রতিরূপ- তৈয়ার উল্লেখযোগ্য। এই সকল মুদ্রার কৃত্রিমতা নির্ণয় করাও সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে। কারণ, রাসায়নিক ক্রিয়ার অধীন করিলে মুদ্রার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা অধিক। কৃত্রিম মুদ্রা মৃত্তিকা গর্ভে বিন্যস্ত রাখিয়া প্রাচীনত্বের ছাপ উৎপাদন করা যায়।

উল্লিখিত বিবিধ কৃত্রিম প্রত্নবস্তুর সনাক্তকরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অধীন করিয়া কৃত্রিমতা নির্ণয় করা হয়। সাধারণতঃ উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু কৃত্রিম হওয়া অস্বাভাবিক। স্বাভাবিক অবস্থায় বিন্যস্ত

প্রত্নবস্তুর আবিষ্কারের প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে মৃত্তিকাগর্ভে বিন্যস্ত কৃত্রিম নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৃত্তিকা স্তরবিন্যাসের অনুশীলন এবং নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পূর্বক কৃত্রিমতা নির্ণয় করা সম্ভবপর। প্রসঙ্গতঃ পিল্‌টডাউন হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের কৃত্রিমতা-নির্ধারণ উল্লেখযোগ্য (পৃঃ ২৪৬-৪৭)।

নির্ধারিত স্তরবিন্যাস এবং সংস্কৃতি-পর্বানুসারে সর্বপ্রকার উৎখনিত প্রত্নবস্তুকে সংগ্রহশালায় বিন্যাস করা উৎখনকের অপর গুরুত্বপূর্ণ কার্য। এই প্রত্নবস্তু বিন্যাসের উপরই ইতিবৃত্তের রূপায়ণ-কার্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সংগ্রহশালায় বিন্যস্ত প্রত্ননিদর্শনের অনুশীলনজাত ব্যাখ্যার সাহায্যেই বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের যথার্থ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিতে হয়। এতদ্‌ব্যতীত সংগ্রহশালায় রক্ষিত অন্য প্রত্নস্থল হইতে উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত অনুরূপ প্রত্ননিদর্শনের তুলনামূলক অনুশীলন করাও প্রয়োজন। উৎখনন-উত্তর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত উক্ত নিদর্শনসমূহ অনুশীলন করিয়া উৎখনন-প্রতিবেদনের রূপায়ণ করাই উৎখনকের প্রধানতম কার্য। উৎখনন-বিবরণী ও ইতিহাস-লিখনের জন্যই সকল প্রকার প্রত্ন-নিদর্শনের স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন করা সর্বপ্রথম কর্তব্য। মানবসংস্কৃতির ইতি-বৃত্ত রূপায়ণের নিমিত্ত উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের ব্যক্তীকরণ ও মৌলিক কার্যনির্ণয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রত্নবস্তু : স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন

। ১ ।

উৎখনন ও ইতিহাস-লিখন

বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসৃত উৎখনন দ্বারা ভূগর্ভে রক্ষিত প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার, লিপিকরণ, কালনিরূপণ, বিবরণী-লিখন ও প্রকাশন উৎখনকের অত্যাবশ্যক কার্যক্রম। সাধারণতঃ বলা হয় যে, প্রত্ননিদর্শনের ব্যাখ্যা-প্রদান বা অর্থান্তর-বিন্যাস করা উৎখনকের এখ্‌তিয়ারভুক্ত কার্য নহে। কোন কোন প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে ইতিহাস-লিখন এবং উৎখনন- বিবরণীর রূপায়ণ ও প্রকাশন-সংক্রান্ত কার্যক্রম উৎখনকের গুরুদায়িত্বের বহির্ভূত। তাঁহারা মনে করেন যে, উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের স্বরূপ-কথন ও ইতিহাস-লিখন আরাম-কেদারায় আসীন প্রত্নতত্ত্ব-বিদের কার্য। উৎখনন- খাদে পদার্পণ করেন নাই এমন অনেক তথাকথিত প্রত্নতত্ত্ববিদের বিদ্যমানতাও বিরল নহে। কার্যতঃ প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন দ্বিবিধ—ক্ষেত্রীয় এবং আভ্যন্তরীণ। যাহারা গ্রন্থাগারে বা সংগ্রহশালায় আরাম-কেদারায় উপবেশন করিয়া প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত প্রত্ননিদর্শনের অনুশীলনপূর্বক ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করেন তাঁহারাই আরাম-কেদারায় আসীন বা আভ্যন্তরীণ প্রত্নতাত্ত্বিক নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ এবং উৎখনন দ্বারা প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কারক ও ইতিবৃত্ত-লেখক ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নামে অভিহিত। কিন্তু প্রত্নবিজ্ঞানে উক্ত প্রকার দৃঢ়বদ্ধ বিভাজন সম্পূর্ণ অবাস্তব। যদিও স্বীকার্য যে, পৃথিবীর বিভিন্নাংশে প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনকার্যে ব্রতী এমন অনেক বেত্তা বর্তমান, যাঁহারা

উৎখননতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এমন কি, তাঁহারা কোনদিন প্রত্নস্থল বা উৎখনন কার্যক্রম পরিদর্শনও করেন নাই। তাঁহাদের পক্ষে উৎখনিত প্রত্নবস্তুর অনুশীলনকার্যে ব্রতী হওয়া ধৃষ্টতা। প্রত্ননিদর্শনের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। উৎখননতত্ত্বে অজ্ঞ বিশারদগণের পক্ষে প্রত্ননিদর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করাও অসম্ভব। উৎখননের সাহায্যে আবিষ্কৃত নিদর্শনের অনুশীলন করিয়া এই সকল তথাকথিত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মানবসংস্কৃতির ইতিহাস লিখিলে তাহা বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মধ্যযুগের সংরক্ষিত দলিলের পাঠোদ্ধারকার্যে অজ্ঞ ঐতিহাসিকের পক্ষে ইতিহাস-রূপায়ণ করিবার প্রচেষ্টা বিফল হওয়াই স্বাভাবিক। তদ্রূপ উৎখননতত্ত্বে অজ্ঞ পুরাশাস্ত্রবিদ্ কর্তৃক উৎখনিত প্রত্ননিদর্শনের অনুশীলনজাত ইতিবৃত্তও ভ্রমাত্মক হইবে। ভারতবর্ষে উল্লিখিত তথাকথিত প্রত্নতত্ত্ববিদের সংখ্যা অত্যধিক। তাঁহাদের প্রত্নতত্ত্ববিদ আখ্যায় ভূষিত করাও অবৈধ। বাস্তব নিদর্শনভিত্তিক মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য কেবলমাত্র ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ববিদের বা উৎখনন-বেত্তার কার্যক্রমই বিজ্ঞানমহলে স্বীকৃত।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত উৎখনন দ্বারা মৃত্তিকাগর্ভ হইতে প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কার করাই উৎখনকের একমাত্র লক্ষ্য নহে। মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই উৎখনকের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবসংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণ করিবার জন্যই উৎখনন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শন সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত রাখিলেই ইতিহাস রূপায়িত হয় না। ইতিহাস-রূপায়ণ-বর্জিত উৎখনন ধ্বংসতুল্য। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস-লিখনে অপারগ বা অবহেলাকারী ও অমনোযোগী উৎখনক মানবসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ ধ্বংসকারী। কেবলমাত্র উৎখনকই প্রত্ননিদর্শনের মৌলিক অর্থ উদ্ঘাটন করিয়া মানবসংস্কৃতির ইতিহাস-লিখনে কৃতকর্মা। সুতরাং উৎখনন-উত্তর প্রত্ননিদর্শনের অনুশীলন করিয়া ইতিহাস-

লিখন বা উৎখনন- প্রতিবেদন রূপায়িত করাই উৎখনকের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্য। এই কার্য সম্পাদনের জন্য আবিষ্কৃত জড়বস্তুসমূহের মর্মার্থ বিন্যাস করা প্রাথমিক প্রয়োজন।

সকল বাস্তব নিদর্শনই অচেতন, নীরব এবং বাক্‌শক্তিবিহীন। এই অচেতন নিদর্শনসমূহকে সচেতন করিয়া বাক্য নিষ্কর্ষণ করাই উৎখনকের মুখ্য কার্য। অর্থাৎ, অচেতন বাস্তব নিদর্শন বিশ্লেষণ পূর্বক ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। ঐতিহাসিক যুগভুক্ত প্রত্নবস্তুর অনুশীলন করিয়া অধিকতর বাস্তব তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। কারণ, লিখিত উপাদানের সাহায্যে বাস্তব নিদর্শনের সবিশেষ বর্ণনা প্রদান করা সহজসাধ্য। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্ত-রূপায়ণের কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে জড় পদার্থভিত্তিক। লিখিত উপাদানের অবিদ্যমানতা সত্ত্বেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের আবিষ্কৃত জড়নিদর্শনসমূহ তৎকালীন মানবসংস্কৃতির সম্যক্ চিত্র পরিবেশন করে। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐতিহাসিক যুগ অপেক্ষা প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্র অধিকতর নিষ্প্রভ। তথাপি বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার গবেষণা- প্রসূত তত্ত্বের সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির ধারা বা গতি সম্যক্‌ভাবে রূপায়ণ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের এবং প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের জন্য প্রামাণিক প্রত্নবস্তুর প্রয়োজন সর্বাধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সর্বত্রই অপ্রামাণিক প্রত্নবস্তুর আধিক্য বিদ্যমান। এমন কি, মন্তব্য করা হইয়াছে যে, ৫০% এর অধিক প্রত্নবস্তুর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ-অনুচ্ছেদে অপ্রমাণিত প্রত্নবস্তু-সম্পর্কিত আলোচনা উল্লেখনীয়। প্রথমতঃ অতীতের অধিকাংশ উৎখননের কার্যক্রম অবৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে পরিচালিত হইয়াছে। ফলে প্রত্নবস্তুর যথাযথ লিপিকরণ সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, অতীতের অধিকাংশ উৎখননের বিবরণীও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং উক্ত উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর

সম্যক্ পরিচিতি লাভ করাও সম্ভব নহে। তৃতীয়তঃ, সংগ্রহশালায় প্রত্নবস্তুর ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণের জন্যও অনেক প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, প্রত্নবস্তু সংগ্রাহকগণ অনেক ভ্রমাত্মক তথ্যও পরিবেশন করিয়াছেন। পঞ্চমতঃ, কৃত্রিম প্রত্নবস্তুর আধিক্যও উল্লেখযোগ্য। কৃত্রিম প্রত্নবস্তু-প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইতিবৃত্ত-রূপায়ণকার্যে প্রামাণিকতাবর্জিত প্রত্নবস্তুর উপর নির্ভর করা অবৈধ। ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসৃত উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে লিপিকৃত প্রত্নবস্তুর উপরই নির্ভর করিতে হইবে। প্রত্ননিদর্শন অনুশীলন করিয়া ইতিহাস-লিখনই উৎখনকের প্রধানতম কার্য।

এই প্রসঙ্গে মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর স্বরূপকথন ও কার্যনির্ণয় সম্পর্কিত পর্যালোচনা প্রয়োজন। প্রত্নবস্তুর স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন করিবার নিমিত্ত দ্বিবিধ পর্যালোচনা করিতে হইবে—বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন।

। ২ ।

প্রত্ননিদর্শন : বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও স্বরূপ-কথন

মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই উৎখননের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিহাস-রূপায়ণে অপারগ উৎখনন ধ্বংসসাধক। বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নিষ্ঠা দ্বারা উৎখনন পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় ইতিহাস-রূপায়ণ বিকৃত হইবে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসৃত উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনই ইতিবৃত্ত রূপায়ণের মৌলিক উপাদান। বর্তমানে বিবিধ বিজ্ঞান-গবেষণা-প্রসূত পদ্ধতির প্রয়োগের উপর প্রত্ননিদর্শনের অনুশীলন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। প্রত্ননিদর্শনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুশীলনজাত অভিজ্ঞানই ইতিহাস-

রূপায়ণকার্যের সুদৃঢ় ভিত্তি। পূর্বের পরিচ্ছেদে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্নবস্তুর কালনিরূপণ এবং অপর তথ্যসমূহ আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ২০৩-৫০)। উক্ত আলোচনা ব্যতীত প্রত্নবস্তুর স্বরূপ-কথনের নিমিত্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলন করা প্রয়োজন। প্রত্ননিদর্শনের বৈজ্ঞানিক অনুশীলনজাত তথ্য ও ইতিহাস-লিখনতত্ত্ব এই অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়। আলোচনার সুবিধার্থে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকৃত প্রত্ননিদর্শনসমূহকে দ্বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে : (১) অস্থিনিদর্শন এবং (২) অপর প্রত্ননিদর্শন।

(১) অস্থিনিদর্শন : সাধারণতঃ উৎখনকগণ অস্থিনিদর্শন সম্পর্কে অধিক সচেতন নহেন। কারণ, বাস্তুনিদর্শন এবং অপর প্রত্নবস্তুর আবিষ্কারের উপরই উৎখনকগণ অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অস্থিনিদর্শন মানবসমাজের ইতিহাস রূপায়ণের অমূল্য সম্পদ। অস্থিনিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া জলবায়ু, তাপ-মাত্রা, প্রাণিকুল, উদ্ভিদকুল, মানুষের জীবনযাত্রা প্রভৃতি-সংক্রান্ত অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। এই বৈজ্ঞানিক অনুশীলন-কার্যের জন্য প্রাণিবিদ্যাবিশারদগণের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। সকল প্রকার অস্থিনিদর্শনের শ্রেণীবিন্যাস, সনাক্তকরণ, সংখ্যানিরূপণ, পরিমাপ গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম বৈজ্ঞানিক অনুশীলন-ভিত্তিক।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আবিষ্কৃত অস্থি-নিদর্শনসমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায় : (ক) পশুঅস্থি নিদর্শন, (খ) পক্ষি-অস্থিনিদর্শন, (গ) জলজাত প্রাণিকুলের অস্থিনিদর্শন এবং (ঘ) নর-অস্থিনিদর্শন।

(ক) পশুঅস্থি-নিদর্শন : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত পশুঅস্থি-নিদর্শনের মধ্যে সাধারণ পশুর অস্থি নিদর্শন, গিরিগুহায় বিন্যস্ত হিংস্র পশুর অস্থিনিদর্শন, গৃহপালিত পশুর অস্থি-নিদর্শন, স্তন্যপায়ী প্রাণিকুলের অস্থিনিদর্শন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই সকল অস্থিনিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া অনেক প্রামাণিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পরিবেশ নির্ণয় করিবার জন্য পশুর অস্থি-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক। ভূতত্ত্বীয় যুগের শেষ-পর্যায়ে অনেক প্রাচীন পশুর বিলোপ এবং নূতন পশুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। হিমযুগের এবং আন্তঃহিমযুগের বিবিধ পর্যায়ের প্রাণি-কুলের বিদ্যমানতাও ভিন্ন ছিল। ভূতত্ত্বীয় যুগের পশুঅস্থি-নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া জলবায়ুর এবং হিমযুগের বিভিন্ন পর্যায়ের কালনিরূপণ করাও সম্ভব হইয়াছে। ভৌগোলিক এবং জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্য ব্যতিরেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের জীবনধারণ ও আচার-অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত অনেক তথ্যও উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে। এমন কি, পশুঅস্থি-নিদর্শনের অনুশীলনপূর্বক প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোকবসতির অবস্থান্তরও নির্ণীত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পশুপালন এবং খাদ্য-উৎপাদন-সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রবর্তনের ফলেই মানুষের বসতি স্থাপন আরম্ভ হয়। বসতি স্থাপনের সঙ্গেই জীবনধারণ, যানবাহন, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্পর্কিত অনেক পরিবর্তনও সাধিত হইয়াছিল। কালক্রমে মানুষ সভ্যতার যাত্রাপথে অগ্রসর হইতে থাকে। পশুর অস্থিনিদর্শন অনুশীলন করিয়া মানব-সংস্কৃতির বিবর্তনের বিবিধ ধারা নির্ধারণ করাও সম্ভবপর হইয়াছে।

কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অস্থিনিদর্শনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা বাঞ্ছনীয় নহে। পশুর অস্থিখণ্ড মানুষের তৎপরতার ফলে কোন একটি বিশেষ স্তরে বিন্যস্ত হওয়াও স্বাভাবিক। এই নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয় না যে, আবিষ্কৃত প্রত্নস্থলের কোন এক সংস্কৃতি-পর্বে উক্ত পশুকুলই একমাত্র বিরাজমান ছিল। উপরন্তু আরও অনেক পশুর বিদ্যমানতাও স্বাভাবিক। বিশেষ কারণবশতঃ অনেক পশুর সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তৎ-সত্ত্বেও আবিষ্কৃত বিবিধ পশুর অস্থিনিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

করিয়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকটিত হইয়াছে। পশুঅস্থির অনুশীলনজাত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখযোগ্য : (ক) ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী প্রাণীর এবং পক্ষীর অস্থিনিদর্শন পরিবেশ-এর ও জলবায়ুর নির্দেশক। (খ) মানববসতিক্ষেত্রে বৃহদাকার ও মধ্যাকৃতি পশুর অস্থি-নিদর্শনের আবিষ্কার শিকার-বৃত্তিভিত্তিক সমাজের অধিষ্ঠান নির্দেশ করে। (গ) কোন সংস্কৃতি-পর্ব হইতে অধিক সংখ্যক অস্থিখণ্ড আবিষ্কৃত হইলে পরিসাংখ্যিক অনুশীলন করিয়া বিভিন্ন প্রাণিকুলের সংখ্যামান নির্ণয় করা যায়। (ঘ) আবিষ্কৃত দন্তের প্রকৃতি অনুশীলন করিয়া পশুর জীবিতকালীন বয়সও নির্ণয় করা সম্ভবপর। (ঙ) বিবিধ পশুর অস্থিনিদর্শন বিশ্লেষণের ফলে গৃহ-পালিত এবং বন্যপশু-সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। (চ) বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্বীয় লেভ্‌ল হইতে উদ্ধৃত অস্থি-নিদর্শন অনুশীলন করিয়া নানা যুগের পশুখাদ্য সম্পর্কিত অনেক প্রামাণিক তথ্যও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (ছ) অস্থিখণ্ড অধ্যয়ন করিয়া পশুশিকার, পশুহত্যা, পশুখাদ্য প্রভৃতি বিষয়েও অনেক উপকরণ প্রকাশ করা সম্ভবপর। এমন কি পশুশিকার-ক্ষেত্রের এবং পশু-শিকারের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্রের সনাক্তকরণও সম্ভবপর হইয়াছে। (জ) পশুর অস্থি বিশ্লেষণের ফলে মানুষের খাদ্যের পরিমাণ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞানেরও নির্দেশ পাওয়া যায়। মাংস-খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয়-কার্যের মধ্যে অস্থির উদ্ধারণ, খাদ্যপরিবেশক পশুর পৃথক্‌করণ, পরিমাপ গ্রহণ, পরিমাপের সংখ্যাকে ½ সংযোগে গুণন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন খাদ্য-পরিবেশক পশুর মাংসের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর। (ঝ) বিভিন্ন ভূতত্ত্বীয় যুগভুক্ত অস্থিনিদর্শন অনুশীলন করিয়া প্রাণিকুলের অভিব্যক্তির হার এবং ধারা নির্ণয় করা যায়। গিরিগুহায় আবিষ্কৃত হিংস্র পশুর অস্থি-নিদর্শনের নানাবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হইয়াছে। স্তরবিন্যস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণিকুলের অস্থিনিদর্শন পরীক্ষা

করিয়া উহাদের অভিব্যক্তি-সংক্রান্ত অনেক তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ গৃহপালিত পশু-সম্পর্কিত আলোচনা প্রয়োজন; কারণ, পশুপালন মানবসমাজের অগ্রগতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন প্রমাণ করিয়াছে যে, মানুষ প্রথমে খাদ্য সংগ্রাহক ছিল। খাদ্যের নিমিত্তই পশু শিকার করিত। সুতরাং প্রত্নাশ্মীয় এবং মধ্যাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বভুক্ত আবাস-স্থলে কেবলমাত্র শিকারজাত পশুর অস্থিনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু নবাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বে এই প্রকার পশুর অস্থিনিদর্শনের সংখ্যামান অত্যল্প। অধিকন্তু এই সংস্কৃতি-পর্বেই মানুষ পশুর সহিত নূতন সম্পর্ক স্থাপন করে। ফলে মানুষ পশুপালকরূপে পরিবর্তিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য পশু-শিকারবৃত্তির উপর ঐকান্তিক নির্ভরশীলতার বন্ধন হইতে মানুষ মুক্ত হয়। পশুপালন ও খাদ্য-উৎপাদনই মানব-সভ্যতার বিকাশের মূল ভিত্তি।

বন্য ও গৃহপালিত পশুর আঙ্গিক ও চরিত্রগত পার্থক্যও বিদ্যমান। প্রাণীবিদ্যাবিশারদগণ এই সকল পার্থক্য নির্ণয় করিয়া গৃহপালিত পশুর ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করিয়াছেন। সর্বপ্রথমে বশীভূত পশুর সুরক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ক্রমান্বয়ে পশুর উপর মানুষের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত বন্য ও গৃহপালিত পশুর অস্থি-নিদর্শনের পার্থক্য নির্ণয়কার্য সহজসাধ্য নহে। সর্বপ্রথমে অস্থি-নিদর্শন অধ্যয়ন করিয়া বিভিন্ন পশুশ্রেণীর সংখ্যামান নির্ণয় করিতে হইবে। শিকারিগণের আবাসস্থলে বন্য পশু-প্রজাতির অস্থি-সংখ্যা অধিক হওয়া স্বাভাবিক। বয়স এবং লিঙ্গগত পার্থক্যও যথাযথ হইবে। কিন্তু পশুপালকগণের আবাসক্ষেত্রে উক্ত পার্থক্যের সমঞ্জস্যতা অবিদ্যমান। পশুপালকগণের আবাসস্থলে কতিপয় বিশেষ পশু-প্রজাতির অস্থির আধিক্য বর্তমান থাকিবে। এই সকল পশুর

বয়সের অনুক্রমিক হার নির্ণয় করিয়া উহাদের ব্যবহারজনিত তথ্যও উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সকল অঞ্চলে বন্যপশু-প্রজাতি দীর্ঘজীবী নহে। পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গেই অনেক পশু-প্রজাতি বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর্তমানে পশুর শারীরিক আকার ও গঠন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করিয়া গৃহপালিত পশুর সনাক্তরণ সম্ভব হইয়াছে। এক শ্রেণীভুক্ত বন্য এবং গৃহপালিত পশুর তুলনামূলক অধ্যয়নও গৃহপালিত পশুর সনাক্তকরণের সহায়ক। সাধারণতঃ গৃহপালিত পশু ক্ষুদ্রাকৃতি। কিন্তু পশুর আকারের পরিবর্তন পরিবেশভিত্তিক; আকারের পরিবর্তনের সঙ্গেই পশুদেহ-গঠনেরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। স্ত্রী-পশু পুরুষ-পশু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। গৃহ-পালনের ফলে এই প্রকার মৌলিক পার্থক্য প্রকটিত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন শিকারলব্ধ পশু-প্রজাতির সংখ্যা গৃহপালিত পশু অপেক্ষা অধিক। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মানুষের জীবনধারণের উপযোগী সকল পশু-প্রজাতিই গৃহপালিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সকল প্রকার পশু-প্রজাতি গৃহপালিত হয় নাই। এশিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশেই প্রাচীনতম গৃহপালিত পশুর অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু প্রাচীন কালে আফ্রিকা মহাদেশে গর্দভ এবং এক শ্রেণীর কুক্কুট গৃহপালিত হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া এবং উত্তর আমেরিকাতে অধিকতর প্রাচীন গৃহপালিত পশুর অস্থি-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্ভবতঃ অনুরূপ প্রয়োজনীয়তার জন্যই এক শ্রেণীর পশু বিভিন্ন অঞ্চলে গৃহপালিত হইয়াছিল। তৎপরে এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর প্রচলন আরম্ভ হয়।

প্রসঙ্গতঃ প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন হইতে বিবিধ বন্য পশুর গৃহপালিত পশু-প্রজাতিতে রূপান্তরের তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। পিরাই (১৯০৭) সর্বপ্রথম বল্‌টিক অঞ্চলের শূকরের অস্থি অনুশীলন করিয়া এই রূপান্তর-সম্পর্কে মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। রীড্‌

(১৯৬১) ইরাক্ হইতে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক অস্থি-নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত গবাদি পশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

অস্থিনিদর্শনের অনুশীলন হইতে বিভিন্ন পশু প্রজাতির গৃহ-পালনের অনুক্রমিক কাল নিরূপণ করাও সম্ভব হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, সারমেয়ই মানবসমাজের সর্বপ্রথম ও প্রাচীনতম গৃহপালিত পশু। কিন্তু রীড্ (১৯৬১) ইরাক হইতে আবিষ্কৃত পশুঅস্থি-নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, মেষই সর্বপ্রথম গৃহপালিত পশু। সনিদার (ইরাক্) প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত অস্থিনিদর্শন বিশ্লেষণ পূর্বক রীড্ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, খ্রীষ্টের জন্মের ৯০০০০ বৎসর পূর্বে মানুষ প্রথম মেষ পালন আরম্ভ করিয়াছিল। তৎপরে ছাগলের গৃহপালন আরম্ভ হয়। জার্মো ও জেরিকো নামক প্রত্নস্থলদ্বয়ের নিম্নতম স্তর হইতে গৃহ-পালিত ছাগলের অস্থিনিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখ্য। জার্মো-প্রত্ন-স্থলের প্রাক্-কৌলাল লেভ্‌লে বন্য শূকরের অস্থিনিদর্শনের আবিষ্কারও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু কৌলাল-নিদর্শন-সম্বলিত স্তর হইতেও গৃহপালিত শূকরের অস্থিনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তথ্যপূর্ণ নিদর্শন হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শূকর প্রথমে অন্যত্র গৃহপালিত হইয়াছিল। গৃহপালিত শূকরের অস্থিনিদর্শনের কাল খ্রীষ্টের জন্মের ৬৫০০ বৎসর পূর্বে আরোপ করা হইয়াছে।

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত অস্থির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, গবাদি পশুর প্রাচীনতম নিদর্শন হালাপীয় (ইরাকের হালাপ-প্রত্নস্থল) সংস্কৃতি-পর্বভুক্ত। খ্রীষ্টের জন্মের ৫০০০-৪০০০ বৎসর পূর্বে বনাহিলক্ (ইরাক্) প্রত্নস্থলে গৃহপালিত গবাদি-পশুর প্রাচীন অস্থিনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্যাটে (৯৩৭) প্রথমে প্রতিপাদন করেন যে, পশ্চিম এশিয়ার অঞ্চলে সারমেয়ই সর্বপ্রথম গৃহপালিত

নাটুফিয়ান্-(প্যালেস্টাইন-এর ওয়াডি-এন-না-টুক- এর গুহা-প্রত্ন-স্থল) সংস্কৃতি-পর্বে (খ্রীঃ পূঃ ৮০০০) প্রথম গৃহপালিত পশুর নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু অধুনা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্যাটের অভিমত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পশ্চিম এশিয়ার অপর প্রাচীনতম প্রত্নস্থল হইতে গৃহপালিত সারমেয়ের অস্থিনিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং মনে হয় যে, পশ্চিম এশিয়া-অঞ্চলে সারমেয়কে প্রাচীনতম গৃহপালিত পশুরূপে প্রতিপাদন করা সম্ভব নহে। কিন্তু মধ্য ইউরোপের পশুঅস্থি-নিদর্শনের বিশ্লেষণজাত তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সারমেয়ই উক্ত অঞ্চলের প্রাচীনতম গৃহপালিত পশু। সম্ভবতঃ মধ্য ইউরোপে নেকড়ে-প্রজাতি হইতেই সারমেয়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। উক্ত প্রাণী মধ্যাশ্মীয় যুগেই সর্বপ্রথম গৃহপালিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ সারমেয়ের উৎপত্তি-সংক্রান্ত মতবাদের এবং অস্থি-নিদর্শনের পর্যালোচনা প্রয়োজন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে হাণ্টার প্রতিপাদন করেন যে, সারমেয়, নেকড়ে এবং শৃগাল একই প্রজাতিভুক্ত। এই সিদ্ধান্ত-সম্পর্কে কতিপয় জটিল সমস্যা উল্লেখনীয় : (ক) সুপ্রাচীন সারমেয়ের অস্থিনিদর্শনের সনাক্তকরণ, (খ) গৃহপালিত ও বন্য-পশুর অস্থিনিদর্শনের পৃথকীকরণ এবং (গ) গৃহপালিত সারমেয়ের বন্য প্রজাতির অবধারণ।

উল্লিখিত পশুর অস্থিনিদর্শনের মধ্যে করোটি এবং দন্তের আবিষ্কার অধিক। বর্তমান কালের শৃগাল, নেকড়ে এবং সারমেয়ের করোটির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। নবাশ্মীয় এবং পরবর্তী যুগের গৃহ-পালিত সারমেয়ের অস্থিনিদর্শন সনাক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু মধ্যাশ্মীয় যুগভুক্ত সারমেয়ের অস্থি সনাক্ত করা অধিক আয়াস-সাধ্য। নাটুফিয়ান্ সংস্কৃতি- পর্বভুক্ত প্যালেস্টাইনের মাউণ্ট ক্যার্‌মেল এবং ডেনমার্কের প্রত্নস্থল হইতে মধ্যাশ্মীয় যুগভুক্ত সারমেয়ের অস্থিনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের উত্তর ভারতীয় মধ্যাশ্মীয় প্রত্নস্থল হইতে ক্যানিডের অস্থির আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। কিন্তু

নেকড়ের অস্থি হইতে ক্যানিডের অস্থির পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। মধ্যাশ্মীয় যুগের ক্যানিডের এবং শৃগালের করোটির পার্থক্য এবং অনুরূপতাও নির্ণীত হইয়াছে। এই সকল করোটি বিভিন্ন আঞ্চলিক নেকড়ের করোটিতুল্য।

পূর্ব-ইউরোপের এবং এশিয়ার সারমেয় ভারতীয় নেকড়ের বংশধররূপে স্বীকৃত। প্রাচীন মিশরের সারমেয় মিশরীয় শৃগালের বংশধর। পশ্চিম এশিয়ার সারমেয় সম্ভবতঃ কোন ভারতীয় নেকড়ে-প্রজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপের বৃহদাকার সারমেয় উক্ত অঞ্চলে পালিত নেকড়ে হইতে উদ্ভূত। শৃগাল হইতে সারমেয়ের উৎপত্তি অস্থিনিদর্শন দ্বারা সমর্থিত হয় না। সারমেয়, নেক্‌ড়ে এবং শৃগালের মধ্যে যৌন সম্পর্কের ফলে অন্য পশু-প্রজাতির জন্ম হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শনের অনুশীলন হইতে প্রমাণিত হয় যে, পশুর গৃহপালন অনুরূপভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে সাধিত হয় নাই। সম্ভবতঃ মেষপালনও বিভিন্ন অঞ্চলেই আরম্ভ হইয়াছিল। অধিক পরিমাণে পশুঅস্থি-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তথ্য দ্বারা এই সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

অশ্ব ও গবাদি পশুর অস্থিনিদর্শন অনুশীলন করিয়া তাহাদের গৃহপালন-সংক্রান্ত অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছে। ইউরোপের ও এশিয়ার পূর্ব-পশ্চিম পার্বত্যাঞ্চলেই অশ্বের আবাসস্থল ছিল। বর্তমানে কেবলমাত্র পূর্ব এশিয়াতে বন্য অশ্ব বিদ্যমান। 'ইক্যোয়াস্ প্রেওয়াল্‌স্‌কী' প্রজাতি হইতেই গৃহপালিত অশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মের ৪০০০-৩০০০ বৎসর পূর্বে চীনদেশে অশ্বের গৃহপালন আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে খাদ্যের নিমিত্তই অশ্বের গৃহপালন প্রবর্তিত হয়। পরে চাষ-আবাদ, রথচালনা, প্রভৃতি কার্যের জন্য অশ্ব প্রধানতঃ নিয়োজিত হয়। অশ্বই মানুষের শ্রমলাঘবের প্রধান উপায়।

ভারতবর্ষই 'আর‍্যাকের' উৎপত্তিস্থল। পরে ভারতবর্ষ হইতে

আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে উক্ত প্রাণী বিস্তার লাভ করে। গৃহপালিত ষাঁড় বন্য ষাঁড় অপেক্ষা ক্ষুদ্র। খাদ্য সরবরাহের নিমিত্তই এই সকল পশু গৃহপালিত হইয়াছিল। পরে বিবিধ কার্যে তাহাদের নিয়োজন আরম্ভ হয়। অশ্ব, গবাদি, মেষ, ছাগল, শূকর প্রভৃতি অদ্যাপি মানবসমাজের অতীব প্রয়োজনীয় গৃহপালিত পশু।

অস্থির বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করিয়া গৃহপালিত পশুর বয়স নির্ধারণ করাও সম্ভবপর। গৃহপালিত পশুর বয়স নির্ণয়কার্যে যে সকল নিদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অধিক তাহাদের মধ্যে কালনির্দিষ্ট পশুপ্রজাতির নিদর্শন, খাদ্যপুষ্টির মান-নির্ণয়সাধক নিদর্শন, দন্ত ও অপর অস্থিনিদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পশুর বয়স নির্ধারণ-কার্য প্রয়োজনসাধক অস্থিনিদর্শনের আবিষ্কারের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু পশুর নিশ্চিত বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক, তরুণ, কিশোর, শিশু প্রভৃতি সংজ্ঞায় পশুর বয়স নির্দেশ করা সম্ভবপর।

প্রাচীন পশুকুলের অস্থির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা পশুব্যাধি-সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। বিবিধ ব্যাধির উৎপত্তি, প্রাচীনত্ব, বিস্তার প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশুব্যাধি পরিবেশজাত। সুতরাং পশুব্যাধি-নির্ণয় পরিবেশের পরিচায়ক। পশুব্যাধির অনুশীলন হইতে বিভিন্ন যুগের সংক্রামক ব্যাধির পরিচয়ও পাওয়া যায়। সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি সম্পর্কিত অনেক তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ব্যাধি-সংক্রান্ত অপর তথ্য নরঅস্থি-নিদর্শনের বিশ্লেষণজাত রোগনির্ণয়-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, মানুষের অধিকাংশ ব্যাধি পশুজাত। অর্থাৎ পশুদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কের ফলেই অনেক রোগের বীজাণু মনুষ্যদেহকে সংক্রামিত করিয়াছে। প্রধানতঃ নবাশ্মীয় যুগ হইতেই মানুষ পশুব্যাধি দ্বারা সংক্রামিত হইতে আরম্ভ করে।

পরিশেষে উল্লিখিত পশুর গৃহপালন-সংক্রান্ত তত্ত্বের আলোচনা প্রয়োজন। কি কারণবশতঃ মানুষ বন্য পশুদিগকে বশীভূত করিয়া গৃহপালন আরম্ভ করে? প্রথমতঃ, মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সহজাত প্রেরণার বশবর্তী হইয়াই মানুষ ক্ষুদ্রাকৃতি বন্য পশুর পরিপালন আরম্ভ করে। কিন্তু এই মতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, মন্তব্য করা হইয়াছে যে, শিকার-বৃত্তিধারী মানুষই শিকারের নিমিত্ত নেক্‌ড়ের পরিপালন আরম্ভ করে। প্রথমে নেকড়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মানুষের সঙ্গে শিকার-বৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করিত। পরে নেকড়ে গৃহপালিত হয়। উপরন্তু গৃহপালিত নেকড়ে হইতে সারমেয়ের উৎপত্তি সম্পর্কেও অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই অভিমতের ভিত্তিও সুদৃঢ় নহে। অধুনা শিকারের নিমিত্ত সকল আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে সারমেয়ের নিয়োজন প্রচলিত নহে। পরবর্তী সময়ে শিকার-অভিযানে সারমেয় মানুষের সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছে। অধিকন্তু সারমেয়ের প্রাচীনতম অস্থিনিদর্শন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, খাদ্য সরবরাহের জন্যই তাহার গৃহপালন প্রবর্তিত হইয়াছিল। অদ্যাপি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সারমেয় খাদ্য পরিবেশকরূপেই পরিগণিত। উপরন্তু নেকড়ের গৃহপালন অতীব কষ্টসাধ্য। নেকড়ের জন্য বিশেষ ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন অধিক। এতদ্‌ব্যতীত সারমেয়ই যে প্রাচীনতম গৃহপালিত পশু, তাহা প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। তৃতীয়তঃ, পশুর গৃহপালনের প্রারম্ভিক কালনিরূপণ-কার্যে ধর্মীয় ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে, বিশেষতঃ গৃহপালিত ষাঁড় সম্পর্কে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গৃহপালিত পশুর মধ্যে ষাঁড় প্রাচীনতম নহে। তবে পরবর্তী কালে ষাঁড় প্রধানতম গৃহ-পালিত পশুরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন দ্বারা উক্ত মতবাদ অসমর্থিত। উল্লিখিত মতবাদের সপক্ষে কোন প্রামাণিক নিদর্শন সন্নিবেশ করাও সম্ভব হয় নাই। উপরন্তু যে সকল নিদর্শন

আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, খাদ্য সরবরাহই পশু-পরিপালনের প্রধান উৎস। বন্য গবাদি দুগ্ধ সরবরাহ করে না। মাংস এবং দুগ্ধ পরিবেশনের জন্যই গবাদির গৃহপালন আরম্ভ হয়। চতুর্থতঃ, পশম সরবরাহের নিমিত্তও মেষের প্রতিপালন আরম্ভ হইয়াছিল।

সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, স্থায়ী অধিষ্ঠানের সঙ্গেই মানুষ নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। সুতরাং খাদ্য সরবরাহের নিমিত্তই বন্য পশুর পরিপালন প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। পরে খাদ্যের উৎপাদন, পরিবহণ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যে গৃহপালিত পশুর নিয়োজন আরম্ভ হয়। প্রকৃতপক্ষে মানব-সংস্কৃতির প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গেই বিবিধ বন্য পশুর গৃহপালন বিজড়িত।

(খ) পক্ষীঅস্থি : পক্ষীঅস্থির স্বল্পতা এবং উক্ত নিদর্শন দ্বারা ক্ষুদ্রাকৃতি পক্ষীর সনাক্তকরণের আয়াসসাধ্যতার জন্য উৎখননে আবিষ্কৃত পক্ষীঅস্থির উপর সাধারণতঃ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কিন্তু পক্ষীঅস্থির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা অনেক মূল্যবান তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। পক্ষী-নিদর্শনের মধ্যে পালক, ডিম্বের খোলা, কঙ্কালাংশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উক্ত আবিষ্কৃত নিদর্শন-সমূহ অনুশীলন করিয়া সর্বপ্রথমেই পক্ষীর সনাক্তকরণ প্রয়োজন। পরে উক্ত প্রজাতিভুক্ত অধুনা বর্তমান পক্ষীর সহিত উহার তুলনামূলক অধ্যয়ন করিতে হইবে। বিভিন্ন যুগের পক্ষীঅস্থির বিশ্লেষণের ফলে পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত অনেক তথ্যও সন্নিবেশ করা সম্ভব হইয়াছে। পক্ষীঅস্থি দ্বারা নির্মিত বস্তু যেমন, সূঁচ, বর্শার সূচালো প্রান্ত ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্কৃতির কারুশিল্পজনিত উৎকর্ষের পরিচায়ক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতেও পক্ষী-অস্থিনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকল অস্থির অনুশীলন করিয়া বিভিন্ন প্রজাতিভুক্ত পক্ষীর সনাক্তকরণও উল্লেখযোগ্য।

(গ) জলজ প্রাণী (অ্যাকোঅ্যাটিক্ অ্যানিম্যাল্) : উৎখননে বিবিধ জলপ্রাণীর অস্থিনিদর্শনের আবিষ্কারও তাৎপর্যপূর্ণ। জলজ প্রাণীর মধ্যে মৎস্যের অস্থিনিদর্শন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মানবসংস্কৃতির সূচনা হইতেই মানুষ মৎস্য শিকার আরম্ভ করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে মৎস্যের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৎস্য ব্যতীত অপর জলপ্রাণীর মধ্যে শীল ও তিমির অস্থিনিদর্শনের আবিষ্কারও উল্লেখনীয়। মৎস্যের অস্থিনিদর্শন অনুশীলন করিয়া বিবিধ তথ্য উদ্‌ঘাটন করা যায়: (১) মৎস্য-অস্থির বিশ্লেষণ প্রাচীন মানুষের খাদ্য-সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করে। (২) বিভিন্ন প্রজাতিভুক্ত মৎস্য-অস্থির অনুশীলন দ্বারা মানবসংস্কৃতির মান নির্ণয় করা যায়। অধিক সংখ্যক খোলক-সম্বলিত (যেমন চিংড়ি, কাঁকড়া, গেড়ি প্রভৃতি) মৎস্যের অস্থির আবিষ্কার আদিম বা নিম্নতম সংস্কৃতির পরিচায়ক। মানুষ প্রথমে খোলক-সম্বলিত মৎস্যই শিকার করিত। (৩) এতদ্ব্যতীত মৎস্যের খোলক দ্বারা অনেক সামগ্রীও নির্মিত হইত। এই সকল সামগ্রী কারুশিল্পের উৎকর্ষ সম্পর্কিত অভিজ্ঞান পরিবেশন করে। (৪) অধিকন্তু মৎস্যের অস্থি ও মৎস্য-শিকার-সংক্রান্ত নানাবিধ নিদর্শন অনুশীলন পূর্বক বিবিধ মৎস্য-প্রজাতির আঞ্চলিক বিস্তার এবং জলবায়ুর প্রকৃতিও নির্ণয় করা সম্ভবপর। (৫) মৎস্যের শরীরাংশ বিশ্লেষণ করিলে নানাবিধ মৎস্য-প্রজাতির ব্যবহার-সম্পর্কিত উপাদান সংগ্রহ করা যায়। মুণ্ডহীন মৎস্য-কঙ্কালের আবিষ্কার দ্বারা মৎস্য শুষ্ক করিবার প্রথার প্রচলন প্রমাণিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত মৎস্য-অস্থির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। মহেঞ্জোদারো হইতে আবিষ্কৃত মৎস্য-অস্থির অনুশীলন করিয়া হোড়া অনেক মৌলিক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। মহেঞ্জোদারোর অধিবাসিগণের মধ্যে মৎস্য-খাদ্য অধিক প্রচলিত ছিল। মৎস্যশিকার-সংক্রান্ত বিভিন্ন অস্ত্রের আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য। এই সকল অস্ত্রের মধ্যে আধুনিক

খননের বড়শির আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাম্রাশ্মীয় যুগ হইতেই বড়শি দ্বারা মৎস্যশিকারের কার্যক্রম আরম্ভ হয়।

অসামুদ্রিক শম্বুকজাতীয় (মলাস্ক্যা) প্রাণীর নিদর্শন : অসামুদ্রিক শম্বুকজাতীয় প্রাণীর নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়াও অনেক মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। শম্বুক-নিদর্শনের বিশ্লেষণ হইতে অবক্ষেপের কালনিরূপণ, জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ণয়, আঞ্চলিক অবস্থা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মৌলিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হইয়াছে।

(ঘ) নরঅস্থি : উৎখননে নরঅস্থি-নিদর্শনের আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। নরঅস্থি-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নৃবিজ্ঞানের অধীন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব নৃতত্ত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। অধিকন্তু উভয় বিজ্ঞানশাখার প্রতিপাদ্য বিষয় মূলতঃ অভিন্ন। মানুষের শরীরের গঠন ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিস্তারিত অনুশীলন করাই নৃবিজ্ঞানের কার্য। বাস্তব নিদর্শনের ভিত্তিতে মানবসংস্কৃতির বিবর্তনের ও প্রকৃতির অনুশীলন করা প্রত্নবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়। বর্তমান নিরক্ষর আদিম মানবসমাজের অধ্যয়নই নৃতত্ত্বের মৌলিক বিষয়বস্তু। কিন্তু প্রত্নবিজ্ঞান প্রাক্-অক্ষরজ্ঞানযুগের মানবসমাজের ব্যবহৃত বাস্তব নিদর্শনের অনুশীলনভিত্তিক। জীবন্ত মানুষের ও নরকঙ্কালের শরীর-গঠনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন নরগোষ্ঠী নির্ণয় এবং উহাদের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্পর্কিত বিবিধ তথ্যের উদ্‌ঘাটন করাই নৃবিজ্ঞানের প্রধানতম কর্মসূত্র। উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত নর-অস্থি-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া উক্ত তথ্য পরিবেশন করাও নৃবিজ্ঞানীর অন্যতম কার্যক্রম। কিন্তু নরঅস্থির অনুশীলন কেবলমাত্র নৃবিজ্ঞানীর এখ্‌তিয়ারভুক্ত নহে। বিবিধ বিজ্ঞানশাখার বিশারদগণও এই কার্যে ব্রতী হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ, শারীরস্থানবিদ্ (অ্যানাটমিস্ট), জীববিজ্ঞানী (বাইঅল্যজিস্ট), রসায়নবিদ্ (কেমিস্ট) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণও নরঅস্থির নানাবিধ বিশ্লেষণপূর্বক প্রাচীন মানুষের

শরীর ও সমাজ সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

সাধারণতঃ নৃবিজ্ঞানে করোটির ও নরকঙ্কালের বিভিন্ন অংশের অস্থির পরিমাপ গ্রহণ করিয়া নরগোষ্ঠী নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র নরগোষ্ঠী নির্ধারণ করাই নরঅস্থি বিশ্লেষণের একমাত্র লক্ষ নহে। বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া মানুষের শারীরিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়েও অনেক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত নরঅস্থি অধ্যয়ন করিয়া যে সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে (১) নরদেহের উচ্চতা নির্ণয়, (২) নরকেশ বিশ্লেষণ, (৩) লিঙ্গ নিরূপণ, (৪) বয়স নির্ণয়, (৫) জনতা-বর্ণন, (৬) মরণশীলতা ও মৃত্যুহার নির্ধারণ, (৭) নররক্ত-বিশ্লেষণ, (৮) ব্যাধি নিরূপণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে নরঅস্থি নির্ণয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হইতে বহুবিধ তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। এই অনুশীলনজাত কার্যক্রমের জন্য বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার বিশারদগণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অধুনা নরঅস্থির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল তথ্য উদ্‌ঘাটন করা যায় তাহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

(১) দৈহিক উচ্চতা (স্ট্যাচার ডিটারমিনেশন্) নির্ণয় : নরকঙ্কালের বিভিন্ন অস্থিখণ্ড অনুশীলন করিয়া মানুষের দৈহিক উচ্চতা নির্ধারণ করা যায়। নরগোষ্ঠীর নির্ণয়কার্যে দৈহিক উচ্চতা একটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক বৈশিষ্ট্য। দেহের পরিমাপ অনুসারে নৃবিজ্ঞানীরা দৈহিক উচ্চতার বিভিন্ন ধারা বা মান নির্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু দৈহিক উচ্চতা নরগোষ্ঠীর নিশ্চিত শারীরিক বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকার্য নহে। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৈহিক উচ্চতা পরিবেশজাত। তৎসত্ত্বেও দৈহিক উচ্চতা নির্ণয় করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের যুগভিত্তিক নরদেহের উচ্চতা অনুধাবন করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিশ্লেষণের জন্য সম্পূর্ণ নর-কঙ্কালের আবিষ্কার সর্বাধিক প্রয়োজন। সাধারণতঃ কবরস্থলের উৎখনন দ্বারাই বিবিধ দৈহিক উচ্চতা-অনুশীলনযোগ্য নরকঙ্কালের

আবিষ্কার উল্লেখনীয়। সম্পূর্ণ কঙ্কাল ব্যতিরেকেও দেহের বিভিন্ন অস্থিখণ্ড যেমন, উর্বাস্থির (ফীম্যার) অনুশীলনজাত তত্ত্ব হইতেও দৈহিক উচ্চতা নির্ণয় করা যায়।

অশ্মীভূত নরঅস্থির বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের দৈহিক উচ্চতার স্থিরতা ছিল না। পক্ষান্তরে বৃহৎকায় (জাইঅ্যাণ্ট) এবং বামনাকৃতি (পিগমি) উভয় প্রকার মানুষের বিদ্যমানতা প্রমাণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের নরকঙ্কালের ও নরকঙ্কালাংশের অনুশীলন দ্বারা প্রতিপাদিত বিবিধ দৈহিক উচ্চতাসম্পন্ন মানুষের অস্তিত্বও উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গতঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের বিশ্লেষণ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক যুগেই একাধিক দৈহিক উচ্চতাসম্পন্ন মানুষ বিদ্যমান ছিল।

(২) নরকেশ-বিশ্লেষণ : বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে প্রাচীন মানুষের ও পশুর কেশের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক অনুশীলন দ্বারা সর্বপ্রথমেই পশু ও মানুষের কেশ সনাক্ত করিতে হইবে। উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুতে এবং বালুকাকীর্ণ ক্ষেত্রে কেশ সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু আবিষ্কৃত কেশের সংখ্যাল্পতার জন্য পরিসাংখ্যিক অনুশীলন করা সম্ভব নহে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া কেশের গঠন সংক্রান্ত অনেক তথ্য অনুধাবন করা যায়। বর্তমান বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর কেশের সহিত প্রাচীন কেশের তুলনামূলক অনুশীলন করিয়াও অনেক তথ্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। সাধারণতঃ প্রত্নকেশের রঙ দ্বিবিধ : ঈষৎ স্বর্ণাভ এবং কৃষ্ণাভ। মিশর, পেরু, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন কেশ কৃষ্ণাভ। তথাপি কেশের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া কোন মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সর্বক্ষেত্রে অনুচিত। কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে কেশ নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যসূচক। নিগ্রো-নরগোষ্ঠীর কেশ পশমতুল্য ও কুঞ্চিত। উক্ত প্রকার কেশের আবিষ্কার হইতে নিগ্রো নামক নরগোষ্ঠীর অধিষ্ঠান প্রতিপন্ন হয়।

(৩) লিঙ্গ নিরূপণ : প্রাচীন নরঅস্থির বিশ্লেষণ করিয়া লিঙ্গ নিরূপণ করাও সম্ভবপর। মানুষের লিঙ্গ নিরূপণের জন্য বিভিন্ন অস্থিনিদর্শন যেমন, শ্রোণী (পেল্‌ভিস্‌), করোটি (স্কাল্‌), মুখমণ্ডলের অংশবিশেষ ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক অনুশীলন প্রয়োজন। অধুনা পারিসাংখ্যিক অনুশীলনও লিঙ্গ নিরূপণকার্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

(৪) বয়স নির্ণয় : অস্থির অনুশীলন দ্বারা নরকঙ্কালের বয়স-নির্ণয়কার্যও সহজসাধ্য নহে। সাধারণতঃ অস্থির আকার ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ পূর্বক বয়স নির্ণয় করা যায়। বয়স-নির্ধারণকার্যে করোটি-অস্থির জোড় বা সন্ধি-স্থলের (সুউচ্যার) অনুশীলন অত্যাবশ্যক। ত্রিদশ বৎসর পর্যন্ত নরকঙ্কালের বয়স নির্ধারণের যথার্থতা স্বীকার্য। এই বয়স-নির্ধারণ ত্রিবিধ বিশ্লেষণ-ভিত্তিক : (ক) মাঢ়ী ভেদ করিয়া উদ্‌গত দন্তের বিশ্লেষণ, (খ) অস্থিবন্ধনের বিশ্লেষণ এবং (গ) প্রত্যেক অস্থি-খণ্ডের স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ। নরকঙ্কালের বয়স সাধারণতঃ আনুমানিক ভাবে নিরূপণ করা হয়। কারণ, নরকঙ্কালের যথার্থ বয়স নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

(৫) জনতা-বর্ণন ও (৬) মৃত্যুহার নির্ণয় : নরঅস্থির বৈজ্ঞানিক অনুশীলন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগের জনতা-বর্ণন ও মরণশীলতা অনুধাবন করাও সম্ভব হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তত্ত্ব হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগেও দীর্ঘায়ু ও স্বল্পায়ু মানুষ বর্তমান ছিল। বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত নরঅস্থি বিশ্লেষণ করিয়া ভ্যালয়স্‌ (১৯৬০) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পরবর্তী প্রত্নাশ্মীয় এবং মধ্যাশ্মীয় যুগের মানব-কুলের আয়ু পঞ্চাশ বৎসরের অধিক ছিল না। হাওলেস্‌ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের মরণ-শীলতার হার ৫৫% হইতে ৬০%-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণবশতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্ত্রীলোকদিগের মৃত্যুহারের আধিক্য উল্লেখযোগ্য।

(৭) নররক্ত বিশ্লেষণ : বর্তমানে নররক্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নৃবিজ্ঞানে নররক্ত অনুশীলন করিয়া নরগোষ্ঠী নির্ধারণ করা হয়। নররক্ত ত্রিশ্রেণীভুক্ত—এ, বি এবং ও। নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, একই নরগোষ্ঠীভুক্ত মানুষের রক্তশ্রেণী অনুরূপ হইবে। মৃতদেহের নিদর্শন অনুশীলন করিয়াও রক্তশ্রেণী নির্ণয় করা যায়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বয়ড্ সর্বপ্রথম মৃতদেহের রক্তশ্রেণী-বিন্যাসের অনুধাবন আরম্ভ করেন। মমিদেহের রক্তের নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া রক্তের শ্রেণীবিন্যাস করাও সম্ভবপর হইয়াছে। বর্তমানে এই বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ক্রমবর্ধমানতা উল্লেখনীয়। কিন্তু প্রাচীন মরদেহের রক্ত-বিশ্লেষণ অধিক সময়সাপেক্ষ। এই বিশ্লেষণকার্যের নিমিত্ত প্রভূত তত্ত্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন অত্যধিক। বর্তমানে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রত্নরক্ততত্ত্ব বা প্যালিও-সেরিওলজী নামে অভিহিত।

(৮) ব্যাধি নিরূপণ : অধুনা প্যালিও-প্যাথলজী বা প্রত্নরোগ বিদ্যা নামে এক নতুন বিজ্ঞানশাখার উদ্ভব হইয়াছে। পশুকঙ্কাল হইতে রোগ-নিরূপণ প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানুষের অধিকাংশ ব্যাধি পশুজাত। আবিষ্কৃত নরকঙ্কাল এবং নরকঙ্কালাংশ অনুশীলন করিয়াও ব্যাধি নির্ণয় করা সম্ভবপর। নরকঙ্কাল বা অস্থিখণ্ড পরীক্ষা করিয়া মানবদেহজাত বিভিন্ন ব্যাধির উৎপত্তি, প্রাচীনত্ব, বিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মৌলিক তত্ত্ব উদঘাটন করা হইয়াছে। কতিপয় ব্যাধির অবধারণ প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। (অ) অঙ্গবিকৃতি : বিবিধ ব্যাধির প্রকোপে অঙ্গ বিকৃত হয়। অস্থিনিদর্শন পরীক্ষা করিয়া অঙ্গবিকৃতির প্রকৃতি অনুধাবন পূর্বক ব্যাধি নির্ণয় করা সম্ভবপর। (আ) অস্থি-প্রদাহ (ইনফ্লাম্যাশন্ অভ্ বোন্) : অস্থিনিদর্শনের অনুশীলনের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সন্ধিবাতগ্রস্ত (আরথ্রাইটিক্)

মানুষের অস্তিত্বও প্রতিপাদিত হইয়াছে। (ই) যক্ষ্মারোগ (টিউবার-ক্যুলেসিস্) : যক্ষ্মারোগাক্রান্ত অস্থিনিদর্শনের আবিষ্কারও বিরল নহে। জার্মানীর নরঅস্থির এবং মিশর দেশের মমির পরীক্ষার ফলে যক্ষ্মা-রোগের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।(ঈ) উপদংশ ব্যাধি(সিফিলিস্) : উপদংশ রোগাক্রান্ত নরঅস্থির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত ব্যাধিগ্রস্ত অস্থিনিদর্শনের আবিষ্কার অতীব তাৎপর্য-পূর্ণ। বর্তমান কালের ন্যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগেও রোগাক্রান্ত হইয়া মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এমন কি, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপের ফলে একাধিক পরিবার নিশ্চিহ্ন হইবার প্রমাণের আবিষ্কারও বিরল নহে।

(৯) রঞ্জনরশ্মি-আলোকচিত্র-পরীক্ষণ : অস্থিনিদর্শনের রঞ্জন-রশ্মিজাত আলোকচিত্র-পরীক্ষণও (রেডিওল্যজিক্যাল্ একৃজা-মিনেশন্) উল্লেখযোগ্য। ব্যাধি-চিকিৎসায় এবং দৈহিক গঠনতন্ত্র-নিরূপণে রঞ্জনরশ্মি-আলোকচিত্র-এর অনুশীলন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অধুনা প্রত্ননিদর্শনের বিশ্লেষণকার্যেও রঞ্জনরশ্মি ব্যবহৃত হয়। অস্থিনিদর্শনের রঞ্জনরশ্মি-আলোকচিত্র নিরীক্ষা ও পরীক্ষা করিয়া মানবদেহ-সংক্রান্ত অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ মমির রঞ্জনরশ্মি-বিশ্লেষণজাত তথ্য উল্লেখ্য। মমি বিবিধ উপকরণ দ্বারা আবৃত থাকে। সুতরাং একমাত্র রঞ্জনরশ্মিজাত আলোকচিত্র পরীক্ষা করিয়া মমির দৈহিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভবপর। রেডিওল্যজিক্যাল পরীক্ষার ফলে মমিদেহের ব্যাধি সংক্রান্ত অনেক তথ্যও উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

(১০) মমির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ : মমির এবং নর-টিস্যুর বৈজ্ঞানিক অনুশীলন প্রসঙ্গ উল্লেখনীয়। সুপ্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঔষধাদি লেপনপূর্বক মৃতদেহকে সংরক্ষণ করা হইত। ঔষধাদির সাহায্যে সংরক্ষিত এইরূপ নরদেহকেই মমি বলা হয়। প্রাচীন মিশরদেশের মমি-নিদর্শন সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণতঃ

নৃপতি ও অভিজাতশ্রেণীর মৃতদেহকে মমিতে পরিণত করা হইত। মিশর ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়া, ওসেনিয়া, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও মমির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক লেখকগণ মমি-সংক্রান্ত বিশদ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতীত মমির যথার্থ মর্মোদঘাটন করা সম্ভব নহে। জীবদেহের টিস্যু-বিন্যাসের বৈজ্ঞানিক অনুশীলন দ্বারা মৃতদেহকে মমিতে পরিণত করিবার জন্য নানাবিধ উপকরণের প্রয়োগ, ব্যাধিনির্ণয় প্রভৃতি সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করাও সম্ভব হইয়াছে।

উপরি-উক্ত অস্থিনিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তথ্য ব্যতিরেকে মানবসমাজের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকিবে। অস্থিনিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতীত মনুষ্যনির্মিত ও ব্যবহৃত বাস্তব প্রত্নিনিদর্শন-সমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তথ্যও উল্লেখনীয়।

(২) অপর প্রত্নিনিদর্শন : মনুষ্যনির্মিত সকল বাস্তব নিদর্শনই প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের মৌলিক ভিত্তি। উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনসমূহ অনুশীলন করিয়াই মানবসংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণ করিতে হয়। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন ব্যতিরেকে শিল্পনিদর্শনের বিশ্লেষণের নিমিত্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই সকল বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলনের ফলেই শিল্প-নিদর্শনের স্বরূপার্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

সর্বপ্রথমেই উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শন মনুষ্যনির্মিত কিনা তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। পরিবেশ-সংশ্লিষ্ট কারুশিল্প-নিদর্শনের অধ্যয়ন-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করাও প্রয়োজন। কিন্তু অসংশ্লিষ্ট শিল্প-নিদর্শনের অনুশীলন-সম্পর্কিত সমস্যা অধিক জটিলতাপূর্ণ। নূতন ও অস্বাভাবিক ধরনের প্রত্নবস্তুর আবিষ্কারও অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সকল সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত আবিষ্কৃত প্রত্ন-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন অত্যধিক। বৈজ্ঞানিক

বিশ্লেষণ করিয়া সে সকল পদার্থের ও বস্তুর মর্মোদ্ঘাটন করা সম্ভব হইয়াছে তাহাদের মধ্যে (ক) অরণি-প্রস্তর (ফ্লিন্ট), (খ) শিলা, (গ) মৃন্ময় বস্তু, (ঘ) ধাতুদ্রব্য, (ঙ) কাঁচ-নিদর্শন, (চ) চর্ম-নিদর্শন, (ছ) তন্তু-নিদর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(ক) অরণি-প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ারের পারিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ : প্রত্নাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় যুগভুক্ত বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত অরণি- প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ারের পারিসাংখ্যিক বিশ্লেষণের ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। এমন কি, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং স্থূলতার পরিমাপ গ্রহণ করিয়া প্রস্তর হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্যসূচক তথ্য নির্ণয় করা সম্ভব। উক্ত পরিমাপ গ্রহণের অনুমোদিত সূত্র ($\frac{\text{দৈর্ঘ্য}}{\text{প্রস্থ} \times \text{স্থূলতা}} \times ১০০$) অনুসারে গণনা করিয়া প্রতি হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্যসূচক তত্ত্ব (ইন্‌ডেক্‌স্) নিরূপণ করা যায়। বিজ্ঞানী বোমের উক্ত তত্ত্ব-সম্পর্কে বিশদ অনুশীলন করিয়া এই পদ্ধতির যথার্থতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(খ) শিলাতত্ত্ব : অধুনা প্রত্নবিজ্ঞানে শিলানির্মিত নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। গত ৩০ বৎসর যাবৎ শিলার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে অনেক নূতন তথ্যও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল তথ্যের মধ্যে শিলার উৎপত্তিস্থল, সংগ্রহণ, অপসারণ, পরিবহণ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখযোগ্য। এমন কি, শিলার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া কৃত্রিম প্রত্নবস্তু নির্ধারণ করাও সম্ভব হইয়াছে।

(গ) মৃন্ময় বস্তু : পূর্ব্বেই মৃৎশিল্প-সংক্রান্ত তথ্য আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ১৫৩-১৮১)। প্রত্নতত্ত্বে কৌলাল-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মৃন্ময় পাত্র হস্তনির্মিত বা চক্রনির্মিত। চক্রনির্মিত হইলে পাত্রের গাত্রে বিলিখনের চিহ্ন বর্তমান থাকে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা কৌলালের পঙ্ক-প্রলেপ, রঙের প্রলেপ, অগ্নিদগ্ধতার

তাপমাত্রা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মৌলিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ মৃন্ময় বস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-সংক্রান্ত কতিপয় অন্যতম পদ্ধতি উল্লেখনীয়। মৃন্ময় নিদর্শনের বিশ্লেষণকার্যে (১) পেট্রোগ্রাফিক অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বিশেষ সহায়ক। (২) বর্ণালি-লেখী (স্পেক্‌ট্রোগ্রাফি) অনুশীলন করিয়া মৃন্ময় বস্তুর বিবিধ উপকরণ নির্ণয় করা যায়। (৩) নিউ ক্লিও বমবার্ডমেণ্ট বা সক্রিয়তা-মূলক বিশ্লেষণের ফলে মৃন্ময় বস্তু-সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকার্যে প্রত্নবস্তুর কোন ক্ষতি হয় না। (৪) এক্‌স্‌-রশ্মি প্রতিপ্রভ (ফ্লু ওরেসেণ্ট) বর্ণালি বিশ্লে-ষণের ফলে মৃত্তিকানির্মিত প্রত্নবস্তু-সম্পর্কিত অনেক নূতন তত্ত্ব পরিবেশিত হইয়াছে। (৫) ইলেক্‌ট্রন প্রোবিং পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া একটি সীমিত ক্ষেত্রে বিন্যস্ত মৃন্ময় নিদর্শনের আয়তন নির্ণয় করা যায়।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল বিজ্ঞান-পদ্ধতির অনুশীলনজাত তত্ত্বের আনুকূল্যে মৃন্ময়-পাত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। প্রসঙ্গতঃ শেফ্যারড্‌ লিখিত 'সেরামিক্ ফর্‌ দি আর্‌কিওলজিস্ট' গ্রন্থে মৃন্ময় বস্তু-সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্যের পর্যালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মৃন্ময় প্রত্নবস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য উৎখনকের সর্বদা সচেতন থাকা অধিক প্রয়োজন। কেবলমাত্র বিজ্ঞান-চেতনাসম্পন্ন উৎখনকই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত মৃন্ময় বস্তুকে বিশেষভাবে উত্তোলন-পূর্বক সংরক্ষণ করিতে সমর্থ।

(ঘ) ধাতুদ্রব্য : প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের বিভাজন মানুষের ব্যবহৃত বস্তুর পদার্থভিত্তিক—অশ্ম, তাম্র ও ব্রঞ্জ এবং লৌহ ধাতুদ্রব্যের বর্ণালি বিশ্লেষণ দ্বারা ধাতুর প্রথম ব্যবহার, পদার্থ-নির্ণয়, সঙ্করধাতু নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়-সংক্রান্ত অনেক তথ্য উদ্‌-ঘাটিত হইয়াছে। বর্ণালি-বীক্ষণের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে

যে, নবাশ্মীয় যুগেই সম্ভবতঃ তাম্র ধাতুর ব্যবহারের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল।

ফ্রাওএনহফই (১৮১৭) প্রথম বর্ণালি পর্যবেক্ষণের যন্ত্র ব্যবহার করেন। পরে বর্ণালি-বীক্ষণের (স্পেক্ট্রাস্কোপ) প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্ণালি-লিখ-এর (স্পেকট্রোগ্রাফ) সাহায্যে আলোক নির্গমের প্রকৃতি ও ধারা নির্ণয় করা যায়। প্রত্ননিদর্শনের এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বর্ণালি-লিখনজাত। সাধারণ দৃষ্টিতে যে সকল পদার্থ নির্ণয়সাধ্য নহে বর্ণালি-পর্যবেক্ষণের ফলে তাহাদের নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে। উক্ত পদ্ধতির অনুসরণের ফলে ধাতুর বিশুদ্ধতা এবং সঙ্কর ধাতুর বিভিন্ন উপকরণের নির্ণয়কার্য সহজসাধ্য হইয়াছে। এমন কি, উক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষিত ধাতুর উৎপত্তিস্থলও নির্ধারণ করা সম্ভবপর।

এতদ্‌ভিন্ন ধাতুদ্রব্যের আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণও উল্লেখযোগ্য। বিশুদ্ধ ধাতুর কোন অস্তিত্ব নাই। সাধারণতঃ সকল ধাতুই খাদমিশ্রিত। বিভিন্ন কারণবশতঃ ধাতুতে খাদ মিশ্রণ করা হয়। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করিয়া সঙ্কর ধাতু সম্পর্কিত অনেক তথ্যের প্রণিধান করাও সম্ভব হইয়াছে।

(ঙ) কাঁচ-নিদর্শন : প্রত্নবিজ্ঞানে সাধারণতঃ কাঁচনির্মিত বস্তুর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কাঁচদ্রব্যের প্রত্নতত্ত্বীয় বিশ্লেষণ করিয়া কাল নিরূপণ করাও সম্ভব নহে। অপর সংশ্লিষ্ট প্রত্ন-নিদর্শনের সাহায্যেই কাঁচনির্মিত বস্তুর কাল নির্ণয় করা সম্ভব। বর্তমানে বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে প্রত্নকাঁচ সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কিন্তু কাঁচের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও অধিক সমস্যাপূর্ণ। প্রথমতঃ, কাঁচের অবিমিশ্র উপকরণ নির্ণয় করা অতীব কঠিন কার্য। কারণ, নির্দিষ্ট আকারশূন্যতার জন্য কাঁচের বিভিন্ন উপকরণের স্বীয় সত্তার বিদ্যমানতা নির্ণয়সাধ্য নহে। এমন কি, কেলাস-সংক্রান্ত পরীক্ষণের সাহায্যেও বিভিন্ন উপকরণের

সনাক্তকরণ অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, সর্ব যুগে এবং সর্বাঞ্চলে, কাঁচের নির্মাণ-পদ্ধতির সাধারণ অনুরূপতাও উল্লেখনীয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া কাঁচের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও নির্ণয় করা যায়। প্রাচীন কাঁচতত্ত্ব বর্তমান প্রত্ন-বিজ্ঞানে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কাঁচ সম্পর্কিত কতিপয় অন্যতম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও উল্লেখযোগ্য : আর্ক-স্পেক্‌ট্রোগ্রাফি (আর্ক-বর্ণালি-লিখন), এক্‌স্‌রশ্মির-প্রতিপ্রভা (এক্‌স্‌রে ফ্লুওরেসেন্‌স্‌) বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সোডা ও চূন মিশ্রিত করিয়া প্রাচীন যুগের কাঁচ নির্মিত হইত। অধিক সংখ্যক প্রাচীন কাঁচ-নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া কাঁচনির্মাণে বিবিধ উপকরণের সংমিশ্রণ সংক্রান্ত অনেক তথ্য সন্নিবেশ করাও সম্ভব হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ আমেরিকার সেইরে (১৯৬২) কর্তৃক বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত কাঁচের তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। সাধারণতঃ পাশ্চাত্ত্য জগতে সোডা ও চূন পদার্থ দ্বারা কাঁচ নির্মিত হইত। দ্বিতীয় সহস্রক যুগভুক্ত কাঁচের মধ্যে ম্যাগ্‌-নিসিঅ্যাম্ (মৌলিক ধাতব পদার্থবিশেষ)-এর আধিক্য বিদ্যমান। কিন্তু অধিক অ্যান্টিম্যনি (সুর্মা)-সম্বলিত কাঁচে ম্যাগ্‌নিসিঅ্যাম্ ও প্যট্যাসিঅ্যাম্ পদার্থদ্বয়ের অংশ ন্যূন। অ্যান্টিম্যনি প্রয়োগের পূর্ব-পর্যন্ত কাঁচনির্মাণে ম্যাংগানিজই (ধাতুপদার্থ বিশেষ) প্রধান উপকরণ ছিল। প্রাচীন কাঁচনির্মাতা অ্যান্টিম্যনির প্রয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিত। কারণ, অ্যান্টিম্যনির সংযোগে অনাবশ্যক বর্ণ তিরোহিত হয় এবং কাঁচবর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐশ্লামিক কাঁচ ম্যাগ্‌নিসিঅ্যাম্ ও প্যট্যাসিঅ্যাম্ উপকরণের সংযোগে নির্মিত হইত। সুতরাং ঐশ্লামিক কাঁচ দ্বিতীয় সহস্রক যুগভুক্ত কাঁচের অনুরূপ। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীর ঐশ্লামিক কাঁচে সীসকের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। উক্ত কাঁচ চীন ও রাশিয়ার সীসক কাঁচ হইতে ভিন্ন।

উপরি-উক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তত্ত্ব অনুধাবন করিয়া কাঁচ-নির্মাণে ব্যবহৃত পদার্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন যুগের কাঁচের আঞ্চলিক বিভাজন সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার বিভাজন কাঁচ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করিতে অপারগ। প্রত্নবিজ্ঞানে কাঁচনির্মাণ-ক্ষেত্রের নির্ণয়কার্য এবং আবিষ্কৃত কাঁচের তারিখ-নিরূপণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কাঁচের তারিখ-নির্ণয়কার্য উহার সহিত সংশ্লিষ্ট তারিখ-সম্বলিত নিদর্শনের আবিষ্কারের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ব্রিল এবং হুড্ (১৯৬১) কর্তৃক প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করিলে কাঁচের কাল নিরূপণ করা সম্ভবপর। ভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে মৃত্তিকাগর্ভে বিন্যস্ত কাঁচখণ্ডের বাৎসরিক তাপমাত্রা অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই অবক্ষয়-প্রাপ্তির মান অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করিয়া কাঁচের কাল নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উৎখননে আবিষ্কৃত কাঁচ সম্পর্কিত আরও অনেক তথ্যের উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন—যেমন, কাঁচনির্মাণে ব্যবহৃত ফ্যার্‌নিস্ (অগ্নিকুণ্ড), অগ্নির তাপমাত্রা, ক্রুসিব্‌ল্ (গলাইবার জন্য মৃন্ময় পাত্র), ব্যবহৃত সাধিত্র ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন কাঁচনির্মাণের মৌলিক উপকরণসমূহ নির্ণয় করিয়া কাঁচের উৎপত্তিস্থল নির্ধারণ করাও অসম্ভব নহে। ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রসূত তত্ত্বের আনুকূল্যে কাঁচ সম্পর্কিত অনেক অভিজ্ঞান অনুধাবন করা সম্ভবপর হইয়াছে।

(চ) চর্মনির্মিত নিদর্শন: উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত চর্মনির্মিত বিবিধ বস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে অনেক অজ্ঞাত তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। শুষ্কীকৃত পশুচর্মের (লেদার) এবং পারচ্‌ম্যান্ট্-এর (লিখনের জন্য ব্যবহৃত পশুচর্ম) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া গৃহপালিত পশু সংক্রান্ত অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

পশুর চর্ম ও লোম অতীব দুর্লভ প্রত্ননিদর্শন। পশুর লোম দ্বারা

বয়নকৃত নিদর্শন ঈষৎ আর্দ্র জলবায়ুতে অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জলাভূমিতে উক্ত বস্তু সংরক্ষিত থাকে। শুষ্ক জলবায়ুতেও লেদ্যার ও পারচ্‌ম্যান্‌ট্‌ সম্যকরূপে রক্ষিত হয়। প্রসঙ্গতঃ মিশরের লেদ্যার-নিদর্শনের এবং প্যালেষ্টাইনের ডেড্‌-সী-স্ক্রোলের পারচ্‌ম্যান্‌ট্‌-এর আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। মধ্য এশিয়া হইতে বরফ দ্বারা আবৃত চর্মের আবিষ্কারও তাৎপর্যপূর্ণ। চর্মে বিন্যস্ত পশমের বা লোমের অনুশীলন করিয়া পশুর সনাক্তকরণও সম্ভবপর। কিন্তু পারচ্‌ম্যানট্‌-এর পরীক্ষা দ্বারা পশু সনাক্ত করা সম্ভব নহে। অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে চর্ম পরীক্ষা করিয়া পশু-প্রজাতি সনাক্ত করা যায়। রাইডের বিভিন্ন জাতীয় মেষের পশম বিশ্লেষণ করিয়া পশু-প্রজাতি সনাক্তকরণের পদ্ধতি উদ্‌ভাবন করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্নাশ্মীয় যুগ হইতেই মানুষ বিবিধ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া চর্মাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আরম্ভ করে। লিখনের নিমিত্ত পশুচর্ম বা পারচ্‌ম্যান্‌ট্‌-এর ব্যবহার অতীব প্রাচীন। পশুচর্ম-লেখর প্রাচীনতম নিদর্শন মিশর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে (২৬০০-২৫০০ খ্রীঃপূঃ)। বিবিধ যুগের পারচ্‌ম্যান্‌ট্‌ তৈয়ার করিবার প্রণালীও ভিন্ন। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, লিখনের নিমিত্ত মেষচর্ম দ্বারাই পারচ্‌ম্যান্‌ট্‌ তৈয়ার করা হইত। এমন কি, পারচ্‌ম্যান্‌ট্‌ ও চর্ম বিশ্লেষণ করিয়া কাল নিরূপণ করাও সম্ভবপর। প্রসঙ্গক্রমে ডেড্‌-সী-স্ক্রোলের কালনিরূপণের তথ্য উল্লেখনীয়। রেডিও-কার্‌বন এবং প্রত্নলেখতত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা উক্ত কালনিরূপণ সমর্থিত হইয়াছে।

(ছ) তন্তু-(ফাইব্যার্) নিদর্শন : পশু ও উদ্ভিদজাত তন্তু বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতেই তন্তু রঞ্জিত করিবার পদ্ধতি প্রচলিত। সুতরাং বিভিন্ন রঙ দ্বারা রঞ্জিত তন্তুর আবিষ্কারও স্বাভাবিক। কিন্তু সহজাত রঙ হইতে কৃত্রিম রঙের পৃথকীকরণ সহজসাধ্য নহে। তন্তু-বয়নকৃত পোষাক-পরিচ্ছদের

আবিষ্কার অত্যল্প। সুতরাং রাসায়নিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত তন্তুর নমুনা সংগ্রহ করা দুরূহ। তন্তুর আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করিয়া পশু ও উদ্ভিদকুলের বিভিন্ন প্রজাতির সনাক্তকরণও সম্ভব হইয়াছে।

বর্তমান প্রত্নবিজ্ঞানে বিবিধ বিজ্ঞানশাখার গবেষণালব্ধ পদ্ধতির অনুশীলন অপরিহার্য। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে যে সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনজাত নহে। তথাপি মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্তের রূপায়ণকার্যে উপরি-উক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রসূত তথ্যসমূহের গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ, প্রত্ননিদর্শনের প্রত্ন-তত্ত্বীয় অনুশীলন দ্বারা উল্লিখিত তত্ত্বসমূহ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নহে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই সকল প্রকার প্রত্ননিদর্শনের ব্যক্তী-করণের মূল ভিত্তি। পুরাবস্তুর আবিষ্কার ও তাৎপর্য নির্ণয়ের উপরই মানবসমাজের ইতিবৃত্তের রূপায়ণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু অদ্যাপি ভারতবর্ষে প্রত্ননিদর্শনের উপরি-উক্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত কোন উল্লেখযোগ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল দেশেই উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য বিবিধ বীক্ষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন কি, বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখার বিশারদগণও ব্যক্তিগত উদ্দীপনায় বশবর্তী হইয়া প্রত্ননিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। ফলে, প্রত্ন-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত বিবিধ পদ্ধতির প্রবর্তনও সম্ভব হইয়াছে। বর্তমান জগতে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে প্রত্ননিদর্শনের স্বরূপ-কথন অসম্পূর্ণ থাকাই স্বাভাবিক। অতএব মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্তের রূপায়ণও অসমাপ্ত থাকিবে।

ভারতবর্ষ প্রাচীন মানবসভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। ভারতবর্ষের অনেক প্রত্নস্থল হইতে প্রাচীন মানবসংস্কৃতির অসংখ্য নিদর্শন আবি-স্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তথ্য অদ্যাপি অজ্ঞাত। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরাও প্রত্ননিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে অধিক সচেতন নহেন। আবিষ্কৃত অসংখ্য প্রত্ন-

নিদর্শনের কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ইতিবৃত্ত রূপায়ণকার্যে প্রত্ননিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তত্ত্ব সন্নিবেশ করাও সম্ভব হয় নাই। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য সর্বপ্রকার সুব্যবস্থার প্রয়োজন অত্যধিক। সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তত্ত্ব ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা সম্ভবপর নহে।

কিন্তু উপরি-উক্ত বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের এখ্‌তিয়ারভুক্ত নহে। সুতরাং উৎখনককে বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার বিশারদগণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। উৎখনক স্বয়ং প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের জন্য সর্বপ্রকার নিদর্শনের তথ্য উদ্‌ঘাটন করিবেন। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন দ্বারা উদ্‌ঘাটিত তত্ত্বই ইতিবৃত্ত রূপায়ণের সুদৃঢ় ভিত্তি।

। ২ ।

প্রত্ননিদর্শন : প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন

মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য প্রত্ননিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রসূত তথ্যই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান নহে। প্রত্নবস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু মানবসংস্কৃতির প্রকৃত তথ্যের উদ্‌ঘাটন প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন দ্বারাই সম্ভবপর। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহের আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন করিয়াই সংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়িত হইয়াছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করিয়া প্রত্নবস্তু সম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত এবং প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন-প্রসূত তথ্যসমূহের সাহায্যেই মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত

সম্যকরূপে রূপায়ণ করা সম্ভবপর। এই অনুচ্ছেদে প্রত্ননিদর্শনের প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনজাত তথ্যসমূহ আলোচিত হইয়াছে।

আবিষ্কৃত নিদর্শনের প্রত্নতত্ত্বীয় ব্যাখ্যান সংক্রান্ত বিবিধ নিয়ন্ত্রণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রাচীনতম মানবসমাজের ইতিবৃত্তের রূপায়ণ-কার্যে প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের গুরুত্ব কোন ক্ষেত্রেই ন্যূন নহে। লিখিত উপাদানবর্জিত প্রাগৈতিহাসিক যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই প্রত্নবিদের প্রধানতম উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রাচীন যুগের প্রত্ননিদর্শনের অপ্রতুলতা বা অবিদ্যমানতা উক্ত ইতিবৃত্ত-রূপায়ণকার্যের প্রধানতম পরিপন্থী। প্রাচীন মানবসমাজের ইতিহাস লিখনের জন্য প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদান অতীব বিরল। সর্বপ্রথমেই উল্লেখনীয় যে, উৎখনন কেবলমাত্র সংস্কৃতির বাস্তব উপাদান সরবরাহ করে। মনুষ্যনির্মিত প্রাচীন হাতিয়ার বা অপর সরঞ্জামসমূহই মানবসমাজের ইতিবৃত্তের প্রকৃত বাস্তব ভিত্তি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে উক্ত বাস্তব উপকরণসমূহ প্রাপ্তি-যোগ্য নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবে প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ার এবং অপর কারুশিল্প-নিদর্শন বিবিধ আকারে রূপায়িত হয়। এতদ্ব্যতীত কালের প্রবাহে অধিক সংখ্যক প্রত্ননিদর্শন ধ্বংসপ্রাপ্তও হইয়াছে। সাধারণতঃ জৈব পদার্থ দ্বারা নির্মিত নিদর্শনের অবশেষ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগ্নপ্রবণতার জন্য সুরক্ষিত অবস্থায় অনেক নিদর্শন আবিষ্কার বা উদ্ধার করাও সম্ভব নহে। ফলে, উক্ত প্রকার প্রত্নবস্তুর যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব। বিবিধ অসুবিধার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীনতম মানবসমাজের ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনই মূল সূত্র। এই কার্যের নিমিত্ত সকল যুগের সর্বপ্রকার প্রত্ননিদর্শনের অনুশীলন প্রয়োজন। তাহা হইলেই প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগদ্বয়ের ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখন সম্ভবপর হইবে।

মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের জন্য উৎখনকের বিভিন্ন বিজ্ঞান-

শাখার সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রত্নবস্তুর যথার্থ মূল্য নির্ধারণের এবং স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য নৃতত্ত্ব এবং লোকতত্ত্ব হইতে অধিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অদ্যাপি বর্তমান আদিম মানবকুলের সংস্কৃতির নৃতত্ত্বীয় অধ্যয়ন হইতেও প্রভূত সহায়তা লাভ করা যায়। অধিকন্তু অনেক প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা ও অনুষ্ঠান সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রত্নবস্তুর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনকার্যে উক্ত তত্ত্ব-প্রসূত তথ্যের ব্যবহারের সংকীর্ণতা সম্পর্কে প্রত্নবিদের সর্বদাই সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণের সংস্কারজাত তথ্যের গুরুত্ব উল্লেখ্য। পৃথিবীর প্রাচীনতম মানবকুলের পরিচিতির জন্য অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণই প্রতিমূর্তিস্বরূপ। অদ্যাপি অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসিগণ প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নাশ্মীয় যুগের সংস্কৃতির ধারা বহন করিতেছে।

প্রত্ননিদর্শনের ব্যাখ্যানকার্যে নৃতত্ত্বের অবদান সর্বাধিক। তৎসত্ত্বেও প্রত্নবিজ্ঞানে নৃতত্ত্বীয় তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কিত কতিপয় সতর্কতামূলক সাধারণ নীতি উল্লেখনীয়। কারুশিল্পজনিত পদ্ধতি বা কৌশলের অনুরূপতার অধ্যয়ন হইতে সামাজিক বা ধর্মীয় সংগঠনের অভিন্নতা প্রতিপাদন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। অনুরূপ পরিবেশজাত সদৃশ কারুশিল্প-নিদর্শন হইতে আদিম অধিবাসিগণের এবং প্রাগৈতি-হাসিক মানবকুলের অবিচ্ছেদ্য রূপের প্রামাণিকতাও অবধারণ করা যায় না। তুষারাবৃত অঞ্চলের অধিবাসী এস্‌কিমোর সহিত প্রাগৈতি-হাসিক ম্যাগ্‌ডেলিয়ান্ মানবকুলের সাধারণ অনুরূপতা উল্লেখ্য। কিন্তু এই প্রকার তথ্য হইতে তাঁহাদিগের সামাজিক গঠনের ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অপৃথকত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নহে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে সকল প্রকার সামাজিক আচার এবং কারুশিল্প-নিদর্শনের ধারাবাহিকতা অবধারণ করাও অসম্ভব। কারণ, বর্তমান আদিম অধিবাসিগণের এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবকুলের পরিবেশ সম্পূর্ণ

ভিন্ন। সর্বদাই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পরিবেশের সঙ্গেই মানব-সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ বিজড়িত।

এতদব্যতীত লোকতত্ত্বও প্রত্নবস্তুর ব্যাখ্যানকার্যে প্রভূত সাহায্য করে। প্রচলিত প্রাচীন প্রথা, বেশভূষা, কারুশিল্প, চিত্রণ ইত্যাদি অনুশীলন করিয়া প্রত্নবস্তুর মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। সম্ভবতঃ সংস্কৃতিজাত অনেক তথ্যই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল-পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত। তৎসত্ত্বেও লোকতত্ত্ব অনুশীলন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক যুগের জীবন-যাত্রার ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা সঙ্গত নহে। কারণ, লোকাচার কখনই নিশ্চল থাকিতে পারে না। যুগে যুগে লোকাচার পরিবর্তিত, সংশোধিত এবং প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং লোকাচারতত্ত্ব যুগ-নির্দেশক নহে।

অতএব প্রত্ননিদর্শনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত সমাজতত্ত্বীয়, নৃতত্ত্বীয় এবং লোকতত্ত্বীয় পর্যালোচনা-প্রসূত তথ্য অতীব সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা কর্তব্য। প্রত্ননিদর্শনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনই একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করিতে সমর্থ। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনকার্যেও উল্লিখিত বিজ্ঞান-শাখার সাহায্য ব্যতীত প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃত মর্মার্থ প্রকাশকরণ সম্ভব নহে। সর্বপ্রকার প্রত্ননিদর্শনের মৌলিক তত্ত্ব উন্মোচন করিয়াই মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করিতে হইবে। সুতরাং প্রত্ননিদর্শনের স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন এবং সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয়তত্ত্বের পর্যালোচনা প্রয়োজন। সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসূচক প্রলক্ষণসমূহের মধ্যে (ক) সংস্কৃতি ও উদ্ভাবক, (খ) সংস্কৃতি ও পরিবেশ, (গ) খাদ্যান্বেষণ, (ঘ) বসতি ও বাস্তুনির্মাণ, (ঙ) বাস্তব সামগ্রী ও গৃহস্থালি-সরঞ্জাম, (চ) জনতাবর্ধন, (ছ) শিল্প-প্রগতি, (জ) বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথ, (ঝ) পর্যটন ও পরিবহণ, (ঞ) সুকুমার কলা, (ট) ধর্ম ও ম্যাজিক, (ঠ) সামাজিক সংগঠন এবং (ড) সংস্কৃতির প্রব্রজন, অভিযান ও প্রভাব বিস্তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(ক) সংস্কৃতি ও উদ্ভাবক : বাস্তব নিদর্শন অনুশীলন করিয়া মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই উৎখনকের প্রধানতম কার্য। এই কার্যের নিমিত্ত নির্ভরযোগ্য প্রত্নবস্তুর অনুশীলন আবশ্যক। কাল-নির্দিষ্ট অভিজ্ঞানের ভূতত্ত্বীয়, ভৌগোলিক এবং নৃতত্ত্বীয় বিশ্লেষণ অধিক প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণ-প্রসূত তথ্যই ইতিহাস লিখনের মূল ভিত্তি।

প্রত্নবিজ্ঞানে 'সংস্কৃতি' সংজ্ঞা দ্বারা মানুষের প্রকৃতিজাত এবং সমাজজাত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বাস্তব ও বোধশক্তিসংজাত কার্য-ক্রম প্রসূত সংসাধনের সমষ্টিকে বুঝায়। মানুষের শিক্ষা ও অভ্যাস-দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞানসমূহকেই সংস্কৃতি বলা যায়। সামগ্রিক উৎকর্ষ-সাধনই সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। অনুরূপ উৎকর্ষ-সাধিত অঞ্চল সংস্কৃতি-ক্ষেত্র নামে অভিহিত। অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে মানুষের জীবনধারণের ও সমাজের সংসাধনাত্মক বাস্তব নিদর্শনের অনুরূপতা বিদ্যমান। সংস্কৃতির শ্রেণিবিন্যাস ও ক্ষেত্রবিন্যাস নির্ধারণ এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অবধারণপূর্বক মানবস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই প্রত্নতত্ত্বীয় অনু-শীলনের গুরুত্বপূর্ণ কার্য। এই কার্যের নিমিত্ত কালানুক্রমিক সংস্কৃতির নির্দেশক পুরাবস্তুর শ্রেণিগত বিন্যাস করা প্রয়োজন। সংস্কৃতির শ্রেণিবিন্যাসকার্যে একক প্রত্নবস্তুর গুরুত্ব অবর্তমান। একক প্রত্নবস্তুর দ্বারা কোন সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের পরিধি বা ব্যাপ্তি নির্ণয় করা অসম্ভব। সর্বপ্রকার আবিষ্কৃত নিদর্শনের সমষ্টিই সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচায়ক। একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের নিদর্শনের শ্রেণিভিত্তিক অনুরূপতা স্বীকার্য। উক্ত সংস্কৃতির উদ্ভাবকগণের কার্যক্রমের ও চিন্তাধারার অনু-রূপতাও উল্লেখনীয়। অতএব সাধারণভাবে মনে হয় যে, একটি ক্ষেত্রের সংস্কৃতির উদ্ভাবকগণ কোন এক নরগোষ্ঠীভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। পণ্ডিতগণ সংস্কৃতি-ক্ষেত্রকে এক ভাষাগোষ্ঠীর সহিতও সংযুক্ত করিয়া-ছেন। অনেকে মনে করেন যে, সংস্কৃতির পার্থক্য বিভিন্ন নরগোষ্ঠীজাত। সুতরাং কতিপয় বেত্তা একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে একক নরগোষ্ঠীর বা ভাষাগোষ্ঠীর বিদ্যমানতাই স্বাভাবিক বলিয়া ধার্য করিয়াছেন।

অনুরূপ বংশগত প্রাপ্তিসাধ্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমন্বিত মানবসমষ্টিকে নরগোষ্ঠী সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। নরগোষ্ঠীর অনুশীলন নৃতত্ত্বের অধীন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অশ্মীভূত মানবকুলের নিদর্শন বিশ্লেষণ পূর্বক নরগোষ্ঠী নির্ণয় করা প্রাগৈতিহাসিক নৃতত্ত্বের এখ্‌তিয়ার-ভুক্ত। অশ্মীভূত মানবকুলের সহিত সংশ্লিষ্ট বাস্তব নিদর্শন উক্ত নর-গোষ্ঠির সংস্কৃতির পরিচয় প্রদান করে। এই অনুশীলনকার্যের নিমিত্ত উৎখনকের নৃবিজ্ঞান-সম্পর্কিত সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। নৃবিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ তত্ত্বের সাহায্যে প্রাগৈতি-হাসিক যুগের মানুষের এবং সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাও সম্ভবপর হইয়াছে।

এই নৃবিজ্ঞানের অনুশীলন আবিষ্কৃত প্রাচীন নরকঙ্কাল বা নর-কঙ্কালাংশ-এর উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু অনেক নৃবিজ্ঞানীর মতে প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত নরকঙ্কাল ও নরকঙ্কালাংশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা অনুচিত। তাঁহারা মনে করেন যে, প্রাচীন যুগের নরকঙ্কালাংশ অসংরক্ষিত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। করোটি ও দেহের অপর অংশের আবিষ্কারই অধিক। এই প্রকার আবিষ্কার হইতে নরমুণ্ড, নাসিকা, চোয়াল, মুখমণ্ডল প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক পরিমাপ গ্রহণপূর্বক মানুষের আকার ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত প্রদান করা সম্ভব। কিন্তু নরগোষ্ঠীর নির্ণয়কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় ত্বকের রঙ, কেশের প্রকৃতি ও রঙ, অক্ষির আকার ও প্রকৃতি প্রভৃতি সংক্রান্ত কোন তথ্যের সন্ধান লাভ করা যায় না। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগের নরগোষ্ঠী-নির্ধারণের পরিধি অধিক সীমিত।

তৎসত্ত্বেও প্রাগৈতিহাসিক নরগোষ্ঠীর কালানুক্রমিক ভৌগোলিক বিস্তার নির্ণয় করা সম্ভবপর। কিন্তু নরগোষ্ঠীর বিস্তারের সহিত সংস্কৃতির বিস্তারের একত্ব অবধারণ করা অনুচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, প্রত্নাশ্মীয় যুগের মৌস্‌টেরিয়ান্ সংস্কৃতি নিয়ান্ডার্থাল্

নরগোষ্ঠীর সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমন্বিত নরগোষ্ঠীর সহিত উক্ত সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট থাকার প্রমাণও বিরল নহে। গ্রীমাল্ডি গিরিগুহার নিদর্শন হইতে মনে হয় যে, নিগ্রোয়েড্ নরগোষ্ঠী এবং নরডিক্ দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমন্বিত ক্রোম্যাগনন্ মানুষও একই প্রত্নতত্ত্বীয় সংস্কৃতিভুক্ত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা হইতে আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রমাণ করিয়াছে যে, উক্ত প্রত্নক্ষেত্রদ্বয়ের তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির সহিত একাধিক নরগোষ্ঠী সংযুক্ত। ঐতিহাসিক যুগের সংস্কৃতির সহিত অধিকসংখ্যক নরগোষ্ঠীর সম্বন্ধও উল্লেখযোগ্য। প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানের অনুশীলন হইতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সভ্যতার সহিত কোন একটি নরগোষ্ঠীরই সাক্ষাৎ সম্পর্ক অবিদ্যমান। সভ্যতার সৃষ্টি বা সমৃদ্ধি কোন একটি বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীর সহিত যুক্ত নহে। উপরন্তু একাধিক নরগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই সভ্যতা সৃষ্ট হয় এবং পরিপুষ্টতা লাভ করে। অতএব নরগোষ্ঠীর সহিত কোন এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির অভেদত্ব প্রমাণ করা বিজ্ঞানসম্মত নহে।

নরগোষ্ঠীর অনুরূপ ভাষাগোষ্ঠীর সহিতও সংস্কৃতির একীকরণ সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে। একই সংস্কৃতিভুক্ত মানুষ এক ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত হওয়াও অসাধারণ। ভাষা ও সংস্কৃতির সমীকরণও বিজ্ঞানসম্মত নহে। অতীতের কেল্টিক্ সংস্কৃতি বা জার্মান-সংস্কৃতি এবং কেলটিক প্রত্নতত্ত্ব বা জার্মান প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি উক্তির সার্থকতা বর্তমান প্রত্নবিজ্ঞানে অমূলক। তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতির ও ভাষার বিস্তার-ক্ষেত্রের পর্যালোচনা প্রয়োজন। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভাষার অনুশীলনকার্য সম্ভব নহে। কারণ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভাষা সম্পর্কিত অভিজ্ঞান অবিদিত। এমন কি, আদি-ঐতিহাসিক যুগের ভাষা সংক্রান্ত তথ্যও অত্যল্প। সুতরাং কেবলমাত্র ঐতিহাসিক যুগের লিখিত নিদর্শনের সাহায্যেই ভাষাতত্ত্বীয় পর্যালোচনা সম্ভবপর।

ভাষাতত্ত্ব ব্যতীত মানবতত্ত্ব বা লোকতত্ত্বও প্রত্নতত্ত্বীয় পর্যালোচনাকে বিবিধ উপায়ে সাহায্য করে। প্রসঙ্গতঃ, বর্তমান আদিম অধিবাসিগণের মধ্যেও বিভিন্ন ভাষার ও উপভাষার বিদ্যমানতা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের সময় ২০০০০০০ অধিবাসিগণের মধ্যে পঞ্চশতাধিক ভাষা প্রচলিত ছিল। এমন কি, একই সংস্কৃতিভুক্ত নরগোষ্ঠীর মধ্যেও বিভিন্ন ভাষার প্রচলন উল্লেখনীয়। অধিকন্তু আদিবাসিগণ স্বীয় সংস্কৃতির বাস্তব ভিত্তি সংহত রাখিয়া অন্য ভাষাও আয়ত্ত করে। সুতরাং প্রত্ননিদর্শনভিত্তিক ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন বহু ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তিকর। প্রসঙ্গতঃ, আর্য বা ইণ্ডো-ইউরোপীয় নামক তথাকথিত নরগোষ্ঠী বা সংস্কৃতিগোষ্ঠী সম্পর্কিত আলোচনা প্রয়োজন।

আর্য বা ইন্দো-ইউরোপীয় সংজ্ঞা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বভিত্তিক। সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, আর্য বা ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীগোষ্ঠী বা সংস্কৃতিগোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট স্থানে উদ্ভূত হয় এবং পরে পৃথিবীর বিভিন্নাংশে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু তথাকথিত আর্য ভাষার বা সংস্কৃতির কোন প্রকার প্রত্নতত্ত্বীয় বাস্তব নিদর্শন অদ্যাপি আবিস্কৃত হয় নাই। আর্য ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন দল ও উপদল সম্পর্কিত কোন প্রকার তথ্যই প্রত্নতত্ত্বীয় অভিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত নহে। অতএব কেবলমাত্র ভাষাতত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া তথাকথিত আর্যদিগের উৎপত্তি এবং বিস্তার সম্পর্কে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্পূর্ণ অবাস্তব।

ভারতবর্ষের আর্য ভাষাগোষ্ঠী বা আর্য সংস্কৃতিগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনাও প্রয়োজন। সাধারণতঃ বৈদিক সংস্কৃতি আর্য সংস্কৃতিরূপে স্বীকৃত। বিবিধ বৈদিক সাহিত্যিক উপাদান-প্রসূত বৃত্তান্তই আর্যগণের ইতিহাস। কিন্তু 'আর্য' সংজ্ঞা কোন নরগোষ্ঠীর পরিচায়ক নহে। এমন কি, কোন সংস্কৃতির সহিতও আর্য ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব নহে। আর্য নামধেয় ভাষাগোষ্ঠীর বা সংস্কৃতিগোষ্ঠীর

কোন প্রকার বাস্তব প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতবর্ষ বা অন্যত্র হইতে এমন কোন প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার সাহায্যে তথাকথিত আর্যগণকে কোন প্রত্নতত্ত্বীয় সংস্কৃতির সহিত সংযুক্ত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে আর্য-সংস্কৃতির কোন প্রত্নতত্ত্বীয় বাস্তব সত্তা অবিদ্যমান। হস্তিনাপুর ও অপর প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত কৌলাল-নিদর্শন (চিত্রিত ধূসর কৌলাল) আর্য-সংস্কৃতিভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই মতবাদের প্রত্নতত্ত্বীয় বা সাহিত্যিক ভিত্তি অবর্তমান। প্রকৃতপক্ষে আর্য সম্পর্কিত কোন বাস্তব সত্তার প্রামাণিক নিদর্শন অজ্ঞাত। সুতরাং প্রত্নতত্ত্বের বিচারে আর্য-সংস্কৃতি বা আর্য-নরগোষ্ঠী নামক সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

এই প্রসঙ্গে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের সহিত নরগোষ্ঠীর সম্পর্ক আলোচনীয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের সংখ্যা অল্প ছিল। মানব-বসতি বিক্ষিপ্ত ছিল এবং বিভিন্ন বসতির সহিত যোগাযোগেরও বিশেষ সুযোগ ছিল না। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অনুরূপ সংস্কৃতির বিদ্যমানতা স্বাভাবিক। কিন্তু তাম্রাশ্মীয় যুগের সংস্কৃতির সমস্যা অধিক জটিলতাপূর্ণ। মানবকুলের ক্রমবর্ধমানতা এবং পারস্পরিক সম্বন্ধের ফলে অধিকাংশ সভ্যতার ক্ষেত্রে একাধিক সংস্কৃতির নিদর্শনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রত্নতত্ত্বীয় বিশ্লেষণকার্য দ্বারা উক্ত ক্ষেত্রের বহিরাগত এবং দেশজ সংস্কৃতির নিদর্শন নির্ণয় করিতে হইবে। এই নির্ণয়কার্য হইতেই সংস্কৃতির প্রভাব এবং বিস্তার সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, প্রভাব ও বিস্তার সংক্রান্ত অনেক তথ্য কৌলাল- নিদর্শনভিত্তিক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৌলালের অগ্নিদগ্ধতা নিকৃষ্ট ছিল। সুতরাং অধিকাংশ মৃন্ময় পাত্রই ক্ষণভঙ্গুর। উপরন্তু এই সকল কৌলালের বৈলক্ষণ্য সম্পূর্ণ আঞ্চলিক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৌলালের তৈয়ার ও ব্যবহার সাধারণতঃ ঐতিহ্যিক। প্রাচীনকালে মৃৎপাত্রের নির্মাণকার্য স্ত্রীজাতির এখ্‌তিয়ারভুক্ত ছিল।

স্ত্রীলোকগণ কৌলাল-নির্মাণের ঐতিহ্যিক প্রণালী অনুসৃত পথ হইতে বিচ্যুত হন নাই। প্রাগৈতিহাসিক বিজেতাগণ বিজিত পুরুষদিগের প্রাণনাশ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে অধিকার করিত। বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকগণ কখনই ঐতিহ্যিক পথভ্রষ্টা হয় নাই। উপরন্তু তাহারা প্রচলিত প্রথানুসারে কৌলাল নির্মাণ করিত। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে বহিরাগত কৌলালের অনুকরণও করা হইয়াছে। তথাপি কৌলাল-নিদর্শনের সহিত নরগোষ্ঠীর কোন বাস্তব সত্তার বিদ্যমানতা প্রমাণ করা অসম্ভব।

প্রসঙ্গতঃ প্রাচীন কালে বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির উপর পরিবেশের প্রভাবও উল্লেখনীয়। প্রধানতঃ, সংস্কৃতি পরিবেশজাত। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যাশ্মীয় যুগের নদীকেন্দ্রিক এবং অরণ্যকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বিভিন্নতা উল্লেখযোগ্য। উভয় সংস্কৃতির উদ্ভাবকগণ একই নরগোষ্ঠীভুক্ত। কিন্তু পরিবেশের জন্য সংস্কৃতির রূপ ভিন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের কাঠামোর বিভিন্নতার জন্যও সংস্কৃতির অসামঞ্জস্য উদ্ভূত হয়। মেসোপটেমিয়ার ও অন্য অঞ্চলের ব্রোঞ্জযুগের অধিবাসিগণ একই নরগোষ্ঠীজাত হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম ও নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট। এমন কি, ঐতিহাসিক যুগের প্রত্ননিদর্শনের সহিত কোন একটি সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করাও সম্ভব নহে। একটি অঞ্চলের বিভিন্ন যুগের প্রত্ননিদর্শনই সংস্কৃতির প্রকৃতির যথার্থ নির্দেশ প্রদান করে। প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনই সংস্কৃতির বিবর্তন-মূলক ধারার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ। কিন্তু সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তারের সহিত কোন বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীর বা ভাষাগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ সম্পর্কের বিদ্যমানতা প্রমাণ করা সহজসাধ্য নহে। নৃতত্ত্বীয় ও ভাষাতত্ত্বীয় তথ্যের সহিত প্রত্নতত্ত্বীয় অভিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করাও দুরূহ। প্রকৃতপক্ষে নৃতত্ত্বীয় ও ভাষাতত্ত্বীয় তথ্যের সহিত প্রত্ন-তত্ত্বের সঙ্গতি অবিদ্যমান। প্রত্নতত্ত্বীয় অভিজ্ঞানের সহিত মানবকুল-তত্ত্বের মিলনও অবাস্তব। বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত সমন্বয় সাধন করা সম্ভব

হইলেও উহার ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। অতএব এই প্রকার সংস্কৃতির রূপায়ণ সর্বক্ষেত্রে সন্দেহাতীত হওয়া অস্বাভাবিক।

বর্তমান উৎখননতত্ত্বে উৎখনিত প্রত্নস্থলের নামানুসারেই সংস্কৃতির বা সভ্যতার নামাঙ্কন বিধেয়—যেমন মহেঞ্জোদারো-সংস্কৃতি, হরপ্পা-সংস্কৃতি, হস্তিনাপুর-সংস্কৃতি ইত্যাদি। প্রত্নস্থলের নামানু-সারেই সংস্কৃতির উদ্ভাবকের নামাঙ্কন করাও বিজ্ঞানসম্মত—যেমন, সুমের-এর সংস্কৃতির উদ্ভাবক সুমেরীয় নামে অভিহিত। ভাষা সম্পর্কেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা শ্রেয়। হরপ্পা-ভাষা বলিতে হরপ্পা নামক প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত ভাষাকেই বুঝায়। কিন্তু একাধিক প্রত্নস্থল হইতে অনুরূপ সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলে, সর্বপ্রথমে আবিষ্কৃত প্রত্নস্থলের নামানুসারে উক্ত সংস্কৃতির নামাঙ্কন করা কর্তব্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হরপ্পা-সংস্কৃতির অনুরূপ নিদর্শন অন্য প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত হইলে, সর্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হরপ্পা প্রত্নস্থলের নামানুসারেই উক্ত সংস্কৃতির নামকরণ বিজ্ঞানসম্মত। উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করিলে সংস্কৃতি, নরগোষ্ঠী এবং ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর।

(খ) **সংস্কৃতি ও পরিবেশ :** প্রাকৃতিক পরিবেশই মানব-সংস্কৃতির স্রষ্টা ও ধারক। পরিবেশ-সংক্রান্ত তথ্য সাধারণভাবে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক সংস্কৃতিই পরিবেশজাত। পরিবেশকে কেন্দ্র করিয়াই সকল সংস্কৃতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু মানুষও পরিবেশকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রভাবিত করিতে সমর্থ। সাধারণতঃ পরিবেশের সহিত সমতা রক্ষা করিয়াই মানুষ জীবন ধারণ করে।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টার মধ্যেই মানবসংস্কৃতির জন্ম। ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার ফলেই সংস্কৃতি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। শিকারজাত সংস্কৃতির-

পরিবেশ পশুপালনজাত বা কৃষিজাত সংস্কৃতির পরিবেশ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিভিন্ন সংস্কৃতিভুক্ত মানুষের কর্মতৎপরতা দ্বারাও পরিবেশ বিবিধ উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। মানবীয় তৎপরতার ফলে আবাস-স্থলের পরিবেশও রূপান্তরিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। ফলে, মানুষের ও পরিবেশের মধ্যে সমতার ব্যাঘাত জন্মায়। পরিবেশের রূপান্তর এবং মানবজীবনধারণের সহিত পরিবেশের সংঘাত হইতেই নূতন সংস্কৃতি উদ্ভূত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তুষারের পশ্চাদপসরণের ফলেই ম্যাগ্ডালেনিয়ান্ সংস্কৃতির অবসান ঘটে এবং পরবর্তী অ্যাজিলিয়ান্ সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। অরণ্যবাসীর ও নদীর উপত্যকাবাসীর সংস্কৃতির ভিন্নতাও পরিবেশজাত। হিমযুগীয় তুন্দ্রা-অঞ্চল অরণ্য দ্বারা প্রতিস্থাপিত ছিল। সুতরাং উক্ত অঞ্চলেই মধ্যাশ্মীয় যুগের প্রস্তর-হাতিয়ারের উদয় হয়। মিশরের নীল নদীর উপত্যকায় সভ্যতার বিকাশের পূর্বেই এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে চক্র এবং রথের প্রচলন আরম্ভ হয়। কিন্তু কেবলমাত্র এই প্রকার অভিজ্ঞান হইতে প্রমাণিত হয় না যে, এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের সভ্যতাই অধিকতর উন্নত ছিল। চক্র ও রথের আবির্ভাবও পরিবেশজাত। পশ্চিম এশিয়ার নিষ্পাদপ (স্টেপ) পরিবেশেই চক্র বা রথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে নদীতান্ত্রিক মিশরে জলযান আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং চাইল্ড (১৯৫১) মন্তব্য করিয়াছেন যে, সংস্কৃতির উন্নতির গতির বা ধারার মান পরিবেশের সহিত সংস্কৃতির সম্পর্কের এবং পরিবেশ কর্তৃক আরোপিত চাহিদার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। অরণ্যবাসী শিকারীর নিকট বর্তমান বাষ্পীয় যান সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

মানবসংস্কৃতির বিকাশের ও উন্নতির ধারা নির্ণয় করিবার জন্য প্রত্ননিদর্শনের মর্মোদ্ঘাটন এবং উহার সহিত পরিবেশের সম্পর্ক নির্ধারণ করাই উৎখনকের অপর প্রধান কার্য। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিশ্লেষণের উপরই প্রত্ননিদর্শনের মর্মোদ্ঘাটনকার্য নির্ভরশীল।

পরিবেশের যথার্থ অনুশীলন করিয়াই সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ পূর্বক এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে সংস্কৃতির অগ্রগম্যতার মান নির্ণয় করা যায়। অ-রূপান্তরিত বা স্বাভাবিক পদার্থের বিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানতা সংস্কৃতির উন্নতির ও অবনতির পরিচয় প্রদান করে। প্রস্তর এবং তাম্র-ধাতুর নিদর্শনের আবিষ্কার দ্বারা তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ প্রমাণিত হয়। তাম্র-ধাতুর অবিদ্যমানতার জন্যই অনেক অঞ্চলে সংস্কৃতি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। সর্ব ক্ষেত্রেই বাস্তব পদার্থের প্রাপ্তি এবং উহার ব্যবহার পরিবেশের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।

(গ) খাদ্যান্বেষণ: খাদ্যই পৃথিবীর প্রাণিকুলের জীবনধারণের একমাত্র উৎস। সুতরাং খাদ্যান্বেষণকে কেন্দ্র করিয়াই মানবসংস্কৃতির বিবিধ প্রলক্ষণ উদ্ভাবিত হইয়াছে। এমন কি, মানবসমাজের সংগঠনও খাদ্যান্বেষণভিত্তিক।

প্রত্নাশ্মীয় এবং মধ্যাশ্মীয় যুগের মানুষ খাদ্যসংগ্রাহক ছিল। উদ্ভিদরাজি সংগ্রহ এবং পশু, মৎস্য, পক্ষী প্রভৃতি শিকার করিয়া মানুষ জীবনধারণ করিত। গিরিগুহায় এই আদিম মানুষের আবাসস্থল ছিল। অতএব গিরিগুহার উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত পশুর অস্থিনিদর্শন হইতে সমসাময়িক প্রাণিকুলের এবং খাদ্যের জন্য শিকারকৃত পশু-সম্পর্কিত অনেক তথ্যও উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হইয়াছে। পশুমাংস কর্তন ও ভক্ষণ-সংক্রান্ত অভিজ্ঞানও নিবেদিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ পিকিং মহানগরীর নিকটবর্তী চৌকিয়াটাঙ-এর গিরিগুহা হইতে বিবিধ প্রস্তর হাতিয়ারের এবং নরঅস্থির ও পশুঅস্থির আবিষ্কার উল্লেখনীয়। পশুঅস্থির নিদর্শন অনুশীলন করিলে আদিম মানব-সমাজের স্বরূপ-সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতিকায় বন্য পশু যেমন, ম্যাম্যাথ (হস্তিবিশেষ)-এর অস্থিনিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত পশু শিকার করা হইয়াছিল। অতিকায় পশু শিকারের

জন্য দল বা গোষ্ঠী সংগঠনের প্রয়োজন অত্যধিক। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনতম কালের পশুশিকারজাত দল হইতেই পরবর্তী সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব হইয়াছে।

নবাশ্মীয় যুগেই মানবসংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এই যুগেই মানুষ সর্বপ্রথম খাদ্যোৎপাদন আরম্ভ করে। সুতরাং কৃষির ও পশুপালনের-বৃত্তি আরম্ভ হয়। কৃষি ও পশুপালন মানব-সংস্কৃতির উন্নতির প্রারম্ভিক পদক্ষেপ। প্রত্নাশ্মীয় ও মধ্যাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বে শিকারীর জীবনধারণ পশু-পক্ষীর ও মৎস্যের প্রাপ্তি-সাধ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। পশুশিকার-অভিযানে বিফল হইলে, অভুক্ত থাকাই স্বাভাবিক। অধিকন্তু ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চিত রাখাও সম্ভব ছিল না। উপরন্তু মানুষকে খাদ্য সংগ্রহণের জন্য পশুশিকারকার্যে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইত। কোন প্রকার বিশ্রামেরও অবকাশ ছিল না। কিন্তু খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গেই মানুষের জীবনযাত্রার ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। ফলে, খাদ্যান্বেষণের নিমিত্ত কৃষকের বা পশুপালকের সর্বদা ব্যাপৃত থাকিবার প্রয়োজন ছিল না। উৎপাদিত খাদ্য ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রাখাও সম্ভব হয়। খাদ্যোৎপাদন অপর্যাপ্ত বা বিফল হইলে দুর্ভিক্ষ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্নাশ্মীয় যুগের শিকারের অপ্রচুরতা বা অভাবের সহিত উৎপাদিত খাদ্যাভাবের তুলনা করা সঙ্গত নহে।

আদিম খাদ্যোৎপাদনের পদ্ধতি অতীব নিম্ন ধরনের ছিল। সুতরাং শিকার দ্বারা খাদ্য-সংগ্রহবৃত্তি কোন সময়েই পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রসঙ্গতঃ সুইজারল্যাণ্ডের নবাশ্মীয় যুগের হ্রদ-আবাসস্থলের আবিষ্কৃত অস্থিনিদর্শন উল্লেখযোগ্য। আবরণমুক্ত রন্ধনশালা হইতে বিবিধ পশুঅস্থি-খণ্ড আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরিসাংখ্যিক অনুশীলন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ৫০% অস্থিনিদর্শন বন্য পশুজাত। কিন্তু কৃষি ও পশুপালন-বৃত্তির উন্নতির সঙ্গেই পশু-শিকারের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস-প্রাপ্ত হয়। ইংলণ্ডের লৌহ যুগভুক্ত অস্থিনিদর্শনের পরিসাংখ্যিক

অনুশীলন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আবিষ্কৃত অস্থিনিদর্শনের মধ্যে ৩৩৫৫ খণ্ড গৃহপালিত পশুজাত এবং কেবলমাত্র ৭১ অস্থিখণ্ড বন্যপশুজাত।

আবিষ্কৃত হাতিয়ার, শস্ত্র, সাধিত্র প্রভৃতি নিদর্শন হইতেও সংস্কৃতির প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল হাতিয়ার বা শস্ত্র দারু, প্রস্তর, অস্থি, তাম্র, ব্রঞ্জ, লৌহ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত হইত। অল্প সময়ের মধ্যেই কাষ্ঠনির্মিত হাতিয়ার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রস্তর বা ধাতুনির্মিত অস্ত্র বা অপর সামগ্রী রক্ষিত থাকে। কৃষিজীবীদিগের আবাসস্থলের অপেক্ষা শিকারীদিগের আবাসস্থলে আবিষ্কৃত নানাবিধ শিকারজাত অস্ত্রের বা হাতিয়ারের আধিক্য উল্লেখ্য। তদ্রূপ মৎস্যজীবীদিগের আবাসস্থলে হারপুন্ (মৎস্য-শিকারের অস্ত্রবিশেষ) এবং বড়শির আবিষ্কারের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কৃষিজীবীদিগের আবাসস্থলে হো (নিড়ানি), লাঙ্গলের ফলা, কাস্তে প্রভৃতির আবিষ্কারের প্রাধান্য থাকিবে। নবাশ্মীয় যুগের মানুষ হো দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিত। অতএব মৃত্তিকা কর্তন করিবার পদ্ধতি নিম্ন ধরনের ছিল। শস্যের আবর্তনমূলক উৎপাদন-প্রসঙ্গে তদ্সময়ের মানুষের কোন জ্ঞান ছিল না। অগভীর ভূমি কর্ষণের নিমিত্ত একই ক্ষেত্রে নিরন্তর শস্য-উৎপাদন ফলপ্রসূ নহে। অতএব অন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে হইত। এই কারণবশতঃই নবাশ্মীয় যুগের মানুষও যাযাবর-বৃত্তি চিরতরে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিবসতির জন্যই নবাশ্মীয় সংস্কৃতির নিদর্শন বিস্তৃত অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্রঞ্জ-সংস্কৃতি-পর্বে লাঙ্গলের ব্যবহার সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়। প্রথমে, মানুষ ও গৃহপালিত পশু দ্বারা লাঙ্গল চালিত হইত। লৌহযুগেই বর্তমান লাঙ্গলের অনুরূপ নিদর্শন সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থায়ী বসতির সঙ্গে জনসংখ্যার বৃদ্ধি জড়িত। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গেই আবাসভূমির আয়তন অধিক বিস্তার লাভ করে। আকাশ-

আলোকচিত্র অনুশীলন করিয়া অগণিত নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় যুগের প্রত্নস্থল নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে। এই সকল প্রত্নস্থলে উৎখনন করিলে অনেক তথ্যপূর্ণ নিদর্শনের আবিষ্কার সম্ভবপর।

নবাশ্মীয় যুগের বিবিধ শস্য-উৎপাদন-সম্পর্কিত নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণতঃ সুপ্রাচীন শস্যকণার আবিষ্কার সম্ভব নহে। কিন্তু অনেক প্রত্নস্থল হইতে মৃৎপাত্রের গাত্রে শস্যকণার ছাপাঙ্কিত নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনতম কালে গমের ও বার্লির উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই শস্যশ্রেণীদ্বয় কোন্ অঞ্চলে সর্বপ্রথম উৎপাদিত হইয়াছিল তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে উক্ত বিষয়ে মতভেদ বর্তমান।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের খাদ্যসামগ্রীর রন্ধন-সম্পর্কিত অভিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্ভব নহে। কিন্তু কতিপয় প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া খাদ্যসামগ্রীর রন্ধনতত্ত্ব অবধারিত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের নবাশ্মীয় যুগে রুটির সহিত মধুর মিশ্রণ সম্পর্কিত তথ্যের নিরূপণ উল্লেখযোগ্য। ডেনমার্কের ব্রঞ্জ-যুগের আবিষ্কৃত নিদর্শন হইতেও খাদ্য সম্পর্কে অনেক তথ্য নিরূপণ করা সম্ভব হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সগোত্রভোজন (ক্যানিব্যালিজম্)-সংক্রান্ত প্রথা উল্লেখনীয়। প্রত্নাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় যুগের আবিষ্কৃত নরঅস্থির নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সগোত্রভোজনের প্রথা প্রচলিত ছিল। সর্বপ্রথমে খাদ্যের অভাব পরিপূরণের নিমিত্তই সগোত্রভোজন প্রবর্তিত হইয়াছিল। পরবর্তী-যুগে সগোত্রভোজন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত হয়।

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত নানাবিধ উপকরণ অনুশীলন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমাজগঠনের ভিত্তির ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। কৃষিপ্রধান সমাজে শিকারবৃত্তির গুরুত্ব বিলুপ্ত হয়। কৃষিজীবী মানুষই সর্বপ্রথম স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। ফলে যাযাবরবৃত্তি

পরিত্যক্ত হয়। তৎপরিবর্তে গ্রাম্যজীবনযাত্রা আরম্ভ হয়। লোক-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সামাজিক গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের সংগঠনও আরম্ভ হয়। খাদ্যোৎপাদন ও ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চয়ের ফলে মানুষ বিশ্রামের বা অবকাশের সুযোগ পায়। এই অবকাশই মানবসভ্যতার বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে। ক্রমে অনেক অজ্ঞাত বিষয়ে সন্ধান লাভের ফলে আদিম মানবসংস্কৃতি দ্রুতগতিতে সভ্যতার পথে ধাবিত হয়। প্রকৃতপক্ষে নবাশ্মীয় যুগের মানবীয় কর্মতৎপরতাই সভ্যতার প্রকৃত উৎসরূপে স্বীকৃত। নবাশ্মীয় যুগ হইতেই মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারা নির্ণয় করা যায়।

তাম্রাশ্মীয় এবং ব্রঞ্জ যুগেই কারুশিল্পের প্রগতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য নগরকেন্দ্রিন্ সমাজ বিকাশ লাভ করে। প্রারম্ভিক নগরকেন্দ্রিন্ সংস্কৃতি হইতেই সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে। নগরকেন্দ্রীয় মানবসমাজের সংগঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়। এই নগরকেন্দ্রীয় সমাজ শ্রেণীভিত্তিক। শ্রেণীবিদ্বেষ ও শ্রেণীসংগ্রাম সভ্যতার বিকাশের সহিত বিজড়িত।

প্রসঙ্গতঃ, উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে তথাকথিত প্রত্নাশ্মীয় ও নবাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বভুক্ত প্রস্তরনির্মিত নানাবিধ হাতিয়ার আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন অঞ্চল হইতেই খাদ্য বা খাদ্যান্বেষণ সংক্রান্ত যথার্থ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্প্রতি বেলুচি-স্তানের একাধিক প্রত্নস্থল হইতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শনের সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের খাদ্যান্বেষণ-সম্পর্কিত ইঙ্গিত প্রদান করা যায়। কেবলমাত্র তাম্রাশ্মীয় বা ব্রঞ্জ-যুগের প্রত্নক্ষেত্র হইতে বিভিন্ন শস্যকণা ও খাদ্য সংক্রান্ত উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি প্রত্নস্থল হইতে খাদ্যান্বেষণ সংক্রান্ত উপকরণের এবং পশু ও মৎস্য শিকারের নিমিত্ত নির্মিত ও ব্যবহৃত শস্ত্র, বড়শি প্রভৃতির আবিষ্কার উল্লেখনীয়। উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে গম ও বার্লির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

খাদ্যোৎপাদনের সহিত বসতির সংস্থাপন ও বাস্তুনির্মাণ সর্বতো-ভাবে জড়িত। স্থায়ী বসতি ব্যতিরেকে খাদ্যোৎপাদন সংক্রান্ত কার্যকলাপ নির্বাহ করা সম্ভব নহে।

(ঘ) বসতিস্থাপন ও বাস্তুনির্মাণ: প্রাগৈতিহাসিক যুগের আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনরাজি হইতে আবাসক্ষেত্র এবং বাস্তুনির্মাণ-সংক্রান্ত তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। আবাসক্ষেত্রের এবং নির্মিত কুটীর বা গৃহের আকার ও আয়তন অনুশীলন করিয়া সমসাময়িক সামাজিক সংগঠনের ধারাও নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে।

প্রত্নাশ্মীয় যুগের মানুষ সাধারণতঃ গিরিগুহায় বসবাস করিত। উৎখননের ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক নিদর্শন গিরিগুহায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গিরিগুহা কেবলমাত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ব্যবহৃত হয় নাই। বর্তমানেও আদিম অধিবাসিগণ গিরিগুহায় বসবাস করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ কেবলমাত্র শীত ও বর্ষা ঋতুদ্বয়ে গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিত। অন্য ঋতুতে তাহারা উন্মুক্ত ক্ষেত্রেই বসবাস করিত। প্রত্নাশ্মীয় মানুষের যাযাবর বৃত্তির জন্য স্থানান্তরে গমনাগমনের প্রয়োজন অধিক ছিল। সাধারণতঃ মুক্তাঙ্গনে তাঁবু নির্মাণ করিয়া আদিম মানুষ বাস করিত। এই সকল তাঁবু বল্‌গা হরিণের (রেইন্‌ডিয়্যার) চর্ম দ্বারা নির্মাণ করা হইত। এই প্রকার চর্মাবৃত তাঁবুর নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। জার্মানীতে বিজ্ঞানী রাস্‌ট কর্তৃক উক্ত প্রকার তাঁবুর নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। প্রস্তরখণ্ড বৃত্তাকারে সংস্থাপিত করিয়া চর্মাচ্ছাদন দ্বারা উহাকে আবৃত করা হইত। চর্মাচ্ছাদন ধারণ করিবার জন্য বৃক্ষশাখা প্রোথিত হইত। প্রোথিত বৃক্ষ-শাখার গর্তের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। দক্ষিণ রাশিয়ার নিষ্পাদপ (ষ্টেপ)-প্রান্তরে প্রত্নাশ্মীয় যুগের বাস্তু-নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখ্য। এই প্রকার বাস্তু অস্থায়ী বসবাসের জন্য নির্মিত কুটীরবিশেষ। উক্ত কুটীর চর্ম ও বৃক্ষশাখা দ্বারাই নির্মিত হইত।

নবাশ্মীয় যুগ হইতে বিবিধ প্রকার বাস্তুনির্মাণ আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ, প্রস্তর, দারু, চর্ম প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা বাস্তু নির্মিত হইত। বিভিন্ন প্রকারের ও আয়তনের গৃহনির্মাণের পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল যেমন, বৃত্তাকার (সার্কুল্যার), ডিম্বাকার (ওভ্যাল), আয়তক্ষেত্রাকার (রেকট্যাঙ্গুলার) ইত্যাদি। কিন্তু উৎখনন দ্বারা বাস্তুর প্রকৃত স্বরূপের সামগ্রিক নিদর্শন আবিষ্কার করা সম্ভব নহে। অতীব সতর্কতার সহিত খননকার্য পরিচালনা করিলে স্তম্ভগর্তের এবং গৃহের মেঝের আয়তনের নিদর্শন আবরণমুক্ত করা সম্ভবপর। স্তম্ভগর্তের ও মেঝের নিদর্শন হইতে গৃহের প্রকার ও আয়তন সম্পর্কিত তথ্য অবধারণ করা যায়। এমন কি, গৃহের আকৃতি রূপায়ণ করাও অসম্ভব নহে। সুতরাং গৃহ-সংক্রান্ত নানাবিধ নিদর্শন অনুশীলন করিয়া বাস্তু-নকৃশা তৈয়ার করাও সম্ভবপর।

এতদ্ব্যতীত নবাশ্মীয় যুগেই কতিপয় সংলগ্ন বসতি গ্রামাকারে রূপায়িত হইয়াছিল। উৎখননের ফলে নবাশ্মীয় যুগভুক্ত এই প্রকার সমগ্র গ্রামও অনাবৃত হইয়াছে। গ্রামের একাধিক বাস্তুভূমিও পৃথক্‌ভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সকল গ্রাম প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিত। জঞ্জালখানা, বেষ্টনী, খামার বা গোলাবাড়ি প্রভৃতির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ চাইল্ড কর্তৃক স্করাব্রাথে-এর উৎখনন উল্লেখযোগ্য। এই গ্রাম স্বল্লায়তন এবং ষষ্ঠ বসতি-সম্বলিত ছিল। প্রতিটি বসতি একটি ক্ষুদ্রাকার কামরাবিশিষ্ট। প্রতি কক্ষে স্বামী, স্ত্রী এবং শিশু বসবাস করিত। অপর নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পশুপালন-বৃত্তিও অনুসৃত হইত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রামের উৎখনন-সম্পর্কিত কতিপয় তথ্যপূর্ণ নিদর্শনের অনুশীলনতত্ত্ব উল্লেখনীয়: গ্রামের আয়তন-নির্ণয়, বসতির সংখ্যা-নিরূপণ, গ্রামাধ্যক্ষের বসতি-নির্ধারণ, মন্দির বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত গৃহ-নির্ণয় ইত্যাদি।

পরবর্তী যুগে অর্থাৎ তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্ব হইতেই প্রস্তর ব্যতীত

অদগ্ধ এবং দগ্ধ ইষ্টকের ব্যবহার আরম্ভ হয়। শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতির সঙ্গেই নগরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। অক্ষরের আবিষ্কারের সহিত সভ্যতার অগ্রগতি জড়িত। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশের সঙ্গেই বসতিস্থাপন, বাস্তুনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য-ক্রমের ধারা অধিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি প্রত্নস্থলের ইষ্টকনির্মিত চিত্তাকর্ষক সৌধ-নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) গৃহস্থালি সরঞ্জাম : প্রত্নাশ্মীয় যুগের মানুষ যাযাবর ছিল। শিকার-শস্ত্র ব্যতিরেকে বিশেষ কোন সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পশুপালন ও কৃষিবৃত্তি অবলম্বনের ফলে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। স্থায়ী বসতির সহিত গৃহস্থালি-সরঞ্জামের প্রয়োজন জড়িত। ঐতিহাসিক যুগের বাস্তুক্ষেত্র উৎখনন করিয়া যে সকল বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে হাতিয়ার ও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, বেশভূষার সামগ্রী এবং অপর গৃহস্থালি-সরঞ্জাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই সকল নিদর্শন-সম্পর্কিত জ্ঞান অতীব সীমিত। প্রাচীনকালে অধিকাংশ সামগ্রী দারু বা অপর জৈব পদার্থ দ্বারা নির্মিত হইত। সুতরাং উক্ত নিদর্শনসমূহ কালের প্রবাহে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র প্রস্তর, অস্থি, মৃত্তিকা এবং ধাতব পদার্থ দ্বারা নির্মিত সামগ্রীর আবিষ্কার সম্ভবপর।

প্রসঙ্গতঃ, হ্রদ, জলাভূমি প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত নিদর্শনের তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন-সম্পর্কে উৎখন্তার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীতা উল্লেখ্য। কারণ, ঐ সকল প্রত্ননিদর্শন বিভিন্ন সংস্কৃতিভুক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। উপরন্তু অনেক উৎখনক এই সকল প্রত্নবস্তুর সহিত বর্তমান আদিম অধিবাসিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত বস্তুর তুলনামূলক অধ্যয়ন করিয়াও অনেক গূঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু এই রূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। কারণ, প্রাগৈতিহাসিক

যুগের পরিবেশের এবং বর্তমান পরিবেশের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। সকল প্রকার গৃহস্থালি-সরঞ্জামই পরিবেশজাত। কেবলমাত্র সমপরি-বেশজাত বস্তুরই তুলনামূলক অধ্যয়ন ফলপ্রদ হইবে। অন্যথায় প্রত্নবস্তুর ব্যাখ্যান বিকৃত হওয়া স্বাভাবিক। সর্বক্ষেত্রেই আবিষ্কৃত নিদর্শনের সামগ্রিক অনুশীলন পূর্বক ব্যাখ্যা প্রদান করা কর্তব্য।

উৎখনন দ্বারা একটি নগণ্য বাস্তব নিদর্শনের আবিষ্কার হইতেও সংস্কৃতির অনেক গূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বাণাগ্র-এর (অ্যারো-হেড্) আবিষ্কার হইতে ধনুকের ব্যবহার প্রমাণিত হয়। টাকুবর্তের (স্পিন্‌ড্‌ল-ওঅ্যারল্) আবিষ্কার তুলা দ্বারা বস্ত্র-বয়নশিল্পের প্রচলন নির্দেশ করে। এতদ্‌ব্যতীত এক অঞ্চল হইতে অনুজঙ্ঘাস্থি-নির্মিত বগ্‌লস্-এর (বাক্‌ল্) এবং অপর অঞ্চল হইতে বোতামের আবিষ্কার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অঞ্চলদ্বয় দ্বি ভিন্ন সংস্কৃতিভুক্ত। অধিকন্তু গুহাচিত্র, মূর্তি-শিল্প, কৌলালগাত্রের নক্‌শা বা চিত্রাঙ্কন ইত্যাদির প্রামাণিক নিদর্শন হইতেও সংস্কৃতি-সম্পর্কিত অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা যায়।

পরিশেষে, আবিষ্কৃত নানাবিধ প্রত্ননিদর্শন হইতে সংস্কৃতির রূপায়ণতত্ত্ব আলোচনীয়। প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন পূর্বক সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র রূপায়ণ করাই উৎখনকের প্রধানতম কার্য। যদি কোন প্রত্নস্থলে বাস্তু নিদর্শন, গৃহস্থালি-সরঞ্জাম, বেশভূষার সামগ্রী, হাতিয়ার ও অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলেই সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্র রূপায়ণ করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সমাধিক্ষেত্রেই উৎখননকার্য পরিচালিত হইয়াছে। শবকবরে বিন্যস্ত নরকঙ্কালের ও বিবিধ সামগ্রীর আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। নৃপতি বা বিত্তশালী সম্প্রদায়ের কবরের উপর স্মৃতিস্তম্ভের আবিষ্কারও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু কেবলমাত্র ধনবান সম্প্রদায়ের কবর-উৎখননজাত প্রত্নবস্তুর অনুশীলনের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত অঞ্চলের মানব-

সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিবেশন করা সম্ভব নহে। কারণ, উক্ত সমাধিক্ষেত্রে যে সকল প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা কেবল ধনিক শ্রেণীর সংস্কৃতিরই পরিচয় প্রদান করে। প্রসঙ্গতঃ উলী কর্তৃক উর-এর সমাধিক্ষেত্র-উৎখনন উল্লেখযোগ্য। সৌভাগ্যবশতঃ উলী রাজকীয় এবং সাধারণ শবকবর আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উভয় প্রকার সমাধির প্রত্ননিদর্শন হইতেই উক্ত অঞ্চলের সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর হইয়াছে।

(চ) জনতাবর্ণন : বিভিন্ন যুগভুক্ত অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত জননিবিড়তা বা জনসংখ্যা নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। অস্থিনিদর্শন অনুশীলনপূর্বক জনতাবর্ণন ও মৃত্যুহার-নির্ণয়ের প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ২৬৭-৮১)। প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া কোন প্রত্নস্থলের জনতাবর্ণন নিশ্চিত বা যথার্থ হওয়া সম্ভব নহে। তৎসত্ত্বেও পণ্ডিতগণ বিবিধ পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক উৎখনিত প্রত্নস্থলের জনসংখ্যা নির্ধারণ করিয়াছেন।

জনতাবর্ণনতত্ত্বের মূলসূত্র অনুসারে অর্থনৈতিক মানের ক্রমবর্ধমানতার সহিত জনসংখ্যার বৃদ্ধি স্বাভাবিক। পশ্চিম ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবান্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা ত্রিগুণ সংখ্যায় বর্ধিত হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অর্থনৈতিক মানের ক্রমবর্ধমানতার বিভিন্ন পর্যায় নির্ধারিত হইয়াছে। খাদ্য-সংগ্রাহকারী সমাজের জনসংখ্যার অপেক্ষা খাদ্য-উৎপাদয়িতা বা পশুপালয়িতা সমাজের জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বে বা নগরকেন্দ্রীয় সমাজে জনসংখ্যার হার অধিক বৃদ্ধি পায়। প্রত্নাশ্মীয় যুগে জনসংখ্যা অপ্রতুল ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আলাস্কায় জনতার নিবিড়তা প্রতি ২৮ বর্গ মাইলে একজনের অধিক ছিল না। এই নির্ণীত গড় অনুসারে পরবর্তী প্রত্নাশ্মীয় যুগে সমগ্র বেলজিয়ামের অধিবাসীর সংখ্যা ৪০০ জনের অধিক হওয়া সম্ভব নহে।

প্রত্নস্থলের আবিষ্কৃত বাস্তু-নিদর্শন অনুধাবন করিয়াও লোকবসতি ও জনসংখ্যা নির্ণয় করা যায়। নবাশ্মীয় যুগের কোলন্‌-লিন্‌ডেনথাল্‌ নামক গ্রামের উৎখনন উল্লেখনীয়। সমগ্র গ্রাম আবরণমুক্ত করা হইয়াছে। আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শন অনুশীলন পূর্বক সিদ্ধান্তও করা হইয়াছে যে, উক্ত স্থানে ২০০-২৫০ জনের অধিক লোকের বসতি ছিল না। কিন্তু মানুষের দীর্ঘায়ু নির্ণয়তত্ত্বের সহিত জনতাবর্ণন জড়িত। আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর এই তত্ত্বের অনুশীলন সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। উপরন্তু নরকঙ্কালের আবিষ্কারের নিমিত্ত সমাধিক্ষেত্র-উৎখনন একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞান-বিশারদ ভ্যালয়স্‌ উক্ত বিষয়ে অনেক মৌলিক তত্ত্ব নিবেদন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভ্যালয়স্‌ কর্তৃক নিবেদিত নিয়ান্‌ডারথাল্‌ মানবকুলের বয়সানুক্রম মৃত্যুহার উল্লেখ্য : জন্ম হইতে ১৪ বৎসর মধ্যে ৪০%, ১৪ বৎসর হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে ১৫%, ২১ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে ৪০% এবং ৪০ বৎসরের ঊর্ধ্বে ৫%। কিন্তু এই প্রকার বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের অনেক প্রতিবন্ধক বর্তমান। অধিকন্তু প্রাচীন মানবকুলের মধ্যে শব দাহ করিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে নরকঙ্কালের আবিষ্কার সম্ভব নহে। উপরন্তু আংশিক শব-সমাধি বা কুম্ভ-সমাধি হইতে আবিস্কৃত অস্থি-নিদর্শনের অনুশীলন দ্বারা জনতাবর্ণনও সম্ভব নহে। কেবলমাত্র সম্পূর্ণ নরকঙ্কালের আবিষ্কার হইতেই জনতাবর্ণন সম্পর্কে নির্দেশ জ্ঞাপন করা যায়।

এতদ্‌ব্যতীত নগরের আবাসগৃহ, খাদ্যের সংস্থান, গোলাঘর প্রভৃতির নিদর্শন হইতেও জনতাবর্ণন সম্ভবপর। প্রসঙ্গতঃ, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নগরসভ্যতার প্রধান কেন্দ্রদ্বয়ের (মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা) জনসংখ্যা-নির্ণয়ের প্রচেষ্টা উল্লেখনীয়। সম্প্রতি পরিসংখ্যানবিৎ দত্ত (১৯৬২) মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা প্রত্নস্থলদ্বয়ের আবিষ্কৃত গোলাঘরের পরিধি ও মেঝের আয়তন এবং উহাতে শস্যের পরিমাণ নির্ণয় পূর্বক

জনসংখ্যা ধার্য করিয়াছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আনুমানিক এক বৎসরের প্রয়োজনীয় শস্য উক্ত গোলাঘরে সঞ্চিত থাকিত। শস্য ব্যতীত অপর খাদ্যদ্রব্য-সংক্রান্ত তত্ত্ব অনুধাবন করিয়া দত্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মহেঞ্জোদারোর ও হরপ্পার লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৩৩৪৬৯ এবং ৩৭১৫৫ ছিল। কিন্তু ফেয়ার-সারভিস্-এর অনুশীলনজাত তত্ত্বানুসারে মহেঞ্জোদারোর জনসংখ্যা ৪০০০০-এর কম ছিল না। বাস্তু-নিদর্শনের ও অধিবাস-কক্ষের আয়তনের অনুশীলন হইতে প্রতি একরে জনতার বসতিও নির্ধারিত হইয়াছে। দত্তের মতে প্রতি একরে মহেঞ্জোদারোতে ৫২ জন এবং হরপ্পাতে ৭৪ জন মানুষ বসবাস করিত। মনে হয়, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা মহানগরীদ্বয়ের উক্ত নির্ধারিত জননিবিড়তা অত্যধিক। প্রাচীন কালের কোন নগরস্থলেই এত অধিক হারে লোকবসতি সম্ভব নহে। মধ্যযুগের বা ২০০-৩০০ বৎসরের পূর্বতন নগরের জনসংখ্যার হার অনুধাবন করিলেও উক্ত মন্তব্যের সার্থকতা প্রমাণিত হয় না। প্রাগৈতিহাসিক বা আদি-ঐতিহাসিক যুগের নগরের বা গ্রামের জনতাবর্ণন সর্বক্ষেত্রেই আনুমানিক। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূহ অনুশীলন করিয়া জনতাবর্ণন নিবেদন করা অসম্ভব নহে। কিন্তু প্রত্ননিদর্শন-ভিত্তিক জনতাবর্ণন আনুমানিক ভাবে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

(ছ) শিল্প-প্রগতি : বিবিধ প্রত্ননিদর্শনের মর্মার্থ কথনের সহিত বস্তুনির্মাণের কৌশলজনিত তত্ত্বও জড়িত। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ প্রস্তর, অস্থি, গজদন্ত, ধাতু প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা বিবিধ সামগ্রী তৈয়ার করিত। এই সকল পদার্থনির্মিত বস্তুর কারুশিল্পের কুশলতা ও উৎকর্ষ নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের সহিত বর্তমান কালের নির্মিত অনুরূপ নিদর্শনের তুলনা-মূলক অনুশীলন করিয়া শিল্পকৌশলজনিত তত্ত্ব অনুধাবন করাও সম্ভবপর। কোন্ নির্দিষ্ট অঞ্চল হইতে এই সকল পদার্থ সংগৃহীত

হইয়াছে তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু ধাতু-সংগ্রহ ও বস্তু-নির্মাণজনিত প্রক্রিয়া বা বয়ন সম্বন্ধীয় কৌশল এবং মৃত্তিকা, কাঁচ প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা নির্মিত সামগ্রীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের সমস্যা অধিক। কারণ, বস্তু নির্মিত হইবার পরে মূল পদার্থের সনাক্তীকরণ সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা বস্তুর মূল পদার্থ নির্ণয় করা সম্ভবপর। বিজ্ঞানবিশারদগণ প্রাচীন যুগের বিবিধ পদার্থ সম্পর্কে অনেক মৌলিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করিতেও সমর্থ হইয়াছেন।

(জ) বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথ : প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষের অধিবসতি বিচ্ছিন্ন ছিল না। নানা কারণবশতঃ বিভিন্ন অধিবসতির সহিত পারস্পরিক যোগাযোগ ও সাক্ষাৎ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সংযোগের ফলে ব্যবহৃত এবং নির্মিত দ্রব্যের আদান-প্রদান-জনিত সম্পর্কও স্থাপিত হয়। ফলে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া বাণিজ্য ও যোগাযোগ সংক্রান্ত অনেক তথ্য পরিবেশন করা সম্ভবপর। বিভিন্ন সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক-জনিত প্রত্ননিদর্শনও অনেক প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্যদ্রব্য-সংক্রান্ত তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন ব্যতীত একাধিক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হইতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর অনুশীলন করিয়া মানুষের ধ্যান-ধারণা এবং বিবিধ বস্তুর নির্মাণ-কৌশলজনিত তথ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব।

প্রাচীনকালের বাণিজ্য-সম্পর্কিত কতিপয় প্রতিপাদ্য বিষয় উল্লেখযোগ্য। সর্বপ্রথমেই আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর সনাক্ত করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল প্রত্নবস্তুর আদি উৎপত্তিস্থল বা নির্মাণ-কেন্দ্র নির্ধারণ করিতে হইবে। মানচিত্রে আবিষ্কৃত অনুরূপ প্রত্নবস্তুসমূহের প্রাপ্তিস্থান চিহ্নিত করিয়া অনুশীলন করিলে বাণিজ্য-সংক্রান্ত অনেক তথ্য যেমন, পণ্যদ্রব্য, বাণিজ্য-বিস্তার, বাণিজ্যের পরিমাণ ইত্যাদি অনুধাবন করা যায়। এতদ্‌ব্যতীত বাণিজপথ-সংক্রান্ত নির্দেশও পাওয়া যায়।

প্রত্নবস্তুর উৎপত্তি-স্থলের বা নির্মাণ-কেন্দ্রের নির্ধারণকার্য আয়াস-সাধ্য। অধুনা বিবিধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে এই কার্যের সম্পাদন সহজসাধ্য হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ পেক্ট্রগ্রাফিক্ অনুশীলনের সাহায্যে প্রত্নবস্তুর মৌলিক পদার্থ সনাক্ত করিয়া উৎপত্তিস্থলের নির্ণয়কার্য উল্লেখযোগ্য। শিলানির্মিত বস্তুর পেক্ট্রগ্রাফিক বিশ্লেষণের ফলে শিলার আদি উৎপত্তিস্থল নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। পেক্ট্রগ্রাফিক্ অনুশীলন দ্বারা ব্রঞ্জধাতুর উপত্তিস্থলও নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু প্রাগৈ-তিহাসিক যুগেও ধাতব বস্তুর ভগ্নাংশ সংগ্রহ পূর্বক উহাকে পুনরায় দ্রবীভূত করিয়া বস্তু নির্মাণের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সুতরাং একটি তাম্র-কুঠার একাধিক ক্ষেত্রজাত আকরিক (অ্যর) হইতে সংগৃহীত মৌলিক ধাতু দ্বারা নির্মিত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। অতএব ধাতু-পদার্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রজাত হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে ধাতুর প্রকৃত উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণের সাহায্যেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলের পীতাভ তৈলস্ফটিক (অ্যাম্‌বার)-নির্মিত বস্তু বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক ও আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এই পদার্থ বাল্‌টিক অঞ্চল হইতে সংগৃহীত। তদ্রূপ কৌলাল-নিদর্শনের বিশ্লেষণ দ্বারা মৃত্তিকার আদিস্থানও নির্ণয় করা যায়।

এতদ্‌ব্যতীত বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত একই শ্রেণিভুক্ত প্রত্নবস্তুসমূহের বৈশিষ্ট্য অনুশীলন করিয়া উহাদের উপত্তিস্থল নির্ধারণ করা সম্ভবপর। কিন্তু এই কার্য অতীব সতর্কতার সহিত সম্পাদন করা প্রয়োজন। কারণ, এক প্রত্নস্থল হইতে প্রাপ্ত বস্তুর অনুকরণে অপর প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত বস্তু নির্মিত হওয়াও স্বাভাবিক। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা অনুকরণজাত বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি ও উদ্ভবস্থল নির্ণয় করা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকার অনুশীলন দ্বারাও প্রত্নবস্তুর আদি উৎপত্তিস্থল নির্ণীত হইয়াছে। মানচিত্রে একই শ্রেণিভুক্ত বস্তু-সমূহের

আবিষ্কারক্ষেত্র চিহ্নিত করিয়া বিশ্লেষণ করিলে উক্ত বস্তুর আদি উৎপত্তিস্থল ও স্থানান্তর নির্দিষ্ট করা সম্ভব। এই প্রকার অনুশীলনতত্ত্ব হইতে বাণিজ্য এবং বাণিজ্যপথ সম্পর্কেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।

প্রত্নাশ্মীয় ও মধ্যাশ্মীয় যুগের শিকারী মানুষ যাযাবরবৃত্তি-সাধক ছিল। উক্ত সমাজে দ্রব্যের আদান-প্রদান বা রপ্তানী ও আমদানী-প্রসঙ্গ সাধারণতঃ অবান্তর। কিন্তু আলঙ্কারিক সামগ্রী সম্ভবতঃ একস্থান হইতে অপরস্থানে প্রেরিত হইত। বোধ হয়, পণ্য বিনিময়ের কোন এক প্রকার প্রথাও প্রচলিত ছিল। ফরাসী দেশে পরবর্তী প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বে এক বিশেষ ধরনের শেল্‌নির্মিত কণ্ঠহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনুশীলন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত শেল্ ১৮০ মাইল দূরবর্তী ভূমধ্যসাগরাঞ্চলজাত। মনে হয়, ভূমধ্যসাগরের অঞ্চল হইতেই উক্ত শেল্ ফরাসী দেশে আমদানী করা হইয়াছিল। এই প্রকার নিদর্শন হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের পর্যটন সংক্রান্ত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

নবাশ্মীয় যুগভুক্ত বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতেও দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উন্নত কারুশিল্প কেন্দ্রীভূত হইবার ফলে বিভিন্ন আবাসস্থলের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাম্রাশ্মীয় বা ব্রঞ্জ-সংস্কৃতি-পর্বেই বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রভূত প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত সংস্কৃতি-পর্বেই ভূমধ্যসাগরবর্তী অঞ্চল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই সংস্কৃতি-পর্বেই সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। অনেক আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল হইতেও সামুদ্রিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত বহুবিধ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, মেসোপটেমিয়ায় সিন্ধুসভ্যতার নির্দেশজ্ঞাপক লেখসম্বলিত সীলের আবিষ্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু মেসোপটেমিয়ার সংস্কৃতির কতিপয় বৈশিষ্ট্যসূচক নিদর্শনও

মহেঞ্জোদারো হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুজরাটের অন্তর্গত লোথাল নামক প্রত্নস্থল হইতে বাহেরিন্-এর সংস্কৃতির নির্দেশজ্ঞাপক সীলের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। এই প্রকার প্রত্ন-নিদর্শনের আবিষ্কার হইতে ব্রঞ্জ-সংস্কৃতি-পর্বভুক্ত বিভিন্ন সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ বাণিজ্য-সম্পর্কে যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায়।

ঐতিহাসিক যুগেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অধিক বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণ ভারতের আরিক্কামেডু নামক প্রত্নস্থল হইতে ইতালীতে নির্মিত এরিটাইন্ কৌলালের নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। এই প্রকার নিদর্শন হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সংক্রান্ত অনেক তথ্য অবধারণ করা সম্ভব হইয়াছে।

(ঝ) পর্যটন ও পরিবহণ: বিভিন্ন সংস্কৃতি-কেন্দ্রের পরস্পর সম্পর্কের ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সহিত পর্যটন ও পরিবহণ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। যাত্রাপথ দ্বিপ্রকার: স্থলপথ ও জলপথ। উভয় পথের পরিবহণ সম্পূর্ণভাবে পরিবেশজাত।

স্থলপথে গমনাগমনের জন্য শকটের প্রবর্তন অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। চক্রনির্মাণই মানবসভ্যতার যাত্রাপথের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সম্ভবতঃ সিরিয়ার নিষ্পাদপ-প্রান্তে প্রথম রথযান আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উক্ত স্থলেই প্রাচীনতম রথযানের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিশরীয় সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক ছিল। সুতরাং পোতের আবিষ্কার ও পোতযানের প্রবর্তন মিশর দেশেই আরম্ভ হইয়াছিল। তদ্রূপ উত্তর ইউরোপেই স্কেইট, স্লেজগাড়ি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত চক্রের নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে অদ্যাপি প্রচলিত গবাদিবাহিত অনুরূপ শকট প্রচলিত ছিল। উপরন্তু পোতের প্রতিকৃতি-সম্বলিত নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয় যে, জলযানের ব্যবহারও প্রসার লাভ করিয়াছিল। জলপথের ও স্থলপথের মাধ্যমে ভারতবর্ষের

প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্র মহেঞ্জোদারোর সহিত অপর প্রত্নস্থলের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আবিষ্কৃত পোতের নিদর্শনজাত তথ্য হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ পোত সম্পর্কিত অনেক তত্ত্ব নিবেদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পোতনির্মাণ সংক্রান্ত বিবিধ অভিজ্ঞানও পরিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের পোত-নিদর্শনের নির্মাণ-কৌশল বিশ্লেষণ করিয়া বর্তমান্ পোতনির্মাণের ক্রমোন্নতির বা বিবর্তনের ধারা নির্ণয় করা সহজ হইয়াছে। এমন কি, বিবিধ পোত-নিদর্শনের বিশ্লেষণ দ্বারা পোতচালনা, পণ্য-পরিবহণ, জলপথ প্রভৃতি বিষয়েও অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব।

স্থলপথে পশুবাহিত যানের প্রবর্তন মধ্যাশ্মীয়-নবাশ্মীয় যুগ হইতেই আরম্ভ হয়। উৎখননের ফলে পরবর্তী যুগের যানবাহন, গমনাগমনের রাস্তা, রাজপথ প্রভৃতির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের যাত্রাপথ সংক্রান্ত আবিষ্কৃত নিদর্শন বিরল। পক্ষান্তরে তাম্রাশ্মীয় বা ব্রঞ্জ- যুগভুক্ত নগরের প্রশস্ত রাস্তা, সঙ্কীর্ণ পথ এবং নগরের সহিত অপর স্থানের গমন-পথের নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। এমন কি, বহির্বাণিজ্য-পথের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বে স্থলপথের মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ার সহিত ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সংযোগ নানাবিধ প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন দ্বারাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। রোমক যুগভুক্ত ইউরোপের সাধারণ রাস্তা, রাজপথ, বাণিজ্যপথ প্রভৃতি সংক্রান্ত অনেক নিদর্শনের আবিষ্কারও উল্লেখ্য। এই সকল নিদর্শন অনুধাবন করিয়া যাত্রাপথ সম্পর্কিত অনেক তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের যাত্রাপথ সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন অদ্যাপি বিরল। ভারতবর্ষের প্রাচীন যাত্রাপথ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ নিদর্শন আবিষ্কারের জন্য সুপরিকল্পিত উৎখননের প্রয়োজন অত্যধিক।

(ঞ) **সুকুমার কলা :** সুকুমার কলার বা ললিত কলার নিদর্শন প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞান। সুকুমার কলার ইতিবৃত্ত-রূপায়ণ প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের অন্তর্গত। সুকুমার শিল্প বা লৌকিক চারুকলা মানবসংস্কৃতির উৎকর্ষের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

সাধারণতঃ উৎখনন দ্বারা কেবলমাত্র দর্শনীয় চারুকলার নিদর্শন আবিষ্কার করা সম্ভবপর। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঙ্গীত ও গীতবাদ্য সংক্রান্ত কতিপয় নিদর্শনের প্রমাণও আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ প্রত্নাশ্মীয় যুগের বাঁশির আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। আদি-ঐতিহাসিক মেসোপটেমিয়ার উর নামক প্রত্নস্থল হইতে মনোরম বীণাবাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। মহেঞ্জোদারো হইতেও বাঁশি ও অপর বাদ্যযন্ত্র-নিদর্শনের অঙ্কিত প্রতিরূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আদি-ঐতিহাসিক যুগভুক্ত মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত মৃত্তিকাতাললেখ হইতে সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের অনেক তথ্য অনুধাবন করা সম্ভবপর।

দর্শনাত্মক চারুকলার মধ্যে রঙিন চিত্রাঙ্কনজনিত নিদর্শনের আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নাশ্মীয় যুগের শেষ পর্বাভিমুখে গিরিগুহার গাত্রে রঙিন চিত্রাঙ্কন অতীব চিত্তাকর্ষক সুকুমার কলার অভিজ্ঞান। প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন দ্বারা এই প্রকার গুহাচিত্রের কালনিরূপণ এবং মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করাই পুরাতত্ত্ববিদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্য। গুহা-চিত্রাঙ্কনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র কি কেবলমাত্র সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি? অনুশীলন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সকল গুহাচিত্র ধর্মীয় বা জাদু (ম্যাজিক্) সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, গুহাচিত্রের উৎকর্ষ নবাশ্মীয় যুগেই বিলুপ্ত হয়। কিন্তু নবাশ্মীয় যুগ হইতেই সমাধিক্ষেত্রে মহাশ্মীয় কীর্তিস্তম্ভের নির্মাণ আরম্ভ হয়।

এতদ্ব্যতীত আলঙ্কারিক চিত্রাঙ্কন প্রসঙ্গও উল্লেখনীয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষ হাতিয়ার, সাধিত্র, কৌলাল প্রভৃতিকে আলঙ্কারিক চিত্রাঙ্কন দ্বারা ভূষিত করিত। এই সকল চিত্রাঙ্কন হইতে বিভিন্ন যুগের মানুষের সৌন্দর্যবোধ সংক্রান্ত উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। আলঙ্কারিক চিত্রাঙ্কন অনুধাবন করিয়া সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ, বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ মহেঞ্জোদারো হইতে নানাবিধ অলঙ্কৃত বা চিত্রাঙ্কিত কৌলাল-নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। শবসমাধির সহিত জড়িত কুম্ভগাত্রের চিত্রাঙ্কনও অতীব মনোরম ও আকর্ষণীয়। এই সকল চিত্রাঙ্কনের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন পূর্বক সংস্কৃতির ভাবধারা ও সমাজ-সংগঠনের সম্যক চিত্র রূপায়ণ করা সম্ভবপর।

সুকুমার শিল্পকলা-নিদর্শনের পর্যালোচনা করিয়া সংস্কৃতির কাল নিরূপণ, সৌন্দর্যবোধের উৎকর্ষ নির্ণয়, সামাজিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ, বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব নিরূপণ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ম্যাজিক সংক্রান্ত তথ্য অনুধাবন, সামাজিক সংগঠন বিষয়ক অনুসন্ধান প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। সুতরাং সুকুমার শিল্পকলা-নিদর্শনের পর্যালোচনা প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু।

(ট) ধর্ম ও ম্যাজিক : আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া মানবধর্মের ধ্যান-ধারণা এবং অনুষ্ঠান সংক্রান্ত অনেক তত্ত্ব প্রণিধান করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমান যুগের আদিম মানবসমাজের সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের ধর্ম-সংক্রান্ত তথ্য অনুধাবন করা সম্ভবপর। প্রাচীনতম কালে ম্যাজিক ও ধর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আদিম মানুষের জীবনধারণ সংক্রান্ত নানাবিধ প্রচেষ্টার মধ্যেই ধর্মীয় বিশ্বাসের ও অনুষ্ঠানের জন্ম হয়। প্রাচীন অনুষ্ঠানসমূহ জাদুক্রিয়া বা ম্যাজিক্-ভিত্তিক। ম্যাজিকের মূলসূত্র ত্রিবিধ : মন্ত্রতন্ত্র, ক্রিয়াকলাপ বা

অনুষ্ঠান এবং বস্তু বা পদার্থ। এই ত্রয়ীসূত্রের সহিতও ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান বিজড়িত।

বর্তমান উন্নীত সমাজেও আদিম নরকুলের ধর্মীয় ভাবধারা প্রবহমান। পূর্বেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাচিত্র প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। গুহাচিত্রের সহিত ম্যাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান নিরবচ্ছিন্নভাবে, সংযুক্ত। আদিম মানুষ বিশ্বাস করিত যে, এই অনুষ্ঠানই তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের কার্যকলাপকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে। নবাশ্মীয় যুগের কৃষিজীবী সমাজে ভূমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিকারক অনুষ্ঠান এবং সূর্যের উপাসনাজনক তথ্যও উল্লেখনীয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা প্রভৃতির পূজা-পার্বণ আরম্ভ হয়। এমন কি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিকিৎসাবিদ্যাও ম্যাজিকবিদ্যার সহিত সংযুক্ত। প্রসঙ্গতঃ করোটিছেদন বা ট্রেপেনিং প্রথা উল্লেখনীয়।

এতদ্ভিন্ন মৃতদেহ সংক্রান্ত ক্রিয়াকাণ্ডও ধর্ম এবং ম্যাজিকের সহিত জড়িত। শবদাহ ও শবসমাধির সহিত বিজড়িত ক্রিয়াকলাপ আত্মার অস্তিত্ব-সম্পর্কিত বিশ্বাসের সহিত যুক্ত। সমাধিক্ষেত্রের উৎখনন দ্বারা ভূগর্ভে শব নিধান করিবার বিবিধ প্রথার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রণালী অনুসরণ করিয়া শব সমাধি করা হইত—প্রলম্বিত শবসমাধি (একস্‌টেণ্ডেড্‌ বেরিঅ্যাল্‌), আংশিক শব-সমাধি (ফ্রাক্‌শন্যাল্‌ বেরিঅ্যাল্‌) এবং শবাধার-সমাধি (অ্যারন্‌ বেরিঅ্যাল্‌) ও শবদাহ-উত্তর কুম্ভসমাধি (পোস্ট-ক্রিমেশন্‌ ব্যেরিঅ্যাল্‌)। প্রলম্বিত শব-সমাধির কবরে মরদেহের সহিত বিবিধ সামগ্রীর বিন্যাস অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। সকল প্রকার কবর-নিদর্শনই সংস্কৃতির যথার্থ পরিচায়ক। শবের সহিত সংশ্লিষ্ট নিদর্শনসমূহ অনুশীলন করিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং আত্মার বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশ পাওয়া যায়।

ধর্ম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যুগের প্রত্ননিদর্শনের পর্যালোচনাও

সাহিত্যিক উপাদান-বহির্ভূত অনেক তথ্য পরিবেশন করে। বিহার, মঠ, মন্দির, দেবদেবীর মূর্তি প্রভৃতির আবিষ্কার তথ্যপূর্ণ। মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতব পদার্থ প্রভৃতি দ্বারা দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হইত। এই সকল মূর্তির অনুশীলন দ্বারা ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষ নির্ণয় ব্যতীত ধর্মীয় বিশ্বাস, দেবদেবীর বৈশিষ্ট্য এবং ধ্যান-ধারণা সম্পর্কিত অনেক তত্ত্ব প্রণিধান করা সম্ভব হইয়াছে। তদ্রূপ স্থপতিবিদ্যার পরিচয় প্রদান ব্যতীত মঠ, বিহার, মন্দির প্রভৃতি হইতে ধর্মীয় বিশ্বাস, সংগঠন, উপাসনা ও উপাসক, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অনেক তথ্য অবধারণ করা যায়। উপরন্তু দেবদেবীর নিকটে উৎসর্গীকৃত অনেক বাস্তব নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল প্রত্নবস্তুর প্রকৃত মর্মার্থ সাহিত্যিক উপাদানের অনুশীলন দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। প্রত্নতত্ত্বীয় বিশ্লেষণ দ্বারাই উক্ত প্রত্নবস্তুর প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভবপর।

ধর্মের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ ভাবমূলক বা নির্বস্তুক। বাস্তব নিদর্শন হইতে উক্ত তত্ত্বের উদ্ঘাটন আয়াসসাধ্য ও বিতর্কমূলক। কিন্তু ব্যবহৃত সামগ্রীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া অনেক ধর্মীয় ভাবধারার প্রকৃত নির্দেশ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, নানাবিধ প্রত্নবস্তুর ব্যাখ্যার প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ সাধারণতঃ ধর্মীয় ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন। প্রায়শঃ দুর্বিজ্ঞেয় প্রত্নবস্তুকে উৎসর্গীকৃত উপকরণরূপে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। কিন্তু এই প্রকার ব্যাখ্যা-প্রদানের ভিত্তি সুদৃঢ় নহে।

(ঠ) সমাজ-সংগঠন : মানবসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র রূপায়ণের নিমিত্ত সমাজের কাঠামো, সংগঠন, আচরণ, প্রথা ও রীতিনীতি প্রভৃতি সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করিবার প্রয়োজন অত্যধিক। কিন্তু প্রত্ননিদর্শন হইতে উক্ত বিষয়ে আলোকপাত করা সর্বক্ষেত্রে অসম্ভব। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন, ন্যায়পরায়ণতা, পারিবারিক জীবনযাত্রা, বিষয়-সম্পত্তি, সামরিক সংগঠন, বিধান,

ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি বিষয়েও মৌলিক নিবন্ধ নিবেদন করা সম্ভব নহে। তৎসত্ত্বেও উক্ত বিষয় সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্তের প্রত্নতাত্ত্বিক ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মহেঞ্জোদারোর প্রশাসন সম্পর্কে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অপর বিশারদগণের মতে মহেঞ্জোদারো মহানগরী অভিজাত সম্প্রদায় বা বণিক-সংঘ দ্বারা শাসিত হইত। উভয় মন্তব্যের প্রত্নতত্ত্বীয় দৃঢ় ভিত্তি অবর্তমান। উপরন্তু রাজতন্ত্র বা পুরোহিততন্ত্র এবং বণিক-সংঘ সম্পর্কেও মতভেদ বিদ্যমান।

এতদ্‌ব্যতীত সমাজের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কেও প্রত্যয়জনক প্রত্নতত্ত্বীয় তথ্য প্রাপ্তিসাধ্য নহে।[১] প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমাজে শ্রেণীবিন্যাসের কল্পনা সম্পূর্ণ অবাস্তব। আদি-ঐতিহাসিক যুগেই কারুশিল্প-বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। উক্ত যুগেই শ্রমিক শ্রেণীর উৎপত্তিও সম্ভবপর। হরপ্পা নগরীর বাস্তু-নিদর্শন বিশ্লেষণ করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর আবাসস্থল সনাক্ত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই যুগেই দাসবৃত্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল মন্তব্যের কোন মৌলিক ভিত্তি নাই। কারণ, অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকে এই সকল সিদ্ধান্তের উপর কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করা সঙ্গত নহে।

উপরি-উক্ত বিষয় সম্পর্কিত তথ্য কেবলমাত্র ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু প্রত্নবিজ্ঞানে উক্ত বিষয় সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য-নিদর্শনের অবর্তমানে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াই সমীচীন। প্রসঙ্গতঃ রাশিয়ায় প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনজাত সমাজ-বিবর্তনের অনুক্রম ধারার নির্ণয় প্রসঙ্গ উল্লেখ্য। রাশিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট পদার্থভিত্তিক ত্রয়ী যুগের বা ত্রয়ী সংস্কৃতি-পর্বের—প্রস্তর, ব্রঞ্জ ও লৌহ—বাস্তবতা স্বীকার্য নহে। কারণ, উক্ত সংজ্ঞা দ্বারা সমাজবিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রমশিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গেই মানব-

সমাজের রূপান্তর সাধিত হইয়াছিল। বস্তুনির্মাণের কৌশলের অগ্রগতির সহিত সমাজবিবর্তন সর্বতোভাবে জড়িত। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা ত্রয়ী সংস্কৃতি-পর্বকে সমাজ-সংগঠনের ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিয়াছেন যেমন, প্রাক্-গোষ্ঠী-সমাজ, গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ এবং শ্রেণীভিত্তিক সমাজ। প্রাক্-গোষ্ঠী-সমাজে যাযাবরের দল বা সমষ্টিই একমাত্র সংগঠন ছিল। অবাধ যৌন সম্পর্কের বিদ্যমানতাও স্বীকৃত হইয়াছে। ক্রমে গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ উদ্ভূত হয়। কতিপয় সম্মিলিত দল গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়। গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজে অবাধ যৌন সম্ভোগও নিয়ন্ত্রিত হয়। উপরন্তু এই গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃশাসন-ভিত্তিক ছিল। তাহার পর শ্রেণীভিত্তিক সমাজের উদ্ভব হয়। শ্রেণীভিত্তিক সমাজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই সমগ্র উৎপাদন কুক্ষিগত করিয়া একান্তভাবে উপভোগ করিতে আরম্ভ করে। ফলে, শ্রমিক ও শিল্পোৎপাদকগণ শোষিত শ্রেণীভুক্ত হয়। এই শ্রমিকশ্রেণী কেবলমাত্র জীবিকাধারণের যোগ্যতা অর্জন করে। অতএব শোষক এবং শোষিত শ্রেণীদ্বয়ে সমাজ বিভক্ত হয়। শ্রেণীবৈষম্যমূলক সমাজ পিতৃতান্ত্রিক বা পিতৃশাসনভিত্তিক।

অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে উক্ত সমাজ-বিবর্তনের ধারা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বর্তমান সমাজবিদ্যার গবেষণাপ্রসূত তথ্যানুসারে অবাধ যৌন সম্পর্কমূলক দলের বা পরিবারের বিদ্যমানতা স্বীকার্য নহে। তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বিবর্তনবাদ অনুযায়ী সমাজ নিম্নতর স্তর হইতেই ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। উক্ত নিম্নস্তরের সমাজ অবাধ যৌন সম্পর্কমূলক ছিল বলিয়াই মনে হয়। ক্রমে গোষ্ঠী-সংগঠনের মাধ্যমে এই অবাধ যৌন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। উপরন্তু সমাজবিজ্ঞানে বিশুদ্ধ মাতৃশাসিত কুলের বিদ্যমানতাও স্বীকার্য নহে। কিন্তু মাতৃপ্রধান পরিবার অদ্যাপি বর্তমান। অতএব গোষ্ঠী-সংগঠনের পূর্বে মাতৃপ্রাধান্যের বিদ্যমানতা স্বাভাবিক। নগরসভ্যতার উদ্ভবের সহিতই শ্রেণীভিত্তিক সমাজ-সংগঠন জড়িত।

প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন দ্বারা উল্লিখিত সমাজ-বিবর্তনের ধারা প্রতিপাদন করা সম্ভব নহে। কারণ, সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রত্নতত্ত্বীয় তথ্যনিদর্শন অত্যল্প এবং তাহাদের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করাও সহজসাধ্য নহে। সাধারণভাবে প্রাক্-গোষ্ঠী সমাজের সহিত প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বের, গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের সহিত পরবর্তী প্রত্নাশ্মীয় বা মধ্যাশ্মীয় সংস্কৃতি-পর্বের এবং শ্রেণীভিত্তিক সমাজের সহিত নবাশ্মীয় ও তাম্রাশ্মীয় সমাজের সমীকরণ সম্ভবপর। কিন্তু এই প্রকার সমীকরণও সর্বক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শনভিত্তিক নহে।

প্রকৃতপক্ষে প্রত্ননিদর্শনের ভিত্তিতে সমাজ-বিবর্তনের ধারা এবং সমাজবিন্যাসের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব নহে। সমাজ-বিবর্তন অনুরূপ ধারায় সর্বত্র প্রতিফলিত হয় নাই। বিভিন্ন অঞ্চলে বিবিধ ধারায় মানবসমাজের বিবর্তন সাধিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং একই সূত্রে বিভিন্ন স্থানের সমাজ-বিবর্তনের ধারার রূপায়ণ অবাস্তব।

(ঙ) পরিব্রজন, অভিযান ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার : পূর্বেই নরগোষ্ঠীর ও সংস্কৃতি-গোষ্ঠীর একাত্মীকরণ-প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। একাধিক অঞ্চলে অনুরূপ সংস্কৃতির বিদ্যমানতা কোন এক নরগোষ্ঠী-জাত হওয়া অস্বাভাবিক। অধিকন্তু একই নরগোষ্ঠীভুক্ত মানবকুলের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশও স্বাভাবিক। সংস্কৃতি পরিবেশজাত। পরিবেশের ভিন্নতার জন্যই সংস্কৃতির রূপভেদ উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সংস্কৃতির এক বা একাধিক প্রলক্ষণ এক বা একাধিক জনসমষ্টির অবদান হওয়াও অস্বাভাবিক নহে।

বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবত অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের শান্তিপূর্ণ পরিব্রজন ও সামরিক অভিযান সংক্রান্ত নানাবিধ গবেষণামূলক তথ্যাবলী নিবেদন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক যুগের অভিযান ও পরিব্রজনের অনুরূপ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের দেশ-দেশান্তরে বিচরণও অতীব রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয়ভাবে রূপায়িত

হইয়াছে। মনে হয়, বর্তমানকালের ন্যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষ ভূপর্যটন করিত। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পরিব্রজন সংক্রান্ত রোমাঞ্চকর কাহিনী ঐতিহাসিক যুগের সাহিত্যে বর্ণিত বিবরণীর অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই প্রকার ভিত্তিহীন রোমাঞ্চকর কাহিনী পরিবেশন করিয়া প্রত্নবিজ্ঞানের সুধী সমাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছেন। প্রাগৈ-তিহাসিক মানুষের ভূপর্যটন সংক্রান্ত বিবরণ সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত।

অত্যল্প এবং সন্দেহজনক প্রত্ননিদর্শনের ব্যাখ্যানের উপর ভিত্তি করিয়া অনেক কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত উপাখ্যানও নিবেদিত হইয়াছে। বৈশিষ্ট্যসূচক এক শ্রেণীভুক্ত শস্ত্র বা কৌলাল-নিদর্শনের বিস্তার অনুশীলন করিয়া সামরিক অভিযান ও প্রব্রজন সম্বন্ধে অনেক অমৌলিক বৃত্তান্তও পরিবেশিত হইয়াছে। এমন কি, মৃন্ময় পাত্রের একটি বিশিষ্ট রূপের ইঙ্গিত হইতেও অভিযান ও প্রব্রজনের ইতিকথা রূপায়িত হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কৌলাল-নিদর্শন বা অপর প্রত্নবস্তুর সহিত নরগোষ্ঠীর কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক সর্বক্ষেত্রে বর্তমান থাকা সম্ভব নহে। দুইটি ভিন্ন অঞ্চলের জনসমষ্টি অনুরূপভাবে মৃৎপাত্রকে তৈয়ার বা অলঙ্কৃত করিলেই একই নরগোষ্ঠী বা সংস্কৃতিভুক্ত বলিয়া ধার্য করা অসঙ্গত। মৃৎপাত্রের গাত্রে ছাপাঙ্কিত নকশার ভিত্তিতে একাধিক জনসমষ্টিকে একাত্মীকরণও অনুচিত। অপর প্রত্ননিদর্শন অনুশীলন করিলে প্রমাণিত হইবে যে, উক্ত সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তদ্রূপ প্রত্নাশ্মীয় বা নবাশ্মীয় যুগের হাতিয়ারের অনুরূপজাত তত্ত্ব উল্লেখনীয়। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রত্নাশ্মীয় হাতিয়ারের সাদৃশ্য অনুধাবন করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবকুলের প্রব্রজন বা অভিযান সম্পর্কিত তত্ত্বালোচনা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রস্তর হাতিয়ারের সাদৃশ্য অনুশীলনপূর্বক সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রভাব আরোপণ সম্পর্কিত অধিকাংশ বর্ণনাই অমৌলিক। শব-সমাধির অনুরূপতা

বা সমাধি-কুম্ভের গাত্রে চিত্রিত নকশা হইতে সামরিক বা সাংস্কৃতিক অভিযান-সম্পর্কিত বিশদ বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ-যোগ্য যে, হরপ্পার সমাধিক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত কুম্ভ-সমাধিজাত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আর্য নামধেয় সংস্কৃতির বা নরগোষ্ঠীর সামরিক অভিযান সংক্রান্ত উপাখ্যানও পরিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার কাহিনীর প্রত্নতত্ত্বীয় ভিত্তি অবর্তমান। উক্ত প্রকার কাহিনী ইতিহাসকে বিকৃত করে। সংস্কৃতির বিভিন্ন বাস্তব নিদর্শনের অনুরূপতাই একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির নির্দেশ-জ্ঞাপক। সুতরাং প্রাচীন কালের উল্লিখিত অভিযানের ও ভূপর্যটনের উপাখ্যান-রূপায়ণ বিজ্ঞানসম্মত নহে।

কিন্তু বিশেষক্ষেত্রে সংস্কৃতির বিচরণ ও প্রভাব বিস্তার বা অনুকরণ সংক্রান্ত তত্ত্ব অনুধাবন করা যায়। একাধিক অঞ্চলে অনুরূপ সংস্কৃতির বিদ্যমানতাও স্বীকার্য। সংস্কৃতির পৌর্বাপর্যের বিচারে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এক অঞ্চলের সংস্কৃতি অপর অঞ্চলের সংস্কৃতি অপেক্ষা অধিক প্রাচীন হওয়াও সম্ভবপর। একাধিক অঞ্চলে অসংক্রামিত বা অপ্রভাবান্বিত সংস্কৃতির বিদ্যমানতাও অসম্ভব নহে।

অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক বা সামরিক অভিযানের ফলেও সংস্কৃতি রূপান্তরিত হয়। এক সংস্কৃতি-ক্ষেত্র হইতে অল্প সংখ্যক জনসমষ্টি অপর ক্ষেত্র অধিকার করিলেও সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। অল্প সংখ্যক অভিযাত্রীর বা আক্রমণকারীর পক্ষে স্বীয় সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে সংস্থাপন করা সম্ভব নহে। ফলে, বিজিত সংস্কৃতির আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু বিজেতা সংস্কৃতির পক্ষেও কতিপয় মৌলিক উপাদান প্রবর্তন করা অসম্ভব নহে। উক্ত ক্ষেত্রে সংস্কৃতিদ্বয়ের সমন্বয় সাধিত হওয়া সত্ত্বেও আদিম সংস্কৃতির প্রকৃত রূপ অপরিবর্তিত থাকে। অধিক সংখ্যক বিজেতা কর্তৃক কোন অঞ্চল অধিকৃত হইলে বিজিত সংস্কৃতির বিলোপ সাধনও অসম্ভব নহে। ফলে, কেবলমাত্র কতিপয় নিষ্প্রভ আদিম সংস্কৃতির প্রলক্ষণ বর্তমান থাকে।

বিভিন্ন প্রত্নস্থল হইতে উভয় প্রকার অভিজ্ঞান সম্বলিত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপের নির্ণয়কার্য সমস্যাপূর্ণ। সংস্কৃতির রূপান্তর শান্তিপূর্ণ বা সামরিক অভিযানের ফলে সাধিত হয়। সুতরাং আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শন অনুশীলন করিয়া অভিযানের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক বা সামরিক অভিযান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিতর্কমূলক।

এই প্রসঙ্গে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তত্ত্ব উল্লেখনীয়: প্রথমতঃ, সংস্কৃতির সাধারণ উপকরণ— যেমন, হাতিয়ার, শস্ত্র, আলঙ্কারিক সামগ্রী, আচার ও অনুষ্ঠানের নিদর্শন প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ সংযোগের বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের ফলে এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে প্রবর্তিত হওয়া সম্ভবপর। দ্বিতীয়তঃ, বিজিত অঞ্চলের সংস্কৃতি বিজেতা সংস্কৃতিকেও প্রভাবান্বিত করে। তৃতীয়তঃ, বিজেতা সংস্কৃতি বিজিত সংস্কৃতির বিলোপ-সাধন করিয়া স্বীয় সংস্কৃতির সংস্থাপন করাও অসম্ভব নহে। চতুর্থতঃ, কোন প্রত্নস্থলে সংস্কৃতির উপাদানের আকস্মিক পরিবর্তনও পরিলক্ষিত হয়। এই আকস্মিক পরিবর্তন বা ভিন্ন রূপান্তর বিবিধ কারণবশতঃ সাধিত হয়। সংস্কৃতির উপাদানের পরিবর্তন বা রূপান্তর কেবলমাত্র বহিরাগত বা বিরোধী সংস্কৃতির প্রভাবসূচক নহে। পক্ষান্তরে স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণবশতঃ উক্ত পরিবর্তন বা রূপান্তর সাধিত হইয়া থাকে।

পরিবেশজাত বিবিধ সংস্কৃতির উপকরণ বিবর্তনের যাত্রাপথে বিভিন্নাকারে রূপায়িত হয়। সুতরাং প্রত্ননিদর্শনের ভিন্নরূপ ও আকার বিবর্তনমূলক হওয়াও স্বাভাবিক। অতএব অপর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বেই প্রত্ননিদর্শনের বিতর্কমূলক তথ্য-সমূহ অনুধাবন করা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন মানুষের মধ্যে অনুকরণ করিবার স্পৃহা অতীব প্রবল। আঞ্চলিক সংযোগের ফলে এক সংস্কৃতির আকর্ষণীয় উপকরণ অন্য অঞ্চলবাসিগণ কর্তৃক অনুকৃত

হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং একই সংস্কৃতি-পর্বে অনুরূপ নিদর্শনের আবিষ্কার অস্বাভাবিক নহে। অধিকন্তু প্রাচীন কাল হইতেই আঞ্চলিক সংযোগের এবং সংস্কৃতির উপকরণের আদান-প্রদান উল্লেখ্য। এই সংযোগের মাধ্যমে এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণের প্রচলন স্বাভাবিক। সুতরাং এক নির্দিষ্ট সংস্কৃতি বহিরাগত সংস্কৃতির উপাদান-সম্বলিত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। কোন প্রত্নস্থল হইতে অল্প সংখ্যক অভিনব প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার বহিরাগত সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ সূচনা করে। উপরন্তু সংস্কৃতির নিদর্শনের তুলনামূলক অনুশীলন করিয়া পরদেশী সংস্কৃতির প্রভাব-বিস্তার সংক্রান্ত তথ্যও নির্ণয় করা যায়।

পরিশেষে সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিস্তার সংক্রান্ত তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। মানবসংস্কৃতির বিস্তার ও প্রভাব সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রণিধান করিবার পূর্বেই কতিপয় বদ্ধমূল অভিমত দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া কোন প্রকার দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত নহে। অনেক প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, পৃথিবীর এক বা দুই অঞ্চলেই মানবসংস্কৃতির সর্বপ্রকার উৎকর্ষিত উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে। মিশর ও মেসোপটেমিয়া পৃথিবীর সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিকাশের প্রাচীনতম কেন্দ্ররূপে পরিগণিত। অতীতে মিশরকেই মানবসংস্কৃতির প্রাচীনতম কেন্দ্র বলিয়া ধার্য করা হইয়াছিল। এই কেন্দ্র হইতেই পৃথিবীর বিভিন্নাংশে সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানসমূহ বিস্তার লাভ করে। কিন্তু অধুনা উৎখনন-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, মিশরে সভ্যতার বিকাশের পূর্বেই পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে সংস্কৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল। মেসোপটেমিয়ার সংস্কৃতিকেন্দ্র হইতেই পৃথিবীর বিভিন্নাংশে সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানসমূহ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এমন কি, প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার সহিত সিন্ধু সভ্যতার তুলনামূলক অনুশীলন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সিন্ধুসভ্যতা সুমেরীয় সভ্যতা হইতেই উদ্ভূত। মহেঞ্জো-

দারো সুমেরীয় সংস্কৃতির ঔপনিবেশিক কেন্দ্ররূপেও নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অমৌলিক ও অবাস্তব। পশ্চিম এশিয়ার অঞ্চলেই নবাশ্মীয় যুগের কৃষিকার্যের ও পশুপালন-বৃত্তির উদ্ভব এবং নগর সভ্যতার বিকাশ সাধারণভাবে স্বীকৃত। যখন পশ্চিম ইউরোপ বর্বরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখনই পশ্চিম এশিয়ার অঞ্চলে সভ্যতার আলোক বিকশিত হয়। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, পশ্চিম ইউরোপই সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করিয়া পরবর্তী প্রত্নাশ্মীয় যুগের মানুষ পশুজীবনযাত্রার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুহাচিত্র, বিবিধ শস্ত্রের উপর নকশা-চিত্রণ, ধর্মাচরণ, ভূমিকর্ষণের নিমিত্ত লাঙ্গল জাতীয় সাধিত্র-এর প্রবর্তন ইত্যাদি এই সংস্কৃতির উৎকর্ষের পরিচায়ক।

উপরন্তু আদি-ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক প্রাচীন যুগের প্রত্ন-নিদর্শনসমূহ অনুশীলন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগর-অঞ্চলেই সভ্যতার উৎকর্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। উক্ত অঞ্চল হইতেই পশ্চিম ও পূর্বদিকে সভ্যতার মৌলিক উপকরণসমূহ বিস্তার লাভ করে। সুতরাং পশ্চিম ইউরোপের বা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মৌলিকত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। এই প্রকার সিদ্ধান্তও গ্রাহ্য নহে। এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে সংস্কৃতির বিস্তার সম্পর্কিত মতবাদ সর্বক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য নহে। অধিকন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃতির বিবর্তনও সাধিত হইয়াছে। কোন অঞ্চলে সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা অধিক দ্রুত গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে এবং অপর অঞ্চলে উক্ত বিবর্তনের জন্য অধিক সময় ব্যয়িত হইয়াছে।

সংস্কৃতির বা সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পূর্ণরূপে পরিবেশ-ভিত্তিক। প্রাযুক্তিক ক্রমোন্নতির এবং অর্থনৈতিক ক্রমবর্ধমানতার সঙ্গে সংস্কৃতির রূপান্তর ও উৎকর্ষের বিকাশ বিজড়িত। সকল সংস্কৃতিই আঞ্চলিক পরিবেশে সমৃদ্ধি লাভ করে। সংস্কৃতির উৎকর্ষ-সাধনকার্যে একাধিক অঞ্চলের দানও স্বীকার্য। আঞ্চলিক সংযোগের

ফলে সংস্কৃতির উপাদানের আদান-প্রদান অস্বীকার করা যায় না। এই প্রকার আদান-প্রদানের ফলে বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব বা অনুকরণও সাধিত হয়। ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সংস্কৃতির আঞ্চলিক ভিত্তি সুদৃঢ় থাকে। সম্পূর্ণভাবে কোন সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করা সম্ভব নহে। বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগ এবং ভাবের আদান-প্রদানের ফলেই সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করে।

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত নিদর্শনের প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনকার্যে উপরি-উক্ত তত্ত্বসমূহ প্রণিধান করা অত্যাবশ্যক। কারণ, উৎখনন-বিবরণীতে মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত-লিখন উল্লিখিত তত্ত্বভিত্তিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় উৎখনন-বিবরণী পক্ষপাতপরায়ণ এবং সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত বিকৃত হওয়া স্বাভাবিক। মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্তকে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্ননিদর্শনের স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং বর্ণনা প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। প্রত্নবিজ্ঞানে অমূলক প্রত্ননিদর্শন-প্রসূত সিদ্ধান্ত ও কাল্পনিক মতবাদ স্বীকার্য নহে। প্রত্নবিজ্ঞানের অনুশীলন সম্পূর্ণভাবে বাস্তব নিদর্শনভিত্তিক। প্রত্ননিদর্শনের যথার্থ স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াই মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করিতে হইবে। উৎখননের বিবরণী-লিখন প্রত্ননিদর্শনের স্বরূপ-উদ্ঘাটন তত্ত্ব-ভিত্তিক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উৎখনন-বিবরণী

। ১ ।

বিবরণী : পরিচিতি

যুগযুগান্তর ধরিয়া মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন লোকলোচনের অন্তরালে মৃত্তিকাগর্ভে বিরাজমান। উৎখনন দ্বারা মৃত্তিকাগর্ভস্থ উক্ত নিদর্শনসমূহকে অনাচ্ছাদন এবং উদ্ধার করা হয়। কিন্তু উৎখনন মৃত্তিকাগর্ভে সুরক্ষিত প্রত্নবস্তুর ব্যাঘাত জন্মায় এবং বহু ক্ষেত্রে উহাদের ধ্বংস সাধন করে। সুতরাং মৃত্তিকাগর্ভস্থ প্রত্ননিদর্শনের অনাচ্ছাদন, উদ্ধারণ, লিপিকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম এমন ভাবে সুসম্পন্ন করিতে হইবে যাহাতে উহাদের যথাযথ পুনর্বিন্যাস এবং মর্মার্থ উদঘাটন করিয়া সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা সম্ভব হয়। বৈজ্ঞানিক নিয়মনিষ্ঠা দ্বারা পরিচালিত উৎখননই উক্ত কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ। খননকার্যের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান এবং আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনের ভিত্তিতে সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই উৎখনকের প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যই উৎখননের বিস্তারিত বর্ণনাতে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। উৎখনন সংক্রান্ত সর্বপ্রকার বাস্তব তথ্যভিত্তিক বর্ণনা-সম্বলিত সংস্কৃতির ইতিবৃত্তের রূপায়ণই উৎখনন-বিবরণী (এক্স্‌ক্যাভেশন্‌ রিপোর্‌ট্‌) নামে অভিহিত।

উৎখননের বিবরণী-লিখন অতীব গুরুত্বপূর্ণ কার্য। বিবরণীর অবর্তমানে উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত সংস্কৃতির নিদর্শনসমূহ চিরকাল দুর্বোধ্য থাকিবে। অধিকন্তু উক্ত নিদর্শনের ব্যাখ্যানও বিকৃত হওয়া স্বাভাবিক। এতদ্‌ব্যতীত মৃত্তিকাগর্ভস্থ নিদর্শনরাজির ব্যাঘাত জন্মাইবার কাহারও অধিকার কোন থাকিতে পারে না। আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের

মর্মার্থ উদঘাটন পূর্বক ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করিতে কৃতকার্য হইলেই উৎখননের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। উৎখনন-উত্তর প্রতিবেদন লিখন ও প্রকাশন উৎখননকার্য পরিচালনার প্রধান শর্ত। এই শর্ত-লঙ্ঘন করা অমার্জনীয় অপরাধ। আবিষ্কৃত অচেতন ও বাক্‌শক্তিহীন বাস্তব নিদর্শনসমূহ হইতেই বাক্য নিষ্কর্ষণ ও স্বরূপ উদঘাটন করিয়া উৎখনন-প্রতিবেদনে মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করিতে হইবে।

অতীতের অনেক খননকার্যের কোন বিবরণী লিখিত বা প্রকাশিত হয় নাই। পূর্বে খননকার্য দ্বারা প্রত্নবস্তু সংগ্রহণ ও সংরক্ষণ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমান যুগেও অনেক উৎখনন-বিবরণী লিখিত হয় না। সম্প্রতি এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ খননকার্য পরিচালিত হইয়াছে যাহার কোন প্রতিবেদন অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। উৎখননের বিবরণী-লিখনে ত্রুটি বা অবহেলা অপরাধজনক। উৎখননের বিবরণী অলিখিত ও অপ্রকাশিত থাকা ধ্বংসের নামান্তর। এই অবহেলার জন্য মানবসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ চিরকালের জন্য অজ্ঞাত বা অবোধ্য থাকিবে। সর্বক্ষেত্রেই উৎখনন-উত্তর বিবরণী-লিখনে উৎখন্তার তৎপর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রতিবেদন-লিখন সমাপ্ত করিয়া প্রকাশনের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিতে হইবে। সুতরাং উৎখনন-বিবরণী দুইটি পর্যায়ে আলোচনীয়ঃ বিবরণী লিখন এবং বিবরণী মুদ্রণ ও প্রকাশন।

।২।

বিবরণী-লিখন

উৎখনন-বিবরণী দ্বিবিধ: অন্তর্বর্তী বিবরণী এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণী। বর্তমান বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে উৎখননের পরিচালনা অধিক সময়-সাপেক্ষ। বিস্তৃত প্রত্নস্থলে সামগ্রিক উৎখনন সম্পন্ন করিতে ন্যূনপক্ষে ১৫-২০ বৎসর অতিবাহিত হয়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্নস্থলের সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিবেশনের নিমিত্ত সামগ্রিক উৎখননই আদর্শ-স্বরূপ। উপরন্তু অধিক বৎসর যাবৎ পরিচালিত উৎখনন দ্বারা

আবিষ্কৃত সংখ্যাতীত প্রত্ননিদর্শনের বিশ্লেষণ করিয়া পূর্ণাঙ্গ বিবরণী লিখনও ততোধিক সময়সাপেক্ষ। এমন কি, উৎখনকের জীবদ্দশায় উক্ত বিবরণী লিখন সম্ভবপর না হওয়াও স্বাভাবিক। বিবরণী লিখন উৎখননের প্রধান পরিচালকেরই গুরুদায়িত্ব। তিনিই উৎখনন-সংক্রান্ত সকল প্রকার অভিজ্ঞানের ও সমস্যার সহিত সম্যকভাবে পরিচিত। তাঁহার অবর্তমানে অপর কাহারও পক্ষে উক্ত কার্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব নহে। প্রয়োজনমত সহকারী পরিচালক বিবরণী লিখনকার্যে আংশিকভাবে উপযোগী। অতএব পূর্ণাঙ্গ উৎখনন-বিবরণী লিখনের প্রত্যাশায় কাল অতিবাহিত না করিয়া অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন-লিখন বিজ্ঞানসম্মত। প্রতি বৎসরের উৎখননকার্যের পরে তাহার বিবরণী লিখন সমাপন করা প্রয়োজন।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এক বৎসরের উৎখনন-বিবরণীর লিখন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী উৎখনন আরম্ভ করা অনুচিত। উৎখনন-বিবরণী লিখিবার সময়ই বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। উক্ত সমস্যার সমাধান করাও পরবর্তী উৎখননের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। অধিকন্তু একাধিক বৎসর-অন্তর আবিষ্কৃত নিদর্শন-সম্পর্কিত সর্বপ্রকার তথ্য স্মরণ রাখাও উৎখনকের পক্ষে সম্ভব নহে। বিলম্বিত উৎখনন-বিবরণী বিক্রিত হওয়াও স্বাভাবিক। উপরন্তু উৎখননের পৃষ্ঠপোষক সংস্থার পক্ষে বিবরণীর সত্বর প্রকাশনের প্রত্যাশা অতীব স্বাভাবিক। সাধারণের অবগতির জন্যও উৎখনন-বিবরণীর বাৎসরিক প্রকাশন প্রয়োজন। এই প্রকার বিবরণী হইতেই উৎখননের বৎসরান্তর ক্রমোন্নতি অবধারণ করা যায়। প্রত্ননিদর্শনের ব্যাখ্যান-সংক্রান্ত পরিবর্তনও প্রণিধান করা সহজসাধ্য। কিন্তু উৎখননের সামগ্রিক চিত্রের সহিত পরিচিত হইবার জন্য সকল বাৎসরিক বিবরণীর অনুশীলন প্রয়োজন। বর্তমানে বিবরণী-মুদ্রণ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং অনেকে মনে করেন, উৎখনন সংক্রান্ত মৌলিক নিবন্ধ একত্রে প্রকাশ করা কর্তব্য। কিন্তু এই মতবাদ

অযৌক্তিক। কারণ, উৎখননের ব্যয় অপেক্ষা বিবরণী প্রকাশনের নিমিত্ত অর্থব্যয় অধিক নহে।

অতএব সাধারণভাবে বলা যায় যে, অন্তর্বর্তী বিবরণী লিখনই সর্বপ্রথম কার্য। প্রতি বৎসরের উৎখনন-বিবরণীর লিখন ও প্রকাশন বাধ্যতামূলক। প্রত্নস্থলের সামগ্রিক উৎখনন পরিসমাপ্তির পরে পূর্ণাঙ্গ বিবরণী লিখিতে হইবে। অন্তর্বর্তী বিবরণীই উৎখননের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনের ভিত্তিস্বরূপ।

এতদ্ব্যতীত পরীক্ষামূলক বা আংশিক এবং একই প্রত্নস্থলে পুনরায় উৎখননের বিবরণী লিখনের প্রসঙ্গও উল্লেখ্য। প্রথমতঃ, প্রত্নতত্ত্বীয় গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য অনেক প্রত্নস্থলে পরীক্ষামূলকভাবে উৎখনন পরিচালনা করা হয়। এই প্রকার খননকার্য পরীক্ষামূলক উৎখনন নামে অভিহিত। উক্ত পরীক্ষামূলক উৎখননের প্রতিবেদনের লিখন এবং প্রকাশনও ত্বরান্বিত করিতে হইবে। কারণ, এই প্রতিবেদন হইতেই উক্ত প্রত্নস্থলের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর। দ্বিতীয়ত, সমগ্র প্রত্নস্থলের উৎখননকার্য-সমাপন অর্থ ও সময়সাপেক্ষ। সুতরাং সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপের সন্ধানের নিমিত্ত আংশিক উৎখননও পরিচালিত হয়। এই সকল ক্ষেত্রেও উৎখনন সংক্রান্ত সর্বপ্রকার তথ্যসম্বলিত বিবরণী সত্বর প্রকাশ করা প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় একই প্রত্নস্থলে পুনর্বার খননকার্য পরিচালনা করা হয়। এই সকল ক্ষেত্রে পরবর্তী বিবরণী পূর্ববর্তী বিবরণীর তুলনামূলক অনুশীলনভিত্তিক হওয়া আবশ্যক। প্রসঙ্গতঃ, অ্যামরি ও হরপ্পা নামক প্রত্নস্থলদ্বয়ের পুনরুৎখনন উল্লেখযোগ্য। অ্যাম্‌রি প্রত্নস্থলের উৎখনন-বিবরণীতে সিন্ধুসভ্যতা ও প্রাক্-সিন্ধুসভ্যতা সম্পর্কে মজুমদার (১৯২৯) অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে উৎখনক ক্যাসাল্ (১৯৫৯-৬২) উক্ত ক্ষেত্রেই খনন করিয়া মজুমদারের সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। হরপ্পার পুনরুৎখননের প্রতিবেদনে (১৯৪২) হুইলার ভাট্‌স-এর (১৯৪০)

বিবরণীর বহির্ভূত অনেক মৌলিক তত্ত্ব নিবেদন করিয়া একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সকল প্রত্নস্থলের পূর্ববর্তী উৎখনন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের অবর্তমানে পরবর্তী উৎখনকের পক্ষে কোন মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইত না। এমন কি, উৎখননের বিবরণীর অবর্তমানে একই প্রত্নস্থলে বারংবার খননকার্য পরিচালিত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে।

উল্লিখিত সকল প্রকার উৎখননের বিবরণী লিখন ও প্রকাশন উৎখনকের অত্যাবশ্যক কার্য। কিন্তু উৎখননের বিবরণী লিখন অধিক সময়সাপেক্ষ। প্রধান পরিচালকের পক্ষে উৎখননের বিবরণী লিখন-কার্যের সর্বপ্রকার দায়িত্ব এককভাবে পালন করাও সম্ভব নহে। অতএব বিবরণী লিখিবার জন্য একনিষ্ঠ একাধিক সহায়কের প্রয়োজন অত্যধিক। উৎখনন-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞ একনিষ্ঠ কর্মীদের সহায়তা ব্যতিরেকে বিবরণীর লিখন ত্বরান্বিত করা অসম্ভব।

। ৩।

বিবরণী ঃ লিখনতত্ত্ব

উৎখননের বিবরণী লিখনের এবং সংস্কৃতির ইতিবৃত্তের সম্যক চিত্র রূপায়ণের নিমিত্ত সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে প্রত্নস্থলে খনন-কার্য পরিচালনা করা অত্যাবশ্যক। অতীতের অধিকাংশ খননকার্যে কোন প্রকার বিজ্ঞান-পদ্ধতি অনুসৃত হয় নাই। ফলে, বহু ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত বিকৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক নিয়মানুযায়ী খননকার্য পরিচালনা এবং আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর লিপিকরণ, কালনিরূপণ, স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত অভিজ্ঞানসমূহই উৎখনন-বিবরণীর প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু। তথাপি

উৎখননের বিবরণী লিখন-সংক্রান্ত কতিপয় মৌলিক পদ্ধতির অনুসরণ-প্রসঙ্গ আলোচনীয়।

অলিপিকৃত খননকার্য মানবসংস্কৃতির আবিষ্কৃত নিদর্শনের ধ্বংসের তুল্য। এই প্রকার খননকার্য দ্বারা উদ্ধৃত প্রত্নবস্তুকে আত্মসাৎ করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের নিমিত্ত উক্ত প্রকার প্রত্নবস্তুসমূহ সম্পূর্ণ অর্থশূন্য। সুতরাং বিদগ্ধ উৎখনক পিট্ রিভার্স বলিয়াছেন যে, প্রত্নবস্তুর আবিষ্কারের তারিখ উহার লিপিকরণের সময় হইতেই আরম্ভ হয়। এই উক্তির মধ্যেই উৎখনকের গুরু দায়িত্ব সন্নিহিত রহিয়াছে। পেট্রি লিখিত 'মেথড্স্ অ্যাণ্ড এইমস্ ইন অ্যর্কিওল্যজী' নামক গ্রন্থে উৎখননের বিবরণী লিখন-প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রখ্যাত উৎখনক পিট্ রিভার্স প্রণীত একাধিক গ্রন্থে উৎখনন-বিবরণীর রূপায়ণ সম্পর্কেও অনেক মৌলিক তত্ত্ব লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন হুইলার কর্তৃক রচিত 'আর্কিওল্যজি ফ্রম দি আর্থ' নামক গ্রন্থেও উৎখননের প্রতিবেদন লিখন-প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক পর্য্যালোচনা বর্তমান।

উৎখননের বিবরণী লিখন-সম্পর্কে দুইটি প্রধান সমস্যা বিবেচ্য : বিবরণীর বিষয়বস্তু ও আয়তন এবং সারবত্তা। এই সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে উৎখননবেত্তা পেট্রির ও পিট্ রিভার্সের অভিমত উল্লেখযোগ্য। সর্বপ্রথমে পিট্ রিভার্স বলিয়াছেন যে, খননকার্য পরিচালনা অপেক্ষা উৎখননের বিবরণী লিখন অধিক শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। অতীব সাধারণ এবং ক্ষুদ্রতম প্রত্নবস্তুরও বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করা প্রয়োজন। এমন কি, পিট্ রিভার্স তাঁহার বিবরণীতে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও অতি সামান্য প্রত্নবস্তুর চিত্র এবং নক্শাঙ্কন সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি প্রণিধান করিয়াছিলেন যে, অতীব সাধারণ বা সামান্য প্রত্নবস্তুরও গুরুত্ব বর্তমান। সাধারণ বস্তুর আকার ও প্রকৃতি বা ভিন্নতার ধারাবাহিকতা নির্ণয় করিয়া সংস্কৃতির পর্যায় এবং তারিখ নির্ধারণ করাও সম্ভবপর। সুতরাং পিট্ রিভার্সের মতে সকল প্রত্নবস্তুর

বিস্তারিত অনুশীলন প্রয়োজন। কারণ, উপেক্ষিত প্রত্নবস্তুও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিবেদন করে। উপরন্তু তিনি সামগ্রিক উৎখনন-বিবরণী লিখনের পক্ষপাতী। অনেক উৎখনক মনে করেন যে, কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রত্ননিদর্শনের বর্ণনা বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিলেই যথেষ্ট। কিন্তু পিট্ রিভার্সের অভিমত সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপরিবর্তিত বা অনুরূপ বস্তুর পুনঃ পুনঃ লিপিকরণও অনাবশ্যক নহে। উৎখনন-বিবরণীতে বিভিন্ন বস্তুর আকারের ও প্রকৃতির পরিবর্তন বা রূপান্তর সংক্রান্ত সর্ব প্রকার চিত্রাঙ্কনের এবং অন্যবিধ বিস্তারিত তথ্যের সন্নিবেশ প্রয়োজন। অন্যথায় উৎখনন-বিবরণী অসম্পূর্ণ থাকিবে।

উৎখনক পেট্রির সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তাঁহার উৎখননে আবিষ্কৃত সংখ্যাতীত প্রত্নবস্তুর উদ্ধারণ এবং তাহাদের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদানকার্যে অনেক সমস্যার বর্তমানতা উল্লেখ্য। উৎখনন-বিবরণীতে সকল প্রত্নবস্তুর বর্ণনা প্রদান ও চিত্র সন্নিবেশ করাও অবাস্তব। সুতরাং তিনি প্রত্নবস্তুর 'ক্যরপ্যাস্' বা শ্রেণীসূচী অনুসারে বিবরণী লিখনের পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর সংরক্ষণও অপ্রয়োজনীয়। এক শ্রেণীভুক্ত কতিপয় নমুনা-মূলক নিদর্শন সংরক্ষণ করিলেই যথেষ্ট। ক্যরপ্যাস্-পদ্ধতি অনুসারে অগণিত প্রত্নবস্তুর বর্ণনা অতি সংক্ষেপে প্রদান করা সহজসাধ্য।

উৎখনন-বিবরণীর লিখন-সংক্রান্ত উল্লিখিত সমস্যার সমাধানের সূত্র সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক নিদর্শনভিত্তিক। সামগ্রিক বিচারে পিট্ রিভার্স কর্তৃক প্রবর্তিত প্রণালীই আদর্শস্বরূপ। কিন্তু এই প্রণালীর অনুশীলন আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, অগণিত প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হইলে উক্ত পদ্ধতি অনুশীলন করা অসম্ভব। এই ক্ষেত্রে ক্যরপ্যাস্ পদ্ধতি অনুসরণ করাই শ্রেয়। দ্বিতীয়তঃ, সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিলে বিবরণী বৃহদায়তন হইবে। কিন্তু ক্যরপ্যাস্ পদ্ধতি অনুসারে উক্ত বর্ণনা সংক্ষেপে পরিবেশন করা সম্ভবপর। তৃতীয়তঃ, পিট রিভার্স-এর পদ্ধতির

অনুসরণে লিখিত বিবরণীর প্রকাশন অধিক ব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ। ওয়েবষ্টার্ (১৯৬৩) মন্তব্য করিয়াছেন যে, পিট্ রিভার্স স্বয়ং বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহার পক্ষে বৃহদায়তন বিবরণী-গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু বর্তমানে কোন উৎখনকের বা সংস্থার পক্ষে প্রভূত অর্থব্যয়ে বৃহদায়তন উৎখনন-বিবরণী প্রকাশ করা অসম্ভব। সুতরাং গুরুত্ব অনুসারে তথ্যনিদর্শন মনোনয়ন করা প্রয়োজন। মনোনীত প্রত্নবস্তুর, বিশদ আলোচনা এবং চিত্রণ ও নক্শার সন্নিবেশ বাধ্যতা-মূলক। বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী, মনোনীত প্রত্নবস্তুর প্রয়োজনীয় চিত্রণ বিবরণীতে সন্নিবেশ করিয়াই সকল প্রকার তথ্য নিবেদন করা সম্ভবপর।

পেট্রির ক্যারপ্যাস্ পদ্ধতির অনুশীলনকার্যের প্রতিবন্ধতাও স্বীকৃত। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে ক্ষুদ্র প্রত্নবস্তুর সূক্ষ্ম ভিন্নতা ও পরিবর্তন-শীলতা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। বিবিধ প্রত্নবস্তুর ভিন্নতার মাত্রা ও ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করাও কষ্টসাধ্য। তৎসত্ত্বেও শিল্প-নিদর্শনের ক্ষেত্রে ক্যারপ্যাস পদ্ধতির অনুসরণ বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গতঃ, অগণিত কৌলাল-নিদর্শনের ক্যারপ্যাস্ প্রণয়নের অধিক প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ্য।

অপর সমস্যাও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ অতীব দুরূহ এবং জটিলতাপূর্ণ হয়। বৈজ্ঞানিক বিবরণী কতিপয় বিশেষজ্ঞের জন্যই লিখিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ উৎখননের বিবরণীও কেবলমাত্র উৎখনন-বিশেষজ্ঞদিগের জন্যই লিখিত হয়। কিন্তু এই প্রকার বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অতীব নগণ্য। অনেকের মতে, সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ এমনভাবে লিখিতে হইবে যাহাতে ন্যূনপক্ষে মধ্যম পর্যায়ের শিক্ষিত মানুষের পক্ষেও সকল প্রকার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। তাহা হইলেই অন্ততঃ কতিপয় সাধারণ বিজ্ঞার্থীও উক্ত নিবন্ধ প্রণিধান করিতে সমর্থ হইবেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আধারের সম্প্রসারণ সঙ্কুচিত করিবার অধিকার কাহারও থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার-সম্পর্কিত তত্ত্ব

সাধারণ শিক্ষিত মানুষ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পক্ষে দুরূহ তত্ত্ব সাধারণের নিমিত্ত নিবেদন করাও সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে। উৎখননের বিবরণী লিখন-প্রসঙ্গেও উক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য।

উৎখননের বিবরণীর সহিত সাধারণ মানুষের যোগসূত্র অতীব নিবিড়। উৎখনন প্রাচীন মানবসংস্কৃতির বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করে। কিন্তু আবিষ্করণের এবং প্রত্নবস্তুর মর্মার্থ উদ্‌ঘাটনের পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনভিত্তিক। সুতরাং উৎখননের বিবরণীও সাধারণের পক্ষে অবোধ্য হওয়া স্বাভাবিক। বিবরণীতে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট থাকাও অস্বাভাবিক নহে। উক্ত তত্ত্বের অবর্তমানে বিবরণীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিথিল হইবে। সুতরাং দ্বিবিধ উপায়ে উৎখননের বিবরণী লিখন কর্তব্য : বৈজ্ঞানিক বিবরণী এবং সাধারণের বোধগম্য বিবরণী।

বিদগ্ধ উৎখনক হুইলার উৎখনন-বিবরণীকে বৈজ্ঞানিক সংবাদ-পত্রের আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। সংবাদপত্রের অনুরূপ উৎখননের বিবরণীও বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকিবে যেমন, সংবাদ-অনুচ্ছেদ, প্রধান প্রবন্ধ, আবিষ্কৃত নিদর্শনের ভাণ্ডার, নির্মাণ, প্রেরণ, বস্তুর অভাব ও অনটন, অনুরূপতা, ভিন্নতা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে উৎখনক একজন উন্নত ধরনের বিদগ্ধ সাংবাদিক। সংবাদপত্রের পাঠকের পক্ষে সর্বপ্রকার সংবাদে কৌতূহলী হওয়া অস্বাভাবিক। সাধারণতঃ আকর্ষণীয় বা কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদের প্রতিই মানুষ অধিক আকৃষ্ট হয়। উৎখননের বিবরণীও এমনভাবে রূপায়ণ করিতে হইবে যাহাতে প্রতি পাঠক স্বীয় কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনার সন্ধান করিয়া মূল তত্ত্ব প্রণিধান করিতে সমর্থ হন। কিন্তু উৎখনন-বিবরণীর সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অত্যাবশ্যক। অন্যথায় উৎখনন-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞানীমহলে গ্রাহ্য হয় না। ফলে, উৎখননের বিবরণীও সাধারণ সংবাদপত্রে পরিবেশিত রোমাঞ্চকর

সংবাদের তুল্য হইবে। উৎখননের বিবরণীকে কোন ক্রমেই সাধারণ সংবাদপত্রের পর্যায়ে রূপান্তরিত করা সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ, উৎখনন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার অন্তর্গত। সুতরাং বিবরণীতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যথাযথভাবে নিবেদন করা কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে উৎখনন-বিবরণীর লেখ-রচনার বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত তত্ত্বালোচনা প্রয়োজন। সাধারণতঃ বিজ্ঞানবিশারদগণ নিবন্ধ লিখনে কুশলী নহেন। তাঁহাদের পক্ষে সাধারণের অবধারণের উপযোগী করিয়া প্রবন্ধ রচনা করাও সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নহে। বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে অনেক নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণভাবে বিজ্ঞানীরা এই ধরণের তত্ত্ব সুষ্ঠুভাবে নিবেদন করিতে অপারগ। উৎখনন-বিবরণীর ভাষা ও ভাবপ্রকাশ এবং তথ্যের পরিবেশন সহজভাবে রূপায়ণ করিতে হইবে। বিবরণীর রচনার কৌশলের উপর উৎখনকের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উৎখননের বিবরণী-লিখন ইতিহাস রচনার সমান। ইতিহাস-লিখনের সকল তাত্ত্বিক নীতিও উৎখননের বিবরণী-লিখনে প্রযোজ্য। সহজবোধ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক লিখন অতীব কষ্টসাধ্য। হুইলার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, উৎখননকার্যে হাতিয়ারের ব্যবহার-জনিত শ্রম অপেক্ষা উৎখন্তার লেখনীর ব্যবহারজাত পরিশ্রম অধিক। উৎখনন-বিবরণীতে খননকার্য সংক্রান্ত রোমাঞ্চকর বা বিস্ময়কর কাহিনীর গ্রথন সর্বক্ষেত্রেই বর্জনীয়। বৈজ্ঞানিক উৎখনন-বিবরণীতে রোমাঞ্চকর বা কল্পনাপ্রসূত কাহিনীর কোন স্থান থাকিতে পারে না। উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্যয়জনক নিদর্শনরাজির মৌলিক বর্ণনাই বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে উৎখননের বিবরণী লিখন সম্পর্কে কতিপয় সাধারণ মৌলিক নীতি উল্লেখ্য। (১) উৎখনন-বিবরণীতে আবিষ্কৃত নিদর্শন-সমূহের আনুপূর্বিক বর্ণনা প্রদত্ত হওয়া উচিত। (২) বিবরণীতে প্রত্ননিদর্শনের মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন পূর্বক সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ

করিতে হইবে। এই রূপায়ণকার্যে কোন কল্পনাপ্রসূত অভিমতের বা রোমাঞ্চকর বর্ণনার অভিব্যক্তি সন্নিবেশ করা অবৈধ। রোমাঞ্চকর বর্ণনা দ্বারা ইতিবৃত্ত বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। এমন কি, উক্ত বর্ণনা বিবরণীর সাধারণ পাঠকবৃন্দের পক্ষেও বিভ্রান্তিকর। সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষে প্রকাশিত কতিপয় উৎখননের বিবরণীতে অনেক রোমাঞ্চকর ও অপ্রত্যয়জনক বা কল্পনাত্মক কাহিনীকে অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। স্বীয় উৎখননের গুরুত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্তই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিভিন্ন কাহিনীর সন্নিবেশ প্রয়োজন হয়। এই প্রকার উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিবরণী-লিখন বিভ্রান্তিকর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিহাসকে বিকৃত করে। (৩) উৎখনন-বিবরণী উৎখন্তার নিজস্ব মতবাদ প্রকাশের ক্ষেত্র নহে। আবিষ্কৃত নিদর্শনের বিশ্লেষণের ফলে যে তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত উদ্ভূত হইবে, তাহার যথাযথ বর্ণনা প্রদান করাই বিবরণী লিখনের মুখ্য উদ্দেশ্য। (৪) সরল ও সুললিত ভাষায় উৎখননের বিষয়বস্তু লিখিতে হইবে। (৫) অধিকন্তু প্রত্ননিদর্শনের অবস্থার ও স্বরূপের কথন-সংক্রান্ত সকল প্রকার বর্ণনাকে আলোকচিত্রণ, নক্শা ও নানাবিধ চিত্রাঙ্কন দ্বারা প্রতিপন্ন করা অত্যাবশ্যক।

উৎখননের বিবরণী-লিখনে উপরি-উক্ত নীতি অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় উৎখনন-বিবরণী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিবর্জিত রোমাঞ্চকর কাহিনীতে পর্যবসিত হইবে। উল্লিখিত লিখনতত্ত্বের মৌলিক নীতি ব্যতিরেকে উৎখনন-বিবরণীর অন্তর্লিখিত বিষয়সমূহও আলোচ্য।

। ৪ ।

বিবরণী : অন্তর্লিখিত বিষয়বস্তু

উৎখননের বিবরণী অতীব গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ। উৎখননের তথ্যসমূহ বিবরণীতে এমনভাবে বিন্যাস করিতে হইবে যাহাতে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের ও অনুচ্ছেদের সারাংশ সুসংবদ্ধভাবে সংযুক্ত থাকে।

বিবরণীর তথ্যবিন্যাস সম্পর্কে কোন দৃঢ়বদ্ধ প্রণালী অবর্তমান। উৎখনক তাঁহার অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারানুসারে উৎখননের সকল প্রকার তথ্যনিদর্শন বিবরণীতে বিন্যাস করিবেন। তৎসত্ত্বেও বিবরণী-লিখনে কতিপয় স্বীকৃত সাধারণ পদ্ধতি ও নীতি অনুসরণ করা কর্তব্য।

উৎখনন-বিবরণী বিভিন্ন পরিচ্ছেদে ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত থাকিবে। বিবরণীর বিভিন্ন পরিচ্ছেদের ও অনুচ্ছেদের আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ উল্লেখনীয়। (১) প্রস্তাবনা: পরিচালিত উৎখননের উদ্দেশ্য এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা ঋণ স্বীকার। (২) প্রত্নাঞ্চলের ভৌগোলিক ও ভূতত্ত্বীয় বৈলক্ষণ্য ও পরিবেশ, ইতিবৃত্ত, পূর্বতন উৎখনন, উৎখনন-ক্ষেত্রের মনোনয়ন, মনোনীত প্রত্নক্ষেত্রের ভৌগোলিক ও অপর বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। (৩) খননকার্য: অনুসৃত উৎখনন-পদ্ধতি, খননকার্যের সারাংশ, সংযোগাত্মক বিশ্লেষণ, সংস্কৃতি-পর্ব ও পৌর্বাপর্য ও কালনির্ঘণ্ট, খাদোৎখননের বিশদ বর্ণনা ইত্যাদি। (৪) প্রত্নুনিদর্শন: বাস্তু-নিদর্শনের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা ও পৌর্বাপর্য-আলোচনা, প্রত্নবস্তুর বিশ্লেষণ ও সম্যক পরিচিতি প্রভৃতি। (৫) সংস্কৃতির প্রকৃতি ও ধারা-বাহিক ইতিবৃত্ত। (৬) মূল সিদ্ধান্ত। (৭) পরিশিষ্ট: বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রতিবেদন। এতদ্ব্যতীত বিবরণীতে অপর কতিপয় বিষয়ও সন্নিবিষ্ট থাকিবে যেমন, (ক) চিত্রণ ও নক্শা, (খ) লিপিকৃত তথ্যসম্বলিত প্রত্নবস্তুর নির্ঘণ্ট, (গ) চিত্রণের ও নক্শার পূর্ণাঙ্গ তালিকা, (ঘ) গ্রন্থপঞ্জি, (ঙ) সূচিপত্র ইত্যাদি। উক্ত বিষয়সমূহ পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত সকল প্রকার আলোচনা ও তত্ত্ব উৎখনন-বিবরণীতে সন্নিবেশ করিতে হইবে।

উল্লিখিত বিষয়বস্তু উৎখননের সর্বপ্রকার বিবরণীতেই লিপিবদ্ধ থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ, সকল বিবরণীই প্রস্তাবনা ও ভূমিকা-সম্বলিত হইবে। প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন

সমস্যার সহিত উৎখনন ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। সমস্যা-বিহীন উৎখনন অর্থশূন্য। ইতিহাসের সমস্যা সমাধানের নিমিত্তই উৎখনন পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়। সুপরিকল্পিত উৎখনন দ্বারা যে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর তাহাও লিপিবদ্ধ করিতে হয়। তৎপরে পরিকল্পিত উৎখননের মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্যসমূহ পরিষ্কার-ভাবে লিখিত থাকিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, বাংলা দেশের প্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক নির্দেশ অজ্ঞাত ছিল। ঐতিহাসিকগণ বাংলা ও বিহারের বিভিন্নাংশের সহিত প্রাচীন কর্ণ-সুবর্ণের অবস্থান সনাক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল সনাক্তীকরণ প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শনভিত্তিক নহে। সুতরাং কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থানের নির্ণয়-প্রসঙ্গ বাংলা দেশের ইতিহাসের অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কেবলমাত্র উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের ভিত্তিতেই উক্ত সমস্যার সমাধান সম্ভবপর। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি নির্দিষ্ট প্রত্নক্ষেত্রে খননকার্যও পরি-চালিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত উৎখনন ফলপ্রদ হয় নাই। বত্রিশ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক মুর্শিদা-বাদ জিলার চিরুটী অঞ্চলের একটি মনোনীত প্রত্নক্ষেত্রে উৎখননের ফলে রক্তমৃত্তিকা নামক প্রখ্যাত বৌদ্ধ মহাবিহারের নামাঙ্কিত প্রামা-ণিক তথ্যনিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ মহাবিহার রক্তমৃত্তিকা প্রাচীন বাংলার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ মহানগরীর উপকণ্ঠেই অবস্থিত ছিল। সুতরাং রক্তমৃত্তিকার ভৌগোলিক স্থিতির সহিত কর্ণসুবর্ণের অবস্থানও বিজড়িত। উৎখনন-বিবরণীতে এই প্রকার সমস্যার সমাধান-প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। উক্ত আলোচনা হইতে উৎখননের সমস্যা ও সমাধান-সংক্রান্ত সম্যক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর।

এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বিবরণীতেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা ঋণ স্বীকারের জন্য পৃথক অনুচ্ছেদ নির্দিষ্ট থাকিবে। যে সকল সংস্থা

বা ব্যক্তি উৎখনন-পরিচালনায় সক্রিয় সাহায্য প্রদান ও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নামোল্লেখসহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়। প্রত্নক্ষেত্রের মালিক, আঞ্চলিক অধিবাসিগণের প্রধান, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য, উৎখনন-দলের সদস্য, উৎখননকার্যে নিযুক্ত স্বেচ্ছাকর্মী ও শ্রমিকবৃন্দ প্রভৃতির নিকটও ঋণ স্বীকার করা আবশ্যক। উৎখননের বিবরণী-লিখনকার্যে সাহায্যকারিগণের নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে। আলোকচিত্র-গ্রহণকারী, জরিপকারী, নক্শা-অঙ্কনকারী প্রভৃতির অবদানের জন্যও ঋণ স্বীকার করা কর্তব্য। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, উৎখননকার্যে ও বিবরণী-লিখনে সকল সাহায্যকারীর ও অনুপ্রেরণা-প্রদানকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিধেয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রত্নাঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। ভূতত্ত্বীয় ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, প্রাণিকুল, উদ্ভিদ্‌কুল এবং মানবকুল সংক্রান্ত সকল প্রকার তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশ করিতে হইবে। প্রত্নাঞ্চলের ধারাবাহিক ইতিহাস রূপায়ণ করাও প্রয়োজন। সাহিত্যের এবং পূর্বতন আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানের ভিত্তিতেই এই ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করিতে হয়। প্রত্নাঞ্চলে প্রচলিত লোকগাথাও সংগ্রহ করা প্রয়োজন। প্রচলিত লোকগাথার বা জনশ্রুতির মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিহিত থাকে। অঞ্চলের অন্তর্গত অপর প্রত্নক্ষেত্রের পূর্বতন উৎখননের বিবরণীর সারাংশও সন্নিবেশ করা দরকার। পূর্বতন উৎখননের বিবরণী হইতে অনেক মৌলিক তথ্য অনুধাবন করা সম্ভবপর। অধিকন্তু প্রত্নাঞ্চলে অধিক সংখ্যক মৃত্তিকা-স্তূপ বর্তমান থাকা স্বাভাবিক। এই সকল মৃত্তিকা-স্তূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। পরিকল্পিত উৎখননের সমস্যা অনুধাবন পূর্বক খননকার্য পরিচালনার নিমিত্ত প্রত্নক্ষেত্রের মনোনয়ন-সংক্রান্ত বর্ণনাও সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। মনোনীত প্রত্নক্ষেত্রের সীমা, বাস্তুনক্শা, সমোন্নতি রেখাসম্বলিত প্ল্যান্ প্রভৃতির অনুশীলনজাত

তথ্যও সন্নিবিষ্ট থাকিবে। মনোনীত প্রত্নস্থলের ক্ষেত্রাংশ নির্ণয়-প্রসঙ্গ এবং পরিকল্পিত উৎখননে অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-সংক্রান্ত আলোচনাও একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে খননকার্য-সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্যের বিস্তারিত আলোচনা থাকিবে। সর্ব প্রথমেই উৎখননের সারাংশ লিখিতে হইবে। সারাংশের প্রকরণের শীর্ষলিপি ও আখ্যান এমন-ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে যাহাতে পাঠক পরবর্তী বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা অবলীলাক্রমে অনুধাবন করিতে সমর্থ হন। সারাংশ তির্যক লিপিতে মুদ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উৎখননের মূল বিষয় ও মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ সুললিত ভাষায় এমতভাবে লিখিত হওয়া উচিত যাহাতে পাঠকবৃন্দের পক্ষে উৎখনন-সম্পর্কে সকল প্রকার তত্ত্ব অতি সহজেই প্রণিধান করা সম্ভব হয়।

পরবর্তী অনুচ্ছেদের লিখন আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। জটিলতাপূর্ণ তথ্যাভিজ্ঞানের বর্তমানে, পূর্বতন-আবিষ্কৃত নিদর্শনের সহিত নবাবিষ্কৃত নিদর্শনের সম্পর্ক, যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান প্রদান করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ প্রত্ননিদর্শনের ব্যাখ্যান প্রদানে উৎখন্তার স্বীয় অভিমতের বা সিদ্ধান্তের নিবেদন অনাবশ্যক। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে উৎখনকের নিজস্ব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা অবৈধ নহে। তবে উক্ত মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে তথ্য-ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে উৎখননজনিত বিবিধ নিদর্শন জটিলতাপূর্ণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসঙ্গত ও দুর্বোধ্য। অতএব আবিষ্কৃত নিদর্শনের তত্ত্বোপলব্ধির জন্য যুক্তিভিত্তিক আনুমানিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য। কিন্তু অনুমানের মাত্রা লঙ্ঘন করা অনুচিত। আবিষ্কৃত তথ্যাদির ভিত্তিতেই বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের ও নিদর্শনের পৌর্বাপর্য-সংক্রান্ত আলোচনা আবশ্যক। বিভিন্ন সংস্কৃতি-পর্বের তারিখ-সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং আলোচনা প্রয়োজন। প্রত্নবস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত এবং

স্তরবিন্যাস-প্রসূত কালনির্ণয়ের বিস্তারিত অনুশীলনজাত তত্ত্ব বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সংস্কৃতি-পর্বের আলোচনায় প্রাচীনতম পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী পর্ব পর্যন্ত সকল প্রকার তথ্যপূর্ণ নিদর্শনের ধারাবাহিক অনুশীলনতত্ত্ব বিবরণীতে সন্নিবেশ করিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন খাদবিন্যাসের প্রতি খাদের খননকার্যের বিস্তারিত ও ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। খাদশ্রেণী অনুসারে বিভিন্ন খাদের খননকার্য-সংক্রান্ত সকল প্রকার নিদর্শনের আবিষ্কার যথাযথভাবে লিখিতে হইবে। খাদোৎখননের তথ্যলিপির উপরই সংস্কৃতির ইতিবৃত্তের পূর্ণাঙ্গ লিপিকরণ সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। খাদের প্ল্যান্-অঙ্কন, প্রস্তচ্ছেদ-চিত্রণ, আলোকচিত্রণ প্রভৃতির ভিত্তিতেই খাদোৎখননের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হয়। উক্ত চিত্রণ বা অঙ্কন-সমূহই উৎখনন-বৃত্তান্তের প্রামাণিক সাক্ষ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের সর্বাঙ্গীণ রূপায়ণ-প্রসঙ্গের আলোচনা থাকিবে। এই পর্যালোচনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্নবস্তুর শ্রেণী-ভিত্তিক। সাধারণতঃ আবিষ্কৃত নিদর্শন-সমূহকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ বাস্তু-নিদর্শন এবং অপর প্রত্নবস্তু।

অনাচ্ছাদিত বাস্তু-নিদর্শনের আকার, স্বরূপ, বৈচিত্র্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিবেদন করিতে হইবে। বাস্তু-নিদর্শনের আনুপূর্বিক বর্ণনা অঙ্কিত বাস্তু-নক্শাভিত্তিক। শ্রেণীবিন্যাস পূর্বক অনাবৃত বাস্তুর রূপভেদের নির্ণয়-প্রসঙ্গের আলোচনাও প্রয়োজন। বাস্তুনির্মানে ব্যবহৃত উপকরণসমূহ—যেমন, ইষ্টক, প্রস্তর, গাঁথনি, আস্তর ইত্যাদি এবং বাস্তুর গঠনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্যও নিবেদন করিতে হইবে।

বিভিন্ন পর্যায় ও সংস্কৃতি-পর্ব অনুসারে বাস্তুর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে হয়। বাস্তু-পর্যায়ের ও সংস্কৃতি-পর্বের ভিত্তিতে বাস্তু-নিদর্শনের বৈলক্ষণ্যের আলোচনাও অত্যধিক প্রয়োজন। বাস্তু-

নিদর্শনের যথার্থ স্বরূপ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য অনুশীলন করিয়া বাসগৃহ, মন্দির, বসতি প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক মৌলিক তত্ত্ব অবধারণ করা সম্ভবপর।

অপর প্রত্নবস্তুসমূহের পদার্থ অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস করিয়া বর্ণনা লিখিতে হইবে—যেমন, প্রস্তরনির্মিত বস্তু, মৃন্ময় বস্তু, ধাতব বস্তু, সেল প্রভৃতি। এই সকল প্রত্নবস্তুর মধ্যে কৌলাল-নিদর্শনের অধ্যয়ন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেই আবিষ্কৃত কৌলাল-নিদর্শন বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে (১৫৩-৬০)। পূর্বের আলোচিত সকল প্রকার তথ্যও বিবরণীতে সন্নিবেশ করিতে হইবে। উৎখননের বিবরণীতে সাধারণতঃ রূপ ও আকার অনুসারে মৃন্ময় পাত্রের বিভাজন করা প্রয়োজন। সদৃশ মৃৎপাত্রসমূহকে এক শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। অধিকন্তু মৃত্তিকান্তরানুসারে একই শ্রেণীভুক্ত কৌলালের বিন্যাস করাও আবশ্যক। মৃৎপাত্রবিন্যাসের সঙ্গে স্তর-বিন্যাসের সঙ্গতি বা অসঙ্গতি নির্ণয় করিয়া সংস্কৃতি-পর্বের সহিত কৌলালের সম্পর্ক নির্ধারণ করা অধিক প্রয়োজন। এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই কৌলাল-নিদর্শনের আনুপূর্বিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা সম্ভবপর।

কৌলাল-নিদর্শন দ্বিবিধ: সাধারণ বা সহজলভ্য এবং অসাধারণ বা দুর্লভ। সাধারণ বা সহজলভ্য নিদর্শন স্থানীয় বা আঞ্চলিক বলিয়া ধার্য করা যায়। অসাধারণ কৌলাল-নিদর্শন সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অনেক সময় অপর সংস্কৃতি-কেন্দ্র হইতে উক্ত কৌলাল-নিদর্শন আমদানীকৃত হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। এই সকল ক্ষেত্রে সংস্কৃতির প্রব্রজন ও প্রভাব বিস্তার-সংক্রান্ত অনেক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। উপরন্তু অসাধারণ মৃৎপাত্র কোন বিশেষ কার্যের জন্যও ব্যবহৃত হইতে পারে।

তাৎপর্যপূর্ণ মৃৎপাত্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। এই কৌলাল-শ্রেণীর মধ্যে তারিখ-সম্বলিত, নক্‌শাঙ্কিত

বা চিত্রিত এবং গ্রাফিটিসম্বলিত মৃৎপাত্র বিশদভাবে উল্লেখযোগ্য। তারিখসম্বলিত মৃৎপাত্রের গুরুত্ব অত্যধিক। প্রত্নস্থলের সংস্কৃতি-পর্বের বিন্যাস এবং কালনিরূপণ উক্ত প্রকার কৌলাল-নিদর্শনের অনুশীলন দ্বারা অতি সহজেই প্রণিধান করা যায়।

শ্রেণীগত কৌলাল-নিদর্শনের যে সকল বৈশিষ্টের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে তাহাদের মধ্যে পাত্রনির্মাণে ব্যবহৃত মৃত্তিকা, পাত্রের আকার ও গঠন (হস্তনির্মিত বা চক্রনির্মিত), ছেদের স্থূলতা, পঙ্ক-প্রলেপ, রঙের ব্যবহার, দগ্ধতা (সূর্যতাপদগ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ), পোয়ান-সম্পর্কিত তথ্য, নক্‌শাঙ্কিত (হস্তাঙ্কিত বা ছাপাঙ্কিত), চিত্রিত, লেখসম্বলিত খোলাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এতদ্‌ভিন্ন মৃৎপাত্রের অপর বৈলক্ষণ্যসমূহও আলোচনা করিতে হইবে :যেমন, পাত্রের ব্যবহারজনিত তথ্য। সাধারণতঃ মৃৎপাত্র গৃহস্থালী কার্যের জন্যই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এবং মরদেহ সমাধিস্থ করিবার নিমিত্তও মৃৎপাত্রের ব্যবহার অধিক প্রচলিত। মৃৎপাত্র-সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মৃৎপাত্রের বর্ণনার যথার্থতার উপরই সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচয় নির্ভর করে। মৃৎপাত্র-সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তথ্যও সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

মৃৎপাত্র ব্যতীত উৎখননের ফলে অপর অনেক মৃন্ময় বস্তুও আবিষ্কৃত হয়—যেমন, মূর্তি, পুঁতি ও অপর অলঙ্কার-সামগ্রী, গোলক, চাকৃতি, ইত্যাদি। এই সকল মৃন্ময় বস্তুর বিশদ বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

অপর প্রত্ননিদর্শনের মধ্যে পশুঅস্থির ও নরঅস্থির আবিষ্কার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। পশুঅস্থির ও নরঅস্থির অনুশীলন দ্বারা বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর। পূর্বেই পশুঅস্থি ও নরঅস্থি সম্পর্কিত তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে (২৬৭-৮২)। পশুঅস্থির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে বন্যপশু, গৃহপালিত পশু,

পশুখাদ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারা, পশুবলি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। আবিষ্কৃত নরকঙ্কাল-নিদর্শনের বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। নরকঙ্কালের নৃতত্ত্বীয় বিশ্লেষণের সাহায্যে নরগোষ্ঠী নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক। নরগোষ্ঠী নির্ণীত হইলেই সংস্কৃতির বা সভ্যতার নিদর্শনসমূহের প্রকৃত স্রষ্টার বা উদ্ভাবকের ও প্রতিষ্ঠাতার একাত্মীকরণ সম্ভবপর। একটি বিশিষ্ট নরগোষ্ঠী নির্ধারিত হইলে সংস্কৃতির স্রষ্টা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু একাধিক নরগোষ্ঠীর বিদ্যমানতা স্থিরীকৃত হইলে সংস্কৃতির প্রকৃত স্রষ্টার সনাক্তীকরণ আয়াসসাধ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নরকঙ্কালের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে একাধিক নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই সকল ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যে বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীকে সংস্কৃতির স্রষ্টা বলিয়া ধার্য করা হয়। কিন্তু উক্ত প্রকার সিদ্ধান্তও সন্দেহাতীত নহে। উল্লেখনীয় যে, কোন সমৃদ্ধিশালী সভ্যতাকে একটি বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীর সৃষ্টি বা অবদান বলিয়া নির্ধারণ করা অযৌক্তিক। একাধিক নরগোষ্ঠীর সংস্কৃতির দানের সমন্বয়ের ফলেই সভ্যতা পরিপুষ্টতা ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। প্রসঙ্গতঃ, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা হইতে আবিষ্কৃত নরকঙ্কালের নৃতত্ত্বীয় বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। উক্ত প্রত্নক্ষেত্রদ্বয়ে একাধিক নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতাও বিভিন্ন নরগোষ্ঠীজাত সাংস্কৃতিক দানের সমন্বয়ের ফলেই সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। উৎখনন-বিবরণীতে সংস্কৃতির উদ্ভাবক বা স্রষ্টার সনাক্তীকরণ প্রসঙ্গ বিশদভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

পূর্বেই বিবিধ পদার্থনির্মিত পুরাবস্তু সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হইয়াছে (২৪৪-২৫২)। উক্ত পর্যালোচিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতেই সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা বিবরণীতে সন্নিবেশ করিতে হইবে। পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচিত সকল বিষয়ই উৎখনন-প্রতিবেদনের অন্তর্ভুক্ত।

মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই উৎখননের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানবসমাজের ধারাবাহিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের মর্মার্থের ভিত্তিতে উৎখনিত প্রত্নক্ষেত্রের বিভিন্ন যুগভুক্ত সংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণ করিতে হইবে। এই ইতিবৃত্ত লিখনকার্যে নৃবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য। প্রসঙ্গতঃ, সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের মৌলিক বিষয়বস্তু উল্লেখের দাবি রাখে।

সংস্কৃতির উপাদানসমূহ প্রকৃতি-নিরপেক্ষ ও কৃত্রিম। সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পূর্ণভাবে পরিবেশজাত। প্রাকৃতিক জগতের সহিত সংস্কৃতির উপকরণসমূহের উৎপত্তি ও উন্নতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ভূমি, জলবায়ু, উদ্ভিদ্‌কুল, প্রাণিকুল প্রভৃতিই সংস্কৃতির বীজক্ষেত্র। সুতরাং আবিষ্কৃত নিদর্শনের ভিত্তিতে অধিবাসিগণের জীবনযাত্রার সহিত প্রাকৃতিক জগতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্ক নির্ণয় করা প্রয়োজন। সংস্কৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রূপের পর্যালোচনার মধ্যে অধিবাসিগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক এবং জ্ঞানবিষয়ক, ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার এবং কার্যকলাপের সুবিন্যস্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

প্রথমে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশজাত সামগ্রী সংগ্রহ এবং পশু ও মৎস্য শিকার করিয়া জীবনধারণ করিত। তাহার পর ভূমিকর্ষণ ও খাদ্যোৎপাদন আরম্ভ হয়। এই সকল কার্যে ব্যবহৃত হাতিয়ারের ও অপর সাধিত্রের এবং শস্য-নিদর্শনের আবিষ্কার দ্বারা উক্ত বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নিবেদন করা যায়। বাস্তুর ও বসতির নিদর্শনরাজি বাসগৃহের ও বাসস্থানের সম্যক চিত্র পরিবেশন করে। কৃষিকার্য ও শ্রমশিল্পোৎপাদন-সংক্রান্ত তথ্য অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিচিতির সুদৃঢ় ভিত্তি। এতদ্‌ব্যতীত পরিবহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রা-প্রচলন, প্রভৃতি সম্পর্কেও পূর্ণ বর্ণনা লিখিতে হইবে। এমন কি, অনেক প্রত্ন-ক্ষেত্রে শিল্পপণ্যোৎপাদক ধনিক ও কারিগর অথবা শিল্পপতি ও শিল্পশ্রমিক সংক্রান্ত তথ্যসংবলিত বর্ণনাও লিপিবদ্ধ করা সম্ভব।

বলা বাহুল্য, সংস্কৃতির অর্থ নৈতিক ভিত্তি এবং মান নির্ধারণ করাও অত্যাবশ্যক।

সামাজিক কার্যকলাপ, খাদ্যদ্রব্য, বেশভূষা এবং অপর নিত্য-প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। সম্ভবমতঃ সমাজ-সংগঠন সম্পর্কেও ইঙ্গিত প্রদান করা যায়। অলিখিত প্রত্নিদর্শনের ভিত্তিতে রাজনৈতিক জীবনযাত্রার যথার্থ বর্ণনা পরিবেশন করা সম্ভব নহে। কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র, আক্রমণ, বসতির ধ্বংসসাধন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মৌলিক তথ্য নিবেদন করা সম্ভবপর। শাসনব্যবস্থা সম্পর্কেও ইঙ্গিত প্রদান করা অসম্ভব নহে। অনুশাসন ও ন্যায়-অন্যায় বিষয়াত্মক বর্ণনা সম্পূর্ণভাবে লিখিত নিদর্শনভিত্তিক। মানসিক উৎকর্ষ, জ্ঞান ও বোধ সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে ভাষা ও লিপি, চারুকলা, তত্ত্বাভিজ্ঞান ইত্যাদি উল্লেখ্য। ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিশদ বর্ণনাও প্রদান করিতে হইবে। প্রাচীনতম কাল হইতেই ধর্মের সহিত ম্যাজিকের সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্ন। শবসমাধির সহিত সংশ্লিষ্ট নিদর্শন হইতেও সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মৌলিক বিবরণ নিবেদন করা সম্ভবপর।

সংস্কৃতির প্রকৃত উৎস এবং উৎকর্ষের যথার্থ পরিচয় লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। অপর সমসাময়িক সংস্কৃতির সহিত তুলনামূলক অধ্যয়ন-জাত তত্ত্বও নিবেদন করিতে হইবে। সংস্কৃতির বিস্তার, প্রভাব প্রভৃতি সম্পর্কিত তথ্যও পরিবেশন করা সম্ভব। সর্বশেষে সংস্কৃতির উত্থান-পতন ও বিলোপসাধন প্রসঙ্গের পর্যালোচনা প্রয়োজন। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, ইতিবৃত্ত-রূপায়ণে সংস্কৃতির উদ্ভব, সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ, অবনতি বা অধঃপতন বা ধ্বংস প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া উৎখনন-প্রতিবেদনে ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা কর্তব্য।

বিবরণীর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে পূর্ব-বর্ণিত তত্ত্ব ও পদ্ধতি অনুসারে উৎখনন সংক্রান্ত সকল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতিবেদনে মৌলিক সিদ্ধান্তসমূহ নিবেদন করা আবশ্যক।

মৌলিক সিদ্ধান্ত : উৎখনন ও প্রত্নানিদর্শন সম্পর্কে সকল প্রকার তথ্য এবং তত্ত্বালোচনার সমাপ্তি-উত্তর মৌলিক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। অভিনব উপকরণসমূহের গুরুত্বের আলোচনা সন্নিবেশ করা অত্যাবশ্যক। কেবলমাত্র উৎখননজাত সকল প্রকার তথ্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-প্রসূত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তসমূহই বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়।

অনেক উৎখনক কল্পনা-প্রসূত তত্ত্বালোচনাও দ্বিধাহীনভাবে উৎখনন-বিবরণীতে সন্নিবেশ করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিয়ম-নিষ্ঠার প্রতি আনুরাগী উৎখনকগণের পক্ষে কোন প্রকার কাল্পনিক বা অবাস্তব মন্তব্য নিবেদন করা অবৈধ। কারণ, পরবর্তী উৎখনন দ্বারা তাঁহাদের মানসসৃষ্টির অসম্ভাব্যতা প্রতিপাদিত হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত তত্ত্বালোচনায় চিন্তার প্রকাশ অবৈধ নহে। তথাপি, চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্তের পরিমিততা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকা উচিত। বিবরণীতে ভবিষ্যতের তথ্যানু-সন্ধানের পরিচালনা সম্পর্কিত ইঙ্গিত প্রদান করাও প্রয়োজন। সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানবসংস্কৃতির অনেক জটিল সমস্যার সমাধানের যথার্থতা বা চিরন্তন সত্যতা প্রতিপাদন করা অসম্ভব। উৎখনন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের মৌলিকতা কখনও সন্দেহাতীত নহে। প্রত্নানিদর্শন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চিরন্তন সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা অযৌক্তিক।

মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্তের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়-প্রসঙ্গও অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর। প্রাচীন মানবসমাজের ইতিহাসের ধারা অতীব ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা গ্রন্থিত। এমন কি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূত্র-গ্রন্থনের রূপ নির্ণয় করাও অসম্ভব। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের গ্রন্থিসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং তখন তাহার সংযোগ স্থাপন করা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু ইতিবৃত্তের সূত্র-গ্রন্থন এবং স্বরূপ উদ্ঘাটন উপাদানের প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল। বিশেষ ক্ষেত্রে কতিপয় আংশিক

পুরাবস্তুজাত তথ্যের সাহায্যেও ইতিবৃত্তের ধারার ছিন্ন গ্রন্থিসমূহের সংযোগসাধন সম্ভবপর। কোন ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক প্রত্নিদর্শনের-আবিষ্কারের ফলে সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। প্রত্নিদর্শন সম্পর্কে কাল্পনিক ব্যাখ্যা নিবেদন করা সহজসাধ্য। কিন্তু উৎখনন-বিবরণীতে উক্ত প্রকার কাল্পনিক ব্যাখ্যান অতীব বিনীতভাবে নিবেদন করা উচিত। মানুষের পক্ষে ভ্রম স্বাভাবিক। এমন কি, অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী উৎখনকেরও ভুলভ্রান্তি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং অনেক সময় প্রত্নিদর্শনের মূল্যায়ন নির্ণয় ও ব্যাখ্যা প্রদান ভ্রমাত্মক হওয়াও স্বাভাবিক। সর্বক্ষেত্রে মানসপটের সংগতির ও স্থিরতার অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করা সম্ভব নহে। যে উৎখনক মানসপটের সংগতি ও সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উৎখননের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে কৃতকার্য হইবেন, তিনিই বিদ্বৎসমাজে দক্ষ বৈজ্ঞানিক উৎখনকরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন।

সকল উৎখনন-বিবরণীতেই ‘পরিশিষ্ট’ সংযুক্ত থাকিবে। পরিশিষ্টাংশে বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞান-বিশারদগণ কর্তৃক নিবেদিত উৎখনন-সম্পর্কিত সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণজাত তথ্যের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সন্নিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের যাথার্থ্য নিঃসন্দেহে স্বীকৃত বা গৃহীত হইবে না। বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনের মৌলিক তথ্যসমূহই উৎখনন-বিবরণীর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আলোচিত বিষয়বস্তুর যথার্থ ভিত্তি।

এতদ্ব্যতীত বিবরণী-গ্রন্থে সন্নিবেশিত অপর বিষয়বস্তুসমূহও উল্লেখ্য : (ক) চিত্রণ, (খ) প্রত্নবস্তু-নির্ঘণ্ট, (গ) চিত্রণ-তালিকা, (ঘ) গ্রন্থপঞ্জি এবং (ঙ) সূচীপত্র।

(ক) চিত্রণ : পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ চিত্রণই সকল প্রকার উৎখনিত অভিজ্ঞানের একমাত্র প্রত্যয়জনক সাক্ষ্য এবং ব্যাখ্যান-কার্যের ও বিবরণী লিখনের সুদৃঢ় ভিত্তি। বাস্তু-নিদর্শনের সহিত স্তরবিন্যাসের সাক্ষাৎ সম্পর্ক কেবলমাত্র চিত্রাঙ্কিত নক্সার

দ্বারাই সম্যকভাবে প্রকাশ করা সম্ভবপর। উৎখনন-বিবরণীতে সন্নিবেশিত চিত্রণ দ্বিবিধ : চিত্রাঙ্কন (নকশা ও রেখাঙ্কন) এবং আলোকচিত্রণ। চিত্রণ-সংক্রান্ত বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে (১১৭-৩৭)। এই অনুচ্ছেদে উৎখনন-বিবরণীর অঙ্গীভূত বিবিধ চিত্রণ সাধারণভাবে উল্লেখ্য।

চিত্রাঙ্কন ত্রিবিধ : ছেদচিত্রণ, নক্শাঙ্কন (প্ল্যান্) এবং প্রত্ননিদর্শন-চিত্রণ। প্রস্তচ্ছেদ ও প্ল্যান্-অঙ্কন উৎখননের বিবরণী লিখনের সুদৃঢ় ভিত্তি। খননকার্য চলাকালীন নক্শার ও প্রস্তচ্ছেদের অঙ্কন সম্বন্ধে উৎখনকের বিশেষ তৎপর হওয়া প্রয়োজন। উৎখননের এই সুদৃঢ় নজিরের যথাযথ অঙ্কন এবং প্রত্নক্ষেত্রেই উহাদের অনুশীলন অত্যাবশ্যক। উৎখননের পরে পেন্সিলের সাহায্যে অঙ্কিত প্ল্যান্ ও প্রস্তচ্ছেদ কালির দ্বারা চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। সাধারণতঃ অঙ্কিত চিত্রণ পরিবর্তক বা কৃষ্ণ কালিদ্বারা অপর কাগজে স্থানান্তরিত করিতে হয়। এই কার্যের নিমিত্ত ছবির প্রতিলিপি অঙ্কনার্থে তৈলাদিলিপ্ত স্বচ্ছ কাগজের ব্যবহার প্রয়োজন। উক্ত কাগজের একাধিক মুদ্রণ সম্ভবপর। প্রয়োজন অনুসারে প্রতিলিপিকে বিবিধ বর্ণ-সংযোগে চিহ্নিত করিতে হয়।

বিবরণীতে সন্নিবেশিত বিভিন্ন প্ল্যান্-অঙ্কন উল্লেখ্য : (১) প্রত্নক্ষেত্রের সহিত বর্তমান গ্রাম, যাত্রাপথ, নদ-নদী প্রভৃতির সম্বন্ধ দর্শনপূর্বক ক্ষুদ্রাকৃতির প্ল্যান্ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ ক্ষেত্রে উক্ত প্ল্যানের পার্শ্বে দেশের মানচিত্র অঙ্কন করিয়া প্রত্নক্ষেত্রের বর্তমান স্থিতি নির্দেশ করাও উচিত। সাধারণতঃ প্রত্নক্ষেত্রের প্ল্যানের স্কেল এক মাইল=ছয় ইঞ্চি হওয়া প্রয়োজন। (২) প্রত্নক্ষেত্রের বিস্তারিত তথ্যনির্দর্শন-সম্বলিত প্ল্যান্-এর অঙ্কনও অত্যাবশ্যক। এই প্ল্যানের সমোন্নতি রেখাঙ্কন দ্বারা প্রত্নক্ষেত্রের বিভিন্নাংশের উচ্চতা ও নিম্নতা নির্দেশ, করিতে হইবে। প্রত্নক্ষেত্রের অপর বৈলক্ষণ্যসমূহও নির্দিষ্ট থাকিবে। এতদ্‌ভিন্ন উৎখননের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রাংশও চিহ্নিত

থাকা অত্যাবশ্যক। এই নক্‌শাঙ্কনের স্কেল প্রত্নক্ষেত্রের আকারের উপর নির্ভরশীল। (৩) এতদ্‌ব্যতীত বিবরণীতে উৎখনন সম্পর্কিত বিস্তারিত প্ল্যান-অঙ্কনও সন্নিবেশ করিতে হইবে। বাস্তু-নিদর্শন, গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তিস্থল, পুরাবস্তু, সমাধিক্ষেত্র, প্রভৃতির প্ল্যান্‌ বিবরণীর লিখিত তথ্যের দৃঢ় ভিত্তি। প্ল্যান্‌-অঙ্কন ব্যতীত প্রস্তচ্ছেদের অঙ্কনও সন্নিবেশ করিতে হইবে। প্রস্তচ্ছেদের চিত্রণের সাহায্যেই বিবরণীর মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। (৪) আলোকচিত্রণ উৎখননের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক সাক্ষ্য। বিবরণীতে অধিক সংখ্যক আলোকচিত্র সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। উৎখননের বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত আলোকচিত্রের মধ্যে প্রত্নাঞ্চল, প্রত্নক্ষেত্র, খননকার্য, স্তরবিন্যাস, বাস্তুনিদর্শন, প্রত্নবস্তু প্রভৃতির চিত্রণসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এতদ্‌ব্যতীত মনোনীত প্রত্নবস্তুর রেখাঙ্কন এবং আলোকচিত্রণও বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। সাধারণতঃ বিবরণীতে প্রত্নবস্তুর রেখাঙ্কন ও আলোকচিত্রণ উভয়েরই সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। প্রধানতঃ ক্ষুদ্রায়তন প্রত্নবস্তুকে দ্বিগুণাকারে অঙ্কিত করিতে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র প্রত্নবস্তুর দরদী চিত্রকরই সম্যকরূপে চিত্রাঙ্কণ করিতে সমর্থ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সকল প্রকার প্রত্নবস্তুর যথাযথ চিত্রণ প্রয়োজন। ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নবস্তুর বহুলতার জন্য কেবলমাত্র মনোনীত বা নমুনাস্বরূপ বস্তুর চিত্রণ বা নক্‌শাঙ্কন সন্নিবেশ করা উচিত।

প্রত্নবস্তুর মধ্যে কৌলাল-নিদর্শনের চিত্রাঙ্কনের সন্নিবেশ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সর্বপ্রথমেই চিত্রাঙ্কনের জন্য খোলামকুচি মনোনয়ন করিতে হইবে। যে সকল খোলামের নক্‌শাঙ্কন বা আলোকচিত্রণ গৃহীত হইবে, তাহাদের মধ্যে তারিখ-নির্দেশক খোলাম, অভিনব ও নূতন ধরনের খোলাম, পোয়ান হইতে উদ্ধৃত খোলাম, বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত মনোনীত খোলাম, নক্‌শাকৃত খোলাম, চিত্রিত ও গ্রাফিটি-সম্বলিত খোলাম, সমাধিক্ষেত্রস্থ পাত্র ও খোলাম, অন্তরিত খোলাম

ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকৃতি খোলামের চিত্রাঙ্কন সম্ভব নহে। কিন্তু উক্ত খোলামকুচিও বিবরণীতে বিশদভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

সাধারণতঃ মৃন্ময় পাত্রের প্রান্ত বা বেড়ের অংশ কালনিরূপণকার্যে বিশেষ উপযোগী। পাত্রের গাত্রাংশও উক্ত কার্যের সহায়ক। মৃন্ময় পাত্রাঙ্কনের বামপার্শ্বে ছেদ এবং দক্ষিণপার্শ্বে অন্তঃক্ষেত্রের ও বহিঃক্ষেত্রের উচ্চতাঙ্কন বিধিসম্মত। প্রয়োজনমত পাত্রের আদি আকারের বিন্যাস করাও উচিত। কৌলাল-নিদর্শনের অঙ্কন অতীব জটিলতাপূর্ণ। অঙ্কনের নিমিত্ত অনেক সাধিত্রও ব্যবহৃত হয়। কৌলাল অঙ্কনের জন্য বেড়ের পরিধির পরিমাপ বিশেষ প্রয়োজন।

(খ) প্রত্নবস্তু-নির্ঘণ্ট: উৎখনন-বিবরণীতে প্রত্নবস্তুর পূর্ণাঙ্গ তালিকাও সন্নিবেশ করা কর্তব্য। এই তালিকাতে নানাবিধ প্রত্নবস্তুর প্রাপ্তিস্থল, দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-পরিমাপ, আকার ও পরিমাপণ, বৈশিষ্ট্য, ব্যবহারজনিত তথ্য, সংস্কৃতি-পর্ব, উদ্ধারণের তারিখ, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত থাকিবে।

(গ) চিত্রণ-তালিকা: এতদ্‌ভিন্ন উৎখনন-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট নক্‌শার ও চিত্রণের পূর্ণাঙ্গ তালিকাও অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। এই এই তালিকায় চিত্রণ ও নক্‌শা দ্বিভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন: অঙ্কিত চিত্রণ ও আলোকচিত্রণ। প্রত্নবস্তুর রেখাঙ্কন রেখা-ব্লক্ বা লাইন-ব্লক্ নামে অভিহিত। সর্বপ্রকার রেখাচিত্রণ আরবী সংখ্যাসূচক প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে—(১), (২), (৩), (৪) ইত্যাদি (ভারতবর্ষেই এই সংখ্যাসূচক প্রতীক সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে আরবীয়গণই উক্ত সংখ্যার ব্যবহার প্রবর্তন করে)। কিন্তু আলোক-চিত্রণ (হাফ্‌টোন্-ব্লকে মুদ্রিত) রোমক সংখ্যায় নির্দেশ করিতে হয়—I, II, III, IV ইত্যাদি। চিত্রণ-তালিকায় প্রথমে সংখ্যানুক্রমে রেখাচিত্রের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করা উচিত। তৎপরে আলোক-চিত্রণের বিস্তারিত বর্ণনা লিখিতে হইবে।

(ঘ) গ্রন্থপঞ্জী : উৎখনন-বিবরণীতে গ্রন্থপঞ্জি অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। বিবরণীতে সন্নিবেশিত তথ্যাদি ও উপকরণ যে সকল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাদের পূর্ণ তালিকা প্রদান করা আবশ্যক। প্রয়োজনমত বিবরণী-গ্রন্থের পাদটীকায় বা পরিচ্ছে-দের শেষে উক্ত গ্রন্থসমূহের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ প্রদান করা উচিত। বিভিন্ন পত্রিকার প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত তথ্যের নির্দেশ থাকাও প্রয়োজন। সংক্ষিপ্তাকারে পত্রিকার নাম লিখিতে হয়। পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা, গ্রন্থকারের ও গ্রন্থের নাম, প্রকাশনের বৎসর প্রভৃতিও লিখিত থাকিবে। আলোচনাকালীন বিবরণীতে কোন গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিলে তাঁহার অভিমতের প্রকাশিত বৎসর নামের সহিত বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক। গ্রন্থের ও পত্রিকার নাম তির্যক লিপিতে মুদ্রিত হওয়া উচিত।

(ঙ) সূচীপত্র : বিবরণী গ্রন্থে সূচীপত্রের সন্নিবেশও আবশ্যক। সর্বনাম-সূচী এবং বিষয়-সূচী উভয় প্রকার সূচীপত্রই বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা সমুচিত।

উপরি-উক্ত নিয়মানুসারেই উৎখনন-বিবরণীর লিখন প্রয়োজন। বিবরণী-লিখনের সমাপ্তি-উত্তর টাইপ রাইটারে মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞ উৎখনকের নিকট প্রেরণ করা শ্রেয়। প্রয়োজনমত একাধিক বিশারদের সমালোচনা অনুশীলন করিয়া বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করিয়া বিবরণী-লিখনের সংশোধন করা আবশ্যক এবং তাহার পরে চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিয়া মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

। ৫ ।

বিবরণী : মুদ্রণ ও প্রকাশন

উৎখনন-বিবরণীর মুদ্রণ সম্পর্কেও অনেক সমস্যা বর্তমান। উৎখনককে মুদ্রণ-সংক্রান্ত সর্ববিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করিতে হইবে।

উৎখননের বিবরণী মুদ্রণের নিমিত্ত সুনিপুণ মুদ্রাকরের উপর গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করা কর্তব্য। বিবরণী মুদ্রণ সম্পর্কেও উৎখনকের সর্বদা সচেতন থাকা উচিত।

মুদ্রণ সম্পর্কে কতিপয় প্রধান বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন: মুদ্রাক্ষর-নির্বাচন, কাগজ-মনোনয়ন এবং গ্রন্থের আকার নির্ধারণ। এতদ্‌ব্যতীত চিত্রণের ব্লক তৈয়ার এবং মুদ্রণও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণতঃ বারো পয়েন্ট মুদ্রাক্ষরে বিবরণী মুদ্রিত হওয়া উচিত। বিবরণী-গ্রন্থের আকার প্রধানতঃ ১০"×১২" হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় চিত্রাদির ব্লক-মুদ্রণ ক্ষুদ্রাকার হইবে। রেখাচিত্রণ ও আলোক-চিত্রণের অক্ষর এবং অপর চিহ্নসমূহ এমনভাবে লিখিতে হইবে, যাহাতে ব্লকের পরিস্ফুটাকার মুদ্রণ সম্ভব হয়।

ব্লক্ তৈয়ার ও মুদ্রণ সম্বন্ধেও উৎখনকের অধিক তৎপর হওয়া প্রয়োজন। চিত্রের বা নক্‌শার অঙ্কন কোন্ প্রকারে মুদ্রিত হওয়া উচিত, তাহা কেবলমাত্র উৎখনকই ধার্য করিতে সমর্থ। সাধারণতঃ চিত্রমুদ্রণ ত্রিবিধ: হাফ টোন্-ব্লক্, ধাতুফলক্ ও লাইন্-ব্লক্ (রেখা-ফলক্) এবং লিথোগ্রাফ্ (খোদিত শিলাফলক্)। হাফ্‌টোন্ ব্লকে আলো ও ছায়ার ঘনতার তারতম্য আলোকচিত্রণজনিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিষয়সমূহ দ্বারা প্রদর্শিত হয়। যে ধাতুফলক হইতে রেখাচিত্র মুদ্রিত হয় তাহাকেই লাইন্-ব্লক্ বলা হয়। লিথোগ্রাফ্ বলিতে শিলাফলকোপরি ক্ষোদিত চিত্রাদির মুদ্রণকার্যকে বুঝায়। লিথোগ্রাফ্ দ্বিবিধ: প্রত্যক্ষ এবং ক্ষোদিতব্য বিষয়ের ছাপ তুলিয়া মুদ্রণ। সর্ব প্রকার হাফ্‌টোন্-ব্লক্ প্রকৃষ্ট আর্ট কাগজে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক, সাধারণতঃ অঙ্কিত চিত্রণ অর্ধাকারে মুদ্রিত হওয়া উচিত।

বিবরণী-গ্রন্থের নামপত্রে গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক, মুদ্রাকর, মূল্য, প্রকাশিত বৎসর ইত্যাদিও লিখিত থাকিবে।

উৎখনন-বিবরণীর লিখন ও প্রকাশন সম্পর্কিত তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হইয়াছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উৎখনন-বিবরণী

লিখনের জন্য কোনরূপ দৃঢ়বদ্ধ প্রণালী নাই। অতীব দক্ষতার সহিত প্রত্নক্ষেত্রের উৎখননকার্য সমাপন করা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র উৎখনন পূর্বক পুরাবস্তুর আবিষ্করণ বা উদ্ধারণ এবং সংরক্ষণ অর্থহীন। উৎখনন-ক্ষেত্রে বসবাসকারী মানবকুলের সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করিতে হইবে। উৎখনন-বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের বিশ্লেষণ করিয়াই প্রত্নক্ষেত্রের একাধিক যুগভুক্ত অধিবাসিগণের ক্রিয়া-কলাপের ও চিন্তাধারার সম্যক পরিচিতি অর্থাৎ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করাই উৎখনকের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রত্নক্ষেত্রের মানবসংস্কৃতির রূপায়িত ইতিবৃত্তই উৎখনন-বিবরণী। এই কার্য সম্পাদনের জন্য মানবসংস্কৃতির উৎখনিত নিদর্শন সমূহের সহিত ঐকাত্ম্য সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ ও মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে এবং বিবরণীর মাধ্যমে সর্বজনের অবগতির জন্য উৎখননের বিবরণী-গ্রন্থ সমর্পণ করাই উৎখনকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পাদিত কার্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উৎখননের অবদান

ভূগর্ভে বিদ্যমান প্রত্নুনিদর্শনরাজির আবিষ্কারের এবং উদ্‌ঘাটিত মর্মার্থের ভিত্তিতে অমূর্ত মানবসংস্কৃতির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের রূপায়িত ইতিবৃত্তের মাধ্যমে অতীতের সহিত বর্তমানের ও ভবিষ্যতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করাই উৎখনন-বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্তের রূপায়ণ সম্পূর্ণভাবে জড় নিদর্শনভিত্তিক। একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুসৃত উৎখননই বাস্তব নিদর্শনের আবিষ্কার ও মর্মার্থ উদ্‌ঘাটন পূর্বক ইতিবৃত্ত রূপায়ণের কাঠামো বিন্যাস করিতে সক্ষম। লিখিত উপাদান-বর্জিত যুগের মানবসংস্কৃতির বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রূপায়ণ করাই উৎখননের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কার্য। এমন কি, ঐতিহাসিক যুগের সাহিত্য-উপাদানভিত্তিক মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত লিখনেও উৎখননের দান ন্যূন নহে। মানবসংস্কৃতির নানাবিধ বাস্তব নিদর্শন, লেখমালা, লেখসম্বলিত বস্তু, মুদ্রা, ভাস্কর্য ও কারুশিল্পজাত সামগ্রী ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়া উৎখনন সাহিত্যিক উপাদান-প্রসূত ইতিহাসের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে।

উৎখনন বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সমসাময়িক লিখিত সূত্র সরবরাহ করিয়াছে—যেমন, প্রস্তরলেখ, সীলমোহর, তাম্রফলক-লেখ, বিবিধ বস্তুর উপর খোদিত লেখ ইত্যাদি। উৎখননই সর্বযুগের সমকালীন ইতিবৃত্ত রূপায়ণের ভিত্‌স্তর। প্রাচীন ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত উৎখনিত লেখমালার উপর ভিত্তি করিয়াই বিরচিত হইয়াছে। উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বিভিন্ন মুদ্রাও ইতিহাস রচনার মৌলিক উপাদানরূপে স্বীকৃত।

উৎখনন ইতিহাসের কাঠামোকে বিন্যাস, পুনঃস্থাপন ও সুদৃঢ় করে। উৎখননতত্ত্ব আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনরাজির মাধ্যমে প্রাচীন মানবজীবন ধারণের সহিত জড়িত জড়বস্তুসমূহকে প্রাণবন্ত করিয়া সাহিত্যিক উপাদানকে পরিপুষ্ট করে। সাহিত্য মানবজীবনধারার যথার্থ তথ্য ও বাস্তব উপাদানের ভিত্তিতে ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠা করিতে অপারগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্য ইতিহাসের ঘটনাবলীর প্রকৃত রূপকে বিকৃত করে। সাধারণতঃ মূল ঘটনা-প্রবাহের যথার্থ তথ্যকে অব্যক্ত বা বিকৃত করিয়াই সাহিত্য বিরচিত হয়। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ইতিহাসকে সম্যকভাবে উপলব্ধির জন্য বিস্তারিত মৌলিক বাস্তব উপকরণের প্রত্যাশা করে। মানবসংস্কৃতির মৌলিক বাস্তব উপকরণসমূহ একমাত্র উৎখননই সরবরাহ করিতে সমর্থ। এমন কি, সাহিত্যিক উপাদান-বহুল ঐতিহাসিক যুগেও উৎখনন অনেক নূতন মৌলিক বাস্তব উপাদান পরিবেশন করিয়াছে।

ভাষাতত্ত্বের ও সাহিত্যের গবেষণায় এবং সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উৎখননের দান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন লেখ আবিষ্কার করিয়া উৎখনন অক্ষরতত্ত্বের ও ভাষাতত্ত্বের ইতিবৃত্ত রূপায়ণের সুদৃঢ় ভিত্ স্তর বিন্যাস করিয়াছে। সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদান অপ্রতুল। কিন্তু ইথাকায় আবিষ্কৃত পোড়ামাটির ফলকের লেখ উক্ত গবেষণাকার্যের প্রকৃষ্ট উপকরণ। প্রকৃতপক্ষে উৎখনন ভাষাতত্ত্বীয় অনুশীলনের ও সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লিখনের মৌলিক উপকরণসমূহও সরবরাহ করিয়াছে। মিশরে ও মেসোপটামিয়ায় উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত লেখমালাই প্রাচীন মানবসমাজের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রকৃত রূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত হিটাইট, ব্যাবিলোনীয় এবং গ্রীক লেখ-মালা অনুশীলন করিয়াই হোমার কর্তৃক বিরচিত ভাষার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। প্রাচীন মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের তৃতীয় অ্যামেনহোটেপ ও চতুর্থ অ্যামেনহোটেপ নামক নৃপতিদ্বয়ের

এবং মিটানী, অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় রাজন্যবর্গের কূটনৈতিক পত্রালাপের ও সংযোগের লেখ-নজির প্রাচীন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ক্যাপাডোকিয়ার লেখ-ফলক হইতে হিটাইট্ ও সেমিটিক্ পূর্বপুরুষদিগের ভাষা, ব্যবসা, বাণিজ্য-সংস্থা, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের সম্যক বিবরণ পাওয়া যায়। বোঘাজকই হইতে আবিষ্কৃত লেখ হিটাইটগণের সংস্কৃতির প্রকৃত পরিচায়ক। এমন কি, প্রাচীন লেখ-মালা হইতেই গ্রীক্ ও ল্যাটিনের কথিত ভাষার প্রকৃত উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। গ্রীক্ ও রোমক সাহিত্যের দুরূহ বর্ণনার সমাধান ও সংশোধনকার্য আবিষ্কৃত লেখমালার অনুশীলনের আনুকূল্যেই সম্ভব হইয়াছে। প্রাচীন লেখমালার ভিত্তিতেই অ্যারিষ্টটলের অনেক গূঢ় তত্ত্ব প্রণিধান করা হইয়াছে। বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কেও অনেক তথ্য প্রাচীন লেখমালা সরবরাহ করিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ আর্য ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কিত তত্ত্ব উল্লেখনীয়। উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত হিটাইট লেখর বিশ্লেষণের ফলে আর্য ভাষার বিস্তার সম্পর্কে অনেক প্রামাণিক তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই ভাষার সহিত ভারতবর্ষের আদি-বৈদিক ও বৈদিক ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

উৎখননের ফলে ভারতবর্ষ হইতেও অসংখ্য লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লেখমালাই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নের প্রকৃত সম্পদ। আবিষ্কৃত লেখমালা হইতেই ভারতীয় সাহিত্যের ক্রমবিকাশ অবধারিত হইয়াছে। লেখমালাই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিবৃত্তের মূল ভিত্তি।

পৃথিবীতে প্রচলিত বিবিধ লিপির বিবর্তনের ধারার যথার্থ স্বরূপও উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত লেখমালার অনুশীলনের সাহায্যেই রূপায়িত হইয়াছে। প্রাচীনতম হাইঅ্যারোগ্লিফিক্ ও কিউনিফরম্ লিপিদ্বয়ের পাঠোদ্ধার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু এমন অনেক লিপিও আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহাদের পাঠোদ্ধার অদ্যাপি সম্ভব হয়

নাই। এজিয়ান্ হইতে আবিষ্কৃত রৈখিক (লিনিয়ার) 'বি' অক্ষরের পাঠোদ্ধার এখনও সমস্যাপূর্ণ। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি প্রত্নস্থল হইতে আবিষ্কৃত লেখসম্বলিত সীলের লিপিই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অক্ষরের নিদর্শন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাপি উক্ত লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। লিপিতত্ত্ববিদ্গণের মতে ভারতের সুপ্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষর মহেঞ্জোদারোর লিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মহেঞ্জোদারোর লিপির পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেই ভারতীয় অক্ষরতত্ত্বের, ভাষার ও সাহিত্যের প্রকৃত স্বরূপের ও উৎসের সন্ধান লাভ করা সম্ভব হইবে। প্রাচীন কালের আবিষ্কৃত লেখমালাই রাজনীতির, বিধানের এবং আইনশাস্ত্রের ইতিহাস রূপায়ণের প্রকৃত তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। মেসোপটামিয়ার প্রত্নক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত নানাবিধ লেখনজিরই মানবসভ্যতার বিভিন্ন রূপের উদ্ভব সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করিয়াছে। উৎখনিত নিদর্শনরাজির বিশ্লেষণের ফলে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মেসোপটামিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলই মানবসভ্যতার উল্লেখযোগ্য কীর্তিসমূহের জন্মদাত্রী।

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত নরকঙ্কাল ও মমি-নিদর্শনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ চিকিৎসাশাস্ত্রের বা রোগতত্ত্বের ইতিবৃত্ত রূপায়ণের বাস্তব ভিত্তি বিন্যাস করিয়াছে। উক্ত নিদর্শন হইতে চিকিৎসকগণ অনেক মৌলিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ করোটিছেদন ও শল্য-চিকিৎসার বাস্তব নিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন কালেও ইন্কাবাসিগণের মধ্যে করোটি ছেদন করিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ইউরোপের ও প্যালেষ্টাইনের একাধিক প্রত্নক্ষেত্র হইতেও উক্ত প্রকার শল্য চিকিৎসার প্রামাণিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মমি-নিদর্শন পরীক্ষা করিয়া নানা প্রকার মানবব্যাধির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব বিষয়ে অনেক তত্ত্ব অবধারণ করাও সম্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিম-ভারতের লোথাল ও রাজস্থানের কালিবঙ্গা হইতে ছেদিত করোটির আবিষ্কার উল্লেখ্য। উৎখনন প্রমাণ করিয়াছে যে, প্রাচীন ভারত-

বর্ষেও করোটির ছেদন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মিশরের আবিষ্কৃত নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাচীনকালেও নানাবিধ জটিল ব্যাধির সূক্ষ্ম বিচার করিবার প্রণালীও অবিদিত ছিল না।

কারুশিল্পের ও ললিতকলার ইতিহাস রূপায়ণকার্যেও উৎখননের দান সবিশেষ তাৎপর্য-মণ্ডিত। উৎখননই কারুশিল্প ও ললিতকলা অধ্যয়নের বাস্তব তথ্য পরিবেশন করিয়াছে। উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বাস্তুনিদর্শন, ভাস্কর্য, চিত্রণ ও অপর শিল্পকলা নিদর্শন হইতেই বিভিন্ন যুগের জীবনের চিন্তা ও প্রযুক্তি বিদ্যার যথার্থ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে নবাশ্মীয় যুগ হইতেই কৌলাল-শিল্পের বিবর্তনের ধারার ও বিস্তারিত ইতিবৃত্তের তথ্য একমাত্র উৎখননই পরিবেশন করিয়াছে : প্রত্নবিজ্ঞানে কৌলাল-শিল্পের বিশ্লেষণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাচীন কারুশিল্প-নিদর্শনের নির্মাণকৌশল অনুশীলন করিয়া সমকালীন কারুশিল্পের বিবর্তনের ধারাবাহিকতাও নির্ধারণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। প্রাচীন শিল্পোৎপাদনের প্রভাবও আধুনিক শিল্প-নিদর্শনের উপর পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পজাত সামগ্রীর উপর পম্পাই মহানগরী হইতে আবিষ্কৃত কারুশিল্প-নিদর্শনের প্রভাবও নির্ণীত হইয়াছে। গ্রীস ও রোমের স্থাপত্যশিল্প ইউরোপের পরবর্তী সৌধ-নির্মাণকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতের পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগের ইমারত-নির্মাণে প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের প্রভাব ন্যূন নহে।

প্রাচীন ভাস্কর্য-নিদর্শনের অধ্যয়নও তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রীক্ ও রোমক ভাস্কর্য দ্বারা পরবর্তী যুগের ইউরোপীয় ভাস্করগণ অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভাস্কর্য-নিদর্শনরাজি হইতেই পরবর্তী ভাস্কর ও শিল্পিগণ অধিক প্রেরণা অর্জন করিয়াছেন। এমন কি, বিংশ শতাব্দীতেও প্রাচীন ভাস্কর্য সংক্রান্ত নিদর্শনরাজির প্রগাঢ় অনুভূতির

ফলেই শিল্পিগণ তাহাদের প্রতিকৃতিও নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রাচীনকালের অনেক ভাস্কর্য-নিদর্শন সৌন্দর্য বা রসবোধ সংবেদনের এবং শক্তিগ্রহণের প্রধান সহায়ক। অদ্যাপি ফরাসীদেশে 'ভেনাস-ডি-মিলো' নারী-সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীকরূপে স্বীকৃত। ইহার সহিত সমগ্র ফরাসীদেশের ঐতিহ্য জড়িত। ভারতবর্ষ হইতেও উক্ত প্রকার অনেক অতুলনীয় ভাস্কর্য সংক্রান্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, সারনাথ ও মথুরা হইতে প্রখ্যাত বুদ্ধমূর্তিদ্বয়ের আবিষ্কার উল্লেখ্য। এই মূর্তিদ্বয়ের গঠনের নিপুণতা, শান্ত ও সম্যক্ ভঙ্গী এবং চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য অতুলনীয়। কোনারক, খজুরাহো ও অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য-নিদর্শনরাজির চিত্তাকর্ষতা ও নির্মাণ-কৌশল উল্লেখযোগ্য। অদ্যাপি ভারতবাসিগণ প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের আন্তরিক অনুরাগী।

চিত্রণতত্ত্বের বা আলেখ্যতত্ত্বের অনুশীলনেও উৎখননের দান অতুলনীয়। প্রত্নাশ্মীয় যুগ হইতে মানুষ গিরিগুহার অভ্যন্তরবর্তী প্রাচীরগাত্রে চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করে। এই চিত্রাঙ্কনের বর্ণলেখ ও প্রতিরূপ এবং অঙ্কনের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত যুগের দেওয়াল-চিত্রণের স্বাভাবিকতা, সারল্যের দীপ্তি ও বলিষ্ঠতা অদ্যাপি ললিতকলা-বিশারদগণকে বিমুগ্ধ করে। প্রাচীন চিত্রাঙ্কনের প্রকৃত উৎসের সন্ধানও নিবেদিত হইয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রণ সম্পূর্ণরূপে জাদু-ক্রিয়াভিত্তিক। মনে হয়, জাদুক্রিয়াই (ম্যাজিক্) প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রাঙ্কনের প্রধান উৎস।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও প্রাচীন গুহাচিত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র ব্যতীত ঐতিহাসিক যুগের অন্তর্গত অনেক গুহাচিত্রণের আবিষ্কারও উল্লেখের দাবি রাখে। অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি স্থানের গুহাচিত্রণ ললিতকলার চিত্তাকর্ষক নিদর্শন। উক্ত গুহাচিত্রণের রূপ ও লাবণ্য এবং

কলাকৌশল বর্তমান যুগের চিত্রাঙ্কনকেও নানা ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত দেওয়ালচিত্রণের প্রভাব সঞ্চারিত হইবার ফলে ভারতবর্ষের আধুনিক চিত্রকলার দিগন্ত প্রসারিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত কৌলালপাত্রের চিত্রাঙ্কন ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। বর্তমান কালের চিত্রকরগণ উক্ত চিত্রাবলি হইতেও যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। কারুশিল্প-বিশারদগণের এবং চিত্রকরগণের নিকট ইহারা যে বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর প্রাচীন শিল্পকলার ও চারুকলার নিদর্শনরূপেই মূল্যবান তাহা নহে, কলানিপুণতার, উৎকর্ষসৃষ্টির এবং শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসাবেও গুরুত্বপূর্ণ।

মানবধর্মের ধারাবাহিক ইতিহাসের ও বিবর্তনের বাস্তব তথ্যও উৎখননই সরবরাহ করিয়াছে। উৎখননের সাহায্যে অনাবৃত প্রাচীন মন্দির, দেবদেবীর মূর্তি, প্রার্থনামন্ত্র-খোদিত ফলক, শব-সমাধির সহিত জড়িত ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি আবিষ্কৃত না হইলে ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও অনুষ্ঠানের ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করা সম্ভব হইত না। পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল উপপাদ্য বিষয়সমূহ প্রস্তর, ধাতু, মৃত্তিকা প্রভৃতির উপর খোদিত হইত। এই সকল নিদর্শনই ধর্মীয় ইতিহাস রচনার মৌলিক ভিত্তি। এমন কি, উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত জড় নিদর্শন হইতেও সাহিত্যিক উপাদানবর্জিত যুগের ধর্মীয় ইতিহাস রূপায়ণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মাইনোয়ান্ ধর্মের আখ্যান উল্লেখযোগ্য। মাইনোয়ান্ ধর্মের দেব-দেবীর উপাসনার পদ্ধতি, সংগঠন প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্য উৎখননই নিবেদন করিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বৈদিক ধর্মই আদিমতম বলিয়া সাধারণভাবে স্বীকৃত। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের ফলে ভারতের প্রাচীনতম ধর্মের যথার্থ নির্দেশ পাওয়া গিয়াছে। বৈদিক ধর্মের সহিত প্রাচীনতম ধর্মের সম্যক পরিচয়ও প্রদত্ত হইয়াছে। কোন ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের অভিজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

কিন্তু আবিষ্কৃত নিদর্শন হইতে বিভিন্ন ধর্মের মৌলিক তত্ত্বের ইতিহাস প্রণয়ন করা সম্ভবপর।

প্রাচীন কালের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান শব সমাধিস্থ করিবার বিবিধ পদ্ধতি বা প্রথার সহিত বিজড়িত। সাধারণতঃ, মরদেহের সহিত মৃত ব্যক্তির বা পরিবারের ব্যবহৃত সাজসরঞ্জাম বিন্যাস করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। উক্ত প্রকার শব-সমাধির আবিষ্কার হইতে ধর্মানুষ্ঠান ও আত্মার বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা যায়। প্রসঙ্গতঃ, উর নামক প্রত্নস্থলের সমাধিক্ষেত্রের আবিষ্কার সম্পর্কিত চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর বর্ণনা উল্লেখনীয়। উলী কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত বর্ণনা হইতে তৎকালীন রাজন্যবর্গের ও সাধারণ মানুষের মরদেহ সমাধিস্থ করিবার বিভিন্ন প্রথা বা পদ্ধতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক মৌলিক তত্ত্ব প্রণিধান করা সম্ভব হইয়াছে। অধিকন্তু যে সকল বহুমূল্য বাস্তব নিদর্শন সমাধিক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সাহায্যে উরবাসিগণের বেশ-ভূষা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সরঞ্জাম, কারু-শিল্পের ও ললিতকলার উৎকর্ষ প্রভৃতির যথার্থ পরিচয়ও পাওয়া গিয়াছে। সিদিয়ান সমাধি-মন্দির হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনেক মৌলিক তথ্য সরবরাহ করিয়াছে। হরপ্পা, লোথাল, কালিবঙ্গা প্রভৃতি প্রত্নস্থলের সমাধিক্ষেত্রের আবিষ্কারও অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। হরপ্পার সমাধিক্ষেত্রের নিদর্শন হইতে বিভিন্ন সংস্কৃতিগোষ্ঠীর বিদ্যমানতাও অনুমান করা হইয়াছে। সমাধিক্ষেত্রই উৎখন্তার প্রকৃত বন্ধু। কারণ, সমাধিক্ষেত্রেই প্রত্ননিদর্শনসমূহ সুরক্ষিত অবস্থায় বিন্যস্ত থাকে। সুতরাং সমাধিক্ষেত্রজাত নিদর্শনই সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের প্রকৃত সহায়ক। সমাধিক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর দ্বারাই বর্তমান কালের অধিকাংশ সংগ্রহশালা সুসজ্জিত। সমাধিক্ষেত্রের প্রত্ননিদর্শনরাজির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াই প্রাচীন কালের জন্ম-মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কিত ইতিহাস রূপায়ণ করাও সম্ভব হইয়াছে।

পূর্বের পরিচ্ছেদে মানবসংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্তের বিভিন্ন রূপের ও ধারার রূপায়ণকার্যে উৎখননের অবদান আলোচিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় যে, বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে অমূর্ত ইতিহাসের অবয়বের বিন্যাস ও সামগ্রিক রূপায়ণই উৎখননের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এই প্রসঙ্গে উৎখননের সহিত ইতিহাসের প্রকৃত সম্বন্ধ সংক্রান্ত আলোচনা প্রয়োজন।

উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত বাস্তব নিদর্শনসমূহই মানবসংস্কৃতির ইতিহাসের সুদৃঢ় ভিত্তি। ঘটনাবহুল ইতিহাসের ধারার অগ্রগতির বাস্তব সন্ধান কেবলমাত্র উৎখননই পরিবেশন করিতে সমর্থ। বিভিন্ন যুগের মানবসংস্কৃতির অগ্রগতির বা অবনতির প্রকৃত পরিচয় উৎখননতত্ত্বেরই অবদান। ইতিহাস বাস্তব তথ্যভিত্তিক। সুতরাং বাস্তব নিদর্শনই ইতিহাস রূপায়ণকার্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। উৎখননই ইতিহাসের প্রত্যয়জনক বাস্তব উপাদান সরবরাহ করে।

সাহিত্যিক উপাদানে সমৃদ্ধ যুগেও উৎখনন অনেক বাস্তব তথ্য নিবেদন করিয়াছে। স্পার্টার কঠোর নিয়মানুবর্তিতার এবং অনুশাসনের ইতিহাস সুপরিচিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে, স্পার্টার অনুশাসন সুপ্রাচীন কালেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রত্নতত্ত্বীয় আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, লাইকারগাসের পূর্বে সমৃদ্ধিশালী স্পার্টার অধিবাসিগণ ভোগ-বিলাসের উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই সুপরিচিত স্পার্টার কঠোর নিয়মনিষ্ঠা প্রবর্তিত হইয়াছিল। স্পার্টার ইতিহাসের পুনর্বিন্যাসকার্যে প্রত্নতত্ত্বের অবদান অনস্বীকার্য। রোমক সাহিত্যিক উপাদানের প্রতুলতা সত্ত্বেও সম্রাট্ অগষ্টাস্ ও ক্লডিয়াসের রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত রচনায় আবিষ্কৃত লেখমালা ও সৌধের ধ্বংসাবশেষ অনেক নূতন তথ্য সরবরাহ করিয়াছে। রোমের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্ক এবং রোমের বিজয়-অভিযান

সংক্রান্ত অনেক নূতন তথ্যও উৎখনন পরিবেশন করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীতে ইংলণ্ডের একাধিক রোমক অধ্যুষিত ক্ষেত্রে উৎখননের ফলে অনেক নূতন তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল নিদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়াই রোমের সহিত ইংলণ্ডের সম্পর্কের ইতিহাস বিরচিত হইয়াছে। রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন ইতালীর ইতিহাস বিভিন্ন প্রকার প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শনের ও তথ্যের সাহায্যে রূপায়িত হইয়াছে। এট্রাস্ক্যান্ ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্বও সম্পূর্ণরূপে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ভিত্তিতে রচিত।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সংস্কৃতির আংশিক ইতিহাস প্রত্নাশ্মীয় যুগের আবিষ্কৃত প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ারের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত হইয়াছে। উৎখননই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নগরসভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত অভিজ্ঞান পরিবেশন করিয়াছে। উৎখননের সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অনুরূপ সভ্যতাও ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু, তথাকথিত বৈদিক বা মহাকাব্য যুগের ইতিহাসের বাস্তব ভিত্তি অদ্যাপি অজ্ঞাত। এমন কি, ঐতিহাসিক যুগের সাহিত্যিক উপাদানের প্রতুলতা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রূপায়ণ করা সম্ভব হইত না। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাসের অপরিহার্য কাঠামোর সংস্থাপনও উৎখননের অন্যতম কীর্তি। সাম্প্রতিক উৎখনন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন পর্বের ইতিবৃত্ত রূপায়ণকার্যে বহু অমূল্য বাস্তব তথ্য সরবরাহ করিয়াছে।

উৎখনন মানবসংস্কৃতির ইতিহাসে অনেক নূতন অধ্যায়ের প্রবর্তন করিয়াছে। অনেকদিন পর্যন্ত আমেরিকার 'মায়া'-সংস্কৃতি সম্পর্কিত অভিজ্ঞান অজ্ঞাত ছিল। উৎখননই মায়া-সংস্কৃতির

ইতিবৃত্তের কাঠামো বিন্যাস করিয়াছে। মেক্সিকো সভ্যতার সম্যক চিত্রের রূপায়ণ উৎখননতত্ত্বেরই অবদান। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর প্রাচীনতম সংস্কৃতি কেন্দ্রদ্বয়ের, (মেসোপটেমিয়া ও মিশর) পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রণয়ন উৎখনন-বিজ্ঞানেরই মহৎ কর্ম। প্রাচীনতম মানব-সংস্কৃতির তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শনরাজি মেসোপটেমিয়া ও মিশর হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত দেশদ্বয়ের আবিষ্কৃত প্রত্নিনিদর্শনের প্রচুরতাও উল্লেখ্য। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার ও মিশরের সভ্যতার বাস্তব নিদর্শনসমূহের অনুরূপতার পরিবর্তে বৈষম্যও লক্ষ্য করা যায়। মনে হয়, উভয় সভ্যতাই স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। উৎখননই প্রমাণ করিয়াছে যে, মেসোপটেমিয়া ও তন্নিকটবর্তী অঞ্চলেই মানবসংস্কৃতির প্রারম্ভিক পর্ব বিকশিত হইয়াছিল। মেসোপটে-মিয়াতেই মানবসংস্কৃতির আদি পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া নগর-সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্তের বাস্তব নিদর্শন উৎখননই আবিষ্কার করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উৎখননের ফলেই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নগর-সভ্যতার নিদর্শনের আবিষ্কার ভারত-উপমহাদেশের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় প্রবর্তন করিয়াছে। উপরন্তু মহেঞ্জোদারো সভ্যতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞানসমূহও উৎখনন পরিবেশন করিয়াছে। উৎখননের ফলে কোট্‌ডিজি, অ্যাম্‌রি, কালিবঙ্গা প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রে প্রাক্‌-হরপ্পা সংস্কৃতির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত বেলুচিস্তানের একাধিক প্রত্নক্ষেত্র হইতেও প্রাক্‌-সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনের আবিষ্কারও উল্লেখের দাবি রাখে। ব্যাপক উৎখননের ফলে সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব ও বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস অচিরেই সুপরিস্ফুটভাবে রূপায়িত হইবে।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, ইতিহাসের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা উৎখননের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। অচেতন বাস্তব পদার্থসমূহের মর্মার্থ নিষ্কর্ষণ পূর্বক মানবসমাজের ইতিবৃত্ত রূপায়ণ

করিতে হইবে। লিখিত উপাদান-বর্জিত মানবসমাজের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে অলিখিত বাস্তব উপাদানভিত্তিক। কিন্তু লিখিত উপাদান-সম্বলিত ঐতিহাসিক যুগেও প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদান কেবলমাত্র সাহিত্য হইতে সংগৃহীত তথ্যের সমর্থনকারী বা অসমর্থনকারী নহে। উপরন্তু ঐতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্তও বহুলাংশে উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়াই বিরচিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে উৎখনন সাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে রচিত ইতিহাসকে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করে। সাহিত্যিক উপাদানজাত ইতিহাস-সূত্রের বিচ্ছিন্নতার বিদ্যমানতা স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, সাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে রচিত ইতিহাস সমস্যাপূর্ণ এবং উহার ঐতিহাসিক সত্যতা প্রায়শঃই অস্পষ্ট। উৎখননতত্ত্বই ইতিহাসের জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান করিয়া মানবসমাজের নিরবচ্ছিন্ন ইতিবৃত্ত রূপায়ণ করিতে সক্ষম।

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের রূপায়ণতত্ত্ব আলোচনীয়। প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানের অবিদ্যমানতার বা অপ্রতুলতার জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে এখনও অনেক জটিলতাপূর্ণ সমস্যা বর্তমান। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ইতিহাস বাস্তব তথ্যবর্জিত বেদ, মহাকাব্য, পুরাণ, প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী সাহিত্যিক উপাদানভিত্তিক। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী (প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দী) হইতে ভারতীয় ইতিহাস রচনার প্রত্যয়জনক বাস্তব উপকরণ উৎখননই সরবরাহ করিয়াছে। কিন্তু উক্ত ইতিহাসও বহুলাংশে রাজকীয় কীর্তিগাথা, মানবসমাজের যথার্থ ইতিহাস নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিদ্যমানতাও উল্লেখনীয়। অগণিত প্রত্নাশ্মীয়, মধ্যাশ্মীয় এবং নবাশ্মীয় হাতিয়ারের আবিষ্কার সত্ত্বেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরীভূত মানব-জীবদেহের অস্তিত্ব অদ্যাপি অবিদ্যমান। প্রস্তরনির্মিত হাতিয়ার ব্যতীত প্রত্নাশ্মীয় যুগের মানুষের অধিষ্ঠানের ও তাঁহার সংস্কৃতির প্রত্যয়জনক অভিজ্ঞানের প্রকৃত সন্ধানও পাওয়া যায় নাই। ভারত-

বর্ষে মানব-জীবাশ্মের অপ্রাপ্তি অতীব বিস্ময়কর। সম্প্রতি ভারত উপ-মহাদেশের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র হইতে খাদ্য-সংগ্রাহক ও খাদ্য-উৎপাদক সমাজ সম্পর্কে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস রূপায়ণকার্যে উক্ত নিদর্শন অপ্রতুল। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, অদূর ভবিষ্যতে উৎখনন প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিবৃত্ত রূপায়ণে বর্তমান সমস্যাসমূহ সমাধান করিতে সমর্থ হইবে।

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ইতিহাস তথা-কথিত আর্য-আগমনের এবং তাঁহাদিগের প্রাচীন সাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে বিরচিত কার্যকলাপের কাহিনীর সহিত জড়িত ছিল। বাস্তব তথ্যভিত্তিক ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সংস্কৃতির উদ্ভব ও ক্রম-বিকাশ সম্পর্কে কোন প্রকার জ্ঞান ছিল না। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা নামক প্রত্নক্ষেত্রদ্বয় হইতে অভূতপূর্ব প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কার করিয়া উৎখনন প্রমাণ করিয়াছে যে, মেসোপটেমিয়ার ও মিশরের অনুরূপ সমৃদ্ধিশালী তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা ভারতবর্ষেও বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সর্বপ্রথমে পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন যে, উক্ত সভ্যতা সিন্ধু উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অধুনা ভারতবর্ষের অনেক প্রত্নক্ষেত্রে উৎখননের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার বিস্তার সুদূর প্রসারিত ছিল। সন্তোষজনক প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, সিন্ধু সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত রূপায়ণ সম্পর্কে অনেক জটিল সমস্যা অদ্যাপি বর্তমান। এমন কি, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত লিপির পাঠোদ্ধার করাও সম্ভবপর হয় নাই।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় তথাকথিত আর্যগণের বহির্জগত হইতে উপ-মহাদেশে আগমন ও অবস্থান সংক্রান্ত বৈদিক কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়াই বিরচিত হইয়াছে। আর্য জাতির

বা আর্য সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন শাস্ত্রবিশারদগণ ভাষাতত্ত্ব কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া অনেক বাস্তব ভিত্তিবর্জিত আখ্যানও রূপায়িত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আর্য জাতি বা আর্য সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন প্রকার প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। আর্য ইতিহাস সম্পর্কেও অনেক জটিল সমস্যা বর্তমান : আর্যগণের আদি আবাসভূমির সনাক্তীকরণ, আর্য আগমনের কালনিরূপণ, আর্য সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ, অনার্য সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ণয়, আর্য সংস্কৃতির বিস্তার, বৈদিক সাহিত্যের বাস্তব ভিত্তি ইত্যাদি। এই সকল বিষয় সংক্রান্ত অনেক তত্ত্বালোচনা সম্বলিত গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত কোন একটি সমস্যারই সমাধান অদ্যাপি সম্ভবপর হয় নাই। স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎখনন-বিজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন আর্য ইতিহাসের উপর কোনপ্রকার আলোকপাত করিতে অদ্যাপি সফলতা অর্জন করিতে পারে নাই।

এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের মূল সূত্র-গ্রন্থির বিচ্ছিন্নতাও উল্লেখ্য। আর্য আগমনের ও সিন্ধু সভ্যতার পরিসমাপ্তির কাল যথাক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ এবং খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে ধার্য করা হইয়াছে। অতএব ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ৩০০-৪০০ বৎসরের ব্যবধান বর্তমান। উপরন্তু আর্যগণের আগমনকাল ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং সিন্ধু সভ্যতার পরিসমাপ্তি-কাল ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (কার্বন-১৪ তারিখ) স্থিরীকৃত হইলেও ২৫০ বৎসরের ব্যবধান বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু সিন্ধু সভ্যতাকে প্রাগার্য পর্বের অনার্য সংস্কৃতিজাত বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে। এই প্রকার সিদ্ধান্ত বাস্তব তথ্যভিত্তিক নহে। অধিকন্তু আর্যগণের আগমনের ও অধিষ্ঠানের (১২০০ বা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নিরূপিত কাল হইতে বাস্তব তথ্যভিত্তিক ইতিহাসের আরম্ভকালের (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) মধ্যবর্তী ব্যবধানও অত্যধিক। আর্য ইতিহাস সম্পর্কে উৎখনন কোনপ্রকার বাস্তব তথ্য পরিবেশন

করিতে পারে নাই। তবে স্বীকার্য যে, বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন-জাত তথ্যসমূহের সাহায্যে অচিরেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায়ের যথার্থ রূপায়ণ সম্ভবপর হইবে।

ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নতত্ত্বীয় তথ্যভিত্তিক ইতিহাসও সমস্যামুক্ত নহে। প্রসঙ্গতঃ, দক্ষিণ ভারতের ইতিবৃত্ত রূপায়ণে কতিপয় সমস্যার বিদ্যমানতা উল্লেখযোগ্য। উত্তর ভারতের আর্য ইতিহাসের অনুরূপ দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় নামধেয় আদিবাসিগণের ইতিহাস সম্পর্কেও অনেক সমস্যা বর্তমান—দ্রাবিড় জাতির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব, দ্রাবিড় নরগোষ্ঠী নির্ণয়, দ্রাবিড় সংস্কৃতির অভিব্যক্তির স্বরূপ এবং বিস্তার নির্ধারণ ইত্যাদি। স্বীকার করিতে হইবে যে, মানবসংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন দক্ষিণ ভারতে আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ ভারতীয় ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বিবরণ অদ্যাপি বিরচিত হয় নাই। দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসও অজ্ঞাত। দক্ষিণ ভারতের সুবিস্তৃত মহাশ্মীয় নিদর্শনরাজি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট অদ্যাপি কৌতূহলের বিষয়। কেবলমাত্র খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাসের আংশিক রূপায়ণ সম্ভব হইয়াছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রথম খ্রীষ্টাব্দ হইতেই দক্ষিণ ভারতের সহিত রোমক সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বাণিজ্যিক সম্পর্ক সংস্থাপিত হয়। রোমক মুদ্রার আবিষ্কার এবং যবনগণের অধিষ্ঠান সম্পর্কিত সাহিত্যিক পরিচয় ব্যতীত উক্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত কোন প্রকার প্রত্নতত্ত্বীয় বাস্তব নজিরের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের মূল সূত্র গ্রথিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস রূপায়ণের উল্লেখিত সমস্যার সমাধান করিয়া উৎখননতত্ত্বই প্রত্যয়জনক বাস্তব নিদর্শনের ভিত্তিতে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত লিখনে সমর্থ। প্রকৃতপক্ষে উৎখনন কতিপয় সমস্যার সমাধানও করিয়াছে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের উৎখননের ফলে হরপ্পা

মহানগরীর প্রাচারের গঠন ও ধ্বংস সম্পর্কিত অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এমন কি, আর্য আগমনের সহিত সিন্ধু সভ্যতার সম্পর্কও নির্ধারিত হইয়াছে। ব্রহ্মগিরি নামক প্রত্নস্থলে উৎখননের ফলে দক্ষিণ ভারতে তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির বিকাশের মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির পৌর্বাপর্যও নির্ণীত হইয়াছে— তাম্রাশ্মীয়, মহাশ্মীয় এবং ঐতিহাসিক পর্ব। উপরন্তু আরিক্কামেড়ু নামক প্রত্নক্ষেত্রে উৎখননের ফলে রোমক বাণিজ্য সম্পর্কে অনেক মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই আবিষ্কারের ভিত্তিতেই দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাসের দৃঢ় ভিত্তিক তারিখের রেখাঙ্কন করা সম্ভব হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন আরিক্কামেড়ু হইতে রোমক ব্যবসায়িদিগের মালগুদাম, রঞ্জনের কারখানা, রোমক সামগ্রী প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে ভারত-রোমক বাণিজ্যিক ইতিবৃত্তের বাস্তব কাঠামোর সুদৃঢ় ভিত্তির বিন্যাস সম্ভবপর হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারত বিভাগের ফলে উপ-মহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্রদ্বয় মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতভূমিতে উক্ত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। উৎখননের ফলে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার অনুরূপ একাধিক তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি-কেন্দ্রের আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে। রূপার, কালিবঙ্গা, লোথাল প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্র হইতে মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা সংস্কৃতির অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শনরাজি আবিষ্কার করিয়া উৎখনন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রূপায়ণের এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে। এমন কি, পশ্চিম পাকিস্তানের কোট্‌ডিজি এবং ভারতবর্ষের কালিবঙ্গা প্রত্নক্ষেত্রদ্বয় হইতে প্রাক্‌-হরপ্পা সংস্কৃতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার ফলে সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভবের ও ক্রমবিকাশের ধারার স্থিরীকরণ বহুলাংশে সম্ভবপর হইয়াছে। পূর্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, সিন্ধু সভ্যতা পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়ায় উদ্ভূত ও বিকশিত সংস্কৃতি হইতে সঞ্জাত।

কিন্তু সাম্প্রতিক উৎখননের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারত উপ-মহাদেশের ভূমিতেই সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের মৌলিকত্ব বেলুচিস্তানের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রের উৎখননজাত তথ্য দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিতও হইয়াছে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তথাকথিত আর্য সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎখনন অদ্যাপি কোন আলোকপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। হস্তিনাপুর, আহার, গিলুণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র হইতে আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনরাজিকে আর্যসংস্কৃতির সহিত অন্বিত করিয়া সিন্ধু সভ্যতা ও আর্য-আগমনের মধ্যবর্তী শূন্য স্থান পূর্ণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই শূন্য স্থান সংক্রান্ত সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধানের প্রত্নতত্ত্বীয় ভিত্তি সুদৃঢ় নহে। এই প্রসঙ্গে হস্তিনাপুর হইতে আবিষ্কৃত প্রত্ননিদর্শনসমূহকে মহাভারতে বর্ণিত আর্যসংস্কৃতির সহিত একীকরণের প্রচেষ্টাও উল্লেখ্য। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে প্রত্নতত্ত্বীয় ভিত্তিবর্জিত। ভারতবর্ষের মহাকাব্যদ্বয়ের প্রত্নতত্ত্বীয় ভিত. অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। স্বীকার করিতে হইবে যে, সক্লীম্যানের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত হোমারের বিদ্যমানতা এবং তাঁহার মহাকাব্যদ্বয়ের ঐতিহাসিকতা ইউরোপীয়গণের নিকট অপ্রতর্ক্য ছিল। কিন্তু সক্লীম্যানের উৎখননই হোমারকে প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং তাঁহার মহাকাব্যদ্বয়কে বাস্তব ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের মহাকাব্যদ্বয়ের ঐতিহাসিকতা এবং ব্যাস ও বাল্মিকীর অস্তিত্ব প্রত্নতত্ত্বীয় বাস্তব নিদর্শনের প্রমাণসাপেক্ষ।

উৎখনন-বিজ্ঞান ঐতিহাসিক যুগভুক্ত ইতিবৃত্তের যোগসূত্রের অনেক বিচ্ছিন্নতাও সংযুক্ত করিয়াছে। অনেক অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগর, রাজধানী, মঠ, বিহার, মন্দির, প্রভৃতির যথার্থ পরিচিতি উৎখননই প্রদান করিয়াছে। ফলে ধারাবাহিক ইতিহাস রূপায়ণের অনেক সমস্যার সমাধান করাও সম্ভবপর হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, বাঙলাদেশের রাজবাড়িডাঙা নামক প্রত্নস্থলের উৎখনন

উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাঙলার সমৃদ্ধিশালী রাজধানী কর্ণসুবর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক স্থাননির্দেশ বহুদিন যাবৎ বিতর্কমূলক ও অনির্ধারিত ছিল। রাজবাড়িডাঙায় উৎখননের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত ক্ষেত্রেই চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্ কর্তৃক বর্ণিত প্রখ্যাত রক্তমৃত্তিকা-মহাবিহার এবং উহার উপকণ্ঠেই গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল। অমূল্য বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া রাজবাড়িডাঙার উৎখনন বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস রূপায়ণে অনেক নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছে।

উৎখনন দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র হইতে নানাবিধ প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার ফলে ইতিহাসের অসংলগ্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশসমূহকে সংলগ্ন ও আলোকিত করা সম্ভব হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইতিহাসের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যনিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে। এই প্রসঙ্গে বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস রূপায়ণ-কার্যে উৎখননের দান উল্লেখ্য। বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস অদ্যাপি তমসাচ্ছন্ন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে উৎখনন এমন অনেক তাৎপর্যপূর্ণ প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছে যাহার সাহায্যে মানবসংস্কৃতির প্রারম্ভিক কাল হইতে বাঙলা দেশের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রূপায়ণের পথ বহুলাংশে সুগম হইয়াছে।

উৎখননের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহুবিধ জটিল সমস্যা অদ্যাপি বর্তমান। এমন কি, প্রাচীন ইতিহাসের অনেক বিশিষ্ট বিচ্ছিন্ন অংশকে সংযুক্ত করাও সম্ভব হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন। কেবলমাত্র উৎখনন-বিজ্ঞানই উক্ত ঘন কুয়াশা দূরীভূত করিয়া ইতিহাসের প্রবাহকে একই ধারায় অন্বিত করিতে সমর্থ। উৎখনন ইতিহাস-সূত্রের গ্রন্থিকে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ইতিবৃত্তের ধারাবাহিকতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রের সাম্প্রতিক উৎখনন ভারতীয় সংস্কৃতির উৎপত্তি ও

ক্রমবিকাশের কাঠামোকে সংস্থাপন করিতেও সমর্থ হইয়াছে। অচিরেই সুপরিকল্পিত ব্যাপক বৈজ্ঞানিক উৎখনন-প্রসূত অভিজ্ঞানের সাহায্যেই ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তমসামুক্ত ও বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করা সম্ভব হইবে।

পৃথিবীর অসংখ্য প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন অনেক অজ্ঞাত সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল আবিষ্কার করিয়া মানবসভ্যতার উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছে। বহুদিন পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল যে, মিশরদেশই মানবসভ্যতার উৎস। কিন্তু সাম্প্রতিক উৎখনন প্রমাণ করিয়াছে যে, মিশরসভ্যতার পূর্বেই মেসোপটে-মিয়াতে মানবসংস্কৃতি বিকাশ লাভ করিয়াছিল। উৎখননই মিশরকে আদি মানবসংস্কৃতির সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া মেসোপটে-মিয়াকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে। এমন কি, সাম্প্রতিক উৎখননের ফলে মানবসভ্যতার প্রাচীন কেন্দ্র হিসাবে ভারতবর্ষের দাবিও স্বীকৃত হইয়াছে।

উৎখনন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানবসংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশ, বিভিন্ন সংস্কৃতি-কেন্দ্রের সহিত সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান প্রভৃতি সংক্রান্ত অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। এই সকল তথ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনকালেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগসূত্র বিদ্যমান ছিল। এই প্রসঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার সহিত সুমেরীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও আদান-প্রদান সম্পর্কিত তথ্যনিদর্শনের আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। উৎখনিত নিদর্শন হইতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আদি-ঐতিহাসিক যুগেও ভারতীয়গণ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

উৎখননই একমাত্র গতিশীল বিজ্ঞান। উৎখননের কর্মক্ষেত্র সমগ্র পৃথিবী। জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি কেহই উৎখননের

হাতিয়ারের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না। ক্ষেত্র ও কাল উৎখননের হাতিয়ারকে নিষ্ক্রিয় করিতে পারে না। সুতরাং মানবসভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রসমূহের বর্তমান ভৌগোলিক নির্দেশ ও বিস্তার সম্পর্কিত যথার্থ পরিচিতি উৎখননেরই অবদান। মানবসভ্যতার অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর নির্ধারণের বাস্তব নিদর্শনও উৎখনন পরিবেশন করিয়াছে। প্রাচীন যুগের পথ-পরিচয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি ও পথ নিরূপণ করিয়া মানবসংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও ইতিবৃত্ত রূপায়ণ উৎখননের গুরুত্বপূর্ণ দান।

উৎখনন ইতিহাসের সাহিত্যিক উপাদানকে পরিপুষ্ট করে। কিন্তু সাহিত্যিক উপাদানবর্জিত যুগের ইতিহাস কেবলমাত্র উৎখনিত প্রত্ননিদর্শনের সাহায্যেই রূপায়িত হওয়া সম্ভব। মানবসংস্কৃতির ইতিহাস রচনার উপাদানের মধ্যে যে অভাব বর্তমান তাহাও একমাত্র উৎখননই পরিপূরণ করিতে সমর্থ। গর্ডন চাইল্ড বলিয়াছেন যে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধিকারক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অনুরূপ উৎখননও ইতিহাসের দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়াছে; ইহা ইতিহাসের সীমা-রেখাকেও পরিবর্ধিত ও প্রশস্ত করিয়াছে। জীবদেহে অগণিত সেল বা কোষের স্থিতির রহস্য-উদ্‌ঘাটক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ন্যায় উৎখননও ইতিহাসের সূক্ষ্ম নিদর্শনসমূহকে সহস্র গুণে প্রশস্ত করিয়াছে। রেডিও-অ্যাকটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা রসায়নশাস্ত্রকে যেরূপ প্রভাবিত করিয়াছে, সেইরূপ উৎখননও ইতিহাস-বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে রূপান্তরিত করিয়াছে। উৎখনন প্রাচীন মানবসংস্কৃতির অজ্ঞাত ইতিহাসের সন্ধান প্রদান করিয়াছে এবং ইতিহাসের ধারাকে সহস্র-সহস্র বৎসর পশ্চাৎ পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছে।

প্রায় প্রতি মাসেই উৎখননের হাতিয়ার নূতন নূতন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল আবিষ্কার করিতেছে। এতদ্ সত্ত্বেও মানবসংস্কৃতির ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। তবু স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎখননই একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থা

যাহার সাহায্যে ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করিয়া মানব সংস্কৃতির প্রকৃত রূপের পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর।

উৎখনন নিরর্থক ও ধ্বংসাত্মক নহে। উৎখনন মানবসংস্কৃতির ইতিহাস সৃষ্টিকারী। ইতিহাসের বাস্তব চিত্র রূপায়ণকার্যে উৎখননের মূল্য অসাধারণ। যে অতীতকে মুখর করিবার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'কথা কও' প্রাণমন্ত্রে ইতিহাসকে উদ্বোধিত করিয়াছেন, তাহার সুদৃঢ় ভিত্তি মৃৎ পরিবেশে উৎখননের কল্যাণেই পাওয়া যায়। উৎখনন কেবলমাত্র অতীতের উদ্‌ঘাটক নহে; অতীতকে স্বীকার করিয়াই উৎখনন ভবিষ্যতের দিকে মানুষের অগ্রগমনের সংকেত ও পদক্ষেপ।

উৎখনন-বিজ্ঞানের অবদান কেবলমাত্র মানবসংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণকার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। বর্তমান সমাজ-সংগঠনে এবং জাতীয়তাবোধ উদ্দীপনে উৎখননতত্ত্বের অনুশীলনের সার্থকতাও অনস্বীকার্য। জনসাধারণের অর্থে ও কায়িক শ্রমে উৎখননকার্য পরিচালিত হয়। বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া লোকশিক্ষা ও সামাজিক সংহতির নিমিত্ত মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করাই উৎখননতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং বর্তমান সমাজেও উৎখননতত্ত্ব অনুশীলনের গুরুত্ব অসাধারণ।

সর্বপ্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান সমাজ প্রত্নতত্ত্বের প্রতি উদাসীন নহে। উপরন্তু সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই প্রাচীনকে অবধারণ করিবার ঔৎসুক্য বর্তমান। উৎখননতত্ত্ব জনসাধারণের এই ঔৎসুক্যের তৃপ্তি সাধন করে। সাধারণভাবে স্বীকার করিতে হইবে যে, শিক্ষিত সমাজই উৎখননতত্ত্বের অনুশীলন হইতে প্রধানতঃ লাভবান। কিন্তু সমাজের সর্ব স্তরের মানুষকেও উৎখননতত্ত্ব বিবিধ উপায়ে আনন্দ, পরিতুষ্টি ও সম্যক জ্ঞান বিতরণ করে। প্রকৃতপক্ষে উৎখনন-বিজ্ঞানই লোকশিক্ষার যথার্থ মাধ্যম। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত

উভয়ই উৎখননতত্ত্ব হইতে শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। উৎখনন-বিজ্ঞান ইতিহাসের দৃষ্টিলব্ধ জ্ঞান বিতরণ করে। প্রত্নতত্ত্বীয় সংগ্রহশালা লোকশিক্ষার প্রকৃত শিক্ষায়তন। সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত প্রত্ননিদর্শন সম্পর্কে অজ্ঞতা নিন্দার্হ। উৎখননতত্ত্ব জনসাধারণকে বিশ্ব মানবসমাজের ইতিহাস-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং বর্তমান সমাজের উৎপত্তির ও বিবর্তনের ধারার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া সমাজতত্ত্বের মর্মার্থ অনুধাবন করিতে সাহায্য করে।

ইতিহাস লিখিত উপাদানভিত্তিক। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, লিখিত উপাদানজাত ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিচ্ছেদ এবং অসঙ্গতি বর্তমান থাকা স্বাভাবিক। ইতিহাস-সূত্রের মূল ঘটনা-প্রবাহের বিচ্ছেদাংশকে একমাত্র উৎখনন-বিজ্ঞানই সংযুক্ত করিতে সমর্থ। উৎখননতত্ত্ব বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার সাহায্যে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করে। উৎখনন বিবিধ বিজ্ঞানশাখার অনুশীলনকার্যে অনেক নূতন তথ্যের ও তত্ত্বের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ভূবিদ্যা, নৃবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানশাখার গবেষণাকার্যে উৎখনন অনেক নূতন নির্দেশও প্রদান করিয়াছে। উৎখনন বিভিন্ন বিজ্ঞানশাখার দৃষ্টিভঙ্গীও বহুলাংশে প্রসারিত করিয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা অনেক নূতন যন্ত্র ও সাধিত্র আবিষ্কার করিয়া প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে। ভূবিদ্যার অনুশীলনও উৎখনন হইতেই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়া উৎখননতত্ত্ব ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি বহুলাংশে প্রসারিত করিয়াছে। প্রাচীন কালের আঞ্চলিক পরিবেশ, উদ্ভিদ্‌কুল, পশুকুল ও মানবকুল সংক্রান্ত সকল প্রকার অভিজ্ঞান সরবরাহ করিয়া উৎখনন বিবিধ বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ধারা পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ব্রতী হইলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণই চীনদেশের প্রত্নাশ্মীয় যুগের অমূল্য নিদর্শনরাজি আবিষ্কার করিয়াছেন। 'পিকিং মানব-কুলের' নিদর্শন প্রত্নবিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার। চীন দেশের তাম্রাশ্মীয় যুগের চিত্রিত কৌলালের গুরুত্ব ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম অনুধাবন করেন। অধুনা চীনা বিজ্ঞানীরাও প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনকার্যে পশ্চাদ্‌পদ নহেন। মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে বর্তমান চৈনিক বিজ্ঞানীরা প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে তৎপর হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াই চৈনিক বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের অতীত সংস্কৃতির নিদর্শনের আবিষ্কার ও অনুশীলনকার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

এমন কি, অস্ট্রেলিয়ায় ও দক্ষিণ এশিয়ার ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশেও জাতীয়তাবোধের সঙ্গেই প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণই উক্ত অনুশীলনকার্যের পথ-প্রদর্শক। কিন্তু বর্তমানে সকল দেশের পণ্ডিতগণই সাজাত্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনকার্যে ব্রতী হইয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণা উল্লেখ্য। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রভূত নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছে। পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকগণই অস্ট্রেলিয়ার অতীত সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনকার্যে তৎপর হইয়াছেন। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই বর্তমান জগতের প্রত্নাশ্মীয় সংস্কৃতির বাহক আদিম মানবকুল অদ্যাপি বিরাজমান। এই পটভূমিতে অস্ট্রেলিয়ায় প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ননিদর্শনের আবিষ্কার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র হইতেও মানবসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জাভা অঞ্চলেই 'পিথিক্যান্‌-থ্রোপাস্' নামক মানব প্রজাতির জীবাশ্ম সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানাবিধ উপকরণ আবিষ্কৃত

হইবার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পশ্চিম এশিয়া-ভূখণ্ডের অনুরূপ এতদঞ্চলও সম্ভবতঃ মানবসংস্কৃতির অগ্রগতির প্রারম্ভিক পদক্ষেপ-ক্ষেত্র ছিল—অর্থাৎ খাদ্য-উৎপাদনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

পশ্চিম এশিয়া-ভূখণ্ডই পৃথিবীর প্রাচীনতম মানবসভ্যতার কেন্দ্রস্থল। আরব, ইরাক, প্যালেস্টাইন্ প্রভৃতি দেশে বাস্তব নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণই মানবসংস্কৃতির উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত রূপায়ণের যথার্থ উপাদান পরিবেশন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। ইউরোপের ও আমেরিকার অধিকাংশ সংগ্রহশালা পশ্চিম-এশিয়া ভূখণ্ড হইতে আবিষ্কৃত পুরাকীর্তির নিদর্শন দ্বারা পরিপুষ্ট। কিন্তু অধুনা নবজাগরণ ও সাজাত্যবোধ সঞ্চারণের ফলে প্রতি দেশের মনীষিগণ প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনকার্যে তৎপর হইয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণই আফ্রিকা মহাদেশের প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলন আরম্ভ করেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম মানব-প্রজাতির জাবাশ্ম এবং সংস্কৃতির নিদর্শনরাজি পাশ্চাত্ত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ-গণেরই আবিষ্কার। এই প্রসঙ্গে বিদগ্ধ প্রত্নবিদ্ পেট্রির অবদান চিরস্মরণীয়। মিশরের নবজাগরণ ও স্বাদেশিকতাবোধ সংক্রান্ত চেতনাও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের আবিষ্কারের সহিত বিজড়িত।

ভারত উপ-মহাদেশেও জাতীয় অনুপ্রেরণা ও স্বাদেশিকতাবোধ সঞ্চারণে প্রত্নবিজ্ঞানের অবদান উল্লেখযোগ্য। পরাধীন ভারতবর্ষেও পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণের প্রচেষ্টাতেই ভারততত্ত্বের সাধনার সূত্রপাত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ভারতবর্ষে প্রত্নতত্ত্বীয় অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন ও উৎখনন আরম্ভ হয়। প্রথমে, প্রিন্সেপ, কানিংহাম, বেগলার, প্রভৃতি মনীষিগণের একনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসার ফলে আবিষ্কৃত লেখ, ভাস্কর্য ও অপর কারুশিল্প নিদর্শনের ভিত্তিতেই প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত-রূপায়ণকার্য দ্রুত অগ্রসর হয়। প্রত্ন-তত্ত্বীয় আবিষ্কারই ভারতবাসিগণের মধ্যে নব চেতনা সঞ্চারিত করে।

ভারতীয় সংস্কৃতির আবিষ্কৃত অমূল্য প্রত্ননিদর্শনরাজি ভারতবাসীকে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে। ভারতবাসিগণ প্রণিধান করিতে আরম্ভ করে যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা পৃথিবীর অপর সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বিদগ্ধ প্রত্নবেত্তা মার্শালের প্রচেষ্টায় প্রত্নবিজ্ঞানের সাধনা অধিক প্রসার লাভ করে। এই সময় হইতেই ভারতীয় মনীষিগণ প্রত্নতত্ত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

বহুদিন যাবৎ বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরম্ভকাল বহির্জগত হইতে আর্য-আগমনের সহিতই জড়িত। প্রাচীন মিশরের ও মেসোপটেমিয়ার অনুরূপ সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কিত তথ্য ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মহেঞ্জো-দারো নামক প্রত্নক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অভূতপূর্ব প্রত্ন-নিদর্শনরাজি বর্তমান জগতের যুগান্তকারী আবিষ্কার। মহেঞ্জোদারোর চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং প্রাচীন মানবসভ্যতার অন্যতম কেন্দ্ররূপে ভারতবর্ষের দাবি বাস্তব ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রথমে প্রতিপাদন করিতে সচেষ্ট হন যে, সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্র মেসোপটেমিয়ার দানেই সম্ভবপর হইয়াছিল। অর্থাৎ, মেসো-পটেমিয়ার সভ্যতাই সিন্ধু সভ্যতার প্রকৃত উৎস। এমন কি, মহে-ঞ্জোদারোকে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার উপনিবেশ রূপেও গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু অধুনা উৎখনন-বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, সিন্ধু সভ্যতা একান্তভাবে ভারতীয়। ভারত-ভূমিতেই সিন্ধু সভ্যতার জন্ম। সিন্ধু সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি ভারত উপ-মহাদেশেই সাধিত হইয়াছে। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার সমগ্র ভারতবাসীকে এক নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বর্তমান ভারত উপ-মহাদেশের অধিবাসিগণ সিন্ধু সভ্যতার গর্বে গরীয়ান। ভারত-বাসিগণ আজ গর্বিত যে, ভারতবর্ষও মানবসভ্যতার জন্মভূমি।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-বিভাগের ফলে সিন্ধু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রদ্বয় (মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা) নব রাষ্ট্র পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। সমগ্র ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ চেতনার উৎস মহেঞ্জো-দারো ও হরপ্পা বর্তমানে ভারতবহির্ভূত। এই জাতীয় অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ভারতীয় প্রত্নবিদ্গণ মূল ভারতখণ্ডে সিন্ধু সভ্যতার ম্রিয়মান প্রত্নক্ষেত্রের অনুসন্ধানকার্যে তৎপর হইলেন এবং অনতি কালের মধ্যেই সিন্ধু সভ্যতার একাধিক প্রত্নক্ষেত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। উৎখননের ফলে মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার সমরূপ সভ্যতার অভূতপূর্ব নিদর্শনও ভারতভূমির প্রত্নক্ষেত্রসমূহে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ, রূপার, লোথাল, কালিবঙ্গা প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রের নাম উল্লেখ্য। লোথাল ও কালিবঙ্গা প্রত্নক্ষেত্রদ্বয়ের আবিষ্কৃত নিদর্শন-রাজির তাৎপর্য মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার নিদর্শন হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে। উপরন্তু অনেক বিষয়ে উক্ত প্রত্নক্ষেত্রদ্বয় হইতে আবিষ্কৃত নিদর্শন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি, কালিবঙ্গা হইতে পাকিস্তানের কোট-ডিজি প্রত্নক্ষেত্রের অনুরূপ প্রাক্-হরপ্পা সংস্কৃতির নিদর্শনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্তমান ভারতখণ্ডে লোথাল ও কালিবঙ্গা মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতখণ্ডের বিভিন্নাংশে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনের আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হরপ্পা-সংস্কৃতি কেবলমাত্র সিন্ধু উপত্যকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বস্তুতঃ, হরপ্পা-সংস্কৃতি সুদূর প্রসারিত ছিল। বর্তমান ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত। কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রদ্বয় এশিয়া মহাদেশেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। উৎখনন-বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তান খণ্ডদ্বয়ে একই সংস্কৃতির ধারা অদ্যাপি প্রবাহিত।

জাতীয়তাবোধ সঞ্চারণে উৎখননতত্ত্বের অবদান প্রসঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবোধ বা স্বাদেশিকতা বা স্বরাষ্ট্রীয় চেতনার উদ্দীপনায়

প্রত্নবিজ্ঞান-প্রসূত তথ্যের অপপ্রয়োগ উল্লেখ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানীতে 'প্যান-জার্মানইজম্' এবং 'নরডিক্ইজম্'-এর মতবাদ প্রচারিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে জার্মানগণই জগতের সুসভ্য ও শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁহারাই পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট নরডিক্ নরগোষ্ঠীর সভ্য। সুতরাং সভ্যতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি জার্মানগণ সমগ্র বিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার একমাত্র অধিকারী। গ্যাস-টাপ্ পোজিন্না কর্তৃক প্রচারিত তন্ত্রে এই মতবর্ণন তারস্বরে ধ্বনিত হইয়াছে। পোজিন্না বলিয়াছেন যে, অতীত হইতে বিচ্যুত জাতি মূল-বর্জিত বৃক্ষের অনুরূপ ক্রমান্বয়ে শুষ্ক হইয়া মৃত্যু বরণ করে। প্রত্ন-তত্ত্বীয় উপাদানের ভিত্তিতে মানবসংস্কৃতির ইতিহাসে জার্মানগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি প্রাক্-ইতিহাসতত্ত্বকে বিকৃত করিয়া প্রতিপাদন করিলেন যে, জার্মানগণই মানবসভ্যতার প্রকৃত স্রষ্টা এবং অনুন্নত ও নিকৃষ্ট জাতিসমূহের উপর জার্মান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলেই সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। হাইন্রিক্ হিম্মলের-এর মতে, মানবসভ্যতার ঊষা-লগ্নে জার্মান-জাতির মহত্ত্বের মধ্যেই প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব নিহিত। অধ্যাপক হেরমান শ্নাইডের বলিয়াছেন যে, সভ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান জার্মান ভূখণ্ডেই উদ্ভূত হইয়াছে। অতএব অতীতেও বর্তমান জার্মান-সংস্কৃতির বৈলক্ষণ্যসমূহের বিদ্যমানতা জার্মান-প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের ধারা বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানের মর্মার্থ বিকৃত করিয়াই উক্ত প্রকার উন্নাসিকতাপূর্ণ মতবাদ প্রচার করা সম্ভপর। জার্মানীর অনুরূপ সাম্যবাদী রাশিয়াতেও উক্ত প্রকার উন্নাসিক মতবর্ণন-তন্ত্রের উদ্ভব-প্রসঙ্গ উল্লেখ্য।

প্রত্নতত্ত্বীয় সাধনার ভিত্তিতে রাশিয়ার বিজ্ঞান-বিশারদগণ রুশ-জাতিকে জাতীয়তাবোধে সঞ্চারিত করিয়াছেন। এমন কি, তাঁহারা মানবসংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনকার্যে রুশবাসিগণের অবদানের মহত্ত্ব ও

গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের সাহায্যেই রাশিয়ার প্রত্নবিদ্‌গণ মার্কস্‌তন্ত্রের সমাজবিবর্তনের ধারাকে বাস্তব ভিত্তিতে বিন্যাস করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার প্রত্নবিজ্ঞানী-রাই মার্কস্‌তত্ত্বের সুদৃঢ় ভিতস্তর সংস্থাপন করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয় নাই। এতদ্‌ব্যতীত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা অতীতে প্রতিপাদিত প্রত্নতত্ত্বীয় বিষয়সমূহের ভিন্ন রূপ ও ব্যাখ্যান প্রদান করিতেও সংকোচবোধ করেন না। উপরন্তু উগ্র জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়াই মানবসংস্কৃতির ক্রমবিকাশ নির্ণয়কার্যে রুশবাসি-গণের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনে রুশবিজ্ঞানিগণের অগ্রগম্যতা প্রতিপাদন করিতেও বিজ্ঞানীরা পশ্চাদ্‌পদ নহেন। কিন্তু এই প্রকার অনুশীলন ও প্রচেষ্টা প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানের বিকৃত ব্যাখ্যা দ্বারাই সম্ভবপর। প্রত্নতত্ত্বে উক্ত প্রকার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

গত বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রত্নতত্ত্বীয় অনুশীলনের কার্যক্রমকে স্বজাতীয়ভাবাপন্ন করিবার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। প্রত্ন-বিজ্ঞানকে স্বজাতীয়ভাবাপন্ন করিবার অর্থ, প্রত্নতত্ত্বীয় সাধনার উপ-করণসমূহকে বিকৃত এবং বিজ্ঞানচ্যুত করা। অধুনা এই জাতীয়-ভাবাপন্ন করিবার প্রচেষ্টার সঙ্গেই জগৎবাসীর মধ্যে আন্তর্জাতীয়তাবোধ সঞ্চারণের তৎপরতাও লক্ষণীয়। বর্তমানে আঞ্চলিক এবং স্বজাতীয় আনুগত্য স্বীকার করিয়াই আন্তর্জাতিক মানবসমাজের অঙ্গীভূত হইবার ভাবধারা সঞ্চারণের প্রচেষ্টা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মানবসংস্কৃতির অবিকৃত ইতিবৃত্তই সামাজিক সংহতির প্রকৃত মাধ্যম। সুতরাং আন্তর্জাতিক মানবসমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত নিখিল বিশ্ব-মানবসংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাসের রূপায়ণ একান্ত প্রয়োজন। আঞ্চলিক সংকীর্ণতাপূর্ণ সংস্কৃতির ইতিবৃত্তের পরিবর্তে নিখিল বিশ্ব-মানবসমাজের ইতিহাস রূপায়ণ করিতে হইবে। এই নিখিল বিশ্ব-মানবসংস্কৃতির বিমূর্ত ইতিবৃত্তের রূপায়ণ অতীব দুরূহ

কার্য। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্নাংশে নবজাগরণ সঞ্চারিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, প্রযুক্তি বিদ্যার অসাধারণ সফলতা এবং সমাজতন্ত্রবাদের সহিত এই নবচেতনা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান পৃথিবী কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ঐকান্তিকভাবে নিরত মানবগোষ্ঠীর অধিবাসক্ষেত্র নহে। বৈজ্ঞানিক ও সমাজদর্শনের ভাবধারা পাশ্চাত্য সমাজের কাঠামোকেও আমূল পরিবর্তন সাধন-করিয়াছে। নব চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ মানবসমাজের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী। এই উদীয়মান মানবসমাজের অংশীদারত্ব কেবলমাত্র বিভিন্ন আঞ্চলিক সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। কতিপয় বৎসর পূর্বে যাহারা প্রাগৈতিহাসিক এবং নিরক্ষর সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহারাও বর্তমানে নিখিল বিশ্ব-মানবসমাজের সক্রিয় সদস্যরূপে স্বীকৃত। কিন্তু পৃথিবীর অনেক মানুষ সুপরিচিত মানবসভ্যতার-সহিত সংযুক্ত নহে। সুতরাং নিখিল বিশ্ব-মানবসংস্কৃতির ইতিহাসের নিবেদন কেবলমাত্র তথাকথিত শিক্ষিত জনসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা অসঙ্গত ও অর্থহীন। পৃথিবীর অবহেলিত ও নগণ্য অসংখ্য জন গণের নিকটও উক্ত ইতিহাসের মর্ম নিবেদন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব-মানবসমাজের যথার্থ ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে মানবতত্ত্বভিত্তিক। বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ও সমাজতন্ত্রের পটভূমিতে বিশ্ব-মানবসমাজের গঠন একেবারে অসম্ভব নহে।

প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে আঞ্চলিক সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কারণ, উক্ত ইতিবৃত্ত আঞ্চলিক সংহতির সহায়ক। কিন্তু উগ্র ভাবাপন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির ইতিহাস বিশ্বমানবসমাজ গঠনের পরিপন্থী। উপরন্তু এক আঞ্চলিক সভ্যতার প্রাধান্য অপর অঞ্চলের সভ্যতার বাহকদিগকে বিচ্ছিন্ন করে। মানুষের স্থায়ী বসতি স্থাপনের পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিক বিভাজন আরম্ভ হইবার ফলেই সভ্যতার অভিব্যক্তির পথ উন্মুক্ত হয় এবং আঞ্চলিক সভ্যতা

বিকাশ লাভ করে। কেবলমাত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানব-সংহতির ইতিবৃত্তে নিখিল বিশ্বরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যাযাবর মানুষের জীবন-সংগ্রামের ফলেই খাদ্য-উৎপাদন ও স্থায়ী বসতি-স্থাপন এবং সংস্কৃতির ক্রমোন্নতি ও উৎকর্ষ-সাধন সম্ভবপর হইয়াছে। এই জীবন-সংগ্রামের ইতিবৃত্তই মানব-সমাজের মহাকাব্য। বিশ্বের সকল নরগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি-গোষ্ঠী প্রাগৈতিহাসিক যুগের যাযাবর মানবকুল হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। বিশ্ব-মানবসংস্কৃতির উৎসের ক্রমবিকাশের ও উৎকর্ষের ইতিবৃত্ত-রূপায়ণ সম্পূর্ণভাবে প্রত্নতত্ত্বীয় উপাদানভিত্তিক। উৎখনন দ্বারা আবিষ্কৃত তথ্যপূর্ণ নিদর্শনের ভিত্তিতেই বিশ্ব-মানবসংস্কৃতির বিমূর্ত ইতিহাসের যথার্থ রূপায়ণ সম্ভবপর হইবে।

বর্তমান জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রগত সভ্যতায় স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব স্বীকার্য। কিন্তু প্রত্যেক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই নিখিল বিশ্ব-মানবসমাজের সক্রিয় সভ্যরূপে নিযুক্ত করিতে পারেন। বৃহত্তর মানবসমাজের আনুগত্য স্বীকার আঞ্চলিক সমাজসংহতির পরিপন্থী নহে। বিশ্ব-মানবসমাজ গঠন করিবার নিমিত্ত অধিকতর ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতেই অভিন্ন মানবসংস্কৃতির ইতিহাস-চেতনায় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। প্রত্নতত্ত্বই এই বিশ্ব-ইতিহাস-চেতনা জাগরণের একমাত্র সুদৃঢ় ভিত্তি। প্রত্নবিজ্ঞানই বিশ্বের মানবকুলের মধ্যে একত্ববোধ সঞ্চার করিতে সমর্থ। সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বিশ্ব-মানবসমাজের সংহতি স্থাপনের কার্যে প্রত্ন-বিজ্ঞানই একমাত্র প্রোৎসাহক। এই ক্ষেত্রে প্রত্নতত্ত্বের অবদান প্রতিস্বক। প্রত্নবিজ্ঞান বিশ্বের প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করিতে পারে। প্রত্নবিজ্ঞানই বিশ্ববাসীকে শান্তি ও মৈত্রীর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া অভিনব মানবসমাজের সংহতি ও কল্যাণ সাধনকার্যে কৃতকর্মা।

নির্দেশিকা

চিত্র-তালিকা ও পরিচিতি

চিত্র নং ১ (পৃঃ ২১, ২২, ২৮, ৩৮)

রাজবাড়িডাঙা : (ক) প্রত্নক্ষেত্রের সাধারণ দৃশ্যপট—মৃৎস্তূপের সমতল-ক্ষেত্র, পূর্ব দিগ্‌বর্তী প্রাচীর-সদৃশ গচ্ছিত মৃত্তিকা ও সংলগ্ন যদুপুর গ্রাম দৃশ্যমান (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)। প্রত্নক্ষেত্রের অপর দৃশ্যপট—পশ্চিম দিগন্ত কৃষিক্ষেত্রে পরিণত মৃৎস্তূপের নিম্ন জলাভূমি (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)।

(খ) চিরুটীর সংলগ্ন অঞ্চল—ভাগীরথীর পূর্বতন তটের মনোরম দৃশ্যপট : ভাগীরথীর প্রণালী, কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তিত পূর্ব্বতন নদীতট, চলনপথ ইত্যাদি দৃশ্যমান (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)। (গ) ভাগীরথীর পূর্বতন তীরবর্তী উচ্চ দুরারোহ পাহাড়-সদৃশ মৃৎঢিবির দৃশ্যপট : কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধানরত পর্যবেক্ষকদলের সদস্যবৃন্দ (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)।

চিত্র নং ২ (পৃঃ ২৬, ২৮, ৩০)

আকাশ-আলোকচিত্র

ভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রদ্বয়ের আকাশ- আলোকচিত্র : (ক) দক্ষিণ পার্শ্বে বার্লি শস্যের এবং বাম পার্শ্বে ঘন ছায়াযুক্ত খানার নিদর্শন দৃশ্যমান। (খ) উপত্যকায় শস্যের চিহ্ন ও অধিবাস-ক্ষেত্রের নিদর্শন (ওয়েবস্টারের গ্রন্থ হইতে গৃহীত)। (গ) আকাশ-আলোকচিত্রে শস্যবৃদ্ধির নিদর্শনের পরিলেখ—হিওমসের গভীরতা, রাস্তা, দেওয়ালভিত্ত, গর্ত, জঞ্জালখানা, ভিতখাত, ইত্যাদির পরিলেখ। (ঘ) আকাশ- আলোকচিত্রে ছায়াযুক্ত ক্ষেত্রের পরিলেখ : ভূমণ্ডলে সূর্যের কিরণপাতের মান অনুসারে ক্ষেত্রের প্রকৃতি-বিন্যাস—ভূমিতল, নিম্নভূমি,

ঘনছায়া, উর্ধ্বতলাংশ ইত্যাদির পরিলেখ (ওয়েবস্টারের গ্রন্থ হইতে প্রতিলেপিত)। (ঙ) চিরুটী অঞ্চলের নক্শা—চিরুটী স্টেশন্, সংলগ্ন গ্রাম, জিলা-বোর্ডের সড়ক, চলনপথ, রাজবাড়িডাঙা-প্রত্নক্ষেত্রের জলাধার, উৎখনন-ক্ষেত্র প্রভৃতি দৃশ্যমান (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)।

চিত্র নং ৩ (পৃঃ ৪১, ৪২)

কতিপয় উৎখনন-হাতিয়ার (পৃঃ ৪২): (ক) গাঁইতি (বড় ও ছোট), (খ) বেলচা (বড় ও ছোট), (গ) মৃত্তিকা পরিচ্ছন্ন করিবার হাতিয়ার বা টার্ফ-কাটার (ট্রিমার), (ঘ) ছুরিকা, (ঙ) কর্ণিক, (চ) ঝুড়ি, (ছ) তক্তা, (জ) লৌহদণ্ড, (ঝ) হাতুড়ি, (ঞ) দাউলি, (ট) কুড়াল, (ঠ) কোদাল, এবং (ড) শাবল্ (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

চিত্র নং ৪ (পৃঃ ৪১, ৪২, ৪৩)

কতিপয় উৎখনন-সরঞ্জাম: (ক) বড় ও ছোট বাক্স, (খ) দারুনির্মিত বারকোষ, (গ) কাপড়ের থলি ও কুলো, (ঘ) পেরেক (ছোট ও বড়), (ঙ) রজ্জু ও সূতলী, (চ) টাব (ছোট ও বড়), (জ) চিত্রিত ও রঞ্জিত করিবার জন্য রং, (ঝ) কালি, (ঞ) প্রত্নবস্তু পুনর্গঠনের নিমিত্ত রাসায়নিক উপাদান, (ট) প্রত্নবস্তু শোধনের নিমিত্ত রাসায়নিক দ্রবণ, (ঠ) লেবল, (ড) বিবিধ প্রকার ব্রুশ ও তুলি, (ঢ) লেফাফা, (ণ) মই, (ত) পরিমাপ-দণ্ড, (থ) ওলন, (দ) বুদ্বুদ-লেভল, (ধ) নোট-বই, (ন) ছক্-কাগজ সম্বলিত নোটবই, (প) সমতলদর্শকবুদ্বুদ-নিবদ্ধ ত্রিভুজাকার সাধিত্র (চিত্র নং ২৮ খ দ্রষ্টব্য) এবং (ফ) চিত্রাঙ্কনের কাগজ।

জরিপ সংক্রান্ত সরঞ্জাম: (ক) পরিমাপ-ফিতা, (খ) সমবীক্ষণ-যন্ত্র, (গ) কোণমাপক যন্ত্র (থিওডোলাইট), (ঘ) সমতলনির্ণায়ক যন্ত্র (ডাম্পি-লেভল্), (ঙ) পরিমাপ-দণ্ড, (চ) শৃঙ্খল ইত্যাদি।

আলোকচিত্র-গ্রহণের সরঞ্জাম: (১) বিবিধ ক্যামেরা, (২) পরিচ্ছন্ন করিবার হাতিয়ার, (৩) নোটবই, (৪) স্কেল (ছোট ও বড়), (৫) বিবিধ ব্রুশ ইত্যাদি।

চিত্র নং ৫ (পৃঃ ৫১, ৫৩, ৬৪)

বিবিধ প্রকার দেওয়ালের ভিতখাত, স্তম্ভগর্ত ও সাধারণ ভিতখাত

(ক) সাধারণ ভিতখাত—দেওয়াল, ভিতখাত ও ভিত, প্রাক্-দেওয়াল মৃৎস্তর, মেঝ ইত্যাদি। (খ) দেওয়াল, ভিতখাত ও ভিত, প্রাক্-দেওয়াল মৃৎস্তর এবং মেঝ। (গ) দেওয়াল, ভিতখাত, ভিত, প্রাক্-দেওয়াল মৃৎস্তর এবং মেঝ। (ঙ, চ, ছ) বিবিধ স্তম্ভভিত-খাত ও স্তম্ভগর্ত: (ঙ) স্তম্ভভিত-খাতে বিন্যস্ত প্রস্তরখণ্ড, মেঝ, মৃৎমেঝের সমকালীন স্তম্ভ ও গঠনস্তর; (চ) স্তম্ভ-ভিতখাতে বিন্যস্ত প্রস্তরখণ্ড, মেঝ, মেঝোপরি স্তম্ভ, এবং ভগ্নশেষ-স্তর; (ছ) ভিতখাতে আলোড়িত প্রস্তরখণ্ড, মৃৎমেঝ, স্তম্ভালোড়ন-কালীন সম্প্রসারিত গর্ত। (ঘ, ঝ, ঞ) বিবিধ প্রকার ভিতখাত ও দেওয়াল-নির্মাণ: (ঘ) দেওয়াল-ভিতখাত, বিপর্যয়ভুক্ত দেওয়াল (নং ১, নং ২), মেঝ, মেঝোপরি ভগ্নশেষ ও পরবর্তী দেওয়াল নং ২ এবং বিবিধ প্রস্তর; (ঝ) দেওয়াল-ভিত ও ভিতখাত, বিভিন্ন মৃৎস্তর, মেঝ এবং দেওয়াল; (ঞ) প্রস্তর-দেওয়ালের ভিতখাত, বিভিন্ন মৃৎস্তর, প্রস্তর-নির্মিত দেওয়াল এবং মেঝ। এই চিত্রণে নানাবিধ ভিতখাত-খনন, দেওয়াল-নির্মাণ, মেঝ-নির্মাণ ইত্যাদি দৃশ্যমান। (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

চিত্র নং ৬ (পৃঃ ৫৭, ৫৮)

মৃৎতাল ও প্রস্তর-নির্মিত দেওয়াল: (ক) হরপ্পা প্রত্নক্ষেত্রের মৃৎতাল-নির্মিত সুবৃহৎ প্রাচীর-দেওয়াল (হুইলারের গ্রন্থ হইতে গৃহীত); (খ-ঘ) তক্ষশিলা প্রত্নক্ষেত্রের বিবিধ প্রকার প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্মিত দেওয়াল। (মার্শালের গ্রন্থ হইতে গৃহীত)।

চিত্র নং ৭ (পৃঃ ৫৯, ৬০, ১৩১)

রাজবাড়িডাঙা প্রত্নক্ষেত্রের একাধিক পর্যায়ভুক্ত অনাবৃত ইষ্টক-নির্মিত সৌধ নিদর্শনের সাধারণ দৃশ্য: (ক) প্রাঙ্গণ, সিঁড়ি, সমতল মেঝ, মেঝোপরি নির্মিত জল-নিষ্কাশন-নালা সম্বলিত আবেষ্টন-দেওয়াল, সিঁড়ির পূর্ব ও

পশ্চিম পার্শ্বে বৃত্তাকার স্তূপভিত্তি এবং স্তূপভিত্তির উপার-নির্মিত পরবর্ত যুগের দেওয়াল। এই চিত্রণে ত্রিপর্যায়ভুক্ত সৌধের নিদর্শন দৃশ্যমান— (১) প্রাঙ্গণ, সিঁড়ি এবং বৃত্তাকার স্তূপভিত, প্রথম পর্যায়ভুক্ত (পর্যায় III), (২) বৃত্তাকার স্তূপভিত্তির উপরি-নির্মিত দেওয়াল, দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত [পর্যায় IV] এবং (৩) মেঝোপরি প্রসরমান দেওয়াল, তৃতীয় পর্যায়-ভুক্ত [V]। দুরমুশকৃত সুরকি ও তদোপরি চুনের পলেস্তারা এবং রক্তাভ প্রলেপন দ্বারা ইষ্টকনির্মিত সৌধশ্রেণী আবৃত ছিল (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)। (খ) একাধিক পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল ও চতুর্ভুজাকার সৌধ : চতুর্ভুজাকার সৌধ ও চুনের পলেস্তারা-সম্বলিত মেঝ এবং পার্শ্বে দ্বিপর্যায়-ভুক্ত দেওয়াল ; চতুর্ভুজাকার সৌধ, মেঝ এবং নিম্নস্থ দেওয়াল একই পর্যায়ভুক্ত (পর্যায় IV); নিম্নস্থ দেওয়ালের উপর পরবর্তী যুগের দেওয়াল (পর্যায় V) নির্মিত হইয়াছিল। উপরিস্থ ও নিম্নস্থ দেওয়ালদ্বয়ের মধ্য-বর্তী গচ্ছিত মৃত্তিকা বিদ্যমান (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)। উভয় চিত্রেই দ্বিপর্যায়-এর দেওয়ালের অন্তর্বর্তী গচ্ছিত মৃত্তিকা দৃশ্যমান।

চিত্র নং ৮ (পৃঃ ৬২)

মহাস্থানীয় প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন-পদ্ধতির খাদবিন্যাস : (ক-খ) চতুষ্পাদী খাদবিন্যাস : (গ) ফালিকৃত খাদবিন্যাস—১, ২, ৩ এবং ৪ খাদ-সংখ্যা।

চিত্র নং ৯ (পৃঃ ৬২, ৬৩)

পূর্ণসমাধি ও খানা : (ক) হরপ্পা প্রত্নক্ষেত্রের অনাবৃত পূর্ণসমাধি— নরকঙ্কাল ও সংশ্লিষ্ট মৃৎপাত্র ; (হুইলারের গ্রন্থ হইতে গৃহীত)। (খ) গর্ত বা খানা—আবর্জনাখানা : মৃৎমেঝ, গর্তে গচ্ছিত সামগ্রী, খানার সামগ্রী ইত্যাদির পরিলেখ। (ওয়েবস্টারের গ্রন্থ হইতে প্রতিলেপিত)।

চিত্র নং ১০ (পৃঃ ৫৯, ১৩১)

রাজবাড়িডাঙা প্রত্নক্ষেত্রের অনাবৃত সৌধ-নিদর্শন : (ক) পঞ্চম পর্যায়-ভুক্ত (V) পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ দিকদ্বয়ে প্রলম্বমান আবেষ্টন-দেওয়াল

এবং উহার পশ্চিম দিকের সংলগ্ন অপর একটি সৌধের নিদর্শন দৃশ্যমান। (খ) ইষ্টকখণ্ড-নির্মিত মেঝ: ইষ্টকখণ্ডের বিন্যাস এবং তদোপরি দুরমুশ-কৃত সুরকি ও চুনের পলেস্তারা দৃশ্যমান। (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)।

(চিত্র নং ১১ (পৃঃ ৭০-৭৫, ৮১-৮৭)

রাজবাড়িডাঙায় উৎখননের সাধারণ দৃশ্য: (ক) অনুভূমিক উৎখনন-ক্ষেত্র ও জালাকার খাদসমূহে খননকার্যেরত কর্মিবৃন্দ; (খ) ঊর্ধ্বাধঃ উৎখনন-ক্ষেত্র ও খাদবিন্যাস। (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

চিত্র নং ১২ (পৃঃ ৭৫-৭৭, ৮১-৮৭)

অনুভূমিক উৎখননের নিমিত্ত জালাকার খাদবিন্যাসের রেখাচিত্র: জালাকার খাদবিন্যাস সংক্রান্ত সকল তথ্য এই রেখাচিত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চিত্র নং ১৩ (পৃ ৭৫-৭৭, ৮১-৮৭)

ঊর্ধ্বাধঃ উৎখননের নিমিত্ত খাদবিন্যাসের রেখাচিত্র। এই রেখাচিত্রে ঊর্ধ্বাধঃ খাদবিন্যাসের সকল প্রকার তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে।

চিত্র নং ১৪ (পৃঃ ১০৬-১০৭, ১২১, ১২৫)

ব্রহ্মগিরি প্রত্নক্ষেত্রে উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত তথ্য-নিদর্শনের রেখা-চিত্রণ: (ক) মহাশ্মীয় ক্ষেত্র-উৎখনন ও চতুষ্পাদ খাদবিন্যাস এবং প্রতি পাদের খননকার্যের দৃশ্য। (হুইলারের গ্রন্থের চিত্রণ হইতে প্রতিলিপিত); (খ) উল্লম্ব ছেদস্তরের রেখাচিত্রণ (হুইলারের গ্রন্থ হইতে প্রতিলেপিত)।

চিত্র নং ১৫ (পৃঃ ৯৫, ৯৬)

ছেদস্তর-চিত্রণ: একক ও একাধিক পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল এবং সংশ্লিষ্ট নিদর্শনরাজির রেখাচিত্র: (ক) ধ্বংসাবশেষ, বসতির ধ্বংসাবশেষ, মেঝ,

দেওয়ালের ভিতখাত প্রভৃতি দৃশ্যমান—ক, খ এবং গ চিহ্নিত দেওয়াল ত্রয়ী সমপর্যায়ভুক্ত। (খ) একই ক্ষেত্রে একাধিক সংস্কৃতি ও দেওয়াল-পর্যায়-ভুক্ত দেওয়াল ও সংশ্লিষ্ট নিদর্শন—বিভিন্ন যুগের লুণ্ঠন-গর্ত, ভিতখাত, মেঝে, ধ্বংসাবশেষ, প্রভৃতি দৃশ্যমান। (কেনিয়নের গ্রন্থে সন্নিবেশিত রেখাচিত্রের অনুকরণে অঙ্কিত)।

চিত্র নং ১৬ (পৃ: ৯৪)

রাজবাড়িডাঙা প্রত্নক্ষেত্রের উৎখননের দৃশ্য: (ক) প্রাক্-উৎখনন-ক্ষেত্র এবং জালাকার খাদবিন্যাস ; পরীক্ষণকার্যেরত উৎখনন-দলের সদস্যাবৃন্দ [চিত্র নং ১১ (খ) এবং চিত্র নং ১২ দ্রষ্টব্য]। (খ) একক খাদে খনন-কার্যে নিযুক্ত খাদতদারক ও শ্রমিকদ্বয়। (গ) অধিক সংখ্যক খাদে খননকার্যেরত কর্মিবৃন্দ। (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

চিত্র নং ১৭ (পৃ: ৯৪)

রাজবাড়িডাঙা: প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন এবং মৃৎস্তর-বিন্যাসের দৃশ্য: (ক) খাদের পশ্চিম ছেদের মৃৎস্তর-বিন্যাসের নির্দেশ-প্রদানেরত খাদতদারক-দ্বয়। (খ) অপর একটি খাদের মৃৎস্তর-বিন্যাসের নির্দেশ-প্রদানরত খাদ-তদারক। (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

চিত্র নং ১৮ (পৃ: ১০৩, ১০৪, ১২২)

স্তরবিন্যাস-নির্দেশিকা: (ক) লেভ্‌লকৃত অপ্রকৃত স্তরবিন্যাসের রেখাচিত্রণ: এই স্তরবিন্যাসে হরপ্পার সীলমোহর, কুষাণ যুগের মুদ্রা এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা সমলেভ্‌লে বিন্যস্ত। সুতরাং ত্রয়ী নিদর্শন একই যুগভুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উক্ত নিদর্শনত্রয় ত্রয়ী যুগভুক্ত। লেভ্‌লকৃত স্তরবিন্যাস ভ্রমাত্মক। (খ) মৃত্তিকাস্তরানুসারে নির্ধারিত স্তরবিন্যাস—ত্রয়ী নিদর্শন (হরপ্পার সীলমোহর, কুষাণ যুগের মুদ্রা এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা) বিভিন্ন কারণবশত: সমলেভ্‌লে বিন্যস্ত অবস্থায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পরবর্তী যুগের লুণ্ঠন-গর্তের ও বৃক্ষগর্তের জন্য ত্রয়ী নিদর্শন সমলেভেলে বিন্যস্ত। কুষাণ যুগের মুদ্রা এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রা বৃক্ষগর্তের ও লুণ্ঠন-গর্তের নিম্নাংশে দৃশ্যমান। সুতরাং উক্ত পুরাবস্তুদ্বয় ভূপতিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র হরপ্পার সীলমোহর যথাস্থানে ন্যস্ত। গচ্ছিত মৃত্তিকা-স্তরানুসারে খনন করিলে উপরি-উক্ত ভ্রম সংশোধন করা সম্ভবপর। (হুইলারের গ্রন্থে সন্নিবেশিত স্তরবিন্যাসের রেখা-চিত্রের প্রতিলিপি)

চিত্র নং ১৯ (পৃঃ ১০৪-৬, ১২১-৫)

বাস্তু-নিদর্শন ও স্তরবিন্যাস : (ক) সৌধধ্বংসাবশেষ ও সংশ্লিষ্ট স্তরায়ণের রেখাচিত্র : এই চিত্রে একাধিক সংস্কৃতি-পর্বের নিদর্শনরাজি পরিস্ফুটাকারে প্রতীয়মান—গ্রাম্য সংস্কৃতি, রাস্তা, একাধিক পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল, মেঝ ইত্যাদি। (খ) দেওয়াল-অনুসরণ পদ্ধতি দ্বারা অনাবৃত দেওয়াল ও অপর নিদর্শনের রেখাচিত্র : এই চিত্র হইতে দেওয়ালের সহিত অপর তথ্য-নিদর্শনের সম্পর্ক নির্ণয় করা সাধ্যাতীত। (হুইলারের গ্রন্থে পরিবেশিত রেখাচিত্রণের প্রতিলিপি)

চিত্র নং ১৯[১] (পৃঃ ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১২৪-৫)

স্তরবিন্যাস ও ছেদস্তর-চিত্রণ : (ক) অভিন্ন মৃৎস্তরের রেখাচিত্র—চিত্র কেবলমাত্র মৃৎস্তরসমূহের বিন্যাস-সম্পর্কিত কতিপয় রেখাসম্বলিত। এই চিত্র হইতে মৃত্তিকাস্তরের বিভিন্ন রূপের ও লোকবসতির কোন প্রকার পরিচয় পাওয়া যায় না। (খ) অজ্ঞেয় মৃৎস্তরের রেখাচিত্র : এই রেখা-চিত্রে মৃৎস্তরের রূপরেখা দুর্জ্ঞেয় এবং লোকবসতির নির্দেশিকার পর্যায় বা পর্ব অজ্ঞেয়। (গ) বোধগম্য মৃৎস্তরের রেখাচিত্র—এই চিত্রে মৃৎস্তরের রূপরেখা সহজবোধ্য। একাধিক পর্যায়ভুক্ত মেঝ ও লোকবসতির যথার্থ নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। (হুইলারের গ্রন্থে সন্নিবেশিত মৃৎস্তরের রূপরেখার প্রতিলিপি)।

চিত্র নং ২০ (পৃঃ ১০৭, ১০৮, ১২২, ১২৫)

রাজবাড়িডাঙার উৎখনন : ছেদস্তর-চিত্রণ ও স্তরবিন্যাস : খাদের পশ্চিম ছেদে বিন্যস্ত মৃত্তিকাস্তরসমূহের রেখাচিত্রণ—বিভিন্ন মৃৎস্তর, ত্রয়ী সংস্কৃতিপর্ব প্রভৃতি চিত্রিত হইয়াছে। (এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে)

চিত্র নং ২০ (পৃঃ ১০৭-৮. ১২২)

রাজবাড়িডাঙার উৎখনন : খাদের উত্তর ছেদের মৃৎস্তরসমূহের রেখাচিত্র—সমচতুষ্কোণিক আলয় ও উহার ভিত, চতুর্থ পর্যায়ের দেওয়াল, মেঝ এবং সংশ্লিষ্ট মৃৎস্তরসমূহ। (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)।

চিত্র নং ২১ (পৃঃ ১২০)

চিরুটী প্রত্নাঞ্চলের নক্শা—চিরুটি (বর্তমান কর্ণসুবর্ণ) স্টেশন। সংলগ্ন গ্রাম, রাজবাড়িডাঙা-ঢিবি, ষ্টেশন হইতে রাজবাড়িডাঙা পর্যন্ত জেলা-বোর্ডের সড়ক, ঢিবির সংলগ্ন জলাধার ও খানা, উৎখননের নিমিত্ত নির্ধারিত ক্ষেত্র, ইত্যাদি। (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)।

চিত্র নং ২২ (পৃঃ ১২০)

রাজবাড়িডাঙা-প্রত্নক্ষেত্রের নক্শা : ঢিবির বহিঃপ্রান্ত ও সমোন্নতি রেখা, পূর্ব ও পশ্চিমাংশে জলাধারদ্বয়, ইষ্টকনির্মিত জলকূপ, উৎখনন-ক্ষেত্র ও খাদবিন্যাস। (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)।

চিত্র নং ২৩ (পৃঃ ১২০, ১২১)

রাজবাড়িডাঙা : উৎখনন-ক্ষেত্রের নক্শা (প্ল্যান্) : বিভিন্ন খাদে একাধিক পর্যায়ভুক্ত সৌধ-নিদর্শন—সৌধ-নিদর্শন ও বিভিন্ন সৌধ-পর্যায় যথাক্রমে আরবীয় ও রোমক সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট। (এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে)।

চিত্র নং ২৪ (পৃঃ ১২১)

রাজবাড়িডাঙার উৎখনন: সৌধমালার বাস্তু-নকশা—বিভিন্ন খাদে অনাবৃত ইষ্টকনির্মিত সমচতুষ্কোণিক চত্বরালয় ও মেঝ, পঞ্চম পর্যায়ভুক্ত আয়ত পরিবেষ্টনী-দেওয়াল, ইষ্টকনির্মিত স্তূপভিতদ্বয়ের উপরে অনুবৃত্ত দেওয়াল, প্রাঙ্গণ, সিঁড়ি, মেঝ, তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত ইষ্টকনির্মিত স্তূপভিত ইত্যাদি (আরবীয় অক্ষর ও সংখ্যা দ্বারা খাদ ও সৌধমালা চিহ্নিত এবং রোমক সংখ্যায় সৌধপর্যায় নির্দিষ্ট)। [এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে]।

চিত্র নং ২৫ (পৃঃ ১২২)

ইষ্টক, খোলামকুচি, ভস্ম এবং মৃত্তিকার প্রতীক-চিহ্ন: (১) পোড়া ইষ্টক; (২) কাঁচা ইষ্টক, (৩) কঙ্করমিশ্রিত শিথিল মৃত্তিকা; (৪) শিথিল মৃত্তিকা; (৫) শক্ত মৃত্তিকা; (৬) শিথিল কর্দম; (৭) শক্ত কর্দম; (৮) ভস্মাকীর্ণ; (৯) কর্দমাক্ত রেখা; (১০) খোলামকুচি; (১১) কঙ্করাকীর্ণ; (১২) বালুকাকীর্ণ; (১৩) ইষ্টক খণ্ড; (১৪) হিউমস্। (হুইলারের গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রতীক চিহ্নের অনুকরণে চিত্রিত)।

চিত্র নং ২৬ (পৃঃ ১২৪)

রাজবাড়িডাঙার উৎখনন: পঞ্চম পর্যায়ভুক্ত দেওয়ালের আনুলম্বিক প্রস্থ-ছেদচিত্রণ—পঞ্চম পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল, জলনিষ্কাশন-প্রণালী, মেঝ, সিঁড়ি, প্রাঙ্গণ; পঞ্চম পর্যায়ের দেওয়ালের নিম্নাংশের মৃত্তিকাস্তর, দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত সুরকি দুরমুশকৃত প্রাঙ্গণ, চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল ইত্যাদি। (চিহ্নিত সৌধ-পর্যায় রোমক সংখ্যায় ও মৃৎস্তর আরবীয় সংখ্যায়)। [এশিয়াটিক্ সোসাইটির সৌজন্যে]।

চিত্র নং ২৭ (পৃঃ ১২১, ১২৬-৭)

রাজবাড়িডাঙার উৎখনন: ছেদস্তরচিত্রণের ও আলোকচিত্র-গ্রহণের দৃশ্য: (ক) ছেদস্তর- চিত্রণকার্যে নিবিষ্ট জরিপকারী এবং তাঁহার সহকর্মী।

(খ) গভীর খাদের আলোকচিত্র গ্রহণকার্যে নিবিষ্ট আলোকচিত্র গ্রহণকারী ও তাঁহার সহকর্মী। (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

চিত্র নং ২৮ (পৃ: ১৩৯, ১৮১)

উৎখনিত খাদ-আবরণকার্যে রত শ্রমিকবৃন্দের দৃশ্য: (ক) উৎখনন-উত্তর অপসারিত মৃত্তিকা দ্বারা খাদসমূহের আচ্ছাদনকার্য চলনকালীন দৃশ্য। (খ) সমতলদর্শক বুদ্বুদ-নিবদ্ধ ত্রিকোণ সাধিত্র। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ পরিমাপ-গ্রহণের সাধিত্র (পৃ: ৪০০ দ্রষ্টব্য; চিত্রণ নং ৪-এ এই সাধিত্রের চিত্র প্রদত্ত হয় নাই। (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

চিত্র নং ২৯ (পৃ- ১৮৪-৮৭)

মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণ-বিন্যাসের রেখা-চিত্র: উৎখননক্ষেত্রের খাদবিন্যাস ও মৃত্তিকাস্তরের সংখ্যামান অনুসারে মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের বিন্যাস।

চিত্র নং ২৯[১] (পৃ: ১৮৪-১৮৭)

মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের দৃশ্য: (ক) খাদ ও মৃত্তিকাস্তরের সংখ্যানুসারে বিন্যস্ত কক্ষসমূহে গচ্ছিত খোলামকুচি; মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের তদারক ও সহকর্মী দণ্ডায়মান; খোলামকুচি ধৌতিকার্যেরত শ্রমিক ও মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের অধিকর্তা খোলামকুচি পরীক্ষণকার্যে নিবিষ্ট। (খ) বিভিন্ন খাদের মৃৎস্তরের সংখ্যানুক্রমিক গচ্ছিত খোলামকুচি, খোলামকুচি ধৌতি কার্যে রত শ্রমিক; মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের অধিকর্তা মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ সংলগ্ন কার্যে নিবিষ্ট এবং তাঁহার সহকর্মী পার্শ্বে দণ্ডায়মান। (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)।

চিত্র নং ৩০ (পৃ: ১৮২)

রাজবাড়িডাঙায় উৎখনন: (ক) দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ পরিমাপ গ্রহণের দৃশ্য: ত্রিকোণ-সাধিত্রের সাহায্যে পরিমাপ গ্রহণকার্যে রত খাদ-তদারক

ও তাঁহার সহকর্মী। (খ) মেঝতলে বিন্যস্ত বৃহদাকার মৃৎপাত্র-উৎখননের দৃশ্য। (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

চিত্র নং ৩১ (পৃঃ ১৬৪)

রাজবাড়িডাঙা উৎখনন: লেখসম্বলিত পোড়ামাটির সীল (1, 1A): হরিণযুগল দ্বারা পার্শ্বদেশবেষ্টিত বেদীর উপরে ডিম্বাকার ধর্মচক্র এবং নিম্নাংশে ছত্রদ্বয়ে লিখিত :

১। শ্রীরক্তমৃত্তিকা-মহাবৈহা-

২। রিকার্য ভিক্ষু-সঙ্ঘস্য।

অর্থাৎ প্রখ্যাত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের মহানুভব ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক পরিবেশিত। সীলের উপরিভাগের হরিণযুগল ও ধর্মচক্র মৃগদাবে (সারনাথ) ভগবান বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচারের প্রতীকরূপে পূজিত। উপরি-উক্ত সীল রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের সরকারী নির্দেশনামা রূপে পরিগণিত। অনুরূপ একাধিক সীল আবিষ্কৃত হইয়াছে। (২) এবং (২A) বিপর্যস্ত চিত্র এবং সুস্পষ্ট চিত্র—গ্রীক অক্ষরে খোদিত সীলমোহর—এই সীলে গ্রীক দেবী হোরার নাম লিখিত আছে। গ্রীক অক্ষরে লিখিত অপর সীলও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রকার সীলমোহরের আবিষ্কার ভারত-রোমক সম্পর্কের পরিচায়ক।

পারিভাষা

অ

অক্রিয় কণা Neutron

অক্সাইড কণা Oxide particles

অঙ্কপট্টি Label

অঙ্গবিন্যাস Texture

অঙ্গারক Carbon

অঙ্গারক—১৪ Carbon—14

অঙ্গারক পরমাণু Carbon atom

অঙ্গারক প্রোটন্ Carbon proton

অঙ্গারীকৃত Carbonized

অজৈব Inorganic

অঞ্চল-নক্শা Regional plan

অধঃ উৎখনন Downward excavation

অধস্তন প্রত্নাশ্মীয় Lower Palaeolithic

অধিকর্তা Director

অধ্যক্ষ (অধীক্ষক) Superintendent (officer-in-charge)

অনুক্রম পর্ব Successive (sequential) periods

অনুক্রমিক Sequent

অনুদৈর্ঘ্য Longitudinal

অণুবীক্ষণ-যন্ত্র Microscope

অনুভবশীল Sensitive

অনভূমিক উৎখনন Horizontal excavation

অন্তঃ সাগরীয় প্রত্নতত্ত্ব (প্রত্নবিজ্ঞান) Submarine archaeology

অন্তঃসাগরীয় প্রত্নতাত্ত্বিক Submarine archaeologist

অন্তর্ভূমি Sub-soil

অন্তঃস্থ চুম্বকত্ব Internal magnetism

অপচ্ছায়া Spectral

অবক্ষয়-আলেপন Preservative application

অবক্ষেপ (অবক্ষেপণ) Deposition of earth by throwing

অভিব্যক্তি Evolution

অম্লজান Oxygen

অরণি প্রস্তর Flint

অশ্মীভূত Fossilised

...শ্মীয় যুগ Stone age (earliest technological period of man ,when tools were made of stone)

অস্তরিত (অস্তরীভূত) Unstratified

অস্তিত্বব্যঞ্জক প্রলম্বিত খাদবিন্যাস Substantive and long trench laying

অস্থি প্রদাহ Inflamation of bone

অস্থি-সমাধি Bone burial

অস্থিসম্বলিত মৃৎপাত্র-সমাধি Burial of urn containing bones

আ

আংশিক শব-সমাধি Fractional burial

আকরিক Ore

আকাশ-আলোকচিত্র Aerial photography

আগ্নেয় গিরি বিস্ফোরণ Volcanic eruption

আগ্নেয় প্রস্তর (কৃষ্ণবর্ণ) Basalt

আদি-ইতিহাস Protohistory (period when history reconstructed from written records has not fully emerged)

আদি-ঐতিহাসিক Protohistoric

আদি-প্লাইষ্টোসিন্ যুগ Proto-pleistocene age

আদিম অধিবাসী Primitive tribe (people)

আদি-মানব প্রজাতি Proto-human species

আদি-সংযুক্তি (ক্তি) Original composition

আন্তঃহিমযুগ Interglacial epoch (a warm interlude between two glaciations)

আবরণ-চিহ্ন Incrustation

আবর্জনা-খানা Pit of debris

আবাসস্থল-উৎখনন Excavation of habitation site

আবাসিক-প্রত্নস্থল Settlement site (habitation site)

আয়তন Area

আয়ত ক্ষেত্রাকার Rectangular

আয়ুধ Implement (tool)

আর্ক-বর্ণালি-লিখন Arc spectography

আল্ফা-কণা Alpha particles

আলেখ্য Drawing (sketch)

আলেখ্য-তত্ত্ব Science of drawing

আলোকচিত্র (প) Photography
আলোকচিত্রকর Photographer

ই

ইমারত Masonry (building, structure)
ইষ্টক বন্ধন Brick bond

উ

উত্তপ্ত নিস্তেজ চুম্বকত্ব-বিশ্লেষণ Heated dormant magnetism analysis
উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ-চিক্কণ-উজ্জ্বল কৌলাল North Indian black-thin and polished ware
উৎখনক Excavator
উৎখনন Excavation
উৎখনন-অধিনায়ক Director of excavation
উৎখনন-আক্রমণ (অভিযান) Expedition for excavation
উৎখননকারী Excavaor
উৎখনন-কৌশল Excavation strategy
উৎখননক্ষেত্র Excavation area
উৎখনন-খাদ Excavation trench
উৎখননতত্ত্ব Science of excavation
উৎখনন-বিজ্ঞান Science of excavation
উৎখনন-বিবরণ Excavation report
উৎখনন-পদ্ধতি Excavation method (technique)
উৎখনন-পরিকল্পনা Excavation planning
উৎখন্তা Excavator
উৎখনিত নিদর্শন Excavated finds (remains)
উদ্ভিদ্‌বিদ্যা Botany
উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ Botanist
উপদংশ ব্যাধি Syphillis
উপপর্ব Sub-period
উৎস্‌পত্তি Transmutation
উপাত্তরেখা Datum line
উল্লম্ব Veritcal
উল্লম্বচ্ছেদ Vertical section

ঊ

ঊর্ধ্ব-অধ:খননকার্য Vertical excavation (digging)
ঊর্ধ্ব-স্তন প্রত্নাশ্মীয় Upper palaeolithic

উর্ধ্বাধঃ Vertical
উর্ধ্বাধঃ আলোকচিত্র Vertical photography
উর্ধ্বাধঃচ্ছেদ Vertical section
উর্বাস্থি Femur

এ

একক প্রলম্বিত খাদ-খনন Extended single trench digging
একক সমাধি Single (individual) burial
এক্সরশ্মি X-Ray
এক্সরশ্মি প্রতিপ্রভ X-Ray fluorescent
এক্সরশ্মি প্রতিপ্রভ বর্ণালি X-Ray fluorescent spectrum
এক্সরশ্মি প্রতিপ্রভ বর্ণালিমাপক X-Ray fluorescent spectrometer
এক্সরশ্মি বিচ্ছুরণ বিশ্লেষণ X-Ray diffraction analysis
এক্সরশ্মি রেডিওগ্রাফী X-Ray radiography

ঐ

ঐতিহাসিক যুগ Historic period (age)—when the account of man's past is primarily reconstructed from written records—historic period begins with writing
ঐতিহ্য Tradition

ও

ওলন Plumb ball

ক

কক্ষের অস্বাভাবিকতা Eccentricity of the equinox
কঙ্কর Gravel
কণিকা Granule
কণিকাকার দস্তা Granulated zinc
কবরস্থল Burrow (cemetery)
করোটি Skull
করোটি অস্থির জোড় বা সন্ধিস্থল Suture
করোটিছেদন Trepanning (cutting of a disc of bone from the skull of a living person—a primitive practice for curing insanity, headache, etc)
করোটি-জীবাশ্ম Skull fossil
কর্ণিক Mason's trowel

কর্তন Cutting
কসমিক্-রশ্মি Cosmic Ray
কাঁচখণ্ড Slide।
কারবন-পরমাণু Carbon Atom
কারবন-যৌগিক Carbon compounds।
কার্ণিস Cornice
কীলক Peg।
কীলকাকার বর্ণমালা Cuneiform script (wedge-shaped writing that developed in Mesopotamia)
কুণ্ডলীকৃত নকশাসম্বলিত মৃৎপাত্র Rouletted ware
কুম্ভসমাধি Urn burial (pot burial)
কুরি-বিন্দু Curie point
কুলুঙ্গী Niche (recess or receptacle)
কৃত্রিম বলয়াকার বেড় False ring
কৃষ্ণ-চিক্কণ-উজ্জ্বল-কৌলাল Black, thin and polished (glazed) pottery
কৃষ্ণ এবং লোহিত কৌলাল-সংস্কৃতি Black and red ware culture (a red pottery with black rim and interior—current in India in Iron Age)
কৃষ্ণ সীস ধাতু Graphite
কৃষ্ণ-শুভ্র-আলোকচিত্র Black and white Photography
কেলটিক্ প্রত্নতত্ত্ব Celtic archaeology
কেলটিক্ (সংস্কৃতি) Celtic (culture)
কোণদ্বয়ভেদক Diogonal
কোণমাপকযন্ত্র Theodolite
কোয়াড্রাণ্ট খাদবিন্যাস Quadrant trench laying
কোষ Cell
কৌলাল (মৃৎপাত্র, মৃন্ময় পাত্র) Pottery (earthen ware)
কৌলাল-গাত্র Pottery body
কৌলাল-চক্র Pottery wheel
কৌলাল-পায়ান Kiln
কৌলাল-সহায়ক Pottery assistant
কৌশল Technique (strategy)
ক্যানিব্যালিজম্ (সগোত্রভোজন) Cannibalism
ক্রমবিকাশ Evolution
ক্রমাঙ্কিত পরিমাপদণ্ড Measuring pelo

ক্রান্তি কোণ Obliquity of the ecleptic

ক্রুসিবল্ (ধাতু গলাইবার মৃৎপাত্র) Crucible

ক্ষুদ্র প্রত্নবস্তু-লিপিকারক Small antiquity recorder

ক্ষেত্রমান Extent of area

ক্ষেত্রবর্ধক ক্যামেরা Field Camera

ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ব Field archaeology

ক্ষেত্রীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ Field archaeologist

ক্ষেত্রীয় বীক্ষণাগার Field laboratory

ক্ষেত্রীয় রাসায়নিক Field Chemist

ক্ষেত্রীয় সংগ্রহশালা Site museum

খ

খনি-নির্দেশক (মাইন ডিটেকটর) Mine detector

খনিজ Mineral

খনিজ মোম Paraffin

খরোষ্ঠী Kharosthi (script—once current in North-west India)

খাত (খোদ) Trench

খাতকর্তন Trench cutting

খাদ Dross of metals

খাদ-তদারক Trench supervisor

খাদবিন্যাস Laying out of trenches (trench laying)

খাদ্য-উৎপাদক Food-producer

খাদ্য-উৎপাদয়িতা সমাজ Food-producing society

খাদ্য-সংগ্রহকারী Food-gatherer

খানা Pit (ditch)

খানা-উৎখনন Pit excavation (digging)

খোদিত শিলাফলক (দ্বারা মুদ্রিত) Lithograph

খোলক (আঁশ) Scale

খোলামকুচি (মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ) Sherd (pottery fragments)

গ

গন্ধকাম্ল Sulphuric acid

গন্ধার শিল্প Gandhara art

গলাইবার জন্য মৃন্ময় পাত্র Crucible

গামারশ্মি Gama Ray

গিরিগুহার পলল-বিশ্লেষণ Cave sediment analysis

গিরি মাটিতে রঞ্জিত কৌলাল Ochre coloured waer

গুটিকা Rounded object

গুপ্ত (যুগ) Gupta age (Age covered by rulers of the Imperial Gupta dynasty 4th—6th cent. A.D.)

গুহা-চিত্রণ Cave painting

গেড়ি A species of snails

গোরস্থান Graveyard

গোলাবাড়ি Granary (barn)

গৃহতল (মেঝে) Floor

গ্রাফাইট (সীস ধাতু বিশেষ) Graphite

গ্রামীণ সংস্কৃতি Village culture

গ্রীড্ খাদবিন্যাস Grid trench laying

ঘন চিত্রদর্শক (স্টেরিওস্কোপ) Stereoscope

চতুষ্পাদ খাদবিন্যাস Quadrant trench laying

চতুষ্পাদ পদ্ধতি Quadrant method

চড়াই মৃৎস্তূপ High (elevated and upright) mound

চারুকলা Fine arts

চাঁচিয়া Scraping

চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্ Physician

চিত্রলেখ Graph

চিত্রশালা Repository of paintings (museum of paintings)

চিত্রিত কোলাল Painted pottery

চিত্রিত ধূসর কোলাল (মৃৎপাত্র) Painted grey ware—Paintings on grey pottery found at Hastinapur and other sites of the Gangetic valley—preceded by ochre-coloured ware and followed by Northern Black polished pottery, sometimes associated with the Aryans.

চিরকুট (কাগজের ফালি) Slip

চুনা পাথর Lime stone

চুনের পলেস্তারা Lime plaster

চুম্বক Magnet

চুম্বকন্ Magnetization

চুম্বকত্ব Magnetism

চুম্বকত্ব বিশ্লেষণ Magnetic analysis

চুম্বক-মেরু Magnetic pole

চুম্বকীয় ক্ষেত্র Magnetic field

চোয়াল Jaw

চোলাই করা তরল দ্রব্য Spirit

চৌম্বক-মান-নির্ধারণ-যন্ত্র Proton magnetic metre
চৌম্বক স্থিতি Magnetic location
চৌম্বক ক্ষেত্র (চুম্বকীয় ক্ষেত্র) Magnetic field

ছ

ছক্ কাগজ Graph paper
ছাঁচ Mould
ছাঁচ-মুদ্রিত Moulded
ছাপাঙ্কিত Punch marked
ছায়াযুক্ত প্রত্নস্থল Shadow site
ছেদ Section
ছেদ-কর্তন Section cutting
ছেদস্তর নক্শা (স) Section drawing

জ

জঞ্জালখানা Refuse (rubbish) pit
জনতাবর্ণন Census
জননিবিড়তা Density of population
জম্বীরাম্ল Citric acid
জ্যামিতিক নক্শা Geometrical design
জরিপ Survey
জরিপকারী Surveyor
জরিপকার্য Surveying
জল-কূপ উৎখনন Excavation of well
জলজ প্রাণী Aquatic animal
জলনিষ্কাশন যন্ত্র Water-pump-machine
জলসম Water level
জড় বস্তু Material object
জাদু (যাদু) Magic
জাদুক্রিয়া Magical rite
জালাকার Grid
জালাকার খাদবিন্যাস Grid trench-laying
জীববিজ্ঞানী Biologist
জীববিদ্যা Biology
জীবাশ্ম Fossil
জীবাশ্মনিদর্শন Fossil remains
জীবাশ্মশাস্ত্র-বিশারদ Palaeontologist
জৈব Organic
জ্যোতির্বিদ্যা Astronomy
জ্যোতির্বেত্তা Astronomer

টরিসেলীয় ভ্যাকুয়ম্ (নল)
Torricellian Vacuum (tube)
টাকুবর্ত Spindle whorl

ড

ডিম্বক Ovule
ডিম্বাকার Oval

ঢ

ঢিবি (ঢিপি) Mound
ঢিবি-প্রত্নস্থল Mound-site

ত

তলদেশ Base
তড়িৎ দ্বার Electrode
তাপক্রিয়া (সংক্রান্ত) Thermal
তাপচ্ছায়া (সংক্রান্ত) Spectral
তাপ-প্রতিভা (তাপদ্যুতি) Thermo-luminescence
তাপীয় Thermal
তাম্র তার Copper wire
তাম্রপট্ট Copper plate
তাম্র ফলক Copper plaque
তাম্র যুগ Copper Age
তাম্রাশ্মীয় Chalcolithic
তাম্রাশ্মীয় (যুগ) Chalcolithic age (when copper and bronze were simultaneously used)
তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি Chalcolithic culture
তাম্রাশ্মীয় যুগ-উত্তর সংস্কৃতি Post-Chalcolithic culture
তির্যকলিপি Italics
তুন্দ্রা অঞ্চল Tundra region (treeless region)
তৃণমূলান্তর (তৃণস্তর) Humus
তেজস্ক্রিয় Radio-active
তেজস্ক্রিয় অঙ্গারক-বিশ্লেষণ Radio-active Carbon analysis
তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ Radio-active Isotope
তেজস্ক্রিয়-গবেষণা—Radio-active research
তেজস্ক্রিয়তা Radio activity
তেজস্ক্রিয় ধাতু (ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম্) Urenium and Thorium
তেজস্ক্রিয় ধাতুবিশেষ Urenium
তেল (উচ্চ ঢিবি) Tell (mound formed by the accumulation of earth on a longlived settlement ; term used for mound in Iraq)
তেল-প্রত্নস্থল (ঢিবি) Tell site (mound)
তৈলস্ফটিক Amber
ত্রিভুজ Triangle (three sided)
ত্রিভুজাকার সাধিত্র Three-sided instrument

দলিল Document (record)
দর্শনশাস্ত্র Philosophy
দহন Combustion
দাউলি A kind of cleaver
দিক্‌চক্র Horizon
দুরমুজ (দুরমুষ) Rammer (ramming)
দূরবীক্ষণ যন্ত্র Telescope
দৃশ্যপট View
দৃঢ় সংযোজক দ্রব্য Strengthening chemicals
দেওয়াল-অনুসরণ-পদ্ধতি Follow-the-wall technique
দেওয়াল-আনুলম্বিক ছেদ Section along the wall
দেওয়াল-চিত্র Wall painting
দেওয়ালের মিলনস্থান Wall-joint (bond)
দেওয়াল-পর্যায় Wall-phase
দৈর্ঘ্য খাদ-উৎখনন Extended trench excavation
দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ পরিমাপ Length-breadth-depth measurement; three dimensional measurement
দৈহিক উচ্চতা Stature
দ্বাণুক অক্সাইড Dioxide
দ্রব্য Chemicals

ধাতু-লিখন Metalography
ধাতু-ফলক Metal plate (plaque)
ধাপ Stage (step)
ধূসর কোলাল Grey ware
ধ্বংসস্তূপ Mound of ruins
ধ্বংসাবশেষ Ruins (remains ; relics)
ধ্রুবক Constant

নক্‌শা (সা) Plan (design)
নক্‌শা-অঙ্কন (চিত্রণ) Plan drawing
নক্‌শাকারী Draftsman
নগর প্রত্নস্থল City (town) site
নদীর ধাপ River terrace
নবজাগরণ Renaissance
নবাশ্মীয় (যুগ) Neolithic (age) (when ground stones were used along with cultivation and domestication of animals)

নবাশ্মীয় শস্ত্র Neolithic implements

নবাশ্মীয় সংস্কৃতি Neolithic culture (characterised by the use of ground stone' tools, habitation, cultivation, domestication of animals, etc.)

নরকঙ্কাল Human skeleton

নরকরোটি Human skull

নরগোষ্ঠী Race (ethnic stock)

নরটিস্যু Human tissue

নরবলি Human sacrifice

নরমুণ্ড Human skull

নররক্ত-বিশ্লেষণ Human blood analysis

নিউক্লিও পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা Radio Physics

নিগ্রো Negro (Woolly-haired African race)

নিগ্রো নরগোষ্ঠী Negro race

নিগ্রোয়েড নর-গোষ্ঠী Negroid race

নিবিড়তা Density

নিম্নস্তর Lower level (layer)

নিম্নাভিমুখ-পরিমাপ Downward measurement

নিয়ন্ত্রণ-খাদ Control pit (trench)

নির্দেশজ্ঞাপক অঙ্কপট্টি Ticket bearing numerals for indicating layers

নিষ্পাদক Steppe

নিষ্পেষণ কাগজ Blotting paper

নিস্তেজ চুম্বক Dormant magnet

নৃতত্ত্ব (নৃ-বিজ্ঞান) Anthropology

নৃতত্ত্ববিদ্ (নৃ-বিজ্ঞানী) Anthropologist

পঙ্ক প্রলেপ Slip application

পদক্ষেপ লেভেল Foot level

পদার্থবিদ্যা Physics

পরমাণু Atom

পরমাণু ওজন (ভার) Atomic weight

পরমাণু বিচ্ছুরণ Atomic radiation

পরাগ (পরাগরেণু) Pollen

পরাগযোগ Pollination

পরাগরেণুতত্ত্ব Pollen science

পরাগরেণু বর্ষণ Pollen rains

পরাগ্নিত বায়ু Pollinated wind

পরিখা Moat ditch, trench)

পরিচালক Director

পরিচালনা Conducting (directing)

পরিচ্ছন্ন-কারক হাতিয়ার Trim-cutter
পরিবীক্ষণ Exploration (survey)
পরিবেশ Environment (environ)
পরিমাণাত্মক Quantitative
পরিমাপদণ্ড Scale (measuring pole)
পরিমাপন-গেলাস Measuring glass.
পরিমাপ-ফিতা Measuring tape
পরিসংখ্যানবিদ্ Statistician
পরিস্রুত (পরিস্রুত) জল Distilled water
পরীক্ষণ-খাদ Trial trench
পরীক্ষণ-খাদ উৎখনন Trial trench excavation
পরীক্ষণমূলক খাদ-খনন Trial trench digging
পর্ব Period
পর্যবেক্ষক Explorer (close observer)
পর্যবেক্ষকদল Exploration party
পর্যবেক্ষণ বিবরণী Exploration Report
পর্যায় Phase
পলল Sediment
পললশিলা Sedimentary rock
পলি Alluvium (silt)
পলিমাটি (পলিজ) Alluvial mud (alluvion)
পলেস্তারা Plaster
পশুচর্মলেখ Parchment
পশুপালয়িতা সমাজ Pastoral society
পশু প্রজাতি Animal species
পাউণ্ড (মুদ্রা) Pound
পাদ (এক চতুর্থাংশ) Quadrant
পাদটীকা Foot note
পাদপ Plant
পারদ Mercury
পারিসাংখ্যিক অনুশীলন Statistical analysis
পিতৃতান্ত্রিক Patriarchal
পীতাভ তৈলস্ফটিক Amber
পুরা-উদ্ভিদ্বিদ্যা Palaeobotany
পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্নবিজ্ঞান Archaeology
পুরাতত্ত্ববিদ্, প্রত্নতত্ত্ববিদ্, প্রত্নতাত্ত্বিক Archaeologist
পুরাতত্ত্ব বিভাগ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ Archaeology Depertment
পুরাদ্রব্য, (বস্তু) প্রত্নবস্তু Archaeological finds or objects (antiquities)

পুরাভূগোল-শাস্ত্রবিশারদ Palaeo-geographer

পুঁতি Bead

পুরোহিততন্ত্র Priestcraft

পূর্ণ কবর Complete burial

পৃষ্ঠ (ধরাপৃষ্ঠ, ভূপৃষ্ঠ) Surface (earth)

পেটিকা Packing box

পেট্রোগ্রাফিক্ অনুবীক্ষণ যন্ত্র Petro-graphic microscope

পেরিস্কোপ আলোকচিত্র Peris-cope photograpy

পোড়ামাটি Terracotta

পোড়ামাটির চিত্র-ফলক Terra-cotta plaque.

পোড়ামাটির পুঁতি Terracotta bead

পোড়ামাটির মূর্তি Terrocotta figures

পোয়ান Kiln

পোতাশ্রয় Harbour

পৌর্বাপর্য Sequence (cultural)

প্যারিপ্লাস্টার Plaster of Paris

প্রজাতি Species

প্রতিকৃতি Representation (symbol)

প্রতিচ্ছেদ Intersection (sec-tion)

প্রতিপ্রভ Fluorescent

প্রতিবিম্বন Projection

প্রতিবেদন Report

প্রতীক (চিহ্ন) Symbol

প্রত্যাবর্তিত তুষার Retreatingice.

প্রত্নউদ্ভিদ্‌বিদ্যা Palaeobotany

প্রত্নউদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ Palaeo-botanist

প্রত্নক্ষেত্র Archaebogical site

প্রত্নচুম্বক Archaeo-magnetism

প্রত্নবস্তু লুণ্ঠন Antiqnity hunt-ing

প্রত্ন (পুরা) বস্তু সহকারী Anti-quity assistant

প্রত্নরক্তত্ত্ব Palaeo-seriology

প্রত্নলেখতত্ত্ব Palaeography

প্রত্নস্থল Archaeological site

প্রত্নোদ্ভিদ্‌বিশারদ Palaeo-bota-nist

প্রত্নাশ্মীয় Palaeolithic

প্রধান পরিচালক Chief director

প্রবাহগ্রাহী যন্ত্র Transformer (electric)

প্রযুক্তিবিদ্যা Technology

প্রলম্বিত Extended

প্রলম্বিত খাদবিন্যাস Extended trench-laying

প্রলম্বিত শব-সমাধি Extended burial

প্রস্থচ্ছেদ Section (cross)

প্রস্তর পেষণী Stone grinder

প্রস্তরশাস্ত্র-বিশারদ (শিলাতত্ত্ববিদ্) Petrologist

প্রস্তরীভূত Fossilized

প্রাক্-অক্ষরজ্ঞান-সমাজ Pre-literate Society

প্রাক্-উৎখনন Pre-excavation

প্রাক্-কৌলাল-লেভল Pre-pottery level

প্রাক্-ক্যোটারনারি Pre-quaternary

প্রাক্-মহাশ্মীয় যুগ Pre-megalithic Age

প্রাক্-সিন্ধু সভ্যতা Pre-Indus civilization

প্রাক্-হরপ্পা-সংস্কৃতি Pre-Harappan culture

প্রাকৃতিক গুহা Natural cave

প্রাকৃতিক মৃত্তিকা Natural soil (virgin soil, undisturbed soil)

প্রাগিতিহাস Prehistory (history of man's past before the appearance of writing)

প্রাগৈতিহাসিক Prehistoric

প্রাচীন অক্ষরতত্ত্ব Palaeography

প্রাচীন কাঁচতত্ত্ব Science of old glass

প্রাচীনত্বের চিহ্ন Patination

প্রাচীর চিত্রণ Wall painting

প্রাচীর-বেষ্টিত প্রত্নস্থল Fortified site

প্রাণীবিদ্যাবিশারদ Zoologist

প্রান্তিক রেখাসমষ্টি (হিমবাহের পলিসৃষ্টি) Moraine (Deposition of sand, clay and boulders caused by melting glacier)

প্রার্থনামন্ত্র খোদিত ফলক Prayer formulae inscribed plaque (tablet)

পৌর্বাপর্য Sequence (of culture)

ফলক Tablet (plaque)

ফালি Strip

ফালিকৃত খাদবিন্যাস Strip trenching

ফালিকৃত পদ্ধতি Strip method

ফুটকি-চিহ্নিত গুটি Dice

ফুস্ফুরক Phosphate

ফেরগুসনাইট কেলাস Crystal

ফোটো-সংশ্লেষ Photo-synthesis

বংশানুক্রম Geneology
বংশানুক্রম-তালিকা Geneological table
বক্র আলোক চিত্রণ Oblique Photography
বক্রচ্ছেদ Oblique section
বক্ররেখা Curved line
বন্ধুরতা Unevenness
বর্গক্ষেত্র Square
বর্ণালি Spectrum
বর্ণালি-বীক্ষণ Spectroscope
বর্ণালিমাপক (যন্ত্র) ' Spectrometer
বর্ণালি লেখ Spectrograph, Spectrography
বর্ণালি-লেখী Spectrographic
বহির্মুখ পরিমাপ Outward measurement
বলয়াকার বেড় Ring
বলয়াকার-বেড় বিশ্লেষণ Ring analysis
বাণাগ্র Arrow head
বায়ুমণ্ডল Atmosphere
বাস্তু House (architecture)
বাস্তুগর্ত House pit
বাস্তু নকশা Ground plan
বাস্তু পর্যায় Structural phase
বাস্তু নিদর্শন Architectural remains
বাস্তুবিদ্যা Architectural science (Civil Engineering)
বাস্তুবিদ্যাবিশারদ Architect
বিচ্ছুরণ Diffraction (radiation)
বিদ্যুত-পরমাণু Electron
বিদ্যুতের অক্রিয় বা প্রশমিত কণা Neutron-6
বিদ্যুতের পরামাত্রা Proton
বিবৃতি Report
বিলিখনের চিহ্ন (বিলেখ) Striation (marks)
বীক্ষণাগার Laboratory
বৈদ্যুতিক Electric
বুদবুদ (বুদ্বুদ) Bubble
বুদ্বুদ-স্তর Bubble level
বুরুজ Dome
বেড়চিহ্ন Ring marts
বেড়বেধ Ring depth
বেড়প্রস্থের পরিমাপগ্রহণ-পদ্ধতি Ring breadth measuring method
বৃক্ষকাণ্ডের বলয়াকার-বেড়-বিশ্লেষণ-কৃত কাল নির্ঘণ্ট Dendrochronology (tree-ring analysis)
বৃতি Enclosure

বৃত্তাকার পদ্ধতি Technique of making by beating clay, rings
বেড় Ring
বেলচা Shovel
বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ পদ্ধতি Electric resistivity method
বৈদ্যুতিক প্রবাহগ্রাহী যন্ত্র Transformer
ব্যাপক উৎখনন Large scale (extended) excavation
ব্রঞ্জদণ্ড Bronze rod
ব্রঞ্জ ব্যাধিগ্রস্ত Victim of bronze disease
ব্রঞ্জ যুগ Bronze Age
ব্ল্যাক্-হোয়াইট Black-white (photography)

ভ

ভগ্নশেষ Debris (remains)
ভগ্নাংশ Relics (remains)
ভস্মপাত্র-সম্বলিত সমাধিস্থল Ashes bearing pot burial site
ভাষাগোষ্ঠী Linguistic group
ভাষাতত্ত্ব Philology
ভাস্কর Sculptor
ভাস্কর্য Sculpture
ভিত Foundation
ভিত-খাত Foundation trench
ভিত-খাততল Base of foundation trench
ভিততল Foundation level
ভিতস্তর Foundation layer
ভিত্তি Foundation
ভিত্তিক রজ্জু Datum string
ভিত্তিক রেখা Datum line
ভূগোল Geography
ভূতত্ত্ব, ভূবিদ্যা Geology
ভূতত্ত্ববিদ্, ভূবিদ্যাবিশারদ Geologist
ভূতত্ত্বীয় Geological
ভূতল Underground
ভূপৃষ্ঠ Surface
ভূপৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ Surface exploration
ভূসংস্থান Topography
ভ্যার্ব-বিশ্লেষণ Varve analysis
মধ্যম জলবায়ু Middling climate
মধ্যতন প্রত্নাশ্মীয় Middle palaeolithic
মধ্যাশ্মীয় (যুগ) Mesolithic (the transitional period between Palaeolithic and Neolithic characterised by microliths)
মধ্যাশ্মীয়-নবাশ্মীয় Meso-neolithic
মণিকবিদ্যা Mineralogy
মনস্তত্ত্ববিদ্ (মনোবিৎ) Psychologist

মরিচা Rust
মর্মর প্রস্তর Marble
মহাজাগতিক রশ্মি (বিচ্ছুরণ) Cosmic Ray
মহাবিহার Great monastery
মহাশ্মীয় Megalithic (built with large stones—dolmen, menhir, stone circle, etc)
মহাশ্মীয় কীর্তিস্তম্ভ Megalithic memorial tomb
মহাশ্মীয় প্রত্নস্থল Megalithic site
মহাশ্মীয় সমাধি প্রত্নস্থল Megalithic burial site
মাতৃতান্ত্রিক Matriarchal
মাতৃশাসিত কুল Matriarchate family (clan)
মানবজীবাশ্ম Human fossil
মানবতত্ত্ব Science of man
মানযন্ত্র Metre
মাপাঙ্কিত ফিতা Tape
মায়া সংস্কৃতি Maya culture (culture of a highly civilized people of the same name occupying Yucatan Honduros, Guatemala, etc.)
মুদ্রাতত্ত্ব Numismatics
মূর্তিতত্ত্ব, মূর্তিবিদ্যা Iconography
মৃত্তিকাতাল Clay lump (mud brick)
মৃত্তিকা তাল-লেখ Inscribed clay tablet
মৃত্তিকা বলয় Clay ring
মৃত্তিকা বিজ্ঞান Soil Science
মৃত্তিকাস্তর-বিন্যাস Soil stratification
মৃত্তিকাযুক্ত প্রত্নস্থল Soiled site
মৃৎতত্ত্ববিদ্ Soil scientist
মৃৎপাত্র Earthen ware (pottery)
মৃৎপাত্র খানা Pottery pit
মৃৎপাত্র-নিবন্ধক Pottery recorder
মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণ Pottery-yard
মৃৎপাত্র-সহকারী Pottery assistant
মৃৎফলক, মৃৎসীল Clay seal
মৃৎস্তর Layer
মৃৎস্তূপ Earthen mound
মেরামতকারী Mender
মেরু Pole
মোচাকার Conical
মোচাকার প্রত্নস্থল Conical site

য

যথাবস্থান Locus
যাদুমন্ত্র (জাদুমন্ত্র) Magical spell
যান্ত্রিক গর্তকারক Mechanical drill

রঙিন আলোকচিত্র Coloured photograph
রঞ্জন-রশ্মি X-Ray
রঞ্জন-রশ্মি আলোকচিত্র X-Ray photograph
রন্ধ্রীয় (প্যরাস) Porus
রশ্মি Ray
রশ্মি বিচ্ছুরণ Radiation
রসায়নবিদ্, রাসায়নিক Chemist
রসায়নশাস্ত্র Chemistry
রাসায়নিক উপাদান (দ্রবণ) Chemicals
রাসায়নিক বিশ্লেষণ Chemical analysis
রাসায়নিক ক্ষার Pottash
রেখাফলক Line block
রেডিও-কারবন কালনিরূপণ Radio Carbon dating
রেডিয়াম্ Radium
রৈখিক Linear
রোডেশিয়ান্ করোটি Rhodesian skull (Fossil skull found in Broken Hill—Zambia—Africa—Middle stone Age—30,000 years old)

ল

লক্ষ্য দর্শক View finder
লম্বচ্ছেদ (দীর্ঘচ্ছেদ) Normal longitudinal section
ললিতকলা Fine arts
লাক্ষা-সংমিশ্রিত দ্রবণ Selac solution
লিখনের জন্য ব্যবহৃত পশুচর্ম Parchment
লিথোগ্রাফ Lithograph
লিপি Script (writing)
লিপিতত্ত্ববিদ্ Graphist
লুণ্ঠন গর্ত Robber's trench
লেখ (লেখমালা) Inscription ; Inscribed tablet (Plaque, plate, etc.)
লেখতত্ত্ব Epigraphy
লেখতত্ত্ববিদ্ Epigraphist
লেভল্-সাধিত্র Levelling instrument
লৌহ-অক্সাইড Iron oxide
লৌহ-খনিজ Iron ore
লৌহ যুগ Iron age

শ

শব-কবর Burial
শব-কবর উৎখনন Cemetery (burial site) excavation
শব-কক্ষ Repository of the dead (grave)

শবদাহ-উত্তর কুম্ভ-সমাধি Post-cremation pot burial
শব সমাধি Burial
শবাধার Container of the dead
শবাধার-সমাধি Urn (pot) burial
শবাংশ গচ্ছিত মৃৎপাত্র-সম্বলিত সমাধি-ক্ষেত্র Pot-burial site
শল্য চিকিৎসা Surgery
শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ Surgeon
শস্য কণা Granule
শস্য ফলিত প্রত্নস্থল Crop site
শস্য ভাণ্ডার Granary
শস্য ভাণ্ডার খানা Granary pit
শারীরস্থানবিদ্ Anatomist
শিলাবীক্ষণ Petrography
শিল্পকলা Arts and crafts (crafts)
শৃঙ্খলিত বালতি Chained bucket
শোরাঘটিত অম্ল Nitric acid
শোষণ Absorb
শ্রমিক-প্রধান Mate
শ্রেণিসূচি Corpus
শ্রোণী Pelvis
স্টাকো মুণ্ড Stucco head

স

সংগ্রহশালা Museum
সংখ্যামান-ফিতা Measuring tape
সংবীক্ষণ Search (enquiry)
সংরক্ষণ Preservation (Protection, conservation)
সংরক্ষণকারক দ্রবণ Preservatives
সংস্কারকার্য Repairing
সংস্কৃতি Culture
সংস্কৃতিগোষ্ঠী Culture-group
সংস্কৃতি পর্ব Cultural period
সংস্তর Layer (stratification)
সংস্থাপক চিহ্ন Binding indication
সংযত জলবায়ু Regulated climate
সক্রিয়তা Activation
সগোত্র-ভোজন Cannibalism
সঙ্কর ধাতু Mixed metal
সঙ্কুচিত উৎখনন Restricted excavation
সঞ্চার-পথ Locus
সন্নিকৃষ্ট দৃশ্য Near view
সন্ধিবাত Artheritis
সপুষ্পক Flowering plant
সমচতুর্ভুজাকার খাদ Square trench
সমতল Plane (level)
সমতলদর্শক বুদ্বুদনিবদ্ধ ত্রিভুজাকার হাতিয়ার (সাধিত্র) Graduated triangle with bubble level affixed.

সমতল নির্ণায়ক যন্ত্র Dumpy level
সমতলক্ষেত্র উৎখনন Even (flat) area excavation
সমবীক্ষণ যন্ত্র Levelling instrument
সমাজবিদ্যা Sociology
সমাধি-কুম্ভ Funeral urn
সমাধি-ক্ষেত্র Cemetery area
সমাধি-গর্ত Burial pit
সমাধি-প্রত্নক্ষেত্র Cemetery archaeological area (site)
সমাধি-প্রত্নস্থল (ক্ষেত্র) Cemetery site
সমাধি-প্রত্নস্থল উৎখনন Cemetery site excavation
সমাধি-ভূমি Cemetery area
সমাধি-মন্দির Burial (cemetery) temple
সমাধিস্মৃতি মন্দির Burial memorial shrine
সমাধি-স্তম্ভ Tomb
সমুদ্র-অবক্ষেপ Marine deposit
সমুদ্রতল Sea bed
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতার নির্ধারিত বিন্দু Bench level
সমুদ্র-সমতল Sea level
সমোন্নতি ক্ষেত্র (সমুন্নতি ক্ষেত্র) Contour-field
সমোন্নতি-রেখা Contour
সমোন্নতি-রেখাঙ্কন Drawing of contour lines
সরেজমিন পর্যবেক্ষক Field explorer
সরেজমিন পর্যবেক্ষণ Field exploration
সাগরতল Sea bed
সাগরপৃষ্ঠ, সাগরাঙ্ক Sea level (Sea surface)
সাগরান্তর Deep seacore
সাঙ্কেতিক চিহ্ন Symbols (signs)
সাঙ্কেতিক লিপি Symbolical sign
সামগ্র্য উৎখনন Extensive excavation
সমুদ্র-অবক্ষেপ Sea deposition
সিন্ধু সভ্যতা Indus civilization (civilization that flourished in the valley of the Indus)
সির্কাম্ল Acetic acid
সীমাবদ্ধ উৎখনন Controlled (restricted) excavation
সীমিত পরীক্ষণ-খাদ Restricted trial trench
সীলমোহর Seal
সুমের-এর সংস্কৃতি (সুমেরীয় সংস্কৃতি) Sumerian culture

সুমেরু North Pole
সুমেরীয় সভ্যতা Sumerian civilization
সুরাভাণ্ড Amphora (wine jar)
সুর্মা Antimony
সুদূরপ্রসারিত দৃশ্য Distant view
সূচক Index
সূর্যমণ্ডলস্থ গ্যাস বিশেষ Helium
সূর্যের নভোরশ্মি Cosmic Ray
সৌধ পর্যায় Structural Phase
স্তম্ভ post
স্তম্ভ গর্ত Post-hole
স্তর Stratum (layer)
স্তরবিন্যাস, স্তরায়ণ Stratification
স্তরবিন্যাসতত্ত্ব Science of stratification
স্তরীভূত Stratified
স্তূপ Mound
স্তূপীকরণ পদ্ধতি (প্রণালী) Dumping method
স্থপতিবিদ্যা Civil engineering
স্থাপত্য (বাস্তু) Architecture
স্মরণসাধ্য পদ্ধতি Memory method
স্মৃতি মন্দির Memorial temple (tomb)
স্মৃতিসৌধ Memorial structure
স্মৃতিস্তম্ভ Memorial pillar

হ

হরপ্পা-উত্তর-সংস্কৃতি Post-Harappan culture
হরপ্পা সংস্কৃতি Harappa culture (Chalcolithic culture that flourished at Harappa, Montogomery district, West Pakistan; generic name for the first phase of Indian civilization.
হাতিয়ার Tools (implements)
হালাফীয় সংস্কৃতি Halafian culture (culture represented at Tell Half, Iraq)
হিম-অবতরণ Advancement of glacier
হিমক্রিয়া Glaciation (a period of cold climate during which a large part was covered with ice)
হিমপশ্চাদ্ধাবন Retreat of glacier
হিমপ্রবাহ River of ice
হিমবাহ Glacier (moving river of ice)
হিমযুগ Glacial Age (Ice Age; Several glaciatious make up an Ice Age)
হীলিয়াম পরমাণু Hilium atom
হ্রদ-আবাসস্থল Lake-dwelling

বর্ণান্তরীকরণ

অক্সিজেন Oxygen

অবলিকুউটি অব দি একলিপটিক্ Obliquity of the ecliptic (ক্রান্তিকোণ)

অব্সিডিয়ান্ Obsidian (volcanic glass)

অশুলীয় (অশুলীয়ান্) Acheulean (Pre-historic tool from St. Acheul, (Amiens) France; early Palaeolithic hand-axe culture)

অ্যাটম্ Atom

অ্যান্টিমণি Antimony (সুর্মা)

অ্যাম্ফোরা Amphora (Roman two handled storage jar; plump in shape and narrow mouth-opening; wine jar)

অ্যাম্বার (পীত তৈলস্ফটিক) Amber

অ্যারুন বেরিয়াল্ (শবাধার-সমাধি) Urn burial

অ্যারিটাইন্ Arretine (from Arretium, modern Arezzo in Tuscany, Italy)

অ্যারেটাইন্ (এরিটাইন্. মৃৎপাত্র Arretine ware; a kind of potteryproduced at Arretium to supply the Roman market during second-first centuries B.C and first and second centuries A. D.; it was widely traded in and outside the Roman empire; discovered from Arikamedu, South India)

অশুলীয় (অশুলীয়ান্) Acheulean (Prehistoric tool from St. Acheul, France)

আয়রন এইজ্ Iron age (when iron had mainfest advantage over bronze—following the bronze age)

আরকাইও ম্যাগনিটিজম্ Archaeomagnetism

আর্কিওলজি Archaeology (study of man's past history on the basis of material relics left behind; *Archaeos* (old) + *logos* or *logium* (science or

study) — Archaeology—the science or study of the ancient remains left by man and found in earth, on earth and under water)

আরগন (গ্যাস বিশেষ) Argon

আলফা ও বিটা Alpha and Beta

ইউরেনিয়াম্ (একপ্রকার ধাতব পদার্থ) Uranium

ইণ্ডোইউরোপীয়ান্ Indo-European (relating to a linguistic group—language once spoken over Europe, West Asia and India)

ইলেকট্রন্ অ্যাটম্ Electron atom

ইলেক্ট্রন্ প্রোবিং Electron probing

ইলেক্ট্রোড Electrode

উইলফোর্ড ইউনিট Wilford unit

উর্ম Wurm (the fourth and final Pleistocene glaciation in Alpine Europe)

এক্স্কাভেশন্ Excavation (Scientific and stratified digging for recovering buired objects)

এক্সটেণ্ডেড বেরিয়্যাল্ Extended burial

এক্সটেণ্ডেড সাউণ্ডিং Extended sounding

এক্স্‌টেন্‌ট্রিসিটি অভ দি ইকউনক্স্ Extentricity of the equinox

এরিয়াল ফটোগ্রাফী Areial Photoygraphy (vertical photograph taken from a high level)

এলম্ ট্রি Elm tree

ওভিউল Ovule

কণ্টুর প্ল্যান্ Contour plan (map containing lines representing horizontal contour of earth's surface at given elevation)

কণ্ট্রোল পিট Control pit

কপার ওয়্যার Copper wire

কষ্টিক্ সোডা Caustic soda

কারবন্-ডাইঅক্সাইড Carbon Dioxide

কারবন্ ডেটিং Carbon-dating (dating determined by Radiocarbon analysis)

কারবন্ পরমাণু Carbon atom

কিউনিফরম্ Cuneiform (name of the old script that developed in Mesopotamia and Iran; Cuneiform = Wedge shaped)

কিউন্যাস্ Cuneus

কারপাস্ Corpus
ক্যানিড Canid
ক্যামবাসন্ Combustion
ক্যামেরা Camera
ক্যাল্‌কোলিথিক্ Chalcolithic (copper/bronze and stone ; a stage of culture marked by simultaneous use of copper and stone ; a period of culture between Neolithic and full-fledged Bronze stages)
কোয়াটারনারি (ভূগঠনের চতুর্থ যুগ) Quaternary (Geological era including both Pleistocene and Holocene periods, subsequent to Tertiary ; recent and present day formations)
ক্রশ-সেক্‌সন্ Cross section
ক্রীষ্টমাস্ পুডিং Christmas pudding
ক্রুসিবল্ (ধাতু গলাইবার মৃৎপাত্র) Crucible
ক্লে ভার্ব অ্যানালিসিস্ (মৃৎভার্ব বিশ্লেষণ) Clay varve analysis (study of sediment deposited —determination of the time-span of deposit—one varve per year)
গ্যাস Gas
গাইগার কাউন্টার Geiger Counter (instrument for counting ionizing particles and for measuring radioactivity —named after Hans Geiger, German physicist)
গুঞ্জ Gunz (first major Pleistocene glaciation in the Alps—590000 years before present)
গ্রানিউল Granule
গ্রানিউল্যাটেড জিংক Granulated zinc
গ্রাফাইট (সীস ধাতু) Graphite
গ্রাফিটি Graffiti (figures or inscriptions scratched on rocks, pottery, etc)
গ্রাসহপ্পা (পা)র Grass-hopper
গ্রীড Grid (layout ; division of a site into squares for excavation ; a square trench is dug within each grid square, separated by a baulk from adjacent trenches)
গ্লাসিয়েসন্ (হিমক্রিয়া) Glacia-

tion (a cold climate when the area covered by ice-sheet increased—several glaciations make up Ice Age)

গ্লাসিয়াল্ পিঅ্যারইঅ্যাড (হিমযুগ) Glacial period (the period when the ice-sheet covered area increased; there were several such periods)

চাইনিজ Chinese (of china)

জিন্‌জান্ থ্রোপাস্ (এক প্রকার মানব প্রজাতি) Zinjanthropus (early human species of the genus Australopithecus; remains found at Olduvai (Tanzania) —characterised by massive jaws; nicknamed 'Nut cracker man'; lived 1'75 million years before);

টপোগ্রাফী (স্থান-বিবরণ) Topography

টিস্যু (স্যু) Tissue

টেক্‌সচ্যার (বয়ন) Texture

টেরি সিগিল্লাতা (একপ্রকার কৌলাল) Terrasigillata (Samian ware made in Gaul during the first three centuries of the Christian era; a red ware with glossy surface, plain or decorated—an imitation of the Aerretine Pottery)

টের‍্যাকট্যা প্ল্যাক্ (পোড়া-মাটির ফলক) Terracotta plaque

ট্যারফ্-কাটার Turfcutter

ট্যার-শ্যারি (টারশ্যারি) [ভূগঠনের তৃতীয় পর্যায়] Tertiary (Tertiary —third great geological period; Caenozoic Era—the era of modern life covering last 70,000,000 years; divided into Eocene, Oligocene, Miocene and Pliocene epochs)

ট্রেপেনিং (করোটি ছেদন) Trepanning (cutting a circular area of the head of a living person as a cure for insanity, headache, etc. or to relieve skull-fractures or tumours or to drive out devils outside as practised today by some primitive tribes; many prehistoric and protohistoric skulls bearing clearly cut circular holes

indicating trepanning have been discovered)

ট্রান্সফরমার Transformer

ট্রান্সমিউটেশন্ (রূপান্তর) Transmutation

ডাম্পি লেভল্ Dumpy level (surveying instrument for spirit-levelling in which the line of sight is adjusted to be perpendicular to vertical axis)

ডায়গোন্যাল্ Diogonal

ডিগ্রী (মান) Degree

ডিপ সীকোর (স) Deep sea core

ডেটাম্ লাইন্ (ভিত্তিক রেখা) Datum line (horizontal line fixed for measuring heights and depths)

ডেড্ সী-স্ক্রোল (মরুসাগরের আবর্তিত পাণ্ডুলিপি) Dead sea-scroll (ancient Hebrew, Aramic and Greek manuscripts recovered from the caves at the north-west corner of the Dead sea (Palestine) where they were hidden from the Romans; they are the religious texts of the Essenes (a sect) who dwelt in a monastery at Qumran; many of these texts are of the Old Testament; first discovered in 1947; not less than eleven caves have yielded these texts; older by at least 1000 years than the earliest known Old Testament)*

ডেনড্রো-ক্রোনলজি Dendrochronology (study of the tree-rings for determining dating of archaeological materials)

ডেন্সিটি ডিটারমিনেসন্ Density determination

থারমল্ (তাপীয়) Thermal

থ্যরিঅ্যাম্ (থোরিয়াম্; তেজস্ক্রীয় ধাতু) Thorium

থ্যার্মোলুমিনেসন্স Thermoluminiscence

থ্রি ডিমেনশনল্ Three dimensional

নরডিক্ Nordic (race)

নরদার্ন-ব্লাক-পলিশড-পট্যারি Northern black polished pottery (a fine metallic ware bearing glossy black surface; chara-

eristic of the early historic culture of Northern India dating from c. sixth century B. C.)

নাইট্রিক এ্যাসিড্ Nitric acid

নাইট্রোজেন্ Nitrogen

নিউক্লিও (য়) বম্বার্ডমেণ্ট Neucleo bombardment

নিউট্রন্ Neutron

নিউলিথিক Neolithic (New stone, i.e., ground and polished stone tools made by man; name given to the stage of culture that followed Palaeolithic and Mesolithic stages and characterised by domestication of animals and cultivation of crops (c. 9000—6000 B.C.)

নিকেল Nickel

নেক্রোন্থিয়া Nekronthia (cemetery of Corinth)

পলিনেটেড উইন্ড Pollinated wind

পলিভিনাইল অ্যাসিটেট্ Polyvinyl acetate

পান্‌শ মার্ক্‌ড Punch-marked (coins bearing impressed design; stamping die on material)

পারচম্যাণ্ট Parchment (skin prepared and dressed for writing)

পিগমি (বামন) Pigmy

পেট্রোগ্রাফি Petrography (scientific study of the formation and composition of rocks)

পেলভিস্ Pelvis

পোলেন (পরাগরেণু) Pollen (grains produced in vast quantities by plants)

পটাসিআম্ (রাসায়ণিক ক্ষারবিশেষ) Potassium

প্যাটিনা (চিহ্ন) Patina (marks; incrustation)

প্যাটিনেসন্ Patination

প্যালিও প্যাথলজি Palaeopathology

প্যালিওম্যাগনিটিজম্ Palaeomagnetism.

প্যালিওলিথিক্ Palaeolithic [Old stone; name attributed to the old culture of the Pleistocene epoch—beginning of the emergence of

man and making of the most ancient tools, about 1·75 million years before and ending in about 8300 B. C.; divided into Lower, Middle and Upper characterised by pebble tools, hand-axe, chopper, etc. (Australopithecus), flake tool (Neanderthal man) and blade and burin (Homo Sapiens) respectively]

প্যালিনোলজি Palynology (science of pollen analysis)

প্রোজেক্ট Project

প্রোবিং Probing

প্লাইস্টোসিন্ Pleistocene [Geological period corresponding to the Great Ice Age; comprising four glacial and three inter-glacial episodes (590,000—10250 years before) marked by the appearance of most of the old animal and human species and making of stone tools]

প্লাম্বল Plumb ball

প্ল্যান্ Plan

ফল্‌স্ রিং False ring

ফাইবার Fibre

ফিলটার Filter

ব্যাটারি Battery

ব্যাসাল্ট Basalt

ভল্‌ক্যানিক্ ইরাপসন্—Volcanic eruption

ভার্টিক্যাল্ সেক্‌শন্ Vertical section

ভিউ-ফাইণ্ডার View-finder

ভ্যার্ব Varve

মমি Mummy (enbalmed human body—practised in ancient Egypt)

মলাস্‌ক্যা (শম্বুক জাতীয় প্রাণী) Mollusca

মাইক্রোস্কোপ্ Microscope

মিটার Metre

মিডিল্ প্রস্তাশ্মীয় Middle palaeolithic (stage of culture predominated by flake tool industry)

মিণ্ডল্ হিমক্রিয়া Mindel (glaciation; the second major pleistocene glaciation in the Alps)

মিণ্ডল-রিস্ (হিমক্রিয়া) Mindle-Riss (Interglacial period between second and third

glaciations in Alpine Europe)
মিন্তারাল্যজি (খনিকবিন্তা) Mineralogy
মৃন্ময় পানাধার Earthen wine jar ; Amphora (two handled wine jar of Rome—it is plump in shape and has narrow mouth)
মেকানিক্যাল্ ড্রিল্ Mechanical drill
মেগালিথিক্ Megalithic (monument built of large stones —dolmen, menhir, cromlech, etc.)
মেটালোগ্রাফি Metalography
মেট্রিক্ Metric
মেন্ডার্ (মেরামতকারী) Mender
মেমরি-মেথড Memory method
মেসোলিথিক্ Mesolithic (middle stone age—the period between Palaeolithic and Neolithic ; characterised by the abundance of microliths and an improved way of life preceding farming and stock-rearing)
মোরেন্ (নিদর্শন) Moraine (remains—continuous debris of sand, clay and boulders deposited by the melting glacier)
মৌস্টেরিয়ান্ Mousterian (derived from Le Moustier, France—name given to Middle Palaeolithic culture characterized by flint industry and essociated with the Neanderthal man—*Homo sapiens neanderthalensis*)
ম্যাংগানিজ Manganese
ম্যাগ্ডেলিনিয়ান্ Magdalenian (from La Madeleine in Dordogne, France)
ম্যাগ্ডেলিনিয়ান্ সংস্কৃতি Magdalenian culture (culture distinguished by barbed harpoon, cave art, decorative works on bone, ivory, etc.—Upper Palaeolithic)
ম্যাগনিটিজাইসন্ (চুম্বকন) Magnetization
ম্যাগনিটিক্ ফিল্ড (চৌম্বক ক্ষেত্র) Magnetic field
ম্যাগনিসিয়্যাম্ Magnesium

ম্যাগনেটিক্ লোকেসন্ Magnetic location

ম্যাগনেটিজম্ (চুম্বকত্ব) Magnetism

ম্যাজিক্ Magic

ম্যানডিব্ল্ Mandible

ম্যামাথ্ (হস্তীবিশেষ) Mammoth

ম্যারীন্ ডিপোজিট Marine deposit

রণ্টগেন রশ্মি Rontgen rays (Wilhelm Konrad Von, German Physicist who discovered X-rays—named after him)

রিভার টেরাস্ (নদীর ধাপ) River terrace

রিস্ Riss (Third major glaciation in Alpine Europe)

রিস-উর্ম Riss-wurm (inter-glacial period between the third and fourth glaciations in the Alps)

রেইন্‌ডিয়ার Reindeer

রেডিএসন্ Radiation

রেডিও অ্যাক্টিভিটি Radioactivity

রেডিও অ্যাক্টিভ Radioactive

রেডিয়াম Radium

রোন্‌জেন-রশ্মি Rontgen rays

রোলেটেড্ (মৃৎপাত্র) Rouletted (earthen ware bearing a series of impressed dashes at right angles to the line of progress; produced by the wheel-rotation; ancient pottery found at various sites)

লঙ্গিচ্যুডিনাল্ সেকশন্ Longitudinal section

লাইন্ ব্লক্ Line block

লাইম্ প্লাষ্টার Lime plaster

লাভা Lava

লাভা-রক্ Lava-rock

লিনিয়ার্ (লেখ) Linear (script—used by the Minoans and Mycenaeans of Crete and Greece—name given by the excavator Evans to distinguish it from hieroglyphic writings—Linear A script in Crete not yet deciphered; Linear B deciphered by Ventris in 1952—an early form of Greek writing)

লিথোগ্রাফ্ Lithograph

লেড Lead

লেদার Leather

লেভল্ Level

লেভেল-সাধিত্র Levelling instrument

লো-এস্ Loess (light coloured and fine grained deposition from moraines carried by wind during periglacial conditions)

লোয়ার প্যালিওলিথিক Lower Palaeolithic (characterised by the predominance of core tools, hand-axe, chopper, etc., made and used by the earliest forms of man *Australopithecus and Homo Erectus*)

স্লেজ গাড়ি Slege

স্টাকো Stucco (a composition made of brick dust, lime, clay, stone chips, etc.)

স্ট্রাইঅ্যাসন্ Striation

স্ট্র্যাটিফিকেশন্ (স্তরবিন্যাস) Stratification (ages and limits of different strata or depositions in the rocks or soil following the principle that oldest in date is the deposit at the bottom and latest at the top ; order of deposition of layers, the oldest one being the first deposition ; such a layer must be free from any disturbance ; in case of any disturbance its contents get mixed up)

স্ট্রীপ্-পদ্ধতি Strip method (method used in excavation for investigating a large area for a modest outlay of effort. After the first long trench is dug, the spoil from a second parallel and immediately adjacent one is dumped straight back into it, and so with subsequent trenches. In such an excavation no longitudinal section is obtainable and the site in its entirety cannot be studied)

সনডেজ্-পদ্ধতি Sondage method (restricted deep digging for determining the stratigraphy of a site)

সাইট্ মিউজিয়াম্ Site Museum (Museum established at the excavated site)

সাউণ্ডিং Sounding (probing an archaeological site)
সার্ভে Survey
সিট্রিক অ্যাসিড্ Citric acid
সিল্ভার নাইট্রেট্ Silver nitrate
সী-লেভেল Sea level
সুউচার্ Suture (line of Junction of two bones of skull)
সেডিমেণ্ট Sediment
সেণ্টিমিটার Centimetre
সেমিটিক্ Semetic (linguistic group—languages of Assyria ; Armenian, Hebrew, Finnish, Arabian ; Language of the Semites)
সোডিয়াম্ Sodium
সোয়ান্সকম্ব করোটি Swanscombe skull (site in the lower Thames valley ; fragments of human skull found in association with hand-axe tools—previously held to be the skull of the *Homo-sapiens* ; now held that the skull is non-*Sapiens*)
স্টেরিওস্কোপ্ Sterioscope
স্টোন্ এইজ্ Stone age (oldest technological age when the use of metal was unkówn and when tools were made of stone, wood and bone—stone being prepondering material—divided into three major periods, namely, palaeolithic, mesolithic and neolithic—dates varying from region to region)
স্পিরিট Spirit
স্পেক্ট্রোগ্রাফ্ Spectrograph
স্পেক্ট্রোমিটার Spectrometer
স্পেক্ট্রোস্কোপ Spectroscope
হলোসিন্ Holocene (most recent of the geological periods—the younger part of the Quaternary Era)
হলোসিন্-পর্ব Holocene period
হাইআ্যারোগ্লিফস্ Hieroglyphs (carved writings—earliest Egyptian script deciphered by Champollion in 1822, first introduced in Egypt in C. 3000 B.C and continued in use up to C. 4 A.D)
হাফটোন্ ব্লক্ Halftone block
হারপুন্ (অস্ত্রবিশেষ) Harpoon (a throwing spear of bone or

antler comprising a pointed shaft with backward pointing barbs)

হালাপীয় সংস্কৃতি Halap culture (represented at Halap site, Iraq)

হিউমস্ Humus

হেলেনিষ্টিক্ Hellenistic (pertaining to the Hellenists—Greeks)।

ব্যক্তি-সংস্থা-নাম পরিচিতি

অগষ্টাস্ Augustus (রোম সম্রাট; খৃঃ পূঃ ৬৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দ)

অ্যারিষ্টটল্ Aristotle (গ্রীক্ দার্শনিক; খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২)

অ্যালেন Allen, G. W. G (প্রত্নতত্ত্ববিদ্)

অ্যালেন Allen, Major (বৈজ্ঞানিক)

অ্যাসিরীয়ান্ (এসিরিয়ান) Assyrian (অ্যাসিরীয়ার অধিবাসী)

আগামেমনন্ Agamemnon (আরগসের নৃপতি এবং ট্রয় অভিযানের সেনাপতি)

আরবীয় Arabian (আরবদেশীয়)

আর্য Aryan (ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী প্রাচীন মানবকুল—ভারতবর্ষের বৈদিক সাহিত্যের স্রষ্টা)

অ্যান্টোনি Antony (রোম সেনাপতি ও কন্সাল; খৃঃ পূঃ ৮২-৩০)

অ্যান্থনী Anthony, Clark (প্রত্ন-

অ্যামেনহোটেপ Amenhotep (প্রাচীন মিশরের সম্রাট)

ইনকা Inca (পেরুর প্রাচীন অধিবাসী; আমেরিকা)

ইন্দো-ইউরোপীয় Indo-European (ইউরোপ, পশ্চিম-এশিয়া এবং ভারতবর্ষের প্রাচীনতম মাতৃভাষা)

ইয়ং Young, Thomas (পুরাতত্ত্ববিদ্)

ইয়ং Young, W. J. (বৈজ্ঞানিক; কোলাসতত্ত্ববিদ)

ইঅ্যানথ্রোপস্ Eoanthropus (প্রাগৈতিহাসিক মানবপ্রজাতির নাম; পিল্টডাউন নামক স্থানে উহার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়, বর্তমানে ধোকা বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে।)

ঈভান্‌স্ Evans, Sir Arthur (প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্, ১৮৫১-১৯৪১)

উইলিয়ম্ জোনস্ (Sir) William Jones (প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ এবং এশিয়াটিক্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা)

উলী Woolley, Sir Leonard (প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্, ১৮৮০-১৯৬০)

এইট্‌কেন্ Aitken, M. J. (পদার্থ-বিদ্যাবিদ্)

এট্রাস্‌কান্ Etruscan [এতুরিয়ার (অধুনা টাসক্যানী, ইতালী) প্রাচীন অধিবাসী]

এরিটাইন্ (অ্যারিটাইন) Arretine (ইতালীর অ্যারিটিয়াম্ নামক স্থানে নির্মিত কৌলাল)

এশিয়াটিক্ সোসাইটি Asiatic Society (এশিয়াতত্ত্ব সাধনার বিদ্যাপীঠ; ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোনস্ কর্তৃক কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত)

এস্কিমো Eskimo (উত্তর আমেরিকার আর্কটিক উপকূলের নরগোষ্ঠী)

ওআ্যকলে Oakley, K. K. (প্রত্নতত্ত্ববিদ্)

ওক্লাহোমা বিশ্ববিদ্যালয় Oklahoma University (আমেরিকার পশ্চিম-দক্ষিণ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র—ওকলাহোমা)

ওয়াটার বক্ Waterbolk, H. T. (বৈজ্ঞানিক)

ওয়েবষ্টার Webster, Graham (প্রত্নতত্ত্ববিদ্)

কুষাণ (যুগ) Kushana (age) [উত্তর ভারতে কুষাণ-বংশোদ্ভব নৃপতিদিগের রাজত্বকাল]

কেলটিক্ Celtic (কেল্‌ট্ জাতি বা কেল্‌ট ভাষাভাষী)

ক্যানিংহাম Cunningham, Alexander (প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্; ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সাধনার জনক, ১৮১৪-৯৩))

ক্যাসাল্ Casal, J. M. (প্রত্নতত্ত্ববিদ)

ক্রফোর্ড Crawford, O. G. S (প্রখ্যাত আলোকচিত্রবিদ্—১৮৮৬-১৯৫৮)

ক্লডিয়াস্ Claudius (রোম সম্রাট্—খৃঃ ৪১—৫৪)

ক্লার্ক Clark, J. Grahame (প্রত্নতত্ত্ববিদ)

ক্লিও Clio (আন্তঃসাগরীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্)

গর্ডন Gordon, Alexander

গর্ডন চাইল্ড Gordon, V. Childe (প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্; ১৮৯২-১৯৫৭)

গ্লাইস্‌লের Geissler, Heinrich (জার্মান পদার্থবিদ্যাবিশারদ; ১৮১৪-৭৯)

নোবেল পুরস্কার Nobel Prize (আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল; ১৮৩৩-৯৬ খৃষ্টাব্দ; বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকদিগের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের প্রবর্তক)

পিট রিভার্স Pitt Rivers (General Augustus) [ইংলণ্ডের প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্; খৃ: ১৮২৭—১৯০০]

পুরাণ Purana (ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ)

পেট্রি (পেট্রী) Petrie, Sir Wiliam Mathew Flinders (প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্; খৃ: ১৮৫৩—১৯৪২)

পৌসানিয়াস্ Pausanias (স্পার্টার সেনাপতি ও শাসক)

প্রপাইলাইয়া Propylaea (এথেন্সের নগর দুর্গের প্রবেশদ্বার)

প্রিন্সেপ Prinsep, James (ভারততত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব সাধনার প্রখ্যাত বেত্তা; ভারতবর্ষে 'ফিল্ড আর্কিওলজি' আখ্যা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন)

প্রিয়াম্ Prium (ট্রয়ের শেষ নৃপতি)

প্লুটার্ক Plutarch (গ্রীক দার্শনিক ও জীবনীকোষ লেখক)

প্লেন্ডেরলাইথ Plenderleith, H. J. (বৈজ্ঞানিক)

ফরাসী একাডেমী French Academy (ফরাসী দেশের তত্ত্বসাধনার সংস্থা)

ফার্গুসন্ Fergusson, James (ভারততত্ত্ববিদ্)

ফেয়ার সারভিস Fairservice, W. A. (প্রত্নতত্ত্ববিদ্)

বন্দ্যোপাধ্যায় Bandyopadhyay (Banerjee), R.D. (প্রখ্যাত ভারতীয় ভারততত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ; মহেঞ্জোদারো প্রত্নক্ষেত্রের আবিষ্কারক)

বয়েড Boyd W.C. (জীববিদ্যাবিশারদ্)

বাইবেল Bible (খ্রীষ্টানদিগের ধর্মগ্রন্থ)

বাল্মিকী Balmiki (মহাকাব্য রামায়নের রচয়িতা)

বুদ্ধ Buddha (বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক)

বেকারেল Bekarel

বেগলার Beglar, G. D. (প্রত্নতত্ত্ববিদ্)

বোট্টা Botta, Paul Emiler (ফরাসী উৎখনক)

বোমেরস্ Bohmers, A. (প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্)

ব্যাটে Bate, D. M. A. (বৈজ্ঞানিক)

ব্যাবিলনীয় Babylonian (ব্যাবিলনের অধিবাসী)

ব্যাস Vyasa (মহাভারত রচয়িতা)

ব্রাড্‌ফোর্ড Bradford, John (বৈজ্ঞানিক)

স্থান ও প্রত্নক্ষেত্র নির্দেশিকা

আল্‌পস Alps (সুইজারল্যাণ্ডের গিরিশ্রেণী)
আলাস্‌কা Alaska (উত্তর আমেরিকার রাষ্ট্র)
আলেক্‌জেণ্ড্রি(ন্ত্রি)য়া Alexandria (আলেকজাণ্ডার কর্তৃক নির্মিত বন্দর, মিশর)
আহার Ahar (উদয়পুরের নিকটবর্তী আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, রাজস্থান, মধ্যভারত)
ইউরোপ Europe (মহাদেশ)
ইতালী Italy (দেশ, দক্ষিণ ইউরোপ)
ইথিকা (ইথাকা) Ithaca (Thiaki) (গ্রীসের পশ্চিমে অবস্থিত দ্বীপ)
ইন্দোনেশিয়া Indonesia (দেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া)
ইরাক্ Iraq (দেশ, পশ্চিম এশিয়া, প্রাচীন মেসোপটেমিয়া)
ইরান (পারস্য) Iran (Persia) (দেশ, পশ্চিম এশিয়া)
ইলোরা (এলোরা) Elora (গিরিগুহা, আওরঙ্গাবাদ জিলা, দক্ষিণ ভারত)
ইংলণ্ড England (দেশ, ইউরোপ)
উৎনূর Utnur (প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, রাইচুর জিলা, দক্ষিণ ভারত)
উর Ur (আদি-ঐতিহাসিক প্রখ্যাত প্রত্নক্ষেত্র ; তেল মুকায়ার ; নাসিরিয়ার নিকটবর্তী ; দক্ষিণ ইরাক্)
এজিয়ান্ Agean (ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ—গ্রীস্ ও এশিয়া-মাইনরের মধ্যবর্তী)
এথেন্স Athens (গ্রীসের পিরাইয়াস্-এর নিকটবর্তী অ্যাটিক্ সমতলভূমির বিখ্যাত প্রাচীন নগর ও রাজধানী)
এরাণ Eran (আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র ; সাগর জিলা, মধ্যপ্রদেশ, ভারতবর্ষ)
এরিটিয়াম্ (অ্যারিটিয়াম্) Arretium (বর্তমান আরিজ্জো, তাসকানী, ইতালী)
এরেক্ Erech (সুমেরীয় নগর ; বর্তমান ওয়ার্কা, ইরাক্)
এশিয়া Asia (মহাদেশ)
এশিয়া-মাইনর Asia Minor (এশিয়ার পশ্চিমাংশ, বর্তমান তুরস্ক)
ওসেনিয়া Oceania (প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ)
ওয়াডি-এন-না-টুক্ Wadi-en-natuk (প্রাগৈতিহাসিক গিরিগুহা-প্রত্নক্ষেত্র, প্যালেস্টাইন)
কনস্টান্টিনোপল্ Constantinople (বসপোরাস্-এর তীরবর্তী ; বর্তমান তুরস্কের প্রাচীন রাজধানী)
কর্ণসুবর্ণ Karnasuvarna (বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ; বর্তমান চিরুটি অঞ্চল—মুর্শিদাবাদ জিলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ)

কার্থেজ Carthage (টাইরে-এর উপনিবেশ—টিউনেস-এর নিকটবর্তী ; উত্তর আফ্রিকা)

কালিবঙ্গা (কালিবঙ্গান) Kalibangan (আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র ; গঙ্গা-নগর জিলা, রাজস্থান, মধ্যভারত)

কোট ডিজি Kot Diji (আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র ; মহেঞ্জো-দারোর ২৫ মাইল পূর্বে, সিন্ধু প্রদেশ, পাকিস্তান)

কোণারক Konarak (প্রখ্যাত সূর্যমন্দিরের অবস্থানক্ষেত্র, উড়িষ্যা, দক্ষিণ-পূর্ব ভারত)

কোরিন্থ Corinth (গ্রীক নগর ; গ্রীক সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল, গ্রীস)

কোলন্-লিন্ডেনথাল্ Coln-Lindenthal (নবাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্র, কোলোন, জার্মানী)

কৌশাম্বী Kausambi (ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল ; এলাহাবাদের নিকটবর্তী ; বর্তমান কোশাম, উত্তর-প্রদেশ, ভারতবর্ষ)

ক্যাপাডোকিয়া Cappadocia (এশিয়া-মাইনর-এর প্রাচীন রাজ্য, তুরস্ক)

ক্রীট Crete (আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল, ইরাক্লিয়ন্, এজিয়ান্ দ্বীপ, গ্রীস)

ক্রোম্যাগনন্ Cromagnon (গিরিগুহা, উরজগনে ; ফরাসীর প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল)

খজুরাহো Khajuraho (বিখ্যাত প্রত্নস্থল ; মন্দির ও ভাস্কর্য, ছাতারপুর জিলা, মধ্যভারত)

গন্ধার Gandhara (প্রাচীন রাজ্য ; উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তান ; ইন্দো-গ্রীক ভাস্কর্য ও শিল্পকেন্দ্র)

গিলুণ্ড Gilund (উদয়পুরের নিকটবর্তী আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, রাজস্থান, মধ্যভারত)

গুজরাট Gujarat (প্রদেশ, পশ্চিম ভারত)

গুলমুহম্মদ Gul Muhammad (কোয়েটার নিকটবর্তী প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র ; বালুচিস্তান, পাকিস্থান)

গ্রীমাল্ডি Grimaldi (cave) (বর্তমান মোনাকোর পূর্বদিকে অবস্থিত ; প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র)

গ্রীস Greece (দেশ, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ)

গৌড় Gauda (বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজ্যের নাম, ভারতবর্ষ)

চীনদেশ China (এশিয়া মহাদেশের পূর্ব-দিকস্থ দেশ)

চৌকিয়াঠাঙ্ Choukoutien (পিকিং-এর নিকটবর্তী প্রাগৈতিহাসিক গিরিগুহা, চীনদেশ)

জাপান Japan (এশিয়া মহাদেশের পূর্ব-সীমান্তে অবস্থিত দেশ)

জার্মানী Germany (দেশ, মধ্য ইউরোপ)

জার্মো Germo (কীরকুকের পূর্ব দিকে জাগ্রোস্ গিরিশ্রেণীর প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, ইরাক্)

জেরিকো Jericho (জরডন্ উপত্যকার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, প্যালেস্টাইন্)

টাইবের Tiber (নদী, মধ্য ইতালী)

টেক্সাস্ Texas (আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম রাষ্ট্র)

ট্যাস্‌মানিয়া Tasmania (দ্বীপ; অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত)

ট্রয় Troy (প্রাচীন নগর; এশিয়া-মাইনরের এজিয়ান্ উপকূলে অবস্থিত; বর্তমান ডারডানেল্লেস্-এর নিকটবর্তী হিসারলিক্ ঢিপি, তুরস্ক)

ডেনমার্ক Denmark (উত্তর ইউরোপের দেশ)

তক্ষশিলা Takshasila (বর্তমান ট্যাক্সিলা; প্রাচীন গন্ধার রাজ্যের রাজধানী; রাওয়ালপিণ্ডির নিকটবর্তী, পাকিস্তান)

থেব্‌স্ Thebes (বর্তমান থিবাই; বোয়েসিয়ার প্রাচীন গ্রীক নগর; গ্রীস)

দাক্ষিণাত্য (Deccan) Southern India (বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণস্থ ভূখণ্ড, দক্ষিণ ভারত)

নসস্ Knossos (প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, হেরাক্লীইয়ন-এর নিকটবর্তী, ক্রীট্)

নাচিকুফান Nachikufan (প্রাগৈতিহাসিক গিরিগুহা-প্রত্নক্ষেত্র; উত্তর রোডেসিয়া, মধ্য আফ্রিকা)

নাটুফিয়ান Natufian (প্রাগইতিহাসিক গিরিগুহা-প্রত্নক্ষেত্র—ওয়াডি-অ্যান্-নাটুফ-সুকবা গুহা, প্যালেষ্টাইন)

নাবদাতলী Navdatoli (তাম্রাশ্মীয় প্রত্নস্থল, নর্মদা তীরবর্তী, মধ্যভারত)

নালন্দা Nalanda (প্রখ্যাত বৌদ্ধ প্রত্নক্ষেত্র, বর্তমান বুরগায়ন, রাজগীরের ৬ মাইল উত্তরে, বিহার, পূর্ব ভারত)

নাসিক্ Nasik (প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক গিরিগুহা-প্রত্নক্ষেত্র, মহারাষ্ট্র, পশ্চিম ভারত)

নিয়ান্‌ডার্থাল্ Neanderthal (প্রখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক গিরিগুহা-প্রত্নক্ষেত্র, ডুসেলডর্ফ, জার্মানী)

নীল নদী Nile river (আফ্রিকা মহাদেশের দীর্ঘতম নদী; প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র, মিশর)

নেদারল্যাণ্ড Netherland (উত্তর ইউরোপের দেশ)

নেপল্‌স্ Naples (নগর ও বন্দর, দক্ষিণ-পশ্চিম ইতালী)

নেভাসা Nevasa (প্রাগৈতিহাসিক এবং আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, আহম্মদনগর জিলা, মহারাষ্ট্র, পশ্চিম ভারত)

পণ্ডিচেরী Pondicherry (দক্ষিণ ভারতের প্রদেশ বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত, দক্ষিণ ভারত)

পম্পাই Pompeii (কম্পানিয়ার প্রাচীন নগর, ইতালী; আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের ফলে ভস্মীভূত ও ভূগর্ভস্থ হইয়াছিল)

পাকিস্তান Pakistan (দেশ, ভারত উপ-মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাংশ)

পারস্য Persia (পশ্চিম এশিয়ার দেশ, ইরান)

পার্থেনন্ Parthenon (এথেন্সের এক্রোপলিসের মন্দিরশ্রেণী, গ্রীস)

পাহাড়পুর Paharpur (ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল; প্রাচীন সোমপুর-বিহার, রাজসাহী জিলা, বাংলাদেশ)

পিকিং (মহানগরী) Peking (মহানগরী ও রাজধানী, চীনদেশ)

পিলটুডাউন্ Piltdown (ফ্লেচিঙ্-এর নিকটবর্তী, সাসেক্স, ইংলণ্ড)

পেনসিলভ্যানিয়া Pennsylvania (আমেরিকার মধ্য অ্যাটলান্টিক্ রাষ্ট্র)

পেরু Peru (দক্ষিণ আমেরিকা, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র)

প্যালেস্টাইন্ Palestine (দেশ; ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বপ্রান্তে; পশ্চিম এশিয়া)

প্রাশিয়া Prussia (রাজ্য, উত্তর জার্মানী, ইউরোপ)

ফরাসী (দেশ) France (দেশ পশ্চিম ইউরোপ)

ফিন্‌দেশ Finland (দেশ, উত্তর-পূর্ব্ব ইউরোপ)

ফ্লোরেন্স Florence (টাস্‌ক্যানীর প্রধান নগর, ইতালী)

বনাহিলক্ Bonahilk (প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, ইরাক)

বাইজানটাইন্ Byzantine (কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীন নাম, তুরস্ক)

বাল্‌টিক (ব্যালটিক্) Baltic (উত্তর ইউরোপের স্থলবেষ্টিত সমুদ্র)

বাহেরিন্ Baherin (Bahrain) [পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ উপকূলের দ্বীপ]

বাংলা (বঙ্গদেশ) Bengal (ভারতের পূর্বপ্রান্ত প্রদেশ)

বানস (সংস্কৃতি) Banas (রাজস্থানের নদী; আহার ও গিলুণ্ড প্রত্নক্ষেত্রদ্বয়জাত সংস্কৃতি)

বুরজাহাইম (বুরজাহোম) Burzahom (নবাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্র; শ্রীনগরের নিকটবর্তী; কাশ্মীর, ভারত)

বেলজিয়াম Belgium (উত্তর ইউরোপের রাষ্ট্র)

বেলুচিস্থান Beluchistan (পাকিস্তানের প্রদেশ)

বৈশালী Vaisali (বর্তমান বেসার, বিহার, পূর্ব ভারত)

বোগাজকই (বোঘাজকই) Boghazkoy (হিট্টাইট্‌দিগের রাজধানী; প্রত্নক্ষেত্র, মধ্য তুরস্ক)

বোম্বাই Bombay (পশ্চিম ভারতের নগর-বন্দর, মহারাষ্ট্র, ভারত)

ব্যাবিলন Babylon (প্রাচীন ক্যাল্‌ডিয়ান্ সাম্রাজ্যের রাজধানী, মেসোপটেমিয়া, ইরাক্)

ব্রহ্মগিরি Brahmagiri (প্রত্নক্ষেত্র, চিতলদুর্গ জিলা, মহীশূর, দক্ষিণ ভারত)

ব্রিটেন Britain (ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স্ এবং স্কট্‌ল্যাণ্ড)

ভারত উপমহাদেশ Sub-continent of India

ভারতবর্ষ (ভারত) Bharatavarsha (India) [উপমহাদেশ, এশিয়া]

ভূমধ্যসাগর Mediterranean Sea (দক্ষিণ ইওরোপ ও উত্তর আফ্রিকার মধ্যবর্তী সাগর)

ভেনিস্ Venice (সমুদ্র-বন্দর; উত্তর পূর্ব ইতালী; সংস্কৃতি-কেন্দ্র)

মথুরা Mathura (ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল; তীর্থক্ষেত্র, উত্তরপ্রদেশ, ভারতবর্ষ)

মহীশূর Mysore (প্রদেশ, দক্ষিণ ভারত)

মহেঞ্জোদারো Mohenjodaro (তাম্রাশ্মীয় প্রত্নস্থল, লারকানা জিলা, সিন্ধু প্রদেশ, পাকিস্তান)

ম্যাগ্‌ডেলিন্ Magdelein (ফরাসী দেশের লা-মাডেলেন্ নামক প্রত্নক্ষেত্র)

মাউন্ট ক্যার্‌মেল Mount Carmel (প্রাগৈতিহাসিক গিরিগুহা-প্রত্নক্ষেত্র, প্যালেস্টাইন্)

মাডি (মাডিয়া) Mahdia (কার্থেজ-এর নিকটবর্তী; উত্তর আফ্রিকা)

মিটানী Mitanni (টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রাইটিস্ নদীদ্বয়ের অন্তবর্তী পর্বত-মূলের রাজ্য, ইরাক; ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী)

মিশর Egypt (দেশ, উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকা)

মুর্শিদাবাদ Mursidabad (জিলা, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব্বভারত)

মেক্সিকো Mexico (প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র, আমেরিকা ; মায়া-সংস্কৃতির অধিবাস-ক্ষেত্র)

মেসোপটেমিয়া Mesopotamia (টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রাইটিস্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল ; বর্তমান ইরাকের প্রাচীন নাম)

মৌস্টের Moustier (লে মৌস্টের ডরডগ্নে, ফরাসি দেশ ; প্রাগৈতিহাসিক গিরিগুহা-প্রত্নক্ষেত্র)

রক্তমৃত্তিকা-বিহার Raktamrittika monastery (চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাং কর্তৃক বর্ণিত প্রখ্যাত বৌদ্ধ বিহার ; বর্তমান রাজবাড়িডাঙ্গা প্রত্নক্ষেত্র ; মুর্শিদাবাদ জিলা, পশ্চিম-বঙ্গ)

রত্নগিরি Ratnagiri (ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল, বৌদ্ধ বিহার, কটক্ জিলা, উড়িষ্যা, দক্ষিণ-পূর্ব ভারত)

রাজগৃহ Rajagriha (ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল ; মগধের প্রাচীন রাজধানী ; বর্তমান রাজগীর, পাটনা জিলা, বিহার, পূর্ব ভারত)

রাজঘাট Rajghat (ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল ; বর্তমান বারাণসীর উত্তরে ; উত্তর প্রদেশ, ভারতবর্ষ)

রাজপুতানা Rajputana (বর্তমান রাজস্থান, মধ্যভারত)

রাজবাড়িডাঙা Rajbadidanga (ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল, মুর্শিদাবাদ জিলা, পশ্চিমবঙ্গ ; উৎখননদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রখ্যাত রক্ত-মৃত্তিকা মহাবিহার উক্ত স্থানেই অবস্থিত ছিল)

রাশিয়া Russia (দেশ ; পূর্ব্ব ইউরোপ এবং উত্তর এশিয়া)

রূপার Rupar (আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, পূর্ব পাঞ্জাব, ভারতবর্ষ)

রোডেসিয়া Rhodesia (মধ্য আফ্রিকা ; ব্রোকেন-হিল-জামবিয়া প্রত্নক্ষেত্র)

রোম Rome (টাইবের নদীতীরবর্তী মহানগরী, রাজধানী, ইতালী)

লাস্কাউক্স্ Laskaux (মন্টিগনাক গ্রামের নিকটবর্তী প্রত্নস্থল, ফরাসী দেশ)

লোথাল Lothal (আদি-ঐতিহাসিক তাম্রাশ্মীয় প্রত্নস্থল ; আমেদাবাদ জিলা, গুজরাট, পশ্চিম ভারত)

শ্লীন্ডন্ Slindon (প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, সাসেক্স, ইংলণ্ড)

স্নিদার Schanider (প্রাগৈতিহাসিক গিরিগুহা-প্রত্নক্ষেত্র, ইরাক্)

সারনাথ Sarnath (প্রখ্যাত বৌদ্ধ-ক্ষেত্র, ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল ; বর্তমান বারাণসীর নিকটবর্তী, উত্তর প্রদেশ, ভারতবর্ষ)

সিদিয়া Scythia (কারপাথিয়ান্ ও ডোনের মধ্যবর্তী প্রাচীন অঞ্চল)
সিন্ধু উপত্যকা Indus valley
সিন্ধুদেশ Sindh (Sind) [প্রদেশ, পশ্চিম পাকিস্তান]
সিন্ধু নদী Indus river (সিন্ধুনদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উদ্‌গত হইয়া আরব উপসাগরে প্রবাহিত ; ভারত উপ-মহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্র)
সিরিয়া Syria (ভূমধ্যসাগরের পূর্ব-দিকস্থ প্রাচীন দেশ ও রাজ্য ; বর্তমান সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন্)
সিল্‌চেষ্টার Silchestor (ইংলণ্ডের প্রাচীন রোমক সহর)
সীয়ালক্ Sialk [আদি-ঐতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, ইরান (পারস্য)]
সুইজারল্যাণ্ড Switzerland (মধ্য ইওরোপের দেশ)
সুইডেন Sweden (পূর্ব স্ক্যাণ্ডানা-ভিয়ার দেশ, ইওরোপ)
সুমের Sumer (দক্ষিণ মেসোপটা-মিয়ার রাজ্য ; ব্যাবিলন ও পারস্য উপসাগরের শীর্ষভাগ ; ইরাক)
সোয়ান্সকম্বে Swanscombe (কেণ্ট, প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, টেমস্ নদের নিম্ন উপত্যকা ; ইংলণ্ড)
স্পার্টা Sparta (প্রাচীন ডরিক্ রাজ্যের রাজধানী, গ্রীস)
হরপ্পা Harappa [আদি-ঐতিহাসিক (তাম্রাশ্মীয়) প্রত্নক্ষেত্র, মণ্টগোমেরী জিলা, পশ্চিম পাঞ্জাব, পাকিস্তান]
হল্যাণ্ড Holland (নেদারল্যাণ্ড রাজ্য, পশ্চিম ইওরোপ)
হস্তিনাপুর Hastinapur (আদি-ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, মীরাট জিলা, উত্তর প্রদেশ, ভারতবর্ষ)
হারকিউলানেয়াম (হেরকুলানেয়াম) Herculaneum (প্রাচীন নগর, ক্যাম্পানিয়া, ইতালী ; পম্পাই-এর সহিত আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের ফলে ভস্মীভূত ও ভূনিমজ্জিত হইয়াছিল)
হালাফ Halaf (খাবুর নদীর নিকট-বর্তী প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র, ইরাক)
হিসারলিক্ Hissarlik (প্রাগৈতি-হাসিক প্রত্নক্ষেত্র, তুরস্ক)

(ক)

প্রত্নক্ষেত্রের সাধারণ দৃশ্যপট

(খ)

ভাগীরথীর পূর্বতন তটের দৃশ্যপট

(গ)
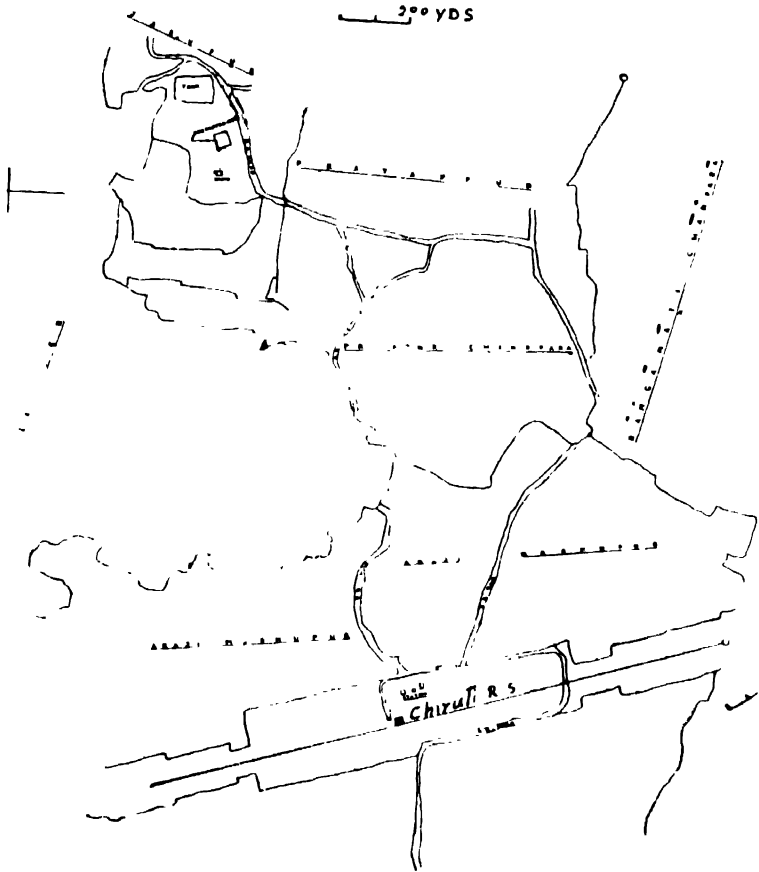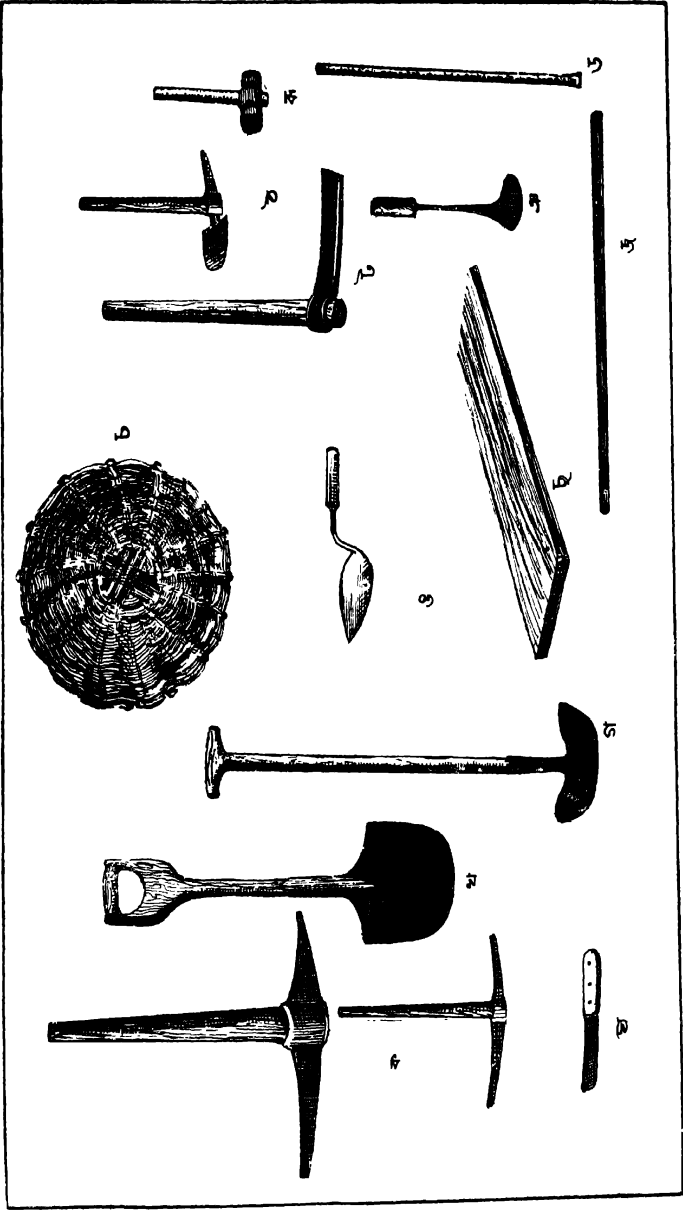
(ক)
শস্য-নিদর্শনের চিত্র

(খ)
উপত্যকায় শস্যের চিত্র

(গ) শস্যবৃদ্ধি-নিদর্শনের পরিলেখ
(ঘ) ছায়াযুক্ত ক্ষেত্রের পরিলেখ

চিরুটী অঞ্চলের নকশা চিত্র নং ১

(৬)

চিরুটী (বর্তমান কর্ণসুবর্ণ) ষ্টেশন্ হইতে রাজবাড়িডাঙ্গা—প্রত্নক্ষেত্র ও সংলগ্ন অঞ্চলের নকশা

চিত্র নং ৩

কতিপয় উৎখননের হাতিয়ার

চিত্র নং ৪

উৎখননের কতিপয় সরঞ্জাম

জরিপ ও আলোকচিত্র-গ্রহণ সংক্রান্ত উৎপাদনের সরঞ্জাম ও সামগ্রী

চিত্র নং ৫

বিবিধ প্রকার দেওয়ালের ভিতখাত, স্তম্ভগর্ত ইত্যাদি

রেখাচিত্র : দেওয়াল, ভিতখাত, স্তম্ভগর্ত প্রভৃতির ঊর্ধ্বাধঃ ছেদস্তর-চিত্র

চিত্র নং ৬

নানাবিধ দেওয়াল

(ক)

(খ ।

(গ)

(ঘ
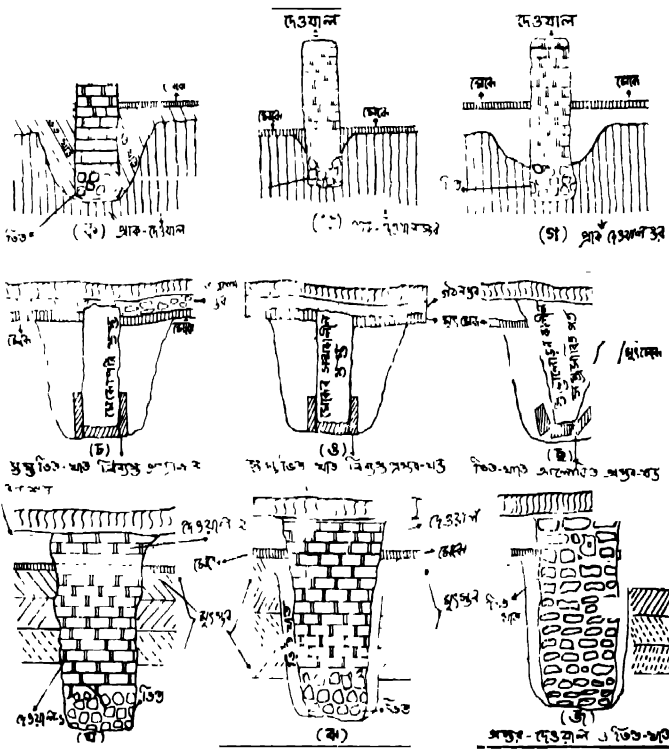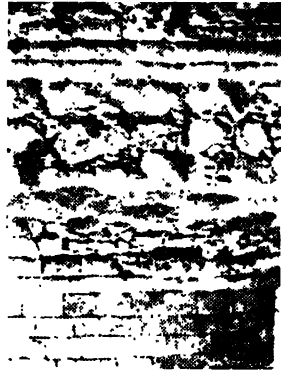
মৃৎতাল ও প্রস্তরনির্মিত নানা প্রকার দেওয়াল
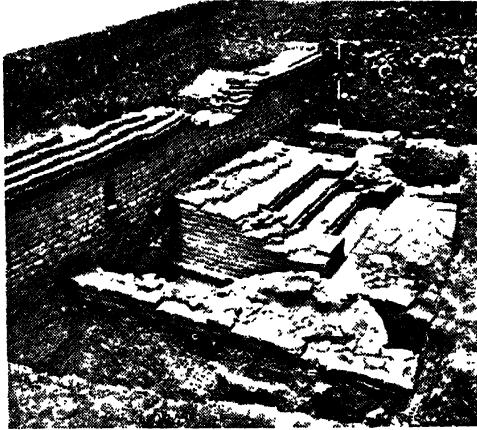
(ক)

একাধিক পর্যায়ভুক্ত ইষ্টকনির্মিত সৌধের নিদর্শন

(খ)

রাজবাড়িডাঙ্গা : (ক) অনাবৃত সৌধনিদর্শনের দৃশ্য ;
(খ) একাধিক পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল ও চতুর্ভুজাকার সৌধের নিদর্শন

চিত্র ন

মহাশ্মীয় প্রত্নক্ষেত্রের উৎখনন-পদ্ধতি
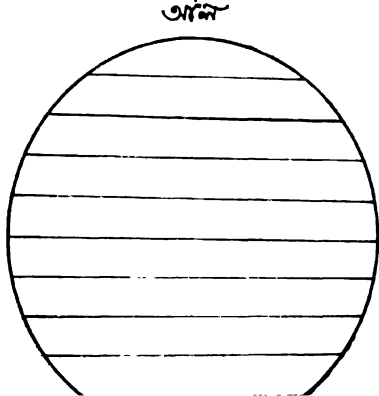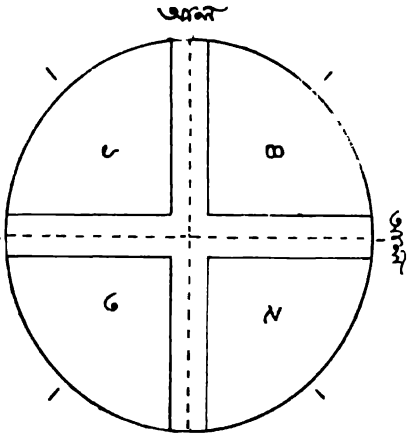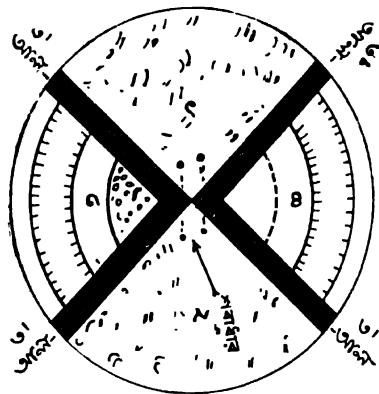
ক এবং খ : চতুষ্পাদ খাদবিন্যাস । গ—ফালিকৃত খাদবিন্যাস—উৎখননের নিমিত্ত ক্রমিক খাদসংখ্যা, ১, ২, ৩,
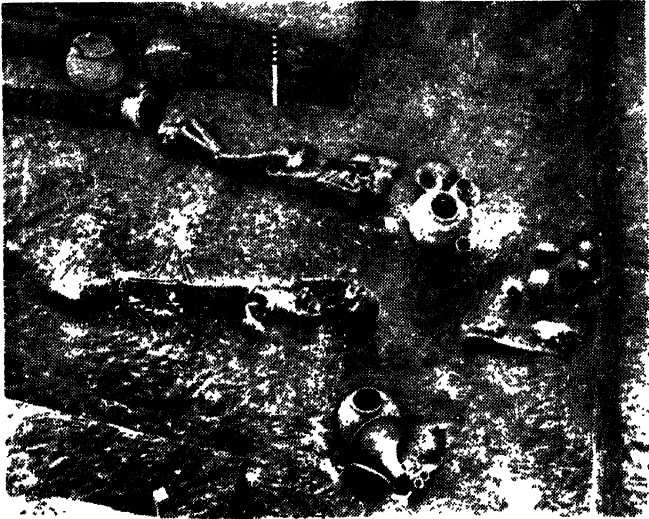
শবসমাধি

(ক)

পূর্ণ শবসমাধি
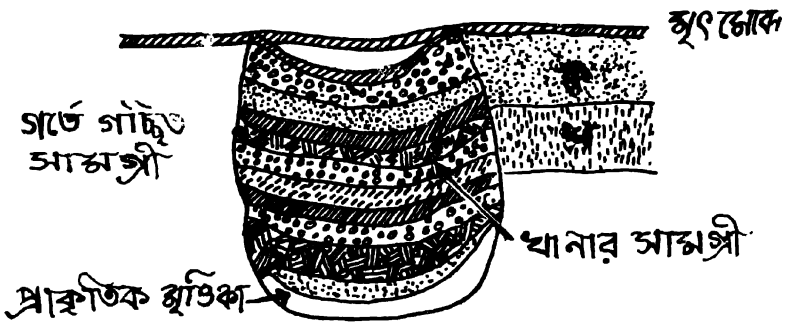
(খ)

আবর্জনা-খানাঃ ছেদস্তরের চিত্র

(মেঝে, সামগ্রী ইত্যাদি)
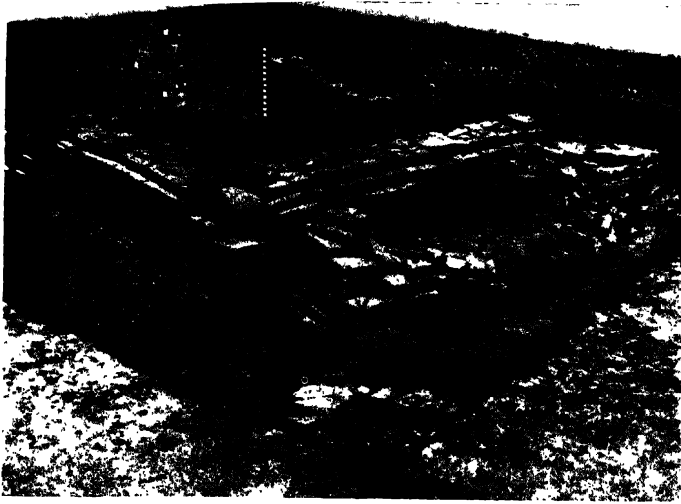
(ক)

আবেষ্টন-দেওয়ালের নিদর্শন

(খ)
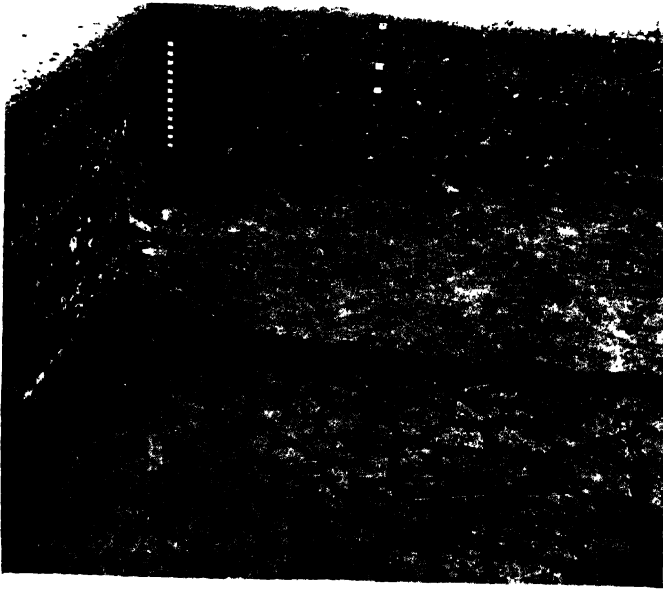
ইষ্টকখণ্ড-নির্মিত মেঝে : দুরমুশকৃত সুরকি ও চুনের পলেস্তারা

রাজবাড়িডাঙ্গায় উৎখননের দৃশ্য

(ক)

উৎখনন-ক্ষেত্র : অনুভূমিক পাদবিন্যাস ও জালাকার খাদে খননকার্যেরত কর্মীবৃন্দ
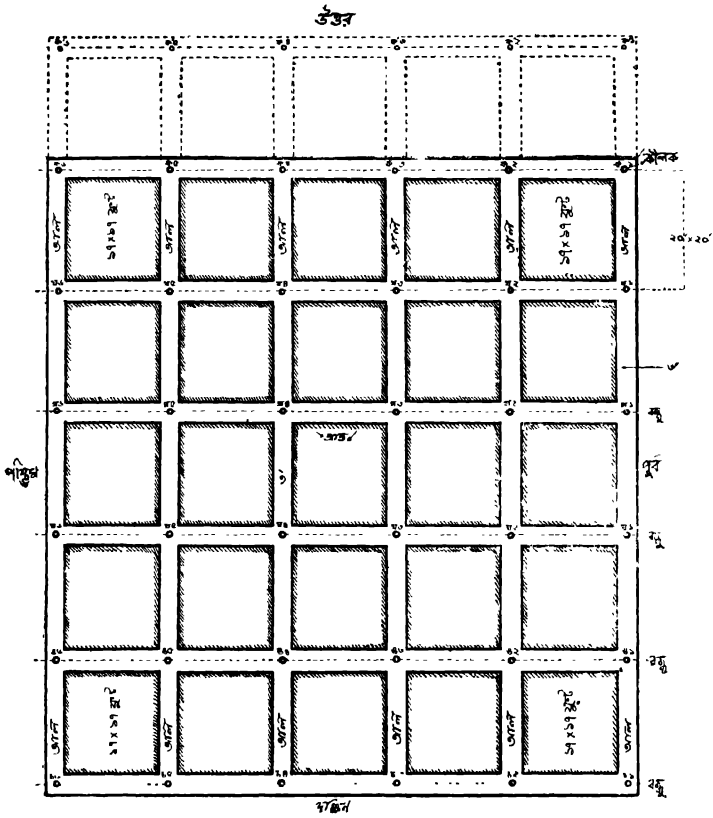
(খ)

উৎখনন-ক্ষেত্র : [illegible]

খাদবিন্যাস

অনুভূমিক উৎখনন-পদ্ধতি : জালাকার খাদবিন্যাসের রেখাচিত্র

চিত্র নং ১৩

খাদবিন্যাস

উর্দ্ধাধঃ উৎখনন-পদ্ধতি : খাদবিন্যাসের রেখাচিত্র

উৎখনন ও ছেদস্তর-চিত্রণ

(ক)

(খ)

(ক) মহাশ্মীয়ক্ষেত্র-উৎখনন, ব্রহ্মগিরি
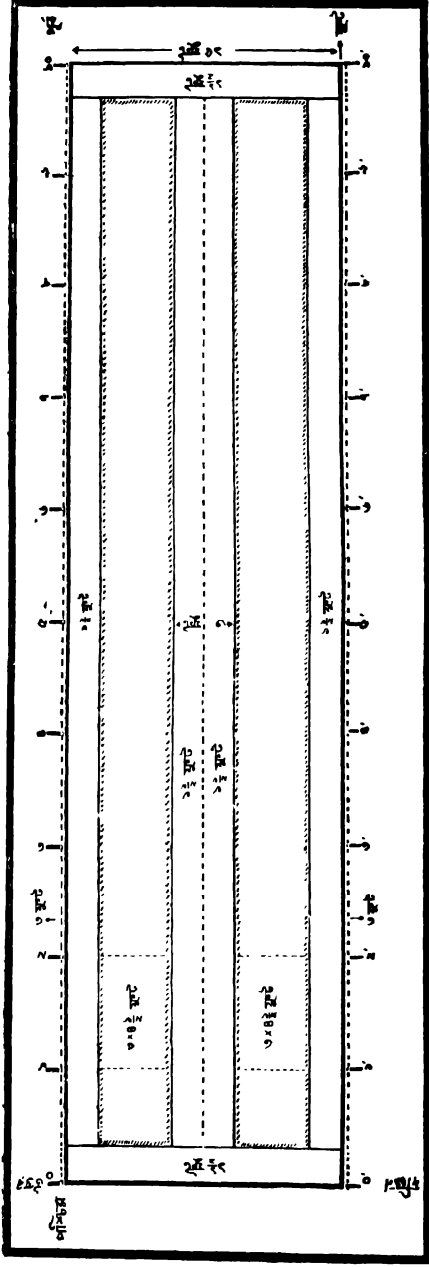
(খ) উল্লম্ব ছেদস্তরের রেখাচিত্র, ব্রহ্মগিরি
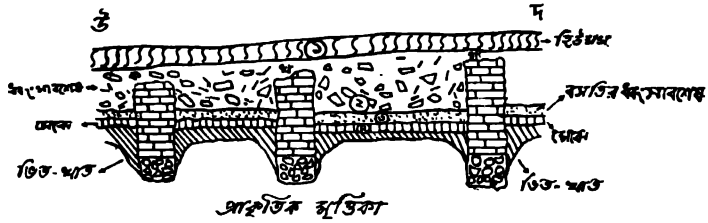
(ক)

ছেদস্তর-চিত্রণ ঃ একক পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল ও সংশ্লিষ্ট নিদর্শনের রেখাচিত্র
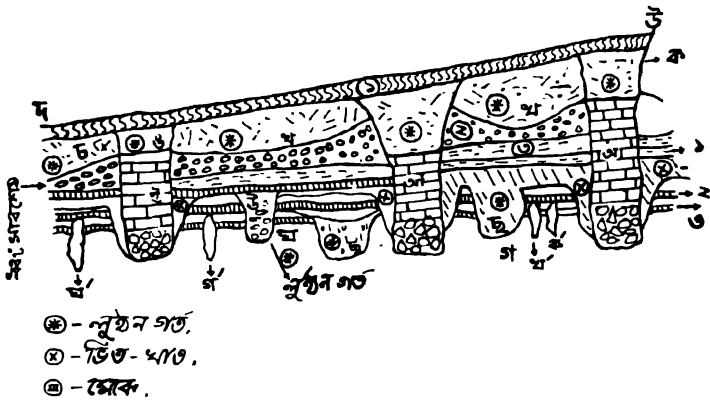
(খ)

ছেদস্তর-চিত্রণ ঃ একাধিক পর্যায়ভুক্ত দেওয়াল ও সংশ্লিষ্ট নিদর্শনরাজির রেখাচিত্র

রাজবাড়িডাঙ্গায় উৎখননের দৃশ্য

চিত্র নং ১৬

(ক) প্রাক-উৎখননক্ষেত্র : পরীক্ষণকার্যেরত উৎখনন-দলের সদস্যবৃন্দ

(ক)

(খ) একক খাদে উৎখননকার্যে নিযুক্ত খাদ-চালক ও শ্রমিকবৃন্দ

(গ) অধিক সংখ্যক খাদে উৎখনন-কার্যেরত কর্মীবৃন্দ

(গ)

চিত্র নং

রাজবাড়িডাঙ্গায় উৎখনন

(ক) রাজবাড়িডাঙ্গা : মৃৎস্তর-বিন্যাসের নির্দেশ-প্রদানেরত খাদতদাবকদ্বয়

(ক)

(খ)

(খ) রাজবাড়িডাঙ্গা : মৃৎস্তর-বিন্যাসের নির্দেশ-প্রদানেরত খাদতদাবক

(ক)

স্তরবিন্যাস-নির্দেশিকা ঃ লেভ্‌লকৃত অপ্রকৃত স্তরবিন্যাসের রেখাচিত্র

(খ)

স্তরবিন্যাস-নির্দেশিকা ঃ মৃত্তিকাস্তরানুসারে নির্ধারিত স্তরবিন্যাস

(ক)

বাস্তু-নিদর্শন ঃ সৌধধ্বংসাবশেষ ও সংশ্লিষ্ট স্তরবিন্যাসের রেখাচিত্র

(খ)

বাস্তু-নিদর্শন ঃ দেওয়াল ও অসংস্পৃষ্ট স্তরবিন্যাসের রেখাচিত্র

ঙ্গ।
চ্ছেদস্তর-চিত্রণ
1 0 1 2
SCALE IN F
রাজব
(ইষ্টকনির্মি
E
2
3
IV
17
31
16
22a
V
7
II

ড়িডাঙ্গার উৎখনন

চিত্র নং ১৪

চ সৌধনিদর্শনের বাস্তু-নক্শা)

রাজবাড়িডাঙ্গার উৎখনন

(দেওয়ালের আনুলম্বিক প্রস্থচ্ছেদ-চিত্রণ

BOTTOM LINE OF CORNICE

STAIR CASE. III

PLATFORM LEVEL. PH. III

চিত্র নং ২৬

·PLATFORM. II

চিত্র নং ২৭

রাজবাড়িডাঙ্গায় উৎখননের দৃশ্য

ছেদস্তর-চিত্রণে রত জরিপকারী

(খ)

আলোকচিত্র-গ্রহণকার্যে রত আলোকচিত্র-গ্রহণকারী

রাজবাড়িডাঙ্গায় উৎখননের দৃশ্য

(ক)

উৎখনিত খাদ-আবরণকার্যেরত শ্রমিকবৃন্দ

(খ)

সমতল-দর্শক বুদ্বুদ-নিবদ্ধ ত্রিকোণ-সাধিত্র

চিত্র নং ১৯

মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের বিন্যাস

মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণ-বিন্যাসের রেখাচিত্র

মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণ

(ক)

মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের দৃশ্য

(খ)
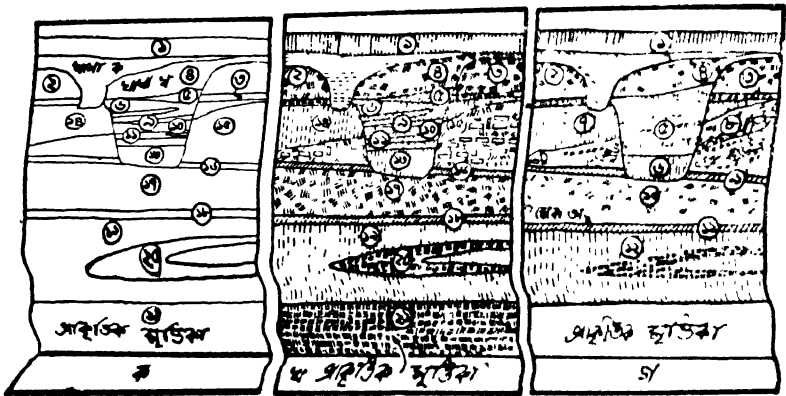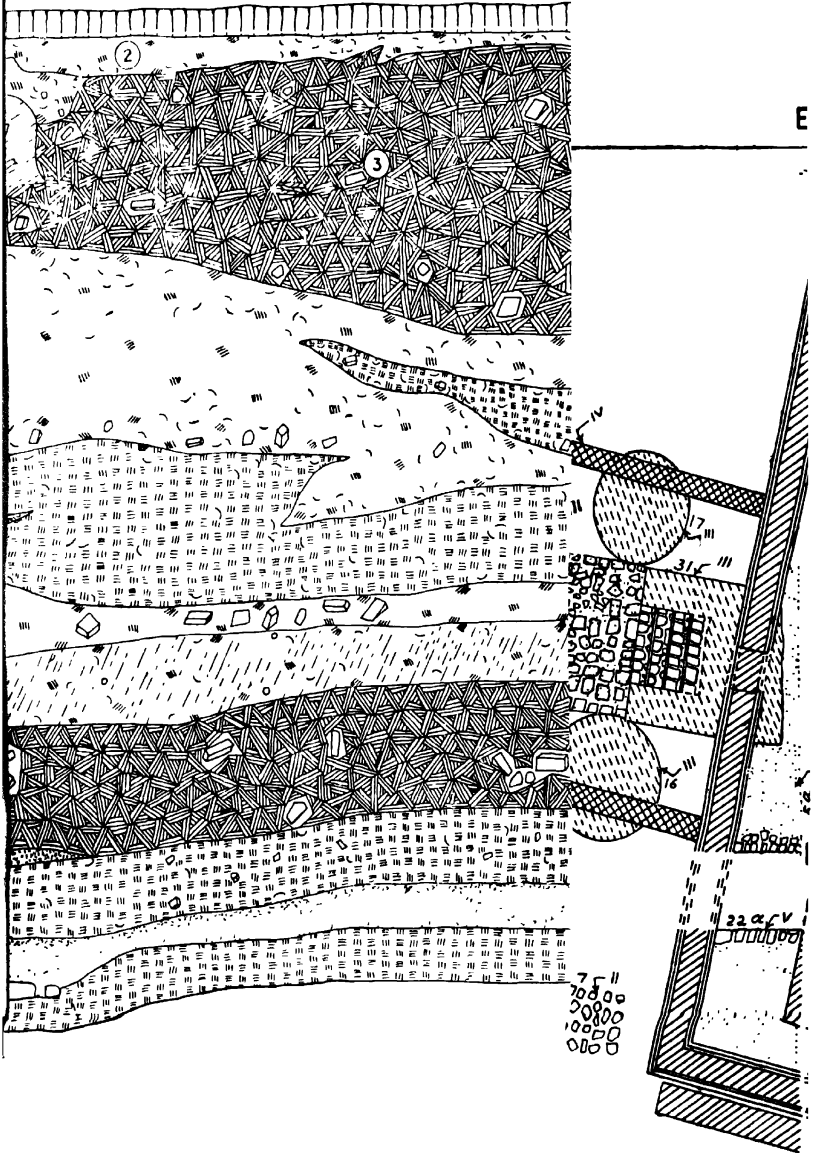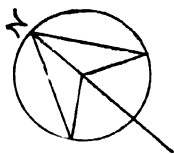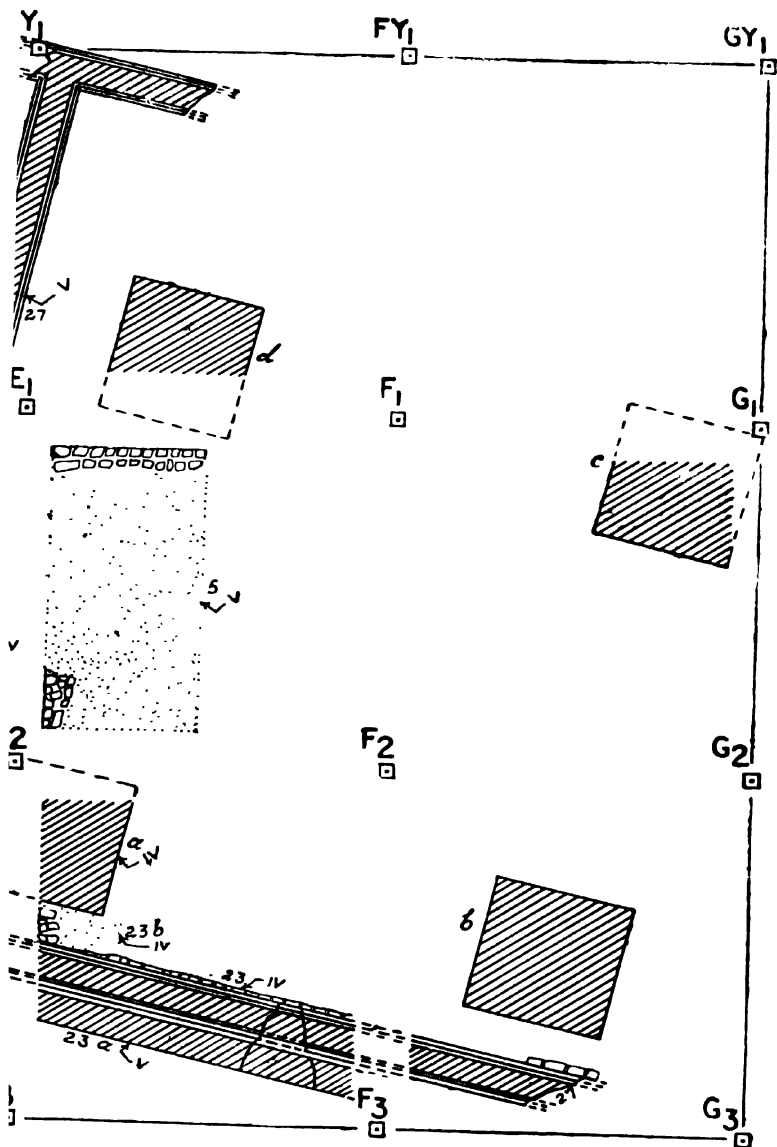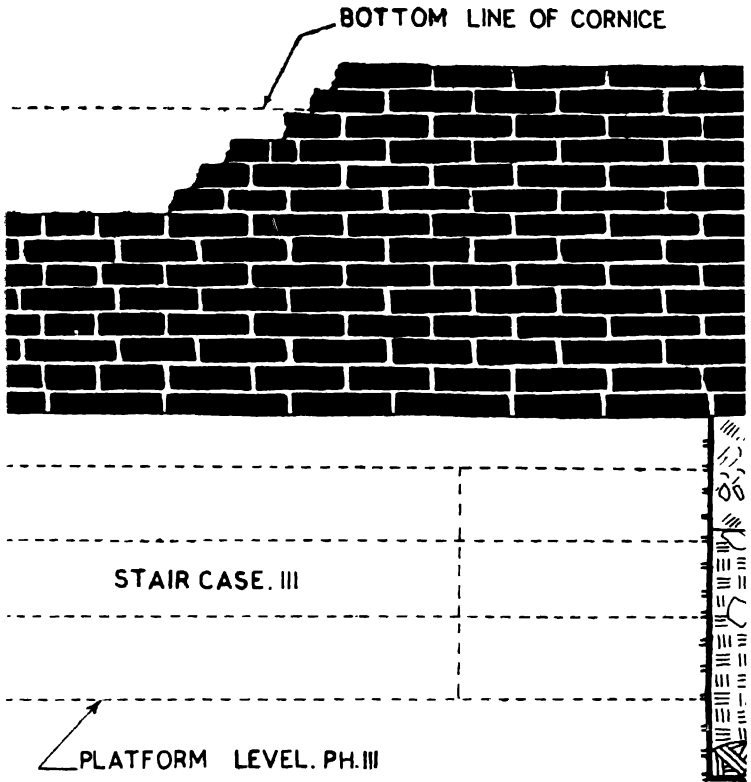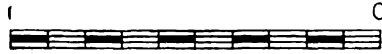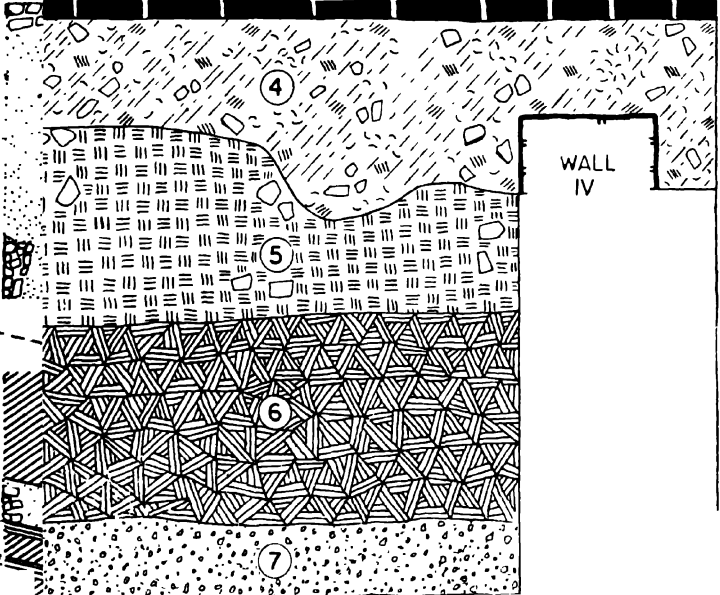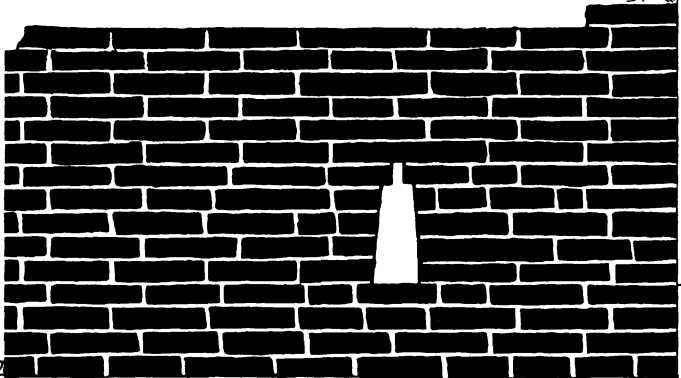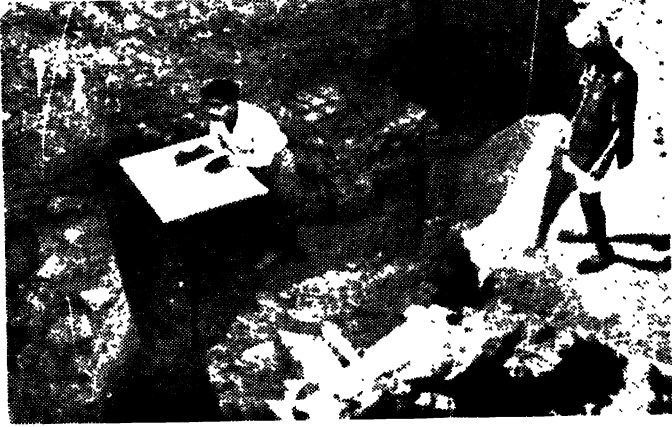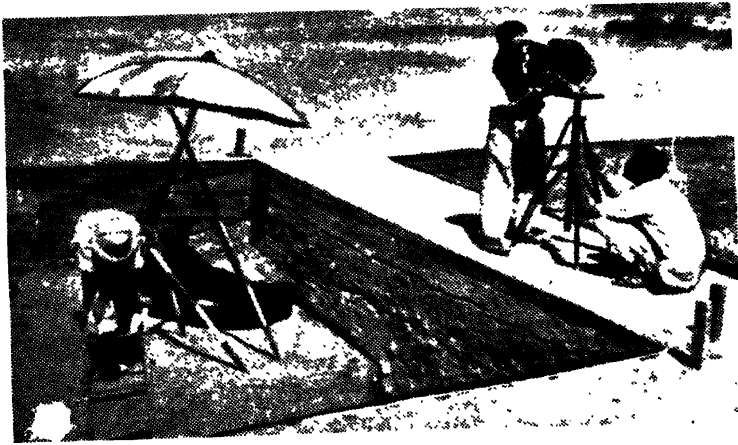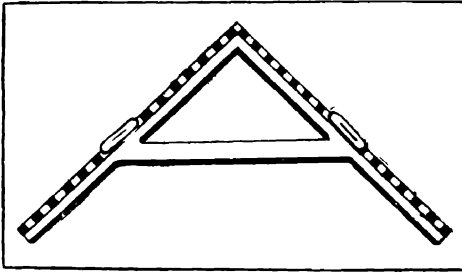
মৃৎপাত্র-প্রাঙ্গণের অপর একটি দৃশ্য

রাজবাড়িডাঙ্গায় উৎখননের দৃশ্য

(ক)

দৈর্ঘ-প্রস্থ-বেধ পরিমাপ-গ্রহণের দৃশ্য

(গ)

মেঝের তলে বিন্যস্ত মৃৎপাত্র-উৎখননের দৃশ্য

রাজবাড়িডাঙ্গায় উৎখনন

লেখসম্বলিত পোড়ামাটির সীল
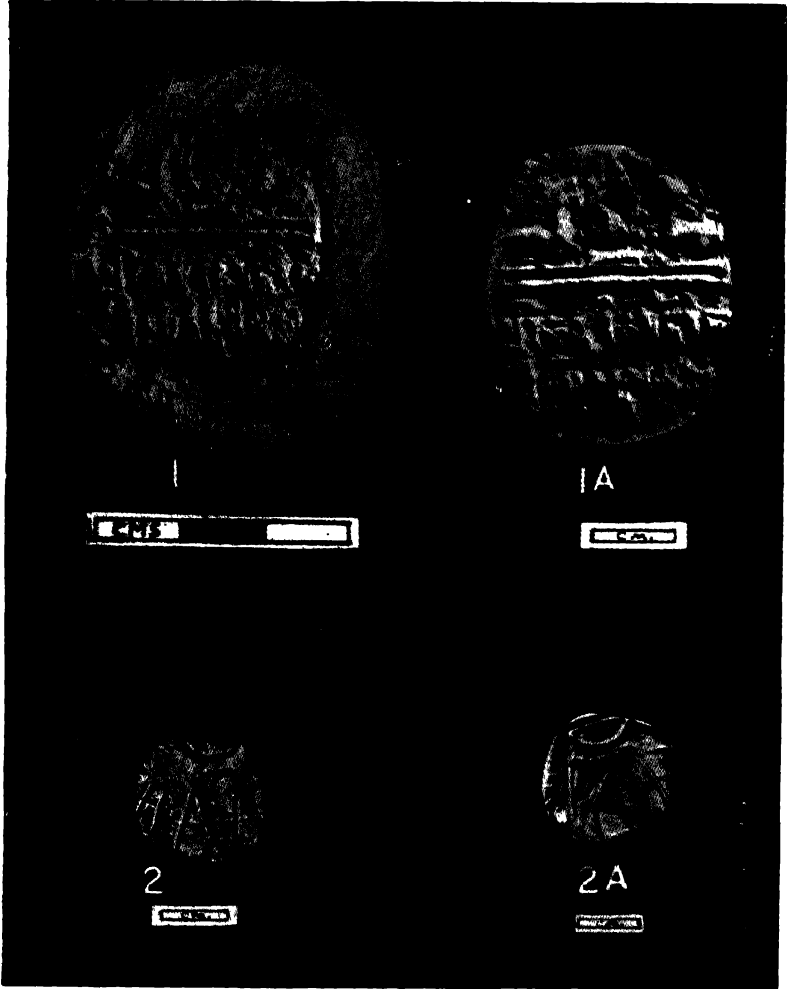
1, 1A ধর্মচক্র ও হরিণযুগল এবং নিম্নে দুই ছত্রে লেখ : রক্তমৃত্তিকা-মহাবিহারের ভিক্ষুসঙ্ঘের সীল ;

2, 2A রোমক অক্ষরে লিখিত গ্রীক্ দেবীর নাম।

উল্লেখপঞ্জি

অ

ই

ঊ

ঋ

এ

খ

ঘ

চ

ঝ

ট

ড

ঢ

ত

ধ

ন

প

ভ

শ

হ

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নির্ঘণ্ট			
৪	১৯	তেজ স্ক্রয়	তেজস্ক্রিয়
৭	৩	মৃত্তিকা-স্তরা ন্যাস	মৃত্তিকা-স্তরবিন্যাস
,,	১১	তাপক্রিয়-বিশ্লষণ	তাপক্রিয়া-বিশ্লেষণ
,,	১৪	বিজ্ঞন-পদ্ধতি	বিজ্ঞান-পদ্ধতি
৭	১২	অন্তালখিত	অন্তর্লিখিত
৵	২২	।কন্তু	কিন্তু
।০	১৮	বিশ্বর	বিশ্বের
।০	২২	আধষ্ঠান	অধিষ্ঠান
।/	১০	জ্ঞানের	বিজ্ঞানের
॥/	১৫	ত্রুট	ত্রুটি
॥/	১৬	সংশোধন	সংশোধন
॥/	১৫	রীদূকরণের	দূরীকরণের
॥৵	১	হইয়ছে	হইয়াছে
৸/	১২	নিষ্ঠ-সহকারে	নিষ্ঠা-সহকারে
৸৵	২২	গ্রন্থ-রচনায়	গ্রন্থ-রচনায়
৸৵	২২	ব্রতা	ব্রতী
ছ	২০	অনুশালন	অনুশীলন
ছ	২৫	এক্সক্যাভেস	এক্সক্যাভেসন্
জ	১৭	পুরাদির্শন	পুরানিদর্শন
ঞ	৯	বৈজ্ঞনিক	বৈজ্ঞানিক
ণ	৫	রীতিনাতি	রীতিনীতি
ধ	৫	তম্র/ব্রোঞ্জ	তাম্র/ব্রোঞ্জ
ভ	১০	অনক	অনেক

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১৭	খননকারীগণ	খননকারিগণ
১৪	১৪	প্রত্নতত্ত্ব	প্রত্নতত্ত্বীয়
১৫	১৬	প্রত্নতত্ত্ব	প্রত্নতত্ত্ব ও
১৬	৩	দিনে	দিকে
১৭	৭	নিধারিত	নির্ধারিত
২৮	১৮	(চিত্র নং ২খ)	(চিত্র নং ২ঙ)
২৯	—	আবিষ্কার পঃথ নির্দেশ	আবিষ্কার ঃ পথনির্দেশ
৩১	২১	পর্যবেক্ষণ	পর্যবেক্ষণ ও
৩৩	১৩	করা নির্ণয়	নির্ণয় করা
৪২	৪	(ক)	(ঝ)
৪৫	৭	জরিকপারী	জরিপকারী
৪৭	২৪	উৎখননের	উৎখননের
৪৯	১৭	স্হন	স্হান
৫৬	২৪	উধর্বাধ	ঊধর্বাধ
৫৭	৮	বাঙ্গনায়	বাঞ্ছনীয়
৫৮	১৭	সামঞ্জস্যতা	সামঞ্জস্য
৬৬	২৪	বিধেয়	বিধেয়।
৬৭	১১	(চিত্র নং ১১ক)	(চিত্র নং ১৪)
৭৫	৮	(ঘ)	(খ)
৭৭	১	একট	একটি
৭৯	১১	খাদবিন্যাস	খাদবিন্যাসকে
৮২	৪	উধর্বাধ	ঊধর্বাধ
৮৪	১২	,,	,,
,,	১৮	,,	,,
,,	২৬	,,	,,
,,	১১	যায় না	যায় না।
৯১	৬	অপসরণকার্যে	অপসারণকার্যে
৯২	২৩	মসয়	সময়

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৩	১৯	খাদ্যাংশে	খাদাংশে
৯৪	২৩	(চিত্র নং ১৬)	(চিত্র নং ১৭)
৯৫	২	পরবর্তী	পরবর্তী-স্তর
৯৬	১৬	মেঝ নং ৩	মেঝে নং ১
৯৬	২২	উপর্যপরি	উপর্যুপরি
৯৯	২৯	খাদনখন	খাদখনন
১০৪	১	সীলমোহর ৮ নং	সীল মোহর ৯ নং
১০৪	২	মুদ্রা ৯ নং	মুদ্রা ৮ নং
১০৭	৯	সংষ্কৃতি	সংস্কৃতি
১০৯	৯	॥ ১০ ॥	॥ ৯ ॥
১১২	৫	ভূতত্ত্বীয়	ভূতত্ত্ব
১১৭	৫	॥ ১১ ॥	॥ ১০ ॥
১২১	২	(চিত্র নং ২৩)	(চিত্র নং ২৪)
১২১	৩	(চিত্র নং ২৪)	(চিত্র নং ২৩)
১২৪	৬	(চিত্র নং ২৫)	(চিত্র নং ২৬)
১২৪	১২-১৩,১৮	চিত্র নং ১৯-তে	চিত্র নং ১৯১-তে, ১৯১ক
১২৫	১০	চিত্র নং ১৯ গ-তে	চিত্র নং ১৯১ গ-তে
১২৬	২৭	চিত্র নং ১৯ খ	চিত্র নং ২৭ খ
১২৭	১২	চিত্র নং ১৯ খ	চিত্র নং ২৭ খ
১২৯	১	উল্লেখনায়	উল্লেখনীয়
১৩০	৪	মদিত	মর্দিত
১৩৭	১৬	। ১০ ।	। ১১ ।
১৩৯	১০	বাস্তুনিদর্শন	বাস্তুনিদর্শনকে
১৫২	১৬	লোহদ্রব্য	লৌহদ্রব্য
১৬৪	১৯	(ঙ)	(চ)
১৬৪	১৮	চিত্র নং ৩০	চিত্র নং ৩১
১৭৭	২	নহে	নহে।
১৯৯	৬	অনিদিষ্ট	অনির্দিষ্ট
২০৭	৯,১০	ফোটো	ফটো
২১৫	২১	নাচিফুকান	নাচিকুফান
২২৬	৭	অনুশালনের	অনুশীলনের
২৩৪	৯	দ্বার	দ্বারা

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪২৩	৬	প্রস্তর-পেষণা	প্রস্তরপেষণী
৪২৩	২৭	প্রাগিতিহাস	প্রাগৈতিহাস
৪২৪	১	ফোটো	ফটো
৪২৪	২০	Ring marts	Ring marks
৪২৫	২৭	Psychologit	Psychologist
৪৩২	৫-৬	Photoygraphy	Photography
৪৩৩	২২	গ্রাড	গ্রীড
৪৪৫	১২	বাল্মিকী	বাল্মীকি
৪৪৭	৫	রাড	রীড
৪৪৯	২০	ওয়াডি-এন-না-টুক	ওয়াডি-এন-না-টুফ Wadi-en-na-tuf
৪৪৯	২৮	দাক্ষণ	দক্ষিণ
৪৫১	১	জাপান, গ্রাক	জাপান, গ্রীক
৪৫২	১৮	Byzntine	Byzantine
৪৫২	৮	খাশিয়া	প্রাশিয়া
৪৬৩	২৪	19	1954

উদ্ধারণ, সনাক্তকরণ, মেঝ, দূরমুজ, পলস্তার, নির্দিষ্টকরণ, পৃথককরণ, স্থিরকৃত, এবং স্থিরকরণ শব্দ সকলের পরিবর্তে উদ্ধরণ সনাক্তীকরণ, মেঝে, দুরমুশ, পলেস্তারা, নির্দিষ্টীকরণ, পৃথকীকরণ, স্থিরীকৃত এবং স্থিরীকরণ পঠনীয়।